দেশবন্ধু

'এই যে জীবন-যজ্ঞ ইহা শুদ্ধ চিত্তে পবিত্র প্রাণে আরম্ভ করিতে হইবে। সকল বিদ্বেষ, সকল স্বার্থ ইহাতে আহুতি দিতে হইবে।'

—দেশবন্ধু, ১৯১৭

DESHBANDHU : A Bengali biography of Chitta Ranjan Das—By : Moni Bagchee

প্রথম প্রকাশ :
নভেম্বর, ১৯৬৯

প্রকাশক :
শ্রীজীবনকুমার বসু
মোহন লাইব্রেরী
৩৫-এ, সূর্য সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট :
শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত

মুদ্রাকর :
মাধবলাল দত্ত
রঘুনাথ ষ্টেশনারী প্রাইভেট লিঃ
২৪-এ, বাগমারী রোড
কলিকাতা-৫৪
প্রথম খণ্ড

বিশ্বনাথ কবিরাজ
হাতীবাগান প্রিণ্টার্স
৫৭, অরবিন্দ সরণী
কলিকাতা-৬
দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড

বাঁধিয়েছেন :
বুক বাইণ্ডিং সেণ্টার
৪০, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৯

মূল্য : টাঃ ১৫·০০

দেশবন্ধু

মণি বাগচি

মোহন লাইব্রেরী
৩৫এ, সূর্য সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

॥ এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ॥

গৌতম বুদ্ধ, রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, রমেশচন্দ্র, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, রবির আলো, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, শিক্ষাগুরু আশুতোষ, নিবেদিতা, নিবেদিতা-নৈবেদ্য, শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার, জননায়ক জওহরলাল, দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র, সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র, বীর সাভারকর, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, বাঘা যতীন, সেই বিশ্ববরেণ্য সাধক, সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী, লোকমাতা নিবেদিতা, সুধীরকুমার সেন, কেমন করে স্বাধীন হলাম, আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ, মহাচীনে নেহরু, অমর-জীবন, আমাদের বিদ্যাসাগর, নানাসাহেব, কাজলরেখা, লীলা-কঙ্ক, ছোটদের গৌতম বুদ্ধ, ছোটদের বার্ণার্ড শ, ছোটদের অরবিন্দ, ছোটদের ছত্রপতি, ছোটদের বিবেকানন্দ, ছোটদের বঙ্কিমচন্দ্র, ছাত্রদের আশুতোষ, আমাদের বীর সৈনিক, সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস, সিপাহী-বিদ্রোহ, বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, Sister Nivedita, Our Buddha, Swami Abhedananda.

॥ পরবর্তী গ্রন্থ ॥

অরবিন্দ ও অগ্নিযুগের বাংলা

স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মসমর্পিত প্রাণ,

বাংলার স্বদেশীযুগের জাতীয়তাবাদী নেতা

ও

বাংলার প্রথম অসহযোগী নেতা

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর

পূর্ণ্য স্মৃতিতে।

কালের কষ্টিপাথরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অত্যাশ্চর্য জীবন যে গভীর রেখাপাত করে গিয়েছে তা স্বীকার করতেই হবে। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 'দেশবন্ধু' একটি অবিস্মরণীয় নাম। অবিস্মরণীয় ও অতুলনীয়। ইতিহাস যদি অমরত্বের পাদপীঠ হয়, তাহলে ঐতিহাসিক বলবেন—এই পাদপীঠে দেশবন্ধুর স্থান আছে। কারণ তিনি সত্যিই অমরত্ব লাভ করেছেন।

এই শতকের প্রথম পঁচি. বছর কালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাঙালী চিত্তরঞ্জন দাশ। আবার এই সময়কার ভারতবর্ষে তিনিই ছিলেন একটি সুসংহত রাজনৈতিক চিন্তার প্রবর্তক। এই পর্বের রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেকগুলি পৃষ্ঠাই প্রকৃতপক্ষে এই মানুষটির জীবনের কাহিনী ও সেই সঙ্গে সমকালীন রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিবর্তনের পরিচয়সহ পূর্ণ থাকবে। দেশপ্রেমই ছিল তাঁর সকল রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা ও কর্মপ্রয়াসের মূল প্রেরণা। তাঁর সেই দেশপ্রেমের সঙ্গে মিলেছিল অভিনব লোকতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁর জীবনের এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য।

আমরা জানি, দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই তাঁর কাছে ছিল একমাত্র সত্য এবং এই সত্যের সাধনে তিনি তাঁর স্বল্পকালস্থায়ী রাজনৈতিক জীবনে যে অপূর্ব কৌশল ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, আজ পর্যন্ত তার একটা সঠিক মূল্যায়ন হয় নি বললেই চলে—যদিও দেশবন্ধু সম্পর্কে জীবনী-গ্রন্থের অভাব নেই। এই গ্রন্থে তাই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের কথাই বিশেষ-ভাবে আলোচিত হয়েছে।

মণি বাগচি

৯০, বাগুই আটি রোড
দক্ষিণ দমদম
কলিকাতা-২৮
নভেম্বর, ১৯৬৯

প্রথম খণ্ড

১৮৭০-১৯১৬

জাগরণ

ভাবনা ছাড়িনু তবে, এই দাঁড়াইনু আমি

যে পথে লইতে চাও—লয়ে যাও অন্তর্যামী।

ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ

চিত্তরঞ্জন দাশ

●

মহাত্মা গান্ধী

তিনি শত যুদ্ধের বিজয়ী বীর ছিলেন।

১৯১৯ সালে পাঞ্জাব তদন্ত সমিতিতে প্রথম এই মানুষটির সঙ্গে আমার সত্য পরিচয় ঘটে। আমি সমিতিতে ত্রস্ত অন্তঃকরণে সন্দেহ-সঙ্কুলচিত্তে যোগ দিয়েছিলাম। কারণ, তফাৎ থেকে তাঁর ব্যারিস্টারির যশ ও প্রচুর অর্থোপার্জনের খ্যাতি আমার কর্ণগোচর হয়েছিল; তিনি মোটরকারে পত্নী ও পরিবারবর্গসহ এসেছিলেন এবং রাজার হালেই থাকতেন, প্রথমটা এসব দেখে আমি অবশ্য খুব খুশি হই নি। হাণ্টার তদন্তের মূল সাক্ষ্যগুলির সম্বন্ধে বিচার করাই আমাদের মিলনের উদ্দেশ্য ছিল। আমি দেখেছিলাম যে, আইনের মারপ্যাচ বুঝতে, সাক্ষীকে জেরা করে নাজেহাল করতে, এবং সামরিক আইনসম্মত শাসন-প্রণালীর দোষগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল, আমি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম; কিন্তু দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হইবার পর আমার সকল সন্দেহের অবসান হলো এবং আমার আশঙ্কাও দূর হলো। তিনি যেন যুক্তির অবতার ছিলেন এবং আমার যা বলবার ছিল তা খুব আগ্রহের সঙ্গেই শুনলেন। ভারতের প্রসিদ্ধ লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হওয়া, সেই আমার প্রথম। দূর থেকে কেবল নামেই আমাদের চেনা-পরিচয় ছিল। কংগ্রেসের ব্যাপারে ইতিপূর্বে আমি বড় একটা সংশ্লিষ্টই ছিলাম না। দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য লড়েছিলাম বলেই আমার একটু আধটু যা নাম ছিল। কিন্তু আমার সহযোগিগণ সকলেই আমার সঙ্গে খুব অসঙ্কোচভাবে মেলামেশি করেছিলেন এবং সবচেয়ে বেশি মিশেছিলেন ভারতের এই বরেণ্য সন্তানটি। আমিই তদন্ত-সমিতির সভাপতি ছিলাম এবং আমাদের মতেরও প্রায় ঐক্য হয়ে আসছিল, তথাপি তাঁর প্রতি যে আমার সামান্য একটু সন্দেহ জেগেছিল সেটুকু দূর করবার জন্য তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এসে বললেন, 'যদিও

কোথাও আপনার সঙ্গে আমার মত না মেলে সেখানে আমার যা বলবার আছে তা আমি বলব, তবে এটা স্থির জানবেন যে, বিচারে যা সিদ্ধান্ত হবে তা আমি মাথা পেতে নেব।' তাঁর কথা শুনে, এমন যোগ্য সহযোগী পাবার সৌভাগ্য লাভ করেছি ভেবে বুক যেন গৌরবে ভরে গেল; তেমনি আবার নিজের মনের ক্ষুদ্রতার কথা মনে পড়াতে একটু যেন নিজেকে ছোট ভাবতে লাগলাম—কারণ আমি তো মনে মনে জানতাম যে, ভারতীয় রাজনীতিতে তখন আমি একজন শিক্ষানবীশ বললেই চলে। সুতরাং সকলের সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হবার আশা করাই আমার পক্ষে দুরাশা! কিন্তু দস্তুরমতো কাজের কাছে ছোট বড় বিচার নেই। কারণ রাজাও যখন তার কোন চাকরের উপর কোন বিষয়ের সম্পূর্ণ বিচার ভার দেন তখন তার বিচারই তিনি মেনে নেন, আমার অবস্থাও ছিল অনেকটা এই রাজবাড়ির ভৃত্যের মতো, এবং একথা লিখতে গর্বে আজ আমার হৃদয় ভরে উঠছে যে, আমার সহযোগীর মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাশের চেয়ে বেশি প্রাণ খুলে আমাকে কেউই মেনে নিতে পারেন নি।

তারপর অমৃতসরের কংগ্রেস,—সেখানে আর আমি আদবকায়দার দাবী করতে পারি নি, কারণ সেখানে আমরা ছিলাম প্রতিপক্ষ। জাতির মঙ্গলার্থে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষমতানুসারে লড়তে গিয়েছিলাম। এখানে সহজে কেউই নতি স্বীকার করতে পারেন না, তবে দলের খাতির বা যুক্তিতর্কের কথা ছিল স্বতন্ত্র। কংগ্রেসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই প্রথম যুদ্ধ করতে আমার ভারি আনন্দ হয়েছিল। মালব্যজী একবার একজনের সঙ্গে তর্ক করছেন, একবার একে অনুরোধ করছেন, এমনি করে তিনি সমতা রক্ষা করছিলেন। সভাপতি মতিলালজী ভেবেছিলেন যে, সব বুঝি শেষে ফেঁসে গেল। লোকমান্য আর দেশবন্ধুকে নিয়ে আমি বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁদের দুই দলের অনেকটা মিল ছিল এবং বাকিটুকুর জন্য অপর দলকে স্বমতে আনবার জন্য তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু কেউ কাউকে ঠিকমত রাজী করাতে পারছিলেন না। সকলেই ভাবছিলেন যে, শেষটা বুঝি একটি বিয়োগান্ত দৃশ্য হয়ে দাঁড়াবে। আলি ভাইদের আমি জানতাম এবং ভালবাসতাম—যদিও এখন তাঁদের যতটা জানি ততটা তখন জানতাম না—তাঁরা তখন আমাকে দেশবন্ধুর প্রস্তাব সমর্থন করতেই অনুরোধ করেছিলেন। মহম্মদ আলি তাঁর স্বাভাবিক বিনয়-নম্রভাবে আমায় বলেছিলেন, 'অনুসন্ধান সমিতিতে যা করেছেন এখন যেন সেটা নষ্ট করবেন না।' আমি কিন্তু তখনো

ভালরকম বুঝতে পারছিলাম না, এমন সময় জয়রামদাস দৌলতরাম নামক এক সিন্ধুবাসী এগিয়ে এসে সবদিক রক্ষা করলেন; আমি তাঁকে ভালরকম চিনতাম না। কিন্তু তাঁর মুখে-চোখে এমন একটা কিছু অস্বাভাবিক ছিল যাতে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তিনি এক টুকরো কাগজে আপোষজনক কয়েকটি প্রস্তাব লিখে আমায় দিলেন, আমি সেগুলি পড়ে দেখলাম যে সেগুলি সত্যিই উত্তম এবং সেটা দেশবন্ধুকে দিলাম। তিনি পড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, এতে আমি রাজী হতে পারি যদি আমার দল এতে স্বীকৃত হন।' দলপতির পক্ষে দলের এই আনুগত্য স্বীকার—দলকে খুশি রাখার চেষ্টা যে তাঁর কত বেশি ছিল, তা এ থেকেই বেশ বোঝা যায় এবং লোকের উপর যে আশ্চর্য প্রভাব তিনি বিস্তার করতে পারতেন এই-ই তার গূঢ় কারণ ছিল। ক্রমশঃ সেই কাগজটি অনেকেই দেখলেন। এসব ব্যাপার শ্যেন-চক্ষু লোকমান্যের দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। বেদী থেকে মালব্যজীর বক্তৃতাস্রোত ভাগীরথী প্রবাহের মতো গম্ভীরনাদে প্রবাহিত হচ্ছিল, আর আমরা সবাই এক টুকরো কাগজ নিয়ে তখন জাতির ভাগ্য-নির্ণয়ে ব্যস্ত ছিলাম। লোকমান্য বললেন, 'আমি ও দেখতে চাই না, দাশ যদি ওটা অনুমোদন করে থাকেন, তবে আমার অনুমোদনও হয়ে গিয়েছে।' মালব্যজী তা শুনতে পেয়ে কাগজখানা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঘোষণা করলেন যে, আপোষ হয়েছে—অমনি চারদিক থেকে এমন আনন্দধ্বনি উঠল যে, কান ঝালাপালা হয়ে যায় আর কি। এসব ব্যাপারের সব খুঁটিনাটি বলবার উদ্দেশ্য এই যে, এর ভিতর দাশের মহত্ত্ব, তাঁর দলপতিত্বের সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্যতা, কার্যে দৃঢ়তা, বিচারে যুক্তি মানার স্বভাব এবং দলের প্রতি অনুরক্তি প্রভৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়।

তারপরের সব কথা—জুহু, আমেদাবাদ, দিল্লী ও দার্জিলিং-এর কথা। জুহুতে তিনি ও মতিলালজী আমাকে তাঁদের মতে আনবার জন্য এসেছিলেন—তখন তাঁরা যেন দুটি যমজ ভাই হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বিভিন্ন। তাঁরা আমার সঙ্গে অনৈক্য সহ্য করতে পারতেন না, তা যদি করতেন তাহলে আমি তাঁদের পঁচিশ মাইল তফাতে যেতে বললে তাঁরা পঞ্চাশ মাইল দূরে চলে যেতেন।

কিন্তু দেশের মঙ্গল যেখানে জড়িত, সেখানে তাঁরা অতি প্রিয় বন্ধুকেও কোন কারণে ছেড়ে দিতে পারতেন না। আমাদের একরকম আপোষ হলো—আমরা বেশ প্রাণ খুলে খুশি হতে পারলাম না, কিন্তু তা বলে নিরাশও হই নি।

আমরা পরস্পরকে জয় করবার জন্য প্রাণপণ করছিলাম। তারপর, আবার আমেদাবাদে সাক্ষাৎ। দেশবন্ধু প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন এবং কূটকৌশলীর মতো চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন—তিনি আমাকে চমৎকার হারিয়ে দিলেন। তিনি বেঁচে থাকলে তাঁর কাছে আরো কতবার হয়ত হারতাম এবং আনন্দ পেতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, আজ আর তিনি শরীরী নন। দিল্লীতে আবার সাক্ষাৎ করা আবশ্যক হলো, সেখানে তাঁর ভীষণ দংষ্ট্রা ও মধুর কান্তি নিয়ে পণ্ডিত মতিলাল আর বিনয়নম্র দাশ—যদিও বাইরের লোকে তাঁর বাইরের দিকটা দেখে তাঁকে অনেক সময় উদ্ধত বলে ভুল করতো—রাজীনামার খসড়া প্রস্তুত করলেন এবং অনুমোদিত হলো। এই চুক্তিবন্ধন এক্ষণে একজনের মৃত্যুতে চিরদিনের জন্য অচ্ছেদ্য হয়ে গিয়েছে।

দার্জিলিং-এর কথা বলব—একটু পরেই। তিনি প্রায়ই আত্মার শক্তি সম্বন্ধে অনুশীলন করতেন এবং বলতেন যে, ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর ও আমার সঙ্গে কোনরূপ বৈধ নেই। তিনি স্পষ্ট না বললেও হয়ত মনে করতেন যে, আমাদের উভয়ের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে ঐক্য দেখতে পাবার মতো কবিত্ব আমাতে ছিল না। আজ বুঝতে পারছি তাঁর অনুমানই ঠিক; কারণ দার্জিলিং-এ যে পাঁচদিন আমি ছিলাম, তাঁর প্রত্যেক কাজেই তিনি প্রমাণ করতেন যে, তিনি ধর্মে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি কেবল মহৎ ছিলেন না, উপরন্তু সৎ ছিলেন এবং দিন দিন তাঁর সদাচরণ বর্ধিত হচ্ছিল। কিন্তু আজ আর নয়, এই পাঁচদিনের স্মৃতি নিয়ে আমি পরে আরো কিছু বলবো। লোকমান্যের মৃত্যুতে আমি নিঃসঙ্গ, দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, এমন কি আজো তার আঘাত সামলাতে পারি নি। কিন্তু দেশবন্ধুর তিরোধানে আমার অবস্থা আরো খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ লোকমান্যের পরলোকগমনের সময়ে দেশে হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য ছিল এবং সকলের প্রাণে আশা ভরসাও খুব ছিল, তখন যেন আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু আজ? *

শুধু বাংলাদেশের উপর নয় সমগ্র ভারতবর্ষের উপর দেশবন্ধুর অসীম প্রভাব ছিল। ভারতের জনসাধারণের তিনি প্রিয় ছিলেন। তাঁর অসাধারণ ত্যাগ ছিল। তাঁর উদারতারও সীমা ছিল না। তাঁর প্রেমময় হস্ত সকলকে গ্রহণ করবার জন্যই প্রসারিত ছিল। তিনি যেরূপ মহাপ্রাণ ছিলেন, তেমনি নির্ভীক

* ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৫শে জুন, ১৯২৫

ছিলেন। তাঁর জন্মভূমির প্রতি তাঁর অপরিসীম অনুরক্তি ছিল। তিনি দেশের জন্য জীবন দান করছিলেন। তিনি অপরিসীম শক্তিশালী দলগুলিকেও সংযত রেখেছিলেন। তাঁর অদম্য উৎসাহ ও ধৈর্যের প্রভাবেই তিনি তাঁর দলকে শক্তিশালী করেছিলেন। এই অপরিসীম উদ্যমের জন্যই তাঁকে জীবন দান করতে হলো। এই স্বেচ্ছায় ত্যাগ—অতি মহান্। তাঁর এই গৌরবজনক মৃত্যুতে কি সমস্ত অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ দূরীভূত হবে না? যে অগ্নিতে দেশবন্ধুর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়েছে সেই অগ্নিতেই যেন এই নশ্বর অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং ভয় ভস্মীভূত হয়ে যায়। দেশবন্ধু হিন্দু-মুসলমান মিলনের অনুরাগী ছিলেন এবং তাতে বিশ্বাস করতেন। তিনি নিতান্ত সংকট সময়েও হিন্দু ও মুসলমানকে সম্মিলিত রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর চিতাগ্নি কি আমাদের অনৈক্যকে ভস্মীভূত করতে পারে না? দেশবন্ধুর স্বপ্নকে সফল করে তুলে স্বরাজ-সৌধের শিখরে আরোহণ করা সম্ভবপর না হলেও অন্ততঃ এর সোপানে অবিলম্বে কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে তাঁর জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষাকে সফল করে তুলবার দায়িত্ব আমাদিগকেই অর্থাৎ শিক্ষিত ভারতবাসীদিগকেই গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই আমরা হৃদয়ের অন্তস্তল হতে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারব যে, 'দেশবন্ধু মরেন নি—দেশবন্ধু চিরজীবী হোন।' *

* ফরওয়ার্ড, ১৭শে জুন, ১৯২৫।

'আমি সেই সময়ের অপেক্ষা করিতেছি যখন আমরা আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব। আমি সেই সময়ে নশ্বর দেহে বাঁচিয়া থাকি আর না থাকি, আমার সন্তান-সন্ততি জীবিত থাকুক কি না থাকুক, কিন্তু আমি দেখিতেছি অদূর ভবিষ্যতে ভগবৎ-প্রসাদে আমরা এমন শক্তি লাভ করিব যে এক মহিমান্বিত জাতিরূপে আমরা সকল ঐশ্বর্যে ভূষিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখীন হইতে সক্ষম হইব। এই আমার ব্রত, আমি বিশ্বাস করি, ভগবান এই ব্রতের উদ্‌যাপনে আমাকে এখানে নিয়োগ করিয়াছেন। যদি এই সংগ্রামে মৃত্যুকেও আমার আলিঙ্গন করিতে হয় তাহাতেই বা কি আসে যায়? এই দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু আবার আসিব, আবার সমস্ত শক্তি দেশের কার্যে নিয়োগ করিব, যে পর্যন্ত সিদ্ধিলাভ না হয়, আবার এইভাবেই দেহপাত করিব।'

—দেশবন্ধু (১৯১৮)

॥ এক ॥

ইতিহাসের মহাবীর দেশবন্ধু।

বিধাতার একটি প্রেক্ষণীয় চরিত্র-সৃষ্টি তিনি।

উন্নত গগনচুম্বী শৈলশৃঙ্গের মতো তাঁর বহুভঙ্গিম চরিত্র সকলের উর্ধ্বে অবস্থিত।

তাঁর সমগ্র জীবনটা যেন বৈষ্ণবের আত্মাহুতি—সর্বেশ্বরের চরণে সর্বস্ব সমর্পণ।

সেই জীবনের কাহিনী বলবার আগে, অথবা সেই চরিত্রের মহিমা উপলব্ধি করবার আগে, তার একটা প্রাথমিক রূপরেখা আঁকবার চেষ্টা করবো। তাঁর লোকান্তর গমনের পর সুদীর্ঘ কাল, প্রায় অর্ধশতাব্দী বললেই চলে—অতিক্রান্ত হলো। আজ বোধ হয় আমরা তাঁর প্রতিভার একটা হিসাব-নিকাশ করতে পারি। দেশবন্ধুর জীবন ও তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ বা মতবাদের একটা সঠিক মূল্যায়ন আজ হওয়া দরকার, কারণ তাঁর জীবিতকালে অনেক বিষয়েই আমরা তাঁকে ভুল বুঝেছি এবং অন্যকেও ভুল বুঝিয়েছি। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেই আমরা এই রূপরেখা আঁকবার প্রয়াস পাব, কারণ দেশের সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে বাদ দিয়ে তাঁর বিষয়ে কিছু আলোচনা করা নিষ্ফল। উইল ডুর‍্যাণ্ট বলেছেন, 'Man is the maker of history.'* আমরা জানি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায় রচনা করেছেন দেশবন্ধু। তিনি ইতিহাসের মহাবীর, কারণ তিনিই মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায়ের স্রষ্টা।

* *The Lessons of History* : **Will Durant.**

কোনো মানুষের মহত্ত্বের বিচার করতে হলে দেখতে হয়, তিনি কোন্ উদ্দেশ্য সাধনে নিজের শক্তি প্রয়োগ করেছেন, সমস্ত শক্তি তাতে প্রয়োগ করেছেন কিনা এবং সেই উদ্দেশ্যে সমস্ত শক্তি প্রয়োগের সমস্ত বাধা বিনষ্ট করেছেন কিনা। আমরা দেখেছি, দেশবন্ধু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চাইতেন। এটা তাঁর পরিণত বয়সের অভিব্যক্তি ছিল না। তাঁর জীবনেতিহাসেই দেখা যায়, বিলাতে ছাত্রাবস্থায় তিনি ভারতবিদ্বেষী ইংরেজদের আচরণের প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করেন নি। তিনি চিরকালই স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন। প্রথম জীবনে স্বয়ং স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত না থাকলেও, যাঁরা সেই উদ্দেশ্যে কাজ করতেন তাঁদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় অনেককেই তিনি আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য করতেন। দেশের নানাবিধ রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁর বরাবরই যোগ ছিল, এমন কি দেশের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা দূর করবার আন্তরিক ইচ্ছাও তিনি পোষণ করতেন। ১৯২০ সনের আগে গান্ধীর নেতৃত্বে দেশে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত তিনি অবশ্য দেশের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন নি। ব্যারিস্টারি পাস করার পর তিনি কম-বেশি কুড়ি-পঁচিশ বছর অর্থোপার্জনে ও সাহিত্যচর্চায় অতিবাহিত করেন। তারপর তিনি যখন রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন তখন আইনব্যবসায় চিরদিনের মতো পরিত্যাগ করেন এবং তখন থেকেই তাঁর সময় ও শক্তির উপর স্বদেশ ও স্বজাতি ভিন্ন অপর কারো দাবী ছিল না।

সর্বস্ব, এমন কি নিজের জীবন পর্যন্ত, আহুতি দিয়েই তিনি যেন দেশের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা দূর করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ঠিক এইভাবে তাঁর আগে আর কোন নেতাকে আমরা পাই নি। সর্বত্যাগী দেশবন্ধু তাঁর সর্বস্ব দিয়ে ভারতের মুক্তি-ঋণ শোধ করে নেতৃত্বের একটা নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। রাজনীতিতে ঝাঁপ দেওয়ার আগে তিনি প্রায়ই বলতেন—'সর্বস্ব বিসর্জন দাও, নইলে এ খেলার দরকার নেই।' এ উপলব্ধি কোনো সুযোগ-সন্ধানী বা পেশাদার

নেতার নয়, সর্বতোভাবেই এ ছিল একজন সর্বত্যাগী সাধকের উপলব্ধি। নিছক গলাবাজির রাজনীতি বা আবেদন-নিবেদনের রাজনীতির দিন তখন শেষ হয়ে এসেছে। ইতিহাসের সেই ক্রান্তিলগ্নে প্রয়োজন হয়েছিল এমন একজন নেতার যাঁর মধ্যে দেখা যাবে যুগপৎ অনির্বাণ প্রাণবহ্নি আর বৈষ্ণবের আত্মাহুতি। সেই প্রত্যাশিত নেতাকে আমরা পেলাম দেশবন্ধুর মধ্যে।

হৃদয়ের অনন্ত ঐশ্বর্যে বিভাসিত তাঁর মূর্তি।
মুক্তির যজ্ঞশালায় তিনিই ছিলেন একনিষ্ঠ তাপস।
আত্মপ্রত্যয়ের জ্যোতির্ময় পুরুষ।
পুরুষাকারের মূর্ত বিগ্রহ।

বাঙালীর ইতিহাসে তিনিই ছিলেন সেদিন সর্বভারতীয় নেতৃত্বের একমাত্র অধিকারী পুরুষ। ভারতের রাজনীতিতে অসম্ভবকে তিনিই সম্ভব করেছেন—দুর্বার শক্তিতে তিনি দ্বৈতশাসন অচল করে শাসক-জাতির প্রাণে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কৌশল ও দূরদর্শিতায় সার্থক তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভা। তাঁর সত্তার শিকড়ে শিকড়ে কেঁপে উঠত প্রাণের চাঞ্চল্য আর তাঁর মনের তন্ত্রীতে সর্বদা অনুরণিত হতো বাঙালীর বৈশিষ্ট্য। ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে যেদিন চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতিরূপে বাংলায় ভাষণ দিলেন সেই দিনই বাঙালী জেনেছিল—দিন আগত ঐ। বন্দরের কাল শেষ হয়েছে, এবার ঘটবে এক নতুন কাণ্ডারীর আবির্ভাব যিনি মাতৃমুক্তি পণ করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন। ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতি চিত্তরঞ্জন মামুলী বক্তৃতা দেন নি—তাঁর সেই 'বাংলার কথা' ভাষণটি বাঙালীরই মর্মের কথা ছিল—তা ছিল জাতীয়তা ও বিশ্বমানবতার সমন্বিত এক মহান্ বাণী। এই ভাষণেই তিনি আবেদন-নিবেদন নীতি বর্জন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দাবী করবার কথাও বলেছিলেন। তাঁর 'বাংলার কথায়' বাঙালী সত্যিই শুনেছিল সংকল্পের শুভ শঙ্খধ্বনি।

দেশবন্ধুর জীবন যেন একটি অসমাপ্ত কাব্য। তথাপি এমন মহোত্তম জীবন-বিন্যাস রাজনীতিক্ষেত্রে আগে তো নয়ই, পরেও আমরা আর দেখলাম না। তাঁর নেতৃত্বের পিছনে ছিল একটা গভীর আদর্শবাদ। তাঁর সেই আদর্শের ভিত্তি ছিল নবীন জাতীয়তাবাদ যার প্রবক্তা ও প্রচারক ছিলেন টিলক-বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দ। ধর্মভিত্তিক এই জাতীয়তাবাদ পাশ্চাত্ত্য জাতীয়তাবাদ থেকে ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। এইটাই ছিল চিত্তরঞ্জনের প্রেরণা ও শক্তির উৎস। তাই না তিনি আনতে পেরেছিলেন দেশজোড়া একটা কর্মপ্লাবন ও ভাবোন্মাদনা অর্থাৎ dynamism ও emotional integration—যার তুলনা ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে বিরল বললেই হয়। সম্ভবত এই একটি কারণেই তিনি অত অল্পসময়ের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনীতিতে অমন প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যা গান্ধী স্বয়ং স্বীকার করেছেন। শুধু কি কর্মপ্লাবন বা ভাবোন্মাদনা? না, তা নয়। সেই সঙ্গে বলিষ্ঠ হাতে গড়ে তুলেছিলেন একটি বিরাট সংগঠন, কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে যা ছিল তখনো পর্যন্ত কল্পনাতীত। পুঞ্জীভূত ভাব নিয়ে ইতিহাসে এক-এক যুগে এক-একটা আদর্শ দেখা দেয়। কিন্তু সেই আদর্শ সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে এক-একজন নেতার কর্মশক্তির মধ্যে। তাঁর সময়ে দেশবন্ধু ছিলেন এমনি একজন শক্তিমান নেতা।

নেতা তিনিই যিনি অনুভব করতে পারেন ইতিহাসের প্রাণস্পন্দন আর যাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হয় বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎকাল পর্যন্ত। দেশবন্ধু এই শ্রেণীর নেতা। আদর্শকে রূপায়িত করার কৌশলটা তাঁর আয়ত্ত ছিল বলেই না তাঁর স্বল্পকালস্থায়ী রাজনৈতিক জীবনে তিনি বিপুল কর্মের আবর্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নেতার আবির্ভাব ঘটে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। সেই প্রয়োজনকে সৃষ্টি করে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী। সে নেতৃত্বের জয়রথ ছুটে চলে বিরামহীন সংগ্রামের পথে। যে পটভূমি, পরিপার্শ্ব ও ঐতিহ্য থেকে দেশবন্ধুর

আবির্ভাব ঘটেছিল তার বিস্তারিত আলোচনা আমরা যথাস্থানে করব। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ইতিহাসের এক সংকট কালে দেশবন্ধু ছিলেন জাতির সেই প্রত্যাশিত নেতা যাঁর কর্মসাধনায় রাজনীতি পেয়েছিল একটা নতুন ব্যঞ্জনা আর আমাদের জাতীয় জীবনের মরা-গাঙে দুকূল প্লাবিত করে ডেকে উঠেছিল বান। পরিপূর্ণ নেতৃত্ব বা complete leadership বলতে যা বুঝায়, দেশবন্ধুর মধ্যে আমরা তাই প্রত্যক্ষ করেছি। এই নেতৃত্বের সম্পূর্ণ ইতিহাস আজো লেখা হয় নি। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক যখন দেশবন্ধুর অসাধারণ নেতৃত্বের বিকাশ ও পরিণতির কথা লিপিবদ্ধ করবেন তখন তিনি যেন বিশেষভাবেই স্মরণ রাখেন যে, প্রতিভার সঙ্গে হৃদয়ের স্বাভাবিক সম্মিলনের ফলেই বাংলার মাটিতে এই নেতৃত্বের উদ্ভব হয়েছিল।

অনেকের বিশ্বাস যে, দেশবন্ধু দেশের কাজে ব্রতী হন মাত্র তাঁর জীবনের শেষ ভাগে। এই ধারণা সত্য নয়। তাঁর মধ্যে স্বদেশের সাধনা ও সভ্যতার প্রতি যৌবনকাল থেকেই একটা তীব্র গভীর অনুরাগ ছিল। এটা যদি না থাকত, তবে অমনভাবে সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। শুধু তাই নয়। বিপিনচন্দ্রের মতে, 'চিত্তরঞ্জনের স্বভাবসিদ্ধ স্বজাতি-প্রীতিই ক্রমে তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যে সামান্য যোগ ছিল, শেষ জীবনে তাহা একেবারে ছিন্ন করিয়া প্রচলিত গতানুগতিক হিন্দু সমাজের দিকে টানিয়া লইয়াছিল। তাঁহার হিন্দুত্ব এবং স্বরাজ-সাধনা, দুই-ই এক মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। এই চাবি দিয়াই তাঁহার শেষ জীবনের হিন্দুত্বের ও দেশচর্যার নিগূঢ় তত্ত্বটি উদ্‌ঘাটন করিতে হয়।' বস্তুত, দেশবন্ধুর মহিমান্বিত জীবনেতিহাসের এই সত্যটা উপলব্ধি করতে না পারলে তাঁর বহুমুখী কর্ম ও চিন্তার ধারা ঠিকভাবে অনুসরণ করা যাবে না।

প্রকৃত দেশসেবক ছিলেন বলেই না দেশবন্ধু হতে পেরেছিলেন যথার্থ দেশনেতা। এইখানেই তাঁর নেতৃত্বের গূঢ় মর্মরহস্য। যখন

ঝাঁপ দিলেন তখন থেকে তাঁর জীবনের গতি একটিমাত্র খাতে বইতে থাকে—স্বজাতির শক্তিহীনতা ও অধিকারহীনতা দূর করে স্বদেশের সকল কাজে তাদের অধিকার স্থাপন। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়োজিত করেছিলেন তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি। সেই শক্তি ছিল যুগপৎ জাগরণ ও বিস্ফোরণ। দেশের সেবক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জন তাঁর দীর্ঘকালের বিলাস-ব্যসনের অভ্যাস পরিত্যাগ করেছিলেন। দেশ-সেবা তিনি গ্রহণ করেছিলেন ব্রত হিসাবে। তাই না তাঁর এতকালের সযত্নলালিত সুখের বাসনা, ভোগবিলাসের মোহ—সব তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল সেই কঠিন ব্রতাচরণের সঙ্গে সঙ্গে। তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা, এমন কি আত্মীয়স্বজন, পুত্র-পরিজন পর্যন্ত।

আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে, দৈবই মানুষের ভাগ্য নিয়ে অচিন্ত্যনীয় লীলা করে থাকে। এই তত্ত্বটাকে না জানলে জীবন-রহস্যের স্বরূপ বোঝা যায় না, সমাধানে পৌঁছান যায় না। দেশবন্ধুর জীবনটা এরই একটা বিস্ময়াবহ নিদর্শন। তা নইলে অমন চকিতের মধ্যে, কে কল্পনা করতে পেরেছিল, তিনি হবেন আমীর থেকে ফকির, বিলাসী থেকে সন্ন্যাসী, তার্কিক থেকে প্রেমিক, ভোগী থেকে ত্যাগী ? সব্যসাচী ব্যবহারজীব গ্রহণ করলেন নিঃস্বার্থ সেবাধর্ম, নামলেন পথের ধূলায়। রসারোডের সেই মোহ-ঘুমপুরী সত্যিই সেদিন শিউরে উঠেছিল যেদিন ভোগী চিত্তরঞ্জন সার করলেন কঠিন ত্যাগব্রত। মানুষটা বাইরেই ভোগী ছিলেন, বিলাসী ছিলেন, আসলে তাঁর প্রাণের মধ্যে জ্বলত আগুন, অন্তরে ধুনী—যার দীপ্ত আভা ফুটে উঠত তাঁর বাগ্মিতায়, তাঁর হাস্যে ও বেদনায়, তাঁর নয়নভঙ্গীতে। তাঁর প্রাণের উত্তাপ বাঙালী বিশেষভাবেই অনুভব করেছে। সেই ধুনীর আগুনেই তো ব্যারিস্টার সি. আর. দাশের ইন্দ্রের মতো বিপুল ভোগৈশ্বর্য ও বিলাস-ব্যসন সব কিছু যেন মুহূর্তের মধ্যে জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, এমন কি, বাসন্তী দেবীর 'সাধের বৃন্দাবন,'

রসারোডের বসতবাড়িটা পর্যন্ত তাঁদের নিজেদের বলতে আর ছিল না। এই অকল্পিত ও অতুলনীয় ত্যাগের ছবি এঁকেছেন কবি এইভাবে ঃ

আজ শুধু জাগে তব অপরূপ সৃষ্টি-কাহিনী মনে,
তুমি দেখা দিলে অমিয়-কণ্ঠ বাণীর কমল-বনে।
কখন তোমার বীণা ছেয়ে গেল সোনার পদ্মদলে.
হেরিনু সহসা ত্যাগের তপন তোমার ললাট তলে।
লক্ষ্মী দানিল সোনার পাপড়ি, বীণা দিল করে বাণী,
শিব মাখালেন ত্যাগের বিভূতি, কণ্ঠে গরল দানি।
বিষ্ণু দিলেন ভাঙনের গদা, যশোদা-দুলাল বাঁশী,
দিলেন অমিত তেজ ভাস্কর, মৃগাঙ্ক দিল হাসি।
চির-গৈরিক দিয়া আশিসিল ভারত জননী কাঁদি,
প্রতাপ শিবাজী দানিল মন্ত্র, দিল উষ্ণীষ বাঁধি।
বুদ্ধ দিলেন ভিক্ষাভাণ্ড, নিমাই দিলেন ঝুলি,
দেবতারা দিল মন্দার-মালা, মানব মাখাল ধূলি।
নিখিল-চিত্ত-রঞ্জন তুমি উদিলে নিখিল ছানি,—
মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, কর্মী, জ্ঞানী। *

এই যে বিপুল ত্যাগ এর পূর্ণতা দেখা গেল তাঁর আত্মদানে—যা দধীচির আত্মদানের সঙ্গেই তুলনীয়। এই ত্যাগ আর এই আত্মদান সম্ভব হয়েছিল কেমন করে? বিত্তবান স্বদেশপ্রেমিক তো সেদিন বাংলা দেশে আরো অনেকেই ছিলেন, কিন্তু একা চিত্তরঞ্জনকে হরিশ্চন্দ্র সাজতে হয়েছিল কেন? এই প্রশ্নটি গভীরভাবে মনের মধ্যে আলোচনা করে একটি উত্তরই পেয়েছি। দেশবন্ধু আজীবন অখণ্ড জীবনবাদে বিশ্বাসী ছিলেন—যে জীবন বর্ণাঢ্য, বৈচিত্র্যমণ্ডিত। আরো পরিষ্কার করে বলি ঃ 'জীবনকে সমগ্রভাবে, সম্পূর্ণভাবে, সর্বাবয়বসম্পন্নরূপে প্রত্যক্ষ করার ও আস্বাদনের সাধনাকে তিনি সর্বতোভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।' জীবনের আলোকিত দিকটাই দেখতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। প্রাণ-মদিরার সবটুকুই পান করেছিলেন তিনি।

* চিত্তনামা : কাজী নজরুল ইসলাম।

সুভাষচন্দ্র মিথ্যা বলেন নি, বাংলা দেশের চিরাগত সাধনার ধারাকে বহন করেই চিত্তরঞ্জন হয়েছিলেন দেশবন্ধু।

তাঁর এই ত্যাগের মহত্ত্ব উপলব্ধি করেই তো রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'আপন দানের দ্বারাই মানুষ আপন আত্মাকে যথার্থভাবে প্রকাশ করে। চিত্তরঞ্জন তাঁহার যে সর্বশ্রেষ্ঠ দান দেশকে উৎসর্গ করিয়াছেন তাহা কোনো বিশেষ রাষ্ট্রিক বা সামাজিক কর্তব্যপালনের আদর্শমাত্র নহে, তাহা সেই সৃষ্টিশক্তিশালী মহাতপস্যা যাহা তাঁহার ত্যাগসাধনের মধ্যে অমৃতরূপ ধারণ করিয়াছে।' বস্তুতঃ দেশবন্ধুর দানশীলতার মূলে ছিল তাঁর হৃদয়ের ঐকান্তিক কোমলতা আর সহৃদয়তা। এই দানের মহিমা উপলব্ধি করে ভাষায় ব্যক্ত করা যেমন-তেমন লোকের কাজ নয়—ভিক্টর হিউগোর মতো শক্তিশালী লেখক ভিন্ন দেশবন্ধু-চরিত্রের এই দিকটা সম্যক ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। কত ঘটনা, কত কাহিনী আছে তাঁর দানশীলতা সম্পর্কে, কিন্তু তাঁর অন্তরালে যে হৃদয়—তাঁর ছবি কে আঁকবে? লোকে বলত, তিনি অবিচারে দান করতেন। কলকাতায় গান্ধী একবার দেশবন্ধুকে এই বিষয়ে একটু সতর্ক, একটু বিচারপরায়ণ হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তার উত্তরে দেশবন্ধু তাঁকে বলেছিলেন, 'কৈ, বিচার না করায় ক্ষতি হইয়াছে তো বলিয়া মনে হয় না।' এই দানশীলতারই পরাকাষ্ঠা দেখা গেল তাঁর শেষ জীবনের বিপুল ত্যাগের মধ্যে—যে ত্যাগ ছিল বুদ্ধের ত্যাগের মতোই মহান আর দাতা কর্ণের ত্যাগের সমতুল্য। সেই অতুলনীয় ত্যাগের কথা কবি বলেছেন এইভাবে:

প্রজারঞ্জন রাম-রাজা দিল সীতারে বিসর্জন,
তারও হয়েছিল যজ্ঞে স্বর্ণ-জানকীর প্রয়োজন।
তব ভাণ্ডার-লক্ষ্মীরে রাজা নিজ হাতে দিলে তুলি
ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর মানবের মুখে, নিজে নিলে পথধূলি;
হেম-লক্ষ্মীর তোমারও জীবনে-যাগে ছিল প্রয়োজন,
পুড়িলে যজ্ঞে, তবু নিলে নাক দিলে যা বিসর্জন! *

* চিত্তনামা: কাজী নজরুল ইসলাম।

এই ত্যাগের মহিমাটা আমরা সেদিন আমাদের অন্তর দিয়ে বুঝতে পারিনি—বুঝতে পারিনি সেই চির বৈরাগী, সেই রাজ-ভিখারীর আত্মাহুতির মহিমা। তাই শেষ পর্যন্ত দেখা গেল 'যে-জীবন কেহ লইল না, তাহা মৃত্যু লইল মাগি।'

বিষয়-সুখাসক্ত চিত্তরঞ্জন কেমন করে বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে শ্রেয়ের দিকে অগ্রসর হলেন, তাঁর জীবনের সেই রহস্যের সন্ধান আজো আমরা নিতে পেরেছি কিনা সন্দেহ, যদি পারতাম তাহলে দেশবন্ধুর বাংলা তাঁর মৃত্যুর পরে স্বার্থান্বেষী দেশসেবকের দলে পূর্ণ হতো না। আজ মনে পড়ে তাঁর বিরুদ্ধবাদী কোনো একটি প্রভাবশালী সাময়িক পত্রিকায় তাঁর লোকান্তর গমনের পর মন্তব্য করা হয়েছিল : 'আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কেহই চিত্ত-রঞ্জনের মত প্রভূত ধনাগমের ইচ্ছা ও আশা ত্যাগ করিয়া একাগ্রতার সহিত দেশের রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত তাঁহার মত আত্মোৎসর্গ করেন নাই। এই বিষয়ে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। *

এ-কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

জীবনের শেষ পাঁচ বছর দেশের জন্য তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, তাই যে তাঁর অকালমৃত্যুর অন্যতম কারণ নয়, তা কে বলবে? ভোগ-বিলাসিতা ও আরামে অভ্যস্ত জীবনের শেষ অধ্যায়ে কৃচ্ছ্রসাধন অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ বড় কঠিন। এই কঠিন কাজ অর্থাৎ পূর্বাভ্যস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বর্জন করে দেশহিত-ব্রত গ্রহণ ও একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেই ব্রত উদ্‌যাপন—দেশবন্ধুর শরীর সহ্য করতে পারে নি। অথচ এই কাজ থেকে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করা অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রম থেকে বিরত থাকতে বলা কারো পক্ষেই সম্ভব হয় নি, না তাঁর পরিবার-পরিজনবর্গের পক্ষে, না তাঁর সহকর্মী ও অনুগামীদের পক্ষে। কারণ সাংসারিক সকল সুখ তুচ্ছ করে তিনি তখন যেন ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দেশসেবার মধ্য দিয়ে শ্রেয়ের, ভূমার অন্বেষণে ছুটেছেন। মাদ্রাজের

* প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩৩২।

বিখ্যাত স্বরাজী নেতা সত্যমূর্তিকে লেখক একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দেশবন্ধুর নেতৃত্ব সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা? এর উত্তরে সত্যমূর্তি লোককে বলেছিলেন: 'His was dedicated leadership. Deshbandhu always felt that the task of leadership is onerous. He never lost the power and the will to use it.' দেশবন্ধুর নেতৃত্বের এই মূল্যায়ন যথার্থ। তাঁর সমকালীন নেতাদের মধ্যে সম্ভবত দেশবন্ধুই একমাত্র নেতা ছিলেন যিনি তাঁর নেতৃত্বের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ছিলেন বিশেষ-ভাবেই সচেতন এবং সতর্ক।

এই নেতৃত্বের রাজদণ্ড পরিচালনা করতে যে অদম্য শক্তি ও ইচ্ছার প্রয়োজন তার অভাব কোন দিনই তাঁর মধ্যে দেখা যায় নি। এইরকম তনুমন-নিবেদিত নেতৃত্বের অধিকারী তিনি ছিলেন বলেই না দেশবন্ধু একদিকে যেমন মাত্র কয়েক বছরের রাজনীতিচর্চায় দল ও মত নির্বিশেষে সমগ্র ভারতের অবিসংবাদী নেতার গৌরব লাভ করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা কিছুকালের জন্য গান্ধীর খ্যাতি ও প্রতিপত্তিকেও নিষ্প্রভ করে দিয়েছিল। আব্রাহাম লিঙ্কনের মতো তিনি ছিলেন একজন practical idealist বা বাস্তববাদী ভাবুক। তাই দেখা যায় যে, রাজনীতিতে তিনি ঠিক সেই ধরনের সাহস বা দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন যাকে আমরা Promethean daring বলে অভিহিত করতে পারি। নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল বলেই না তাঁর পক্ষে সেদিন গয়া কংগ্রেসে সভাপতির মঞ্চ থেকে এই কথা ঘোষণা করা সম্ভব হয়েছিল: 'I shall bring the whole of India to my side in course of one year and those who now oppose me, will see that I mean what I say. People will no doubt continue to shout in honour of Mahatma Gandhi, but they will follow C. R. Das.'

দেশবন্ধু তাঁর এই স্মরণীয় উক্তিটি করেছিলেন গয়া কংগ্রেসে সভাপতির মঞ্চ থেকে যখন বিরোধী-পক্ষ তাঁর কাউন্সিল-প্রবেশ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। এমন দৃপ্ত ঘোষণা সেই নেতাই করতে পারেন যাঁর মধ্যে আছে আত্মপ্রত্যয় আর দূরদর্শিতা। আমরা তাই গান্ধীযুগের রাজনীতিতে একমাত্র দেশবন্ধুর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করি সম্পূর্ণ নেতৃত্ব আর তনুমন-নিবেদিত নেতৃত্বের একটি দুর্লভ দৃষ্টান্ত। আজ যখন আমরা চিন্তা করি যে, সেই রাজনৈতিক সংকটের দিনে তাঁর মতো একজন বিচক্ষণ নেতার আরো কয়েকটা বছর বেঁচে থাকা জাতির পক্ষে যে কতখানি প্রয়োজন ছিল তখন আমাদের মন স্বতঃই বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। সেদিন তাঁর গুরুভার পরিশ্রমের বোঝাটা যদি আমরা লাঘব করার চেষ্টা করতাম, যদি তাঁর কর্মক্লান্ত দেহকে একটু বিশ্রামের অবকাশ দিতে পারতাম, তাহলে বোধ হয় দেশবন্ধুকে এত অধিক ব্যক্তিগত চেষ্টা করে আয়ুক্ষয় করতে হতো না।

বিষয়টি আরো একটু আলোচনা করব।

দেশবন্ধু ছিলেন অত্যন্ত ভাবপ্রবণ মানুষ।

তাই বলে তিনি যে যুক্তিবাদী ছিলেন না তা নয়। গান্ধী তো তাঁকে যুক্তির অবতার বলতেন। তথাপি বাংলার জলবায়ু তাঁকে যতখানি ভাবপ্রবণ করে গঠন করেছিল, ঠিক ততখানি যুক্তিপ্রবণ করে গঠন করে নি। এই ভাবপ্রবণতার দরুণ যখন যেদিকে ঝুঁকতেন তাতে একেবারে গা ঢেলে দিতেন। এই যে গা-ঢেলে দেওয়া—এর প্রকৃত রহস্যটা কি? এটা কি তাঁর একটা ক্ষণিকের উন্মাদনা বা উচ্ছ্বাস ছিল? কখনই নয়। এটা হলো ভিতরের একটা শক্তি। এই শক্তি না থাকলে মানুষ বড় কাজ করতে অথবা বড় হতে পারে না। দেশবন্ধুর জীবনের প্রত্যেকটি অধ্যায়ে এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। খুব বড় একটা কাজ করতে হলে, বুদ্ধি-বিবেচনা ও জ্ঞানের যেমন দরকার, তেমনি দরকার ভিতরের শক্তি। এই ভাব ও শক্তির সমন্বিত বিগ্রহ ছিলেন তিনি, জীবনে তিনি যে মহতী সিদ্ধিলাভ

করেছিলেন তা এই শক্তির প্রসাদে। আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়ার সময় থেকেই এই শক্তি তাঁর মধ্যে কাজ করে আসছিল এবং এইজন্য তিনি কৃতী হয়েছিলেন। তাঁর এই শক্তির উৎস ছিল মস্তিষ্ক নয়, হৃদয়।

সেই শক্তির বিস্ফোরণ ঘটল তাঁর জীবন-সায়াহ্নে।

সেই শক্তি নিয়েই তো তিনি ঝাঁপ দিয়েছিলেন রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে। নিজের বা নিজের জাতির শক্তির উপর তাঁর যে কখনো সংশয় ছিল না তা নয়, কিন্তু যেদিন ভিতরের শক্তির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে গেল, সেদিন সব সংশয় দূর হয়ে গেল। দেশবন্ধুর জীবনের শেষ অধ্যায়ে শক্তির যে লীলা আমরা প্রত্যক্ষ করি তাকে বর্ষার পদ্মার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তেমনি কূল ছাপিয়ে ফুলে ফুলে গর্জে উঠেছিল দেশবন্ধুর অন্তর্নিহিত সেই শক্তি। বাঙালী তথা ভারতবাসী সেদিন সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছে কেমন করে একটি প্রচণ্ড দুর্বার জীবনস্রোত পাঁচটি বছর ধরে ভাব ও আবেগের প্রলয় প্লাবনে বাংলা ডুবিয়ে ভারতবর্ষ অতিক্রম করে ইংলণ্ডের তটভূমিকে পর্যন্ত আঘাত করেছিল আর সচকিত করেছিল লর্ড বার্কেনহেডকে। অমৃতসর থেকে শুরু করে কংগ্রেসের প্রত্যেকটি অধিবেশনে সেই শক্তির দাপট দেখে সকলকে ত্রস্ত হতে হয়েছিল। কিন্তু কেবলমাত্র শক্তি থাকলেই তো চলে না, সেই শক্তির প্রয়োগ রহস্যটাও সেই সঙ্গে আয়ত্তে থাকা দরকার। দেশবন্ধুর তাও ছিল। শ্রীঅরবিন্দের কথায় বলি, 'বঙ্গদেশে কৌশলের সহিত দূরদর্শিতার সমবায় একমাত্র চিত্তরঞ্জনে দেখা গিয়াছে।' আমরা বঙ্গদেশের পরিবর্তে ভারতবর্ষ কথাটি উল্লেখ করার পক্ষপাতী। ইতিহাসের যাঁরা মহাবীর তাঁদের প্রত্যে-কের মধ্যেই শক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ করা যায় অরবিন্দ-কথিত এই কৌশল ও দূরদর্শিতা। এই শক্তি, এই কৌশল আর এই দূরদর্শিতার সমবায়ে গঠিত ছিল দেশবন্ধুর বিরাট নেতৃত্ব।

এই নেতৃত্বের বলয়-বেষ্টনীর মধ্যে যাঁরা এসে পড়েছিলেন তাঁর অনুগামী ও সহকর্মী হিসাবে, তাঁদের পক্ষে দেশবন্ধুর প্রভাব অতিক্রম করা কঠিন ছিল। এই ব্যক্তিগত প্রভাবের জন্য তাঁকে যে কতকটা অল্পায়ু হতে হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কেন, সেটা একটু বুঝিয়ে বলি। যাঁরা তাঁর দলের লোক ছিলেন, কিংবা যাঁরা তাঁর দলের লোককে আইনসভায় বা পৌরসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করেছিলেন, তাঁদের সকলে যদি ঐ দলের মত-বিশ্বাস, আদর্শ ও নীতির খাতিরেই কাজ করতেন, তাঁদেরকে কর্মে প্রবৃত্ত করাবার জন্য দেশবন্ধুর ব্যক্তিগত প্রভাবের অপেক্ষা না করতেন, তাহলে তাঁকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে ভগ্ন দেহকে আরো ভগ্ন করতে হতো না। হয়ত তিনি আরো কয়েকটা বছর বেঁচে থাকতেন এবং আমাদের বিশ্বাস, বেঁচে থাকলে মহত্তর অবদান-পরম্পরায় তাঁর জীবন আরো মহিমামণ্ডিত হতো। স্বরাজ্য-দলের জন্য তিনি একা যত পরিশ্রম করেছিলেন, তাঁর সহকর্মী ও অনুগামীদের মধ্যে (একমাত্র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ব্যতীত) কেউ ততটা পরিশ্রম করেছিলেন কিনা সন্দেহ। তা যদি তাঁরা করতেন, তাহলে স্বাস্থ্যলাভের জন্য কিছুটা অবসর দেশবন্ধু পেতেন। মৃত্যুর তিন মাস পূর্বে পাটনায় গিয়েও তিনি পরিশ্রম থেকে বিরত থাকেন নি। কিন্তু তাঁর শক্তির ভাণ্ডার তো অফুরন্ত ছিল না—কোনো মানুষেরই থাকে না। তিনি নিজেও সেটা বুঝেছিলেন। 'শরীরে আর বয় না'—ফরিদপুর সম্মিলনীর শেষে যখন তিনি এই উক্তি করেছিলেন গান্ধীর কাছে, তখন ভিতরে ভিতরে তাঁর দেহটা যে কতখানি জীর্ণ হয়েছিল তার সন্ধান কেউ রাখত না।

সঙ্গীতের ন্যায় মানবজীবনেরও একটা মূল রাগিণী আছে। দেশবন্ধুর জীবনে স্বদেশপ্রীতি ছিল সেই রকম একটা রাগিণী। স্বদেশ তাঁর সেব্য ছিল, ছিল ধ্যানের বিষয়। দেশের মুক্তিসংগ্রামে তিনি যে অকাতরে আত্মদান করতে প্রস্তুত ছিলেন—এটা ধ্রুব সত্য। আজ মনে হয়, এতটা তিনি না করলেও পারতেন। অকাতরে

আত্মদান গৌরবের বিষয় সন্দেহ নেই, কিন্তু দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য এই জাতীয় আত্মদান যথেষ্ট নয়। নিজের শক্তি সংরক্ষণ ও নিজের স্থলাভিষিক্ত যোগ্য ব্যক্তি গড়বার প্রয়োজনীয়তা—এই দুটি কাজের প্রতি দেশবন্ধু যেন যথেষ্ট মনোযোগ দেন নি, তেমনি তাঁর পার্ষদগণ ও অনুচরগণও এই বিষয়ে যথেষ্ট উদাসীন ছিলেন। আজ তাই প্রশ্ন জাগে—কেন এটা সেদিন সম্ভব হয় নি? সর্বত্যাগী সেই নেতার জীবনের মূল্যটা আমরা সেদিন ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারি নি—এ প্রশ্নের এই-ই উত্তর। আরো একটা উত্তর আছে। দেশবন্ধুর জীবনের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখতে পাই যে মানুষটাই ছিলেন অত্যন্ত বেহিসাবী—টাকাকড়ি বিষয়ে যেমন, নিজের শক্তি সম্বন্ধেও তেমনি। 'এবার হয় ভাল করে সারব, না হয় ভাল করে মরব'—এমন কথা একমাত্র বেহিসাবী মানুষেই বলতে পারে। নিজের শক্তি সম্বন্ধে তিনি কোনদিন মিতব্যয়ী ছিলেন না। তা যদি থাকতেন, তাহলে বাংলার ভাগ্যে অকাল-বৈধব্য ঘটত না, ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নেমে আসত না অকাল-সন্ধ্যা আর দেশব্যাপী বিলাপের ধ্বনি উঠত না এই বলে:

খোলো মা দুয়ার খোলো,
প্রভাতেই সন্ধ্যা হ'ল,
দুপুরেই ডুবল দিবাকর গো।

কিন্তু ইতিহাসের মহাবীর তিনি। নিজের চিত্ত জ্বেলে সকলের ঘুম ভাঙালেন, তারপর নিজেই নিভলেন চিতার উপরে। এমনি করেই তিনি যেন দুই চরণে মরণকে দলে, বিশ্বচরাচরের প্রণামের মধ্য দিয়ে শঙ্করের মতো প্রসন্ন মনে স্বীয় শক্তি সংহরণ করে নিয়েছিলেন। বেদনাহত সেই দিনটির ছবি এঁকেছেন কবি এইভাবে:

তখনো অস্ত যায়নি সূর্য, সহসা হইল শুরু
অম্বরে ঘন ডম্বরু-ধ্বনি গুরু গুরু গুরু গুরু!
আকাশে আকাশে বাজিছে এ কোন্ ইন্দ্রের আগমনী?
শুনি, অম্বুদ-কম্বু-নিনাদে ঘন বৃংহিত-ধ্বনি।
বাজে চিক্কুর হ্রেষা-হর্ষণ মেঘ-মন্দুরা-মাঝে,
সাজিল প্রথম আষাঢ় আজিকে প্রলয়ঙ্কর সাজে!

... ...

জাগিয়া প্রভাতে হেরিনু আজিকে জগতে সুপ্রভাত,
শয়তানও আজ দেবতার নামে করিছে নান্দী পাঠ।
হে মহাপুরুষ মহাবিদ্রোহী হে ঋষি সোহম্-স্বামী!
তব ইঙ্গিতে দেখেছি সহসা সৃষ্টি গিয়াছে থামি।
থমকি গিয়াছে গতির বিশ্ব চন্দ্র-সূর্য-তারা,
নিয়ম ভুলেছে কঠোর নিয়তি, দেব দিয়াছে সাড়া!
হে অরিন্দম মৃত্যুর তীরে করেছ শত্রু জয়,
প্রেমিক! তোমার মৃত্যু-শ্মশান আজিকে মিত্রময়। *

দাতা, ত্যাগী, সাহসী ও প্রেমিক—দেশবন্ধু এসবই ছিলেন। তাঁর যৌবনকাল থেকে তিনি যা-কিছু চিন্তা করেছেন তা যে ভ্রম-প্রমাদ শূন্য বা ত্রুটিবর্জিত ছিল, এমন কথা বলি না। কোনো মানুষ বা নেতা সম্পর্কেই তা বলা যায় না। তাঁরই সতীর্থ মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনেই আমরা দেখেছি 'হিমালয় সদৃশ' ভুল, একবার নয়, বহুবার ঘটেছে। কিন্তু একথাও সত্য যে, দেশবন্ধুচরিত্রের কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, যথা—অকপটতা, স্বাধীন চিত্ততা এবং স্বীয় মতপ্রকাশের দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা। আরো একটা বিষয়ে নির্ভীকতা তাঁর মধ্যে দেখা যেত। নিজের কথার ও কাজের ফলস্বরূপ দুঃখভাগী হতে তিনি কখনো ভীত বা পশ্চাদ্‌পদ হতেন না। নেতা হওয়ার মতো জ্ঞানবুদ্ধি বিবেচনা অনেকের থাকে। কিন্তু দায়িত্ব স্বীকার

* চিত্তনামা : কাজী নজরুল ইসলাম।

করবার মতো সাহস ও দৃঢ়তা খুব কম নেতার মধ্যেই দেখা যায়। গান্ধী অবশ্য এর ব্যতিক্রম ছিলেন।

এর চেয়েও বড় কথা হলো নেতৃত্বের গর্ব বা অভিমান। লেনিন সম্পর্কে যেমন বলা হয়ঃ 'He was a dictator without vanity.'—ঠিক তেমন কথা দেশবন্ধু সম্পর্কেও প্রযোজ্য। রাজনীতি তাঁকে গ্রাস করতে পারে নি বলেই তাঁর পক্ষে নেতৃত্বের অভিমান থেকে মুক্ত হওয়া সহজ হয়েছিল। তাঁর জীবন ও চরিত্র গভীরভাবে অনুশীলন করে আমি বুঝেছি যে, এই মানুষটির অন্তরে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মতো একটা আধ্যাত্মিকভাব নিত্য প্রবহমান ছিল; তাঁর কাব্যেই এর সুস্পষ্ট স্বাক্ষর আছে। আত্মসমর্পণ যোগে সিদ্ধ ছিলেন তিনি; তাইতো তিনি বলতে পেরেছিলেনঃ

> তোমারি এ গীত প্রাণে সারা দিনমান,—
> আমি যে হয়েছি তব হাতের বিষাণ।
> আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী! বাজাও আমারে
> দিবস রজনী ভরি আলোকে আঁধারে।*

এইরকম মনোভাব নিয়ে যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে রাজনীতির আবর্তে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, তিনি তো রাজনীতিসর্বস্ব মানুষ হতে পারেন না। অথবা তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের অভিমানও থাকতে পারে না। প্রশ্ন হতে পারেঃ দেশবন্ধু প্রভুত্বপ্রিয় বা একনায়কত্বপ্রিয় ছিলেন কি না? স্তাবকতা তিনি ভাল বাসতেন কি না? সাধারণ স্তরের নেতা যাঁরা তাঁদের নেতৃত্বের মধ্যে এই ভাবগুলো খুবই প্রকট থাকে। দেশবন্ধু তো এই স্তরের নেতা ছিলেন না। তাঁর নেতৃত্বটা আসলে ছিল dedicated leadership এবং তাঁর সমগ্র জীবনটা ছিল, যা আগে বলেছি, বৈষ্ণবের আত্মাহুতি। কিন্তু এত কথায় দরকার কি আমাদের। দেশবন্ধুর মন্ত্রশিষ্য সুভাষচন্দ্র স্বয়ং তাঁর রাজনৈতিক গুরু সম্পর্কে এই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, স্পষ্টবাদীর উপর

* মালাঃ চিত্তরঞ্জন দাশ

তিনি কখনো বিরক্ত হতেন না এবং যাঁরা বেশি আপত্তি তুলতেন তাঁদের কথাই তিনি বেশি শুনতেন। যাঁর হৃদয়টা ছিল বিশাল এবং তাঁর মধ্যে আত্মপর ভেদজ্ঞান বিন্দুমাত্র ছিল না, সেই মানুষ যে নেতা হিসাবে প্রভুত্বপরায়ণ বা একনায়কত্ব প্রিয় হবেন, তাঁর জীবন ও চরিত্রের প্রতি সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকিয়ে আমরা বলব যে, এমন কল্পনা কষ্ট-কল্পনা ভিন্ন আর কিছু নয়।

ক্ষমতা ও গৌরবের শিখরদেশে তিনি যখন সমাসীন, ঠিক সেই সময়ে দেশবন্ধু আচম্বিতে লোকান্তরিত হলেন। কেউ বলল, তিনি ভগ্নহৃদয়ে মারা গেলেন, আবার কেউ তাঁর রাজনৈতিক কর্মের সফলতা ও বিফলতার হিসাব করে বললেন, কই, দেশবন্ধু তেমন একটা দর্শনীয় কিছু করে যেতে পারেন নি। জীবন সম্পর্কে যাঁরা সংকীর্ণ ও সঙ্কুচিত দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেন, এমন কথা শুধু তাঁরাই বলতে পারেন। আপাত প্রতীয়মান বিফলতা বা প্রত্যক্ষ সফলতার মানদণ্ডে এ জাতীয় বিচার চলে না। মানুষ যে জীবনে সব বিষয়ে কৃতকার্যতা লাভ করবে এমন কোন কথা নেই, কিন্তু যাঁরা 'great man' পদবাচ্য, শুধু তাঁদের কাছেই কৃতকার্যতা জিনিসটা নিতান্ত গৌণ বলেই বিবেচিত হয়ে থাকে। অচরিতার্থ উদ্যমের জন্যই পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ লোক আজো আমাদের স্মরণীয় হয়ে আছেন এবং থাকবেনও চিরকাল। কেবল-মাত্র সামান্য বা অকিঞ্চিৎকর সফলতার ক্ষেত্রেই আমরা কৃতকার্যতার কষ্টিপাথরে তা যাচাই করে থাকি। পৃথিবীর খ্যাতনামাদের কর্মের সফলতা ও বিফলতা আলোচনা করে একালের অন্যতন চিন্তানায়ক বার্ট্রাণ্ড রাসেল যথার্থই বলেছেন: 'However much we may love success in the historic estimate and in the nature of real values, the first places are not assign-ed to isolated successes.* আসল কথা, কোনো একটি

* *Autobiography* : **Bertrand Russel.**

মহৎ প্রচেষ্টায় তার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়টাই মুখ্য, সফলতা যা বিফলতার প্রশ্ন গৌণ।

দেশবন্ধু দ্বৈতশাসন ধ্বংস করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে তিনি নব-প্রবর্তিত শাসন-সংস্কারের প্রকৃত স্বরূপটা উদ্ঘাটন করে দিয়েছিলেন। এই কাজটা তিনি করেছিলেন এবং এ বিষয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু আমার বিবেচনায়, গৌরবজনকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হলেও, আসলে এটা ছিল একটা সামান্য রকমের সফলতা। কিন্তু যে সফলতার পরিমাপ হয় না, সেই তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব যা তাঁর সমকা ন লোকদের প্রভাবিত করেছিল এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য তিনি প্রেরণার যে শাশ্বত পাথেয় রেখে যেতে পেরেছেন—এই দিয়েই তো ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক বিচার করবেন রাজনীতিক্ষেত্রে দেশবন্ধু কি করতে পেরেছেন আর কি পারেন নি। তাঁর নির্ভীকতা, তাঁর ত্যাগ বা তাঁর বদান্যতা—এইসবের খণ্ড খণ্ড বিচারে নয়, এইগুলির সমাবেশে তাঁর সমগ্র জীবন ও ব্যক্তিত্ব কিভাবে সার্থক হয়েছিল সেইটাই তো প্রকৃত বিচার্য। এ ছাড়া তাঁর অবদানের মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

'Who is a great man ?'—এই প্রশ্নটির উত্তরে ডিজরেলি বলেছেন: 'A great man is one who influences the lives of men in a radical manner, who gives a new direction to man's thoughts and actions.' দেশবন্ধুর জীবনে আমরা দেখেছি কি গভীর প্রভাব তিনি বিস্তার করে-ছিলেন সমকালীন বাংলা ও ভারতের মানুষের উপর, আর কি নতুন দিক্-নির্দেশ করেছিলেন তাদের প্রত্যেকের কর্মে ও চিন্তায়। সমকালীন রাজনৈতিক ভাবধারার তিনিই তো ছিলেন মুখ্য প্রবক্তা এবং আমাদের জাতীয় ক্রিয়াকলাপের যেসব আদর্শ ছিল অনভিব্যক্ত বা কুয়াশায় আবৃত, তাকেই তিনি দিয়েছেন একটি পরিচ্ছন্ন রূপ

এবং এই কাজটা তিনি সম্পন্ন করেছেন সেই সময়ে যখন দেশের রাজনৈতিক অবস্থাটা ছিল কঠিন ও সমস্যাসঙ্কুল। দীর্ঘকাল প্রস্তুতির পরে তিনি রাজনীতিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী যথার্থই বলেছেন: 'It was a sense of duty urged by a passion for truth and freedom that brought Deshbandhu to the forefront. We know how little he spared in working for the cause and it is certain that his health was seriously impaired by his constant worries and unremitting toil'* একটি প্রবল কর্তব্যবোধ থেকে সঞ্জাত সত্য ও স্বাধীনতার জন্য দেশবন্ধুর সমগ্র সত্তা কিভাবে অভিসিঞ্চিত ছিল এবং সেই কর্তব্যের বেদীমূলে তিলে তিলে তিনি কিভাবে আত্মদান করেছিলেন, সেইটাই তো তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর নেতৃত্বের প্রকৃত পরিচয়।

দেশবন্ধুর জীবন সর্বতোভাবেই একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ইতিহাস। তাঁর জীবন সর্বাঙ্গসম্পন্ন একটি অপূর্ব ব্যক্তিত্বের ইতিহাস। ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে জননায়কের গৌরবমণ্ডিত আসনে বসবার শক্তি ও প্রতিভা নিয়ে এ পর্যন্ত যত লোকাতিপ পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, দেশবন্ধু সেই শ্রেণীভুক্ত হলেও, অনেক বিষয়েই তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ ও তুলনাহীন দেশসেবক। ইংরেজদের ডিপ্লোমেসি বিশ্ববিখ্যাত। এরই বলে তারা পৃথিবীতে বৃহত্তম সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল চালিয়েছিলেন। এই ডিপ্লোমেসির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ইংরেজের সমকক্ষ। এর প্রমাণ তিনি দিয়েছিলেন আইনসভায় সরকারকে বার বার পর্যুদস্ত করে। সরকারকে বাক্‌যুদ্ধ বা ভোটযুদ্ধে পরাজিত

* ১৯২৫, ডিসেম্বর ৮, মাদ্রাজে দেশবন্ধুর একটি আবক্ষ মর্মরমূর্তি উন্মোচনকালে প্রদত্ত তুলসীচরণ গোস্বামীর ভাষণ।

করে পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে তিনি যে দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন তা আজো অতুলনীয় হয়ে আছে। নেতৃত্বের দায়িত্ব ও দুঃখকে স্বীকার করে তিনি যে দৃঢ়তা, সাহস ও সহিষ্ণুতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। এযুগে প্রথম শ্রেণীর বহু নেতাকে আমরা পেয়েছি, কিন্তু ক্ষত্রশক্তির এমন জলন্ত মূর্তি দ্বিতীয়টি আর দেখি নি। সেই নেতৃত্বই সার্থক যার মধ্যে থাকে তিনটি দুর্লভ উপাদান, যথা—ইস্পাত, আগুন আর সংগঠনী প্রতিভা। দেশবন্ধুর নেতৃত্বের তাৎপর্যটা আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে, তাঁর মধ্যে এর কোনাটারই অভাব ঘটে নি। ইস্পাতের মতোই কঠিন ও অনমনীয় ছিল সেই নেতৃত্ব, সেই নেতৃত্বের সংস্পর্শে এলে পরেই অনুভূত হতো তার দাহিকা-শক্তি। আর সংগঠন-প্রতিভা? স্বেচ্ছাবাহিনী ও স্বরাজ্যদল গঠনের মধ্যেই তো আছে তার দীপ্যমান স্বাক্ষর। এর বলেই তো তিনি সমকালীন রাজনৈতিক জীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করে সমস্ত প্রতিকূলতা সবল হস্তে অপসারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমন সচল, গতিবেগসম্পন্ন নেতৃত্বের লীলা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার লক্ষ্যে স্থির, আপোষহীন সংগ্রামে দৃঢ়নিষ্ঠ সেই একাগ্র একক জীবনে এই অনন্যসুলভ নেতৃত্বের প্রাচুর্যই ছিল সবচেয়ে গৌরবের বিষয়। এমন স্বতন্ত্র, সচেতন ও সজীব নেতৃত্ব বাঙালী বহুকাল প্রত্যক্ষ করে নি, ভারতবাসী তো নয়ই। দেশবন্ধু ভিক্ষাজীবী বা আপোষকামী নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন যথার্থই একজন সংগ্রামী নেতা। নেতৃত্বের এই আদর্শই অনুধ্যেয়।

১৯২৫-এর ১৬ই জুন যেদিন অকালে এই নেতৃত্বের অবসান ঘটল, সেদিনকার কথা স্মরণ করে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন: 'The death

of Deshabandhu was for India a national calamity. With the reckless abandon of a Vaishnava devotee, he had plunged into the political movement with heart and soul and he had given not only himself but his all in the fight for Swaraj. He was a hard fighter. He was a practical politician.* পৌরুষ-সমন্বিত এই নেতৃত্বই দেশবন্ধু-চরিত্রের প্রধান গৌরব। এই চরিত্র, এই জীবন আমরা কতটুকু গ্রহণ করেছি, আর কতটুকু করি নি, সেইটাই আজ বিচার্য। তাঁর জীবিতকালে মানুষের হৃদয়-মনের উপর তাঁর যে অসামান্য প্রভাব পরিলক্ষিত হতো, সেই প্রভাব আমাদের মন থেকে মুছে গেল কেন? তিনি তো স্বাধীনতা-যজ্ঞের অনলে জীবনাহুতি দিলেন, কিন্তু আমরা তার কতটুকু মূল্য দিলাম? তিনি তো তাঁর জীবন দিয়ে স্বাধীনতার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন, আমরা আমাদের জীবনের পাত্রে সেই জীবনের অগ্নি কতটুকু চয়ন করলাম? দেশমাতৃকার আহ্বানে একদা তিনি ঝড়ের বেগে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন—তাঁর আবির্ভাবে 'পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি' কেটে গিয়ে এক নতুন সূর্যোদয় হয়েছিল, দিকে দিকে উড়েছিল নতুনের কেতন, পুরাতন শুষ্কপত্র সব কোথায় উড়ে গিয়েছিল। একটা জ্বলন্ত ত্যাগের মূর্তি নিয়ে দেশের সামনে আবির্ভূত হয়ে দেশের হৃদয় কেড়ে নিয়েছিলেন দেশবন্ধু। ভোগে ইন্দ্র, ত্যাগে দধীচি, দানে দাতাকর্ণ, জনসেবায় সিদ্ধার্থ আর রাজনীতি-ক্ষেত্রে একাধারে প্রতাপ-শিবাজী—এই তো দেশবন্ধু, এই তো দেশবন্ধুর জীবন, এই তো তাঁর চরিত্র। পরের মঙ্গল ইচ্ছাকে, দেশের স্বাধীনতাকে জীবনের মূলমন্ত্র করে এইভাবেই তো দেশবন্ধু তাঁর জীবনটা বিলিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর চিন্তা ছিল বড়, স্বপ্ন ছিল

* *The Indian Struggle* : **Subhash Chandra Bose**

আরো বড়—তাই না তাঁর পক্ষে অত কম সময়ের মধ্যে কংগ্রেসের রাজনীতিতে অমন একটা বৃহৎ পরিবর্তন এনে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল; দেশব্যাপী অমন একটা জাগরণ ও বিস্ফোরণ এনে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। কবির কথায় আজ তাই মনে হয়ঃ

'তুমি বড় ছিলে তাও জানি
কিন্তু এত বড় এতখানি!
আগে কে জানিত এত বড় তব প্রাণ
হে সাধক, হে মহান, হে মহীয়ান।'

॥ দুই ॥

'এই ছেলে বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।'

এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন দুর্গামোহন যখন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র চিত্তরঞ্জনের জন্ম হয়। অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল এই ভবিষ্যদ্বাণী। শুধু বংশের নয়, সমগ্র দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন তিনি। সার্থক-নামা পুরুষ ছিলেন চিত্তরঞ্জন—নিখিল মানবের চিত্ত রঞ্জন করেছেন তিনি সকল দিক দিয়ে। তাই 'চিত্তরঞ্জন' শুধু একটি মানুষের নাম নয়, এটা একটা প্রত্যয়—স্বদেশ-আত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ। এই প্রত্যয় আর এই প্রকাশের মর্মকথা বুঝতে হলে যে বংশে তাঁর জন্ম, সেই বংশের কথা দিয়েই শুরু করতে হয় আমার এই আলোচনা। কিন্তু চিত্তরঞ্জন ছিলেন ইতিহাসের একজন চিহ্নিত মানুষ; একটি মহৎ কর্ম সম্পাদনের জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের একটি গূঢ় উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাই শুধু তাঁর পিতৃ-পিতামহের পরিচয় দিলে চিত্তরঞ্জনের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হয় না। তিনি যে যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের কথাও বলতে হয়; কারণ এসবই যে তাঁর চরিত্র-বিকাশে সহায়তা করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

খ্যাতি, প্রতিপত্তি, মহানুভবতা, দানশীলতা ও পরোপকারিতায় বিক্রমপুরের তেলিরবাগের বৈদ্যরা এক সময়ে খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। গ্রামটি খুবই প্রাচীন—আর এই গ্রামের যা-কিছু নামডাক তা ছিল এঁদেরই জন্য। পুরাতন বিবরণে দেখা যায় যে, এমন অতিথিপরায়ণ, স্বজনবৎসল ও উদারহৃদয় পরিবার পূর্ববাংলার এই অঞ্চলে খুব কমই

ছিল। এই পরিবারের উপাধি ছিল 'দাশ'। দেশবন্ধুর মহানুভবতা ও দানশীলতা যতখানি তাঁর আত্মগত, তার চেয়েও বেশি ছিল তাঁর বংশগত সংস্কার। সেই সংস্কার পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত হয়ে এই এই বংশের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান চিত্তরঞ্জন দাশের মধ্যে এক আশ্চর্য পরাকাষ্ঠা লাভ করেছিল।

তেলিরবাগের এই দাশ-পরিবারটি যেন উকিল-ব্যারিস্টার-জজের বংশ বললেই হয়। একটি পরিবারের মধ্যে এতগুলি আইনজীবী মানুষের আবির্ভাব নিঃসন্দেহে এই বংশের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কলকাতার রামবাগানের বিখ্যাত দত্ত-পরিবারের একদা এইরকম খ্যাতি ছিল। স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন এই পরিবারের মুখোজ্জ্বলকারী এক সন্তান। তিনি বাংলা তথা ভারতের অন্যতম সুসন্তানও ছিলেন। দাশ-পরিবারের উত্তরপুরুষ হিসাবে আমরা পাই কালীমোহন, দুর্গামোহন ও ভুবনমোহন—এই তিন ভাইকে। তিন ভাই যেন হরিহরাত্মা। দুর্গামোহন ছিলেন এই বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান। চিত্তরঞ্জন ছিলেন ভুবনমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয় ১৮৮৭ সালে। এই উপলক্ষে ভারতবর্ষে জুবিলি উৎসব হয়েছিল। এই বছরেই কালী-মোহন দাশের মৃত্যু হয়।

চিত্তরঞ্জনের পিতামহ ও পিতৃব্য দু'জনেই স্বনামধন্য উকিল ছিলেন। তেলিরবাগ থেকে এঁরা বরিশালে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। সমস্ত পূর্ববঙ্গের মধ্যে বরিশালের জলবায়ু স্বতন্ত্র, এখানকার অধিবাসীদের মানস-প্রকৃতি স্বতন্ত্র। কর্মে নিষ্ঠা, দৃঢ়চিত্ততা আর দুর্বার জীবনীশক্তি—এই হলো বরিশালের মানুষ। এই জেলার স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্তের সময় রাজনৈতিক আন্দোলনে 'বরিশাল পুণ্যে বিশাল' হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল। এইখানে দীর্ঘকাল বসবাস করার ফলে দাশ-পরিবারের মধ্যে বরিশালীয় মনোভাব—সেই কর্মে নিষ্ঠা, দৃঢ়চিত্ততা ও অবাধ জীবনীশক্তি—স্থানীয় জলবায়ুর

সঙ্গে অনেকখানি সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য, চিত্তরঞ্জনও উত্তরাধিকারসূত্রে এই তিনটি গুণই লাভ করেছিলেন এবং তাঁর মানস-গঠনে এইগুলি বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল। উত্তরকালে অনেক সময়ে দেশবন্ধু তাঁর অন্তরঙ্গস্থানীয়দের বলতেন: 'জানো, আমি একাধারে বিক্রমপুর ও বরিশাল।'

যৌবনকালেই তিন ভাই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে একমাত্র অগ্রজ কালীমোহন উত্তরকালে প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দুধর্মে ফিরে এসেছিলেন। রসা রোডের বাড়িতে তিনি একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম জীবনে এঁরা বরিশালে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং পরে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। যে বছর (১৮৭০) দুর্গামোহন বরিশাল থেকে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতে আসেন সেই বছরেই পটলডাঙায় চিত্তরঞ্জনের জন্ম হয়। ১৪৮ নম্বর রসা রোডের বসতবাড়িটি কালীমোহন তৈরি করিয়েছিলেন। এখনো বোধ হয় খুঁজলে পরে দেখা যাবে, সেবাসদনের কোনো প্রাচীরে 'কালীমোহন আলয়' এই নামটি উৎকীর্ণ আছে। কালী-মোহনের দুই পুত্র ও এক কন্যা তাঁর জীবিতকালেই মারা যায়। সেজন্য তিনি কনিষ্ঠ ভুবনমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র বসন্তরঞ্জনকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ইনি ব্যারিস্টার হয়েছিলেন ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য ব্রজেন্দ্র-নাথ শীলের অন্যতম জামাতা ছিলেন। বসন্তরঞ্জন অল্প বয়সে মারা যান। দত্তকপুত্র ছিলেন বলে কালীমোহনের রসা রোডের বাড়ির মালিক বসন্তরঞ্জনই হয়েছিলেন। বসন্তরঞ্জন তাঁর মৃত্যুকালে উইল করে ঐ বাড়ি তাঁর গর্ভধারিণী মায়ের নামে লিখে দেন। নিস্তারিণী দেবীর মৃত্যুর পরে তাঁর দুই পুত্র, চিত্তরঞ্জন ও প্রফুল্লরঞ্জন—এই বাড়ির উত্তরাধিকারী হন। পরে প্রফুল্লরঞ্জন তাঁর অংশ অগ্রজকে বিক্রী করে পাটনায় গিয়ে বসবাস করতে থাকেন—তাঁর কর্মস্থলই ছিল পাটনা। এইভাবেই চিত্তরঞ্জন ১৪৮ নম্বর রসা রোডের বাড়ির সম্পূর্ণ মালিক হয়েছিলেন। তখন কি তিনি জানতেন ভবিষ্যতে

একদিন তাঁর এই বসতবাড়ি ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করবে এবং একেই কেন্দ্র করে রচিত হবে বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে একটি নতুন অধ্যায়।

কালীমোহন অত্যন্ত তেজস্বী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন; তিনি অল্পতেই রেগে যেতেন। এইজন্যই হাইকোর্টে তাঁর সঙ্গে বিচারপতিদের প্রায়ই সংঘর্ষ বাধত। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন এখানে নামকরা উকিলদের মধ্যে ছিলেন চন্দ্রমাধব ঘোষ, রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি। হাইকোর্টে উকিল হিসাবে কালীমোহনের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। মানুষটি ছিলেন নিভীক প্রকৃতির। তখনকার দিনে হাইকোর্টের কোন একজন জজকে চ্যালেঞ্জ করা একজন দেশীয় উকিলের পক্ষে কম সাহসের ব্যাপার ছিল না। একবার তিনি যখন কোন একটি মামলায় আসামীর পক্ষে দাঁড়িয়ে সওয়াল করছিলেন, তখন বিচারপতি লুই জ্যাকসন আইনঘটিত একটি প্রশ্ন বার বার জিজ্ঞাসা করায়, কালীমোহনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ বিচারকের মুখের উপর বলেন: 'হুজুর, আমি খুবই বিস্মিত হচ্ছি যে, যদিও জেলার বিচারক হিসাবে আপনি বহু বছরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তথাপি, আইনের একটি ছাত্র সহজে যা বুঝতে সক্ষম, আপনি তা বুঝতে পারছেন না।' বিচারক ক্রুদ্ধ হলেন এবং কালীমোহনের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এলেন। তাঁর বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই তাঁকে এই আচরণের জন্য ক্ষমা চাইতে বলেন, কিন্তু কালীমোহন তাঁদের সেই অনুরোধে কর্ণপাত করলেন না। এই উপলক্ষে হাকোর্টের ফুল বেঞ্চ বসল এবং প্রধান বিচারপতি স্যার বার্ণস পিকক্ তাঁর রায়ে বললেন; 'কালীমোহনবাবু যে রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করেছেন তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আইনের যে নীতি তিনি আলোচনা করেছিলেন তা সর্বতোভাবেই ঠিক। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা যেতে পারে না।' বলা বাহুল্য, জ্যাঠামশাইয়ের এই নির্ভীকতা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র চিত্তরঞ্জনের মধ্যেও দেখা

গিয়েছিল এবং তাঁর গৌরবমণ্ডিত ব্যবহারজীবী জীবনে তাঁকেও একাধিকবার একাধিক আদালতে বিচারকদের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল।

কালীমোহনের মধ্যম ভ্রাতা দুর্গামোহন।

তাঁর সময়ে ইনি ব্রাহ্মসমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা, উন্নতি ও বহুবিধ সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাসের সঙ্গে দুর্গামোহনের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এসব ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ও অর্থানুকূল্য দুই-ই ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী-বিরচিত 'হিস্ট্রী অব্‌ দি ব্রাহ্মসমাজ' নামক বইতে দুর্গামোহনের নাম বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গেই উল্লিখিত হয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন কালে ইনি কাউয়েল সাহেবের প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন। বরিশালের ব্রাহ্মসমাজ দুর্গামোহন স্থাপন করেছিলেন। সমাজ-সংস্কারকদের মধ্যেও ইনি একজন অগ্রগণ্য ছিলেন। বিদ্যাসাগরের সাহায্যে ইনি স্বীয় বিধবা বিমাতার পুনরায় বিয়ে দিয়ে সমাজে তুমুল আলোড়ন এনেছিলেন। দুর্গামোহনের সময় থেকে (১৮৭০) ১৪৮ নম্বর রসা রোডের বাড়িটা সর্বপ্রকার সংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল; যেমন পরবর্তীকালে ১৯২০ সাল থেকে এই বাড়িটাই হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র-স্থল। সমকালীন বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে এই বাড়িটি সত্যিই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, বলা যেতে পারে।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ও সিংহীবাড়ি, কলুটোলার রামকমল সেনের বাড়ি, রামবাগানের দত্তবাড়ি এবং রসা রোডের গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও কালীমোহন দাশের বাড়ি—সাধারণ গৃহস্থের বাসগৃহ ছিল না। উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথম চতুর্থাংশে বাংলার যে সর্বাবয়বসম্পন্ন নবজাগৃতি, তারই কীর্তিস্তম্ভ মহানগরীর এই কয়টি প্রখ্যাত বাসভবন।

দুর্গামোহনের কথা একটু বিস্তারিতভাবে বলা দরকার। সে যুগে সমাজ-সংস্কারকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি যখন বরিশাল থেকে কলকাতায় আসেন তখন কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামে নতুন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছে ও সেই সঙ্গে সমাজের কর্মক্ষেত্র নানাদিকে বিস্তারলাভ করেছে।* দুর্গামোহন স্বভাবতঃই এই নতুন সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই স্বীয় প্রতিভাবলে প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের তিনি অন্যতম নেতা হয়ে উঠলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে ভেদ রাখতে চেয়েছিলেন। দুর্গামোহন ও তাঁর মতের অনুগামীরা এই জাতীয় শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। ১৮৭৩ সালে তিনি নিজব্যয়ে একে উচ্চ-শিক্ষিত ইংরেজ মহিলার (মিস্ এ্যাক্রয়েড) তত্ত্বাবধানে 'কলিকাতা হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। কিছুকাল পরে ইহা 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' রূপান্তরিত হয় এবং তারো কিছু পরে ইহা বেথুন স্কুলের সঙ্গে সম্মিলিত হয়। এই কারণেই দুর্গামোহন বেথুন স্কুলের পরিচালনা সমিতির অন্যতম সভ্য হতে পেরেছিলেন।

পরবর্তীকালে যখন 'কুচবিহার বিবাহ আন্দোলনকে' কেন্দ্র করে* ব্রাহ্মসমাজে নতুন আলোড়ন দেখা গিয়েছিল তখন শিবচন্দ্র দেব ও শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে দুর্গামোহন কেশব-বিরোধী শিবিরের নেতৃত্ব করেন এবং এজন্য প্রভূত অর্থব্যয় করেন। তখন থেকেই তিনি 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের' সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সমাজের বহুমুখী উন্নয়ন কার্যে মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করেন। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, সিটি কলেজ প্রভৃতি শিক্ষায়তনগুলির প্রতিষ্ঠার পিছনে তাঁর যথেষ্ট অর্থানুকূল্য ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী তাই দুর্গামোহনকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ বলে উল্লেখ করেছেন। দুর্গামোহন অত্যন্ত জেদী পুরুষ ছিলেন। কোন কাজের ঔচিত্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলে তিনি কোনক্রমেই সেই কাজ থেকে

* এই লেখকের 'কেশবচন্দ্র' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পশ্চাদ্পদ হতেন না। পরিজনবর্গ ও আত্মীয়স্বজনের বাধা ও বিরোধিতা সত্ত্বেও আপন বিধবা বিমাতার বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা ছিল এর একটা বড় নিদর্শন। চিত্তরঞ্জনের মধ্যেও এই গুণটি পরিলক্ষিত হতো। দাশ-বংশের প্রকৃতিটাই ছিল অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। দুর্গামোহন এর প্রমাণ রেখেছেন, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দেশবন্ধুও এর প্রমাণ রেখেছেন। 'মেজ জ্যাঠামশাইয়ের জেদটা আমি পুরোমাত্রায় পেয়েছি। কোন একটা কাজ ধরলে সেটা শেষ না করে ছাড়ি না।'—এই কথা বলতেন তিনি।

দুর্গামোহনের তিন পুত্র ও তিন কন্যা। সকলেই কৃতবিদ্য ছিলেন। তিন পুত্রই—সত্যরঞ্জন, সতীশরঞ্জন ও যতীশরঞ্জন—ব্যারিস্টার ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পরে রেঙ্গুন হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন। আইন-ব্যবসায়ে মধ্যম পুত্রের কৃতিত্ব ও সাফল্যই ছিল সবচেয়ে বেশি। সতীশরঞ্জন রাজনীতিক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু দুর্গামোহন দাশের অন্যতম জামাতা ছিলেন। দুর্গামোহনের জীবনের ইতিহাস নির্যাতনের ইতিহাস, সহিষ্ণুতার ইতিহাস। ১৮৯৭ সালে প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র চিত্তরঞ্জনের বিয়ের একপক্ষকাল পরেই দুর্গামোহনের মৃত্যু হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, দুর্গামোহনের স্ত্রী ব্রহ্মময়ী দেবী নারীকুলে চিরস্মরণীয়া হয়ে থাকবেন। তাঁর কথা বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী এবং শিবনাথ-দুহিতা, হেমলতা দেবী। স্বামীর মৃত্যুর একুশ বছর আগে এই সাধ্বী লোকান্তরিতা হন।

ভুবনমোহন ছিলেন ভাইদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

বরিশাল থেকে আসার পর তিন ভাই কলকাতায় পটলডাঙার বাড়িতে একসঙ্গেই থাকতেন এবং পরবর্তীকালে যখন রসা রোডের বাড়ি তৈরি হয়, তখনো তাঁরা পৃথগান্ন হন নি—এমনি সদ্ভাব ও সম্প্রীতি ছিল এঁদের মধ্যে। বাঙালীর একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শটা এঁদের যেন মজ্জাগত ছিল। চিত্তরঞ্জনও এই ধারা শত অসুবিধার

মধ্যেও অক্ষুণ্ণ রক্ষা করেছিলেন। কালীমোহন দুই সহোদরকেই তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অছি নিযুক্ত করেছিলেন এবং দুর্গামোহনের মৃত্যুর পরে নাবালক ভাইপো ও নাবালিকা ভাইঝিদের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন ভুবনমোহনের স্ত্রী নিস্তারিণী দেবী।

এই ভুবনমোহন ও নিস্তারিণী দেবী ছিলেন চিত্তরঞ্জনের পিতামাতা। তিনিই ছিলেন তাঁদের প্রথম সন্তান। ভুবনমোহন হাইকোর্টে ওকালতি করতেন। তিনি এ্যাটর্ণিশিপ পরীক্ষাও পাস করেছিলেন। আইনে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং মকদ্দমার ঘটনাবলী সাজাবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। সম্ভবতঃ উত্তরাধিকার-সূত্রে পুত্র চিত্তরঞ্জন তাঁর পিতার এই প্রতিভা পেয়ে থাকবেন। আইন-ব্যবসায়ে ভুবনমোহনের বিস্তর অর্থাগম হয়, কিন্তু হলে হবে কি, —দাশ-পরিবারের দানশৌণ্ডতা ও উদারতা তাঁর মধ্যেও দেখা গিয়েছিল। পরের দুঃখ দেখলে ইনি স্থির থাকতে পারতেন না। পিতার এই গুণটিও পুত্র চিত্তরঞ্জন বিশেষভাবেই লাভ করেছিলেন। দুর্গামোহন ও ভুবনমোহনের মানসিকতার মধ্যে একটা পার্থক্য ছিল। ভুবনমোহন ছিলেন একান্তভাবেই আত্মপ্রচারবিমুখ একজন নীরব কর্মী। আত্মপ্রতিষ্ঠা তিনি চাইতেন না। সব কাজের অন্তরালে থেকে সকলকে সাধ্যমত, কখনো বা সাধ্যের অতিরিক্ত, সাহায্য করতে ভালবাসতেন। কারো উপকার করে তিনি উপকৃত ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসর দিতেন না। কোন বিষয়েই তিনি সহজে নাম জাহির করতে সম্মত হতেন না।

দুর্গামোহনের মতো ভুবনমোহনও ব্রাহ্মসমাজের প্রধানদের মধ্যে একজন ছিলেন। ১৮৭৮ সালের ১৫ই মে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐদিন টাউন হলের এক বিরাট সভায় বাংলার অন্যতম ধর্মগুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রস্তাবক্রমে স্থাপিত হয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। এই নবগঠিত সমাজের সম্পাদক-পদে বৃত হন শিবচন্দ্র দেব আর কার্যপরিচালনার জন্য পঁয়ত্রিশজন নির্বাচিত

সভ্যের মধ্যে ভুবনমোহন দাশ ছিলেন একজন।* ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'দি ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' যখন আনন্দমোহন বসু ও দুর্গা-মোহন দাশের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয় তখন থেকেই ভুবনমোহন ছিলেন এর অন্যতম লেখক; শুধু লেখক নন, তিনিই ছিলেন এর সম্পাদক। সম্পাদক হিসাবে তিনি লিখতেন রাজনৈতিক প্রবন্ধ আর শিবনাথ শাস্ত্রী লিখতেন ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ। ভুবনমোহন এই পত্রিকায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা করতেন। কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই সমাজের মুখপত্রে রাজনৈতিক আলোচনার আধিক্য পছন্দ করলেন না। সম্ভবতঃ এই কারণে একাদিক্রমে পাঁচবছর (১৮৭৮-৮৩) সম্পাদনা করার পর ভুবনমোহন সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিয়ে 'বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন' নামে নিজস্ব একটি কাগজ করেন।

সাংবাদিক হিসাবে ভুবনমোহনের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। তিনি 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এর একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। তারপর তিনি যখন 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' পত্রিকার সম্পাদক, সেই সময়ে হাইকোর্টের কোনো একটি মকদ্দমা উপলক্ষে ভুবনমোহনের কাগজে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় উক্ত সংবাদটি উদ্ধৃত করে তার উপর একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। ফলে আদালত অবমাননার দায়ে তিনি অভিযুক্ত হন ও তার কারাদণ্ড হয়।* এই ঘটনার পরেই ভুবন-মোহনের সঙ্গে পত্রিকার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় ও তিনি তখন নিজস্ব পত্রিকা বের করেন। এই প্রচেষ্টায় তাঁকে বিশেষভাবেই ঋণগ্রস্ত হতে হয়েছিল। পিতার এই সাংবাদিক প্রতিভারও অধিকারী হয়েছিলেন পুত্র চিত্তরঞ্জন। মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদর্শন করে ভুবন-মোহন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যে আদর্শ রেখে গিয়েছিলেন উত্তরকালে

[1] *History of the Brahmo Samaj* : **Shivanath Sastri**

*লেখকের 'রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ' দ্রষ্টব্য।

চিত্তরঞ্জনের জীবনে তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি বিশেষ নীতি—শুধু নীতি নয়, একটা 'প্যাশন' বললেই চলে। পিতার রাজনীতি-প্রবণতা পুত্র চিত্তরঞ্জনের মধ্যেও বিশেষভাবে সংক্রামিত হয়ে গিয়েছিল। ভুবনমোহন স্যুরেন্দ্রনাথের একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন ও ভারত-সভার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

ভুবনমোহনের চরিত্রে বহুবিধ সদ্‌গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি যত বড় উকিল ছিলেন তার চেয়ে বেশি সংস্কৃতিবান্ মানুষ ছিলেন তিনি। তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বেশি সুশিক্ষিত। শিক্ষার সঙ্গে মিলেছিল সংস্কৃতির প্রতি একটা প্রবল অনুরাগ। পুত্র চিত্তরঞ্জন উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর পিতার এই মানসিকতাও লাভ করেছিলেন।. যে সর্বতোমুখী সাংস্কৃতিক অনুরাগ তাঁর মধ্যে উত্তরকালে দেখা গিয়েছিল সেজন্য তিনি তাঁর পিতার নিকটই বেশি ঋণী ছিলেন। ভুবনমোহন ছিলেন নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মানুষ আর ধর্মে ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। কিন্তু ধর্মের গোঁড়ামি তাঁর মধ্যে কখনো দেখা যায় নি। কথিত আছে, তিনি ব্রাহ্ম-সমাজে সর্বদা হিন্দু আচার-প্রণালী প্রবর্তনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর নিজের পরিবারে বিবাহাদি অনুষ্ঠানে ভুবনমোহন হিন্দু আচার অনুসরণ করতেন। চিত্তরঞ্জনও তাঁর পিতার কাছ থেকে এই গুণটি পেয়ে থাকবেন, কারণ তাঁর জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, ব্রাহ্ম পিতামাতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও পারিবারিক আচার-আচরণে চিত্তরঞ্জন হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন, অথবা হিন্দুই ছিলেন বলা যায়।

স্বজনবৎসল ভুবনমোহন সর্বদা আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত হয়ে থাকতে ভালবাসতেন—দুরবস্থার সময়েও কোন পোষ্যকে তিনি ত্যাগ করেন নি। ভুবনমোহনের চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিল—অভিমানশূন্যতা অমায়িকতা, মিষ্টভাষিতা ও সদালাপ। চরিত্রের মহত্ত্ব ও বদান্যতা একদিকে তাঁকে যেমন সর্বজনশ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল, আবার অন্য-

দিকে ইহাই শেষ জীবনে তাঁর দুঃখ ও দারিদ্র্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দান ও পরোপকার বিষয়ে মানুষটি ছিলেন মুক্তহস্ত। পিতার এইসব গুণ পুত্র চিত্তরঞ্জন পূর্ণমাত্রায় লাভ করেছিলেন। ভুবনমোহন অর্থগৌরবে গৌরবান্বিত হতে পারেন নি—তিনি গৌরব লাভ করেছিলেন সর্বস্বান্ত হয়ে—তিনি দান করতেন অপর্যাপ্ত, সামর্থ্যের অধিক। তিনি লোককে ঋণ দিতেন, কিন্তু ঋণ আদায় করতে পারতেন না। এই উদারতার জন্যই তিনি শেষ জীবনে ঋণভারে জড়িত হয়ে পড়েন এবং এইজন্য তাঁকে দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। দাশ-পরিবারে এটা একটা মর্মন্তুদ কাহিনী।

এ্যাটর্ণি ভুবনমোহন প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন বলে জানা যায়, কিন্তু তিনি সঞ্চয়ী ছিলেন না। তিনি পুরুলিয়াতে একটি বাড়ি নির্মাণ করিয়েছিলেন, এ ছাড়া তাঁর আর কোন সম্পত্তি ছিল না। হাইকোর্ট-পাড়ায় তাঁর নিজস্ব অফিসের নাম ছিল 'দাশ য়্যাণ্ড সেন'। এই সেন ছিলেন যশস্বী লেখক কুমুদবন্ধু সেনের পিতা সত্যরঞ্জন সেন। বিলাস-ব্যসন বলতে ভুবনমোহনের কিছুই ছিল না, তথাপি তাঁকে দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় নিতে হয়েছিল কেন? শোনা যায়, বন্ধুপ্রীতিই এর কারণ ছিল। এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধুর এক জীবনীকার (ইনি দেশবন্ধুর জীবিত-কালে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন) লিখেছেন: 'জনৈক বন্ধুর জামিন হইয়া সেই দায়ে ভুবনমোহনকে চল্লিশ হাজার টাকার ঋণ হাতে তুলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। এই ঋণ পরিশোধ হওয়ার আশু সম্ভাবনা না থাকায়, তিনি ইন্‌সল্‌ভেণ্টের (দেউলিয়া) আসামী হন।'* মতান্তরে, এই ঋণের পরিমাণ ছিল ত্রিশ হাজার টাকা। এর পর থেকেই দাশ-পরিবারে দেখা দিতে থাকে অর্থের অনটন। তাঁর মধ্যম অগ্রজ দুর্গামোহন সহোদরকে ঋণমুক্ত করার জন্য বহু

[1] দেশবন্ধু-স্মৃতি: হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু চল্লিশ হাজার টাকা পরিশোধ করা তাঁর সাধ্যের অতীত ছিল। দেউলিয়া হয়ে ভুবনমোহন আইনের চক্ষে ঋণমুক্ত হলেন বটে, কিন্তু তিনি যে ঋণী, এটা তিনি সর্বক্ষণ অন্তরে অনুভব করতেন। দাশ-পরিবারের মানসিক মর্যাদাও এজন্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। উত্তরকালে চিত্তরঞ্জন তাঁর পিতার জীবিত-কালেই তাঁকে ঋণমুক্ত করেছিলেন, সেই কাহিনী আমরা যথাস্থানে বলব।

চিত্তরঞ্জনের জীবনে তাঁর পিতা ও পিতৃব্যদের চরিত্রের প্রভাব যেমন ছিল, তেমনি মাতা নিস্তারিণী দেবীরও প্রভাব বড় কম ছিল না। 'বাবা বা জ্যাঠামশাইদের চেয়ে, আমার উপর মায়ের প্রভাবটাই ছিল বেশি'—এই কথা বলতেন চিত্তরঞ্জন। দাশ-পরিবারের সঙ্গে বিপিন-চন্দ্র পালের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি লিখেছেনঃ 'চিত্তরঞ্জন সর্বদাই মাতার অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার মায়ের মত এমন উদারমতি, স্বজনবৎসল, স্বামী-পুত্র-পরিবারের সেবানিষ্ঠ নারী আমি খুব কমই দেখিয়াছি।' আকাশের মতো উদার ছিল নিস্তারিণী দেবীর হৃদয়—সেই উদারতার বোধ হয় সবটাই জন্মসূত্রে লাভ করেছিলেন তাঁর প্রথম সন্তান চিত্তরঞ্জন। দাশ-পরিবার একটি বৃহৎ পরিবার ছিল, অতিথি-অভ্যাগতদের এখানে ছিল নিত্য আনাগোনা। তাঁদের পরিচর্যায় এতটুকু ক্রটী যাতে না হয় সেদিকে সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন নিস্তারিণী দেবী। খুব যে একজন শিক্ষিতা মহিলা তিনি ছিলেন তা নয়, তবে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান্ স্বামীর সাহচর্যে তিনি নিজেকে সর্বাংশে দাশ-পরিবারের উপযুক্ত করে নিতে পেরেছিলেন। স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি তাঁর ছিল অত্যন্ত প্রখর। স্বামীর অকৃপণ বদান্যতার ফলে সংসারে যখন অর্থকষ্ট দেখা দিত, তখন এই বুদ্ধিমতী নারী শক্ত হাতে সংসারের হাল ধরে রাখতেন। স্বামী যখন দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন তখনো তিনি যে দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়ে স্বামীর দুশ্চিন্তা লাঘব

করেছিলেন তা দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। 'সুখের সময় সুখ ভোগ করেছি, এখন দুঃখের দিনে ভগবানের কাছে কেন নালিশ করব?' এই কথা একদিন বলেছিলেন নিস্তারিণী দেবী তাঁরই সমবয়সী প্রতিবেশিনী এক মহিলাকে যখন ভুবনমোহন দেউলিয়া হন। বিপদে বা সম্পদে, কোন অবস্থায়ই তিনি বিচলিত বোধ করতেন না, বরং প্রসন্নচিত্তে সংসারের আলো-অন্ধকারের পথে স্বামীর আদর্শকে সামনে রেখেই চলতেন। এমন মায়ের প্রতি চিত্তরঞ্জন যে গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করবেন, এটা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল। মায়ের মৃত্যুকালে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন নি বলে যারপরনাই ক্লেশবোধ করেছিলেন। চিত্তরঞ্জনের অপরিসীম মাতৃভক্তি যে তাঁর দেশপ্রেমের উৎস ছিল, এমন অনুমান বোধ করি অসঙ্গত নয়।

নিস্তারিণী দেবীর কথা আরো একটু বলা দরকার, কারণ চিত্তরঞ্জনের চরিত্র-গঠনে ভুবনমোহনের যতখানি প্রভাব ছিল, তেমনি প্রভাব ছিল তাঁর মায়ের। তাঁর অন্তরখানি স্নেহ ও কোমলতায় পরিপূর্ণ ছিল। ব্রাহ্মধর্ম তাঁর ও তাঁর স্বামীর স্মরণীয়' ধর্ম ছিল বটে কিন্তু তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের উগ্রতা তো ছিলই না, এমন কি সামাজিক ও পারিবারিক আদর্শের দিক দিয়ে তিনি খুব বেশি প্রগতিশীলা নারীও ছিলেন না। সম্ভবতঃ মায়ের এই সংরক্ষণশীল মানসিকতা চিত্তরঞ্জনকে তাঁর পরিণত বয়সে অনেকখানি হিন্দুভাবাপন্ন করে তুলতে সহায়তা করেছিল। তাঁর স্নেহশীলতার কথা একবার শুনেছিলাম লেডি অবলা বসুর কাছে। তিনি বলতেন, তাঁর নিজের মায়ের মৃত্যুর পরে তিনি ও তাঁর ভাইবোনেরা নিস্তারিণী দেবীর জন্যই নিজেদের একদিনের জন্যও মাতৃহারা মনে করতে পারেন নি। তিনি তাঁদের নিজের পুত্রকন্যার মতোই লালন-পালন করেছিলেন। আবার তাঁর দানশীলতার কথাও লেডি অবলা বসু শতমুখে বলতেন। তাঁর বদান্যতা শুধু তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, আর্ত ও

অভাবগ্রস্তের প্রতিও তা ছিল নিত্য প্রসারিত। দানে তিনি সত্যিই মুক্তহস্ত ছিলেন। একটি বিরাট সংসারের গৃহিণীপদে অধিষ্ঠিতা থাকতে হলে যে রকম কর্তব্যপরায়ণ হওয়া দরকার, নিস্তারিণী দেবী তাঁর জীবনে তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। সংরক্ষণশীলতার সঙ্গে মিশেছিল একটা অসাধারণ চারিত্রিক-শক্তি এবং এরই ফলে তিনি নারীকুলের আদর্শস্থানীয়া হতে পেরেছিলেন। আমরা দেখতে পাব যে, চিত্তরঞ্জনের দেহের শোণিতধারার সঙ্গে তাঁর মায়ের এই বিবিধ গুণাবলী মিশ্রিত হয়ে মানসিক উদারতার দিক দিয়ে তাঁকে করে তুলেছিল একজন সার্থকনামা পুরুষ। মাতৃভক্ত চিত্তরঞ্জন তাঁর মায়ের অশেষ সুখের কারণ হয়েছিলেন।

॥ তিন ॥

কোন কোন মানুষ বড় হয়ে জন্মগ্রহণ করে, আবার কোন কোন মানুষ নিজের চেষ্টায় বড় হয়। মহত্ত্ব জিনিসটা যতখানি অর্জিত সম্পদ, উত্তরাধিকারসূত্রে ঠিক ততখানিই প্রাপ্ত বস্তু। কিন্তু কোন একটি মানুষের জীবনে অর্জিত ও প্রাপ্ত মহত্ত্বের সমাবেশ খুব কমই দেখা যায়। চিত্তরঞ্জনের পঞ্চান্ন বছরের জীবনে তাঁর বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টা ও চিন্তা-ভাবনার মধ্যে যে মহত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়েছিল তার অর্ধেক ছিল তাঁর অর্জিত সম্পদ আর বাকী অর্ধেক ছিল বংশ-পরম্পরায় প্রাপ্ত। মহত্ত্বের বীজটা তাঁর সত্তার মধ্যেই ছিল, তাঁর পিতামাতার জীবন থেকে এটা তাঁর জীবনেও সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল তাঁর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই। বাল্য ও শৈশব জীবনে তিনি যে এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন, তিনি যে একটি মহৎ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সেই বংশের মহত্ত্বের ধারা তাঁকে অক্ষুণ্ণ রক্ষা করতে হবে, এই বোধটা জীবনের প্রথমাবধি চিত্তরঞ্জনের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। তাই বোধ হয় দুর্গামোহন তাঁর কনিষ্ঠ সহোদরকে প্রায়ই বলতেন, 'আমাদের বংশে যদি কেউ মানুষ হয়, তবে এক চিত্তই হবে।'

চিত্তরঞ্জনের জীবন ও তাঁর কার্যকলাপের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে হলে, বিশেষতঃ তাঁর রাজনৈতিক মতামত, তাঁর স্বরাজ-সাধনার অর্থ বুঝতে হলে, গোড়া থেকেই তাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও পরিস্থিতিকে আমাদের দৃষ্টিপথে রাখা দরকার। ইতিহাসের বুকে যাঁরা তরঙ্গ তোলেন অথবা যাঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করেন, তাঁদের জীবন-কথা পরিপার্শ্ব ও পটভূমি এই দুটিকে বাদ দিয়ে রচিত হতে পারে না। চিত্তরঞ্জনের জন্মকাল ইংরেজী ১৮৭০ সালে অর্থাৎ তখন উনিশ শতকের প্রথমার্ধ শেষ হয়ে আরো বিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তাঁর পিতা

ও পিতৃব্য দুইজনই ছিলেন এই সময়কার সাক্ষীপুরুষ। তাঁরা তাঁদের প্রাণরস উনিশ শতকের বাংলার বর্ণাঢ্য নবজাগৃতি থেকেই আহরণ করেছিলেন এবং বংশানুক্রমিক ধারায় প্রবাহিত হয়ে সেই প্রাণরস তাঁদের বংশধর চিত্তরঞ্জনের জীবনকেও পরিপুষ্ট করেছিল। সেই নবজাগরণের চিত্রটা আমাদের সামনে রেখে তখনকার ঘটনাবলীর সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের পরিণত বয়সের চিন্তা ও কর্মসাধনাকে আমরা ঠিকভাবে মিলিয়ে দেখতে পারব।

উনবিংশ শতক নানা কারণে বাঙালীর নবজন্মলাভের ইতিহাসে স্মরণীয়। এই যুগটা ছিল সদ্যোজাগ্রত তরুণ বাংলার আত্মানুসন্ধানের যুগ, বাঙালীর পথ-পরিবর্তনের যুগ। ধর্মবীরের ও কর্মবীরের যুগ ছিল এই শতকটি। ধর্ম, কর্ম, শিক্ষা, সমাজ, শিল্প, সাহিত্য, ঘরের ও বাইরের সংস্কার-প্রয়াস ও রাষ্ট্রচেতনা প্রভৃতি জাতীয় জাগরণের সকল দিকেই এই যুগ তার অগ্নিমুদ্রা অঙ্কিত করে বাঙালীকে জয়ের পথে অগ্রসর করেছিল। এই যুগের বাঙালীপ্রধানগণ সত্যকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করে দেশকে মুক্তির পথে অগ্রবর্তী করেছিলেন। উনিশ শতকের আরো একটু পিছন দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলে আমরা কি দেখতে পাই? দেখতে পাই পুঞ্জীভূত কুসংস্কার, তমোগ্রস্তের আলস্য ও জড়তা, পরশ্রীকাতর কূপমণ্ডুকের প্রাণহীন জীবন—যা পাঠান-মোগলের চরম দানপত্রে প্রদত্ত মলিন ঐশ্বর্যরূপে একদিন পলাশীর আম্রকাননে পদদলিত হয়ে শেষে লাঞ্ছিত বাঙালীর দীপপ্রভাহীন গৃহের অন্ধকার কোণে আশ্রয় নিয়ে ছত্রকের মতোই বিস্তারলাভ করেছিল। তারপর উনিশ শতকের এক শুভ প্রভাতে বাংলায় নেমে এলো জাগরণের অমৃতধারা যার স্পর্শে এইসব জঞ্জাল অপসারিত হয়ে গিয়েছিল। বাঙালীর ইতিহাসে সেই পট-পরিবর্তনের কাহিনী অল্পবিস্তর সুবিদিত, কারণ এর আলোচনা অনেক মনীষীই করেছেন। উনিশ শতক একদিকে যেমন রামমোহন, বিদ্যাসাগর,

মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির প্রভায় সমুজ্জ্বল, তেমনি আবার জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতির অবদানে সুসমৃদ্ধ। আবার এই যুগই দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতির তপস্যায় পবিত্র; তেমনি এই যুগ রামগোপাল, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতির সিংহনাদে বিকম্পিত। মোটকথা, বাংলার আকাশে তখন নানা দিকে নানা পূর্ণচন্দ্রের উদয় দেখা গিয়েছিল। বাঙালী যে তার নিজের পথ নিজে করে নিতে পেরেছিল তার কারণ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকেই মাত্র কয়েক দশকের মধ্যেই এতগুলি সঞ্জীবনী প্রতিভার আবির্ভাব। যে জাতির জীবনে একটিমাত্রও এমন যুগের উদয় হয়, সে জাতির আশা আছে। এই কর্মময় যুগের প্রাণশক্তিতে পরিপুষ্ট হয়েছিলেন চিত্তরঞ্জনের পিতা ও পিতৃব্যগণ।

উনিশ শতকের উদ্বোধন হয়েছিল রামমোহনের শঙ্খনিনাদে। এই শক্তিমান ও দূরদ্রষ্টা পুরুষ সেদিন ইতিহাসের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করে তাঁর স্বদেশবাসীদিগের মুখ পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকেই পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা প্রবলভাবে ভারতবর্ষে আসতে থাকে। পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার উদ্দাম বন্যাস্রোত প্রথম কিছুকাল বাংলা দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এই শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজ চেয়েছিল ভারতবর্ষে cultural conquest বা সাংস্কৃতিক-বিজয় সুসম্পন্ন করতে। রামমোহনের আবির্ভাব না ঘটলে হয়ত এই সাংস্কৃতিক বিজয় সফল হতো, কিন্তু তাঁর মেধা ও মনীষার জন্য এটা প্রতিহত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ইতিহাসের গর্ভ থেকে যখন একে একে যুগনায়কদের আবির্ভাব ঘটতে লাগল তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবনে রামমোহনের চিন্তা প্রতিফলিত হতে থাকে যার মূল বক্তব্য ছিল আত্মস্থ হওয়া—জাতীয় ধর্ম ও ভারতীয় জীবনবাদে শ্রদ্ধান্বিত হওয়া। বাংলার নবজাগৃতির পুরোধাগণ প্রাচীন ও নবীনের

সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে কিভাবে ইংরেজের সাংস্কৃতিক জয়-গৌরবকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন তার বিস্তারিত ইতিহাস আমাদের এই আলোচনার বহির্ভূত। এঁদের প্রত্যেকেই সমুন্নত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা লাভ করেও স্বদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ত্যাগ করেন নি। ধর্ম থেকে সাহিত্য, সাহিত্য থেকে সমাজ-চিন্তা, সমাজ-চিন্তা থেকে রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জনের প্রয়াস—বাঙালী অগ্রসর হয়েছে এইভাবে ধাপে ধাপে। এই ভাবেই উনবিংশ শতকে এইসব চিন্তানায়ক ও ধর্মাচার্যদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙালীর শিক্ষায়, সমাজে, ধর্মে ও রাজনীতিতে যে কর্মব্যাকুলতার ‘য় পাওয়া যায় তা একটি পরাধীন অধঃপতিত জাতির ইতিহাসে তখনই প্রকাশ পায়, যখন সেই জাতি নব অভ্যুদয় লাভ করার জন্য অগ্রসর হয়। উনিশ শতকের সেই জাগরণ ও তার সুবিস্তৃত প্রভাবের পরিমণ্ডলের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ।

ভারতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনের মধ্যবর্তী কালে বাংলা দেশের অবস্থাটা কি রকম ছিল তা এখানে একটু আলোচনা করা দরকার। সিপাহী-বিদ্রোহ দমন হওয়ার অনেক বছর পরে ভারতের জনজীবনে শতাব্দীকালব্যাপী ইংরেজের শাসন, অথবা প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সংঘর্ষের ফল কিছুটা অনুভূত হতে থাকে। কোম্পানীর শাসনকালে এদেশে যাঁরা গভর্ণর-জেনারেল হয়ে এসেছিলেন তাঁদের প্রায় সকলেই একই লক্ষ্যে কাজ করতেন, ইংলণ্ডের নব-প্রতিষ্ঠিত ভারত-সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক আয়তন বৃদ্ধি করা, অর্থাৎ এই সময়টায় conquest ও annexation—এই দুটি কাজ ভিন্ন তাঁদের বিশেষ কিছু করণীয় ছিল না। তবে এঁদের মধ্যে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে কেউ কেউ যে আদৌ মনযোগ দেন নি তা নয়, যেমন ওয়ারেন হেষ্টিংস্ কলকাতা মাদ্রাসা ও এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেছিলেন;

লর্ড কর্ণোয়ালিস্ ও স্যার জন্ শোরও ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য কিছু কাজ করেছিলেন। তবে লর্ড ড্যালহৌসির সময় পর্যন্ত যে নীতি অনুসৃত হয়ে এসেছে, মুখ্যত এঁরা সকলেই ছিলেন সেই নীতির ধারক ও বাহক—প্রাচ্য সাম্রাজ্যের কাঠামোটি মজবুত করা ও এর বনিয়াদ সুদৃঢ় করা।

এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, লর্ড ড্যালহৌসির শাসনকাল পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে সুবে বাংলার প্রশাসনিক গুরুত্বটাই ছিল সমধিক। ১৮৫৩ সালের সনদ আইনের আগে পর্যন্ত বাংলার আয়তন ছিল বিশাল। তখনকার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বলতে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম এবং পাঞ্জাবের একটি অংশ ও দিল্লী সমেত সমগ্র সংযুক্ত প্রদেশ (বর্তমান উত্তর-প্রদেশ)—এই বিশাল ভূখণ্ডকে বুঝাত। নতুন সনদ আইনে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম—এই চারিটি প্রদেশ নিয়ে একটি স্বাধীন প্রশাসনিক প্রদেশ গঠিত হয় ও এই নবগঠিত প্রদেশের শাসনভার অর্পিত হয় একজন লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের উপর। ১৮৫৩ সালে এই পদটির সৃষ্টি হয়। এইভাবে ভারতবর্ষের মানচিত্রে বাংলা নামে যে প্রদেশটি সেদিন দেখা গিয়েছিল তার সঙ্গে সেন রাজাদের আমলের বাংলা অথবা ঢাকা ও পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদের নবাবদের শাসনাধীনের বাংলা, এমন কি ১৯১২ সালে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রহিত হওয়ার পর বাংলার কোনো তুলনা হয় না।

উনিশ শতকের প্রথমাবধি ভারতবর্ষ বলতে বাংলা দেশকেই বুঝাতো। তারপর বিগত শতাব্দীর প্রথম কয়েক বছর যখন অতিক্রান্ত হলো তখন থেকে শাসকবর্গ সমগ্র ভারতবর্ষের অধিবাসী-দিগের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে থাকেন। ১৮১৭ সালের আগে ইংরেজীর মাধ্যমে সরকারী উদ্যোগে কলকাতায় একটি বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয় নি। তবে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে ইংরেজ মিশনারী সমিতিগুলির প্রয়োজনই যে সবচেয়ে

উল্লেখযোগ্য ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ১৮১৬ সালে সেই স্বনামধন্য ব্যাপটিস্ট মিশনারিত্রয়—কেরী, মার্শমান ও ওয়ার্ড—যখন কলকাতা থেকে পনের মাইল দূরে গঙ্গার তীরে শ্রীরামপুরে একটি কলেজ স্থাপন করেন তখন থেকেই নবীন বাংলার ইন্‌টেলেকচুয়াল্ জীবনের প্রকৃত সূচনা। এর পর উল্লেখযোগ্য প্রয়াস ছিল স্কচ্ পাদ্রী ডক্টর ডাফের ; তিনি ১৮৩০ সালে নিমতলায় স্থাপন করেন 'ফ্রী চার্চ ইন্‌ষ্টিটিউসন' যা পরবর্তীকালে জেনারেল এ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিট্যুসনের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। একাদিক্রমে বাংলার তরুণরা পাঁচ-পুরুষ ধরে এই শিক্ষানিকেতনটি থেকে শিক্ষা লাভ করেছিল এবং বাংলার নবজাগরণের মালমসলার অনেকখানি এখান থেকেই আমরা পেয়েছিলাম।

পাশ্চাত্ত্য জীবনধারায় ভারতবর্ষকে সুসভ্য করে তুলবার জন্য এই ছিল প্রাথমিক প্রয়াস এবং এইসব স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ছেলেরা বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা এই শিক্ষার ফলাফলটা উপলব্ধি করতে পারি নি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হরিশ্চন্দ্র মুখার্জী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (ইনি নাট্যকার গিরিশ ঘোষ নন), রামগোপাল ঘোষ, রাজনারায়ণ বসু ও কে. এম. ব্যানার্জী প্রভৃতি সেদিনের তরুণ বাঙালী সন্তানগণ ছিলেন ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ফসল। বাংলার নবজাগ্রত জাতীয় জীবনের এইটাই ছিল প্রাথমিক অভিব্যক্তি। এই প্রাথমিক ফসল সংগৃহীত হওয়ার পর বোঝা গেল যে প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজী ভাষার প্রভাবেই একটি ক্ষয়িষ্ণু সমাজদেহে নবজীবনের সঞ্চার হয়েছে। এইভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে জাগরণটা সেদিন বাংলাদেশে দেখা দিয়েছিল তার সঙ্গে এতকালের বিচ্ছিন্ন একটি প্রাচীন জাতির মানসিকতায় একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতে থাকে। আবার উনিশ শতকের এই আদিপর্বেই ইংরেজ গভর্ণর-জেনারেলগণ ভারতীয় জীবনের সামাজিক কাঠামোর প্রতি দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনে

অধিরোহণের বহু পূর্বেই জন্ কোম্পানীর চেষ্টায়, ঠগীর উৎপাত, শিশুহত্যা, সতীদাহ প্রভৃতি বহু সামাজিক কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধিত হয়। এইভাবে ভারতবর্ষকে একটি নতুন পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেবলমাত্র বিদেশী ইংরেজ শাসকগণই যে সচেষ্ট হয়েছিলেন তা নয়। এই সময়কার যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী সেই রাজা রামমোহন রায়ের কথা বিশেষ ভাবেই উল্লেখ্য। এই যুগনায়কের মধ্যে ছিল একাধারে মার্টিন লুথারের নির্ভীকতা ও জন্ কালভিনের আদর্শবাদ। রামমোহন বাংলাদেশে শুধু একটি নতুন শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলতেই সহায়তা করেন নি, তিনি তাঁর স্বদেশবাসীর প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও বেন্টিঙ্ক ও মেটকাফের সংস্কার-প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করতেও সহায়তা করেছিলেন। হিন্দুসমাজে শতাব্দীর সঞ্চিত জঞ্জাল সমূলে অপসারণ করার জন্য রাজা তাঁর মুষ্টিমেয় কয়েকজন বন্ধুদের সাহায্যে কি অসাধ্য-সাধন করেছিলেন, সে ইতিহাস এখন সুপরিচিত।*

কিন্তু রামমোহনের সংস্কার-প্রয়াসের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে আমাদের কয়েক পুরুষ লেগেছিল এবং তার প্রভাবটাও হিন্দুসমাজ-জীবনে অনুভূত বা কার্যকরী হতে বিলম্ব হয়েছিল। তাই দেখা যায় যে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত হিন্দু-সমাজে বাল্য-বিবাহ ও বহু-বিবাহ অবাধে প্রচলিত ছিল। এই দুইটি সামাজিক কুপ্রথা উৎখাত করবার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল আর একজন মানুষের। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। উনিশ শতকের বাংলার তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় সমাজ-সংস্কারক।† তাঁর এই সংস্কার আন্দোলনের ফলেই শিক্ষিত বাঙালীর মানসিকতায় দেখা দিতে থাকে একটি পরিচ্ছন্ন আধুনিকতা। পর্দা, জাতিভেদ প্রথা, বারবেলা বিচার, পৌত্তলিকতা—এইসব নানাবিধ কুসংস্কার

* লেখকের 'রামমোহন' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
† লেখকের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

হিন্দুসমাজ-দেহকে জীর্ণপ্রায় করে তুলেছিল। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সংস্কার-প্রয়াস ইতিহাসের স্রোতোধারার মুখ যে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল এবং এটা কতক পরিমাণে যে ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে আসার ফলেই সম্ভব হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তবে ভিক্টোরিয়ার শাসনের মধ্যবর্তী কালে বাঙালীর সমাজ বা ধর্মনৈতিক জীবন যে একেবারে নিন্দনীয় ছিল তা নয়। ধর্মের উচ্চ চিন্তা না থাকলেও সেদিনের বাঙালীর মধ্যে ধর্মভাবটা ছিল প্রবল ও আন্তরিক। শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনে তারা ছিল অভ্যস্ত। ধর্মভাব প্রবল ছিল বলেই না এই সময়কার সাধারণ বাঙালী-জীবন এই কয়টি বিশেষ গুণের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল—সততা, সত্যবাদিতা, সরলতা, আন্তরিকতা ও লক্ষ্যসাধনে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা। যৌথ-পরিবার প্রথা তখনো একেবারে লুপ্ত হয় নি, সমাজ তখন ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ছিল না, ছিল পরিবার-কেন্দ্রিক। সেই সময়কার ভারতীয় সমাজ-জীবনের একজন সহৃদয় বিদেশী পর্যবেক্ষক লিখেছেন: 'There is no doubt that it is the main cause of the fundamental stability and contentment by which Indian society has braced for centuries against the shocks of politics and the cataclysms of Nature. It provides every man with his place, his career, his occupation, his circle of friends. It makes him at the outset a member of a corporate body....The caste organization is to the Hindu his club, his trade union, his benefit society, his philanthropic society.' * যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শটা বাংলাদেশে ছিল বলেই এর সমাজ-জীবনে সম্প্রীতি ও মানবিকতাবোধ বিদ্যমান ছিল।

* *Vision of India* : Sidney Low

রামমোহন যে বীজ বপন করে গিয়েছিলেন তা অঙ্কুরিত হতে বেশ কিছু সময় লেগেছিল এবং ভিক্টোরিয়ার শাসনকালের মধ্যবর্তী সময়েই আমরা সেটা প্রত্যক্ষ করলাম। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত যে কয়জন খ্যাতনামা ব্যক্তিকে আমরা এই সময়ে পাই তাঁরা সকলেই এসেছিলেন মধ্যবর্তী শ্রেণী থেকে। এঁদের মধ্যে ছ'জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। রামমোহনের ভাবধারার এই ছ'জনই ছিলেন সুযোগ্য উত্তরসাধক। বাংলার নবজাগরণ এঁদের উভয়ের চিন্তা-ভাবনা ও কর্মপ্রয়াসের নিকট কম ঋণী নয়।* ভারতবাসীকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার নীতিটা যে সর্বতোভাবে সুফলপ্রসূ হয় নি, তা বলা বাহুল্য। পাশ্চাত্ত্য কালচারের সবটাই যে আমাদের পক্ষে হিতকর হয়েছিল তা নয়। হিন্দুসমাজের পুরাতন পাত্রে নতুন মদ ঢেলে দেওয়ার ফলটা বরং অনেক ক্ষেত্রেই সাংঘাতিক হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে লর্ড রোনাল্ডসের একটি অভিমত উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি লিখেছেন: 'By the middle of the nineteenth century a period of intellectual anarchy had set in, which swept rising generation before it like a craft which has snapped its moorings. Westernism became the fashion of the day—and Westernism demanded of its votaries that they should cry down the civilization of their country. The more ardent their admiration for everything Western, the more vehement became their denunciation of everything Eastern. The ancient learning was despised, ancient

* লেখকের 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' ও 'কেশবচন্দ্র' দ্রষ্টব্য।

custom and tradition were thrust aside, ancient religion was decried as an outworn superstition.' * এই ভাঙনের নেশা এমনভাবেই আমাদের সেদিন পেয়ে বসেছিল যে, হিন্দু-সমাজের মূল ভিত্তিটাই শিথিল হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজী শিক্ষার এই কুফলটা আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল এবং রোনাল্ডসের বহু পূর্বেই তিনি লিখেছিলেন: 'We are much too completely possessed by the spirit of modern India. We are the fruits of a hybrid education that has produced a kind of intellectual and spiritual atavism in us. This education has on the one hand, divorced our mind and spirit from the deeper realities of life and thought of our own country, without, on the other hand, placing us in any living and real relations even with the life and thought of Europe.' † এইভাবে অন্ধ অনুকরণের ফলে আমরা না পেরেছিলাম য়ুরোপকে গ্রহণ করতে, না পেরেছিলাম বুঝতে ভারতবর্ষকে। এর ফলে দেশের মধ্যে দুই শ্রেণীর মানুষের উদ্ভব হলো—সংস্কার-সমর্থক ও সংস্কার-বিরোধী যাদের বলা হতো প্রতিক্রিয়াপন্থী।

ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের ফলে বাংলাভাষা ও সাহিত্য দুই-ই যেন গতিবেগসম্পন্ন হয়ে উঠল। এতকালের উপেক্ষিত ও অনাদৃত বাংলাভাষাকে যাঁরা মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং ভাব-প্রকাশের একটি উত্তম বাহনরূপে পরিণত করলেন তাঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানই ছিল সমধিক। বাঙালী-জীবনে এঁরাই বাংলা ভাষার মাধ্যমে নিয়ে আসেন একটি

* *The Heart of Aryavarta* : **Ronaldshey.**

† *The Soul of India* : **B. C. Pal.**

নতুন ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি। স্মার্ত রঘুনন্দনের বাংলা রূপান্তরিত হয়ে গেল এক নতুন বাংলায় এবং এইসব সাহিত্যসেবীদের রচনার মাধ্যমে বাঙালীর জীবন-বীণায় ঝঙ্কৃত হতে লাগল সাম্য ও স্বাধীনতার নতুন সুর। তবে শিক্ষা, সাহিত্য, অর্থনীতি, শিল্প—এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রকৃত উৎকর্ষ সাধিত হয় কোম্পানীর রাজত্বের অবসানে ভিক্টোরিয়ার শাসনকাল থেকেই। এই সময় থেকেই ভারতবর্ষ প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক বিবর্তনের পথে সুনিশ্চিতভাবে পদক্ষেপ করে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও বাঙালীর প্রতিভা কোম্পানীর আমল থেকেই বিস্ময়কর নির্ভীকতা দেখিয়ে এসেছে। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্বে হরিশ্চন্দ্র মুখার্জীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লর্ড ক্যানিং-এর শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং বিদ্রোহোত্তর কালে কেশবচন্দ্র সেনের 'ইণ্ডিয়ান মিরার' ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বেঙ্গলী' (১৮৬৮) স্বাধীন মত প্রকাশের দৃষ্টান্ত স্থাপনে অগ্রণী ছিল।

এইভাবে প্রায় সকল দিকেই নবজাগরণের শঙ্খধ্বনি শোনা গেলেও দুইটি ক্ষেত্রে এর অপূর্ণতা রয়ে গিয়েছিল। জনমতগঠনের উপায় যেমন সংবাদপত্র, তেমনি একে জাগ্রত করে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল বক্তৃতামঞ্চের। আধুনিক গণতন্ত্রের প্রধান দুইটি উপকরণ হলো ব্যবহারজীবী সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক বক্তৃতামঞ্চ ('The Bar and the platform are the two principal instruments of modern democracy.'—এই কথা বলেছেন প্রখ্যাত সমাজতন্ত্রী চিন্তানায়ক সিডনী ওয়েব।) বাংলা দেশে লর্ড কার্জনের আমল শেষ না হওয়া পর্যন্ত জনমত জাগ্রত করার জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক বক্তৃতামঞ্চ তৈরি হয় নি এবং ইণ্ডিয়ান বার কমিটির সুপারিশগুলি কার্যকর হওয়ার আগে পর্যন্ত এদেশে ব্যবহারজীবী সম্প্রদায় শক্তিশালী হয়ে উঠতে

পারেন নি, কারণ তার আগে আদালতে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ ব্যবহারজীবীদের মধ্যে পদমর্যাদার একটা দুস্তর ব্যবধান বা পার্থক্য বিদ্যমান ছিল।

একদিকে শাসক ও শাসিতের মধ্যে এই সংঘর্ষ, অবিশ্বাস ও বর্ণ-বিদ্বেষ, এবং অন্যদিকে নবজাগ্রত জাতীয় আত্মবোধ, বুদ্ধির উৎকর্ষ এবং রাজনৈতিক সক্রিয়তার পরিবেশের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ।

॥ চার ॥

১৮৭০, ৫ই নভেম্বর। শনিবার।

ক্ষণজন্মা চিত্তরঞ্জন পটলডাঙায় জন্মগ্রহণ করেন এই দিনটিতে তাঁর পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান ও প্রথম পুত্র হিসাবে। ভাই-বোন মিলে তাঁরা সবসুদ্ধ আটজন; ভুবনমোহন ও নিস্তারিণী দেবীর প্রথম সন্তান একটি কন্যা, চিত্তরঞ্জন ছিলেন তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান, তারপর কালক্রমে তাঁদের আরো চারটি কন্যা ও দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। চিত্তরঞ্জন যখন স্কুলে ভর্তি হন, তখন তাঁর পিতামাতা পটলডাঙা থেকে দক্ষিণ কলকাতায় পিপুলপটি রোডে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। এই পিপুলপটি রোড পরবর্তীকালে রসা রোড নামে পরিবর্তিত হয়। এই অঞ্চলটি তখন বেলতলা নামেও পরিচিত ছিল। দক্ষিণ কলকাতার এই জনবিরল অঞ্চলে প্রথমে বসতি স্থাপন করেন কালীমোহন দাশ; দাশ-পরিবারই ছিলেন এই অঞ্চলের প্রথম ব্রাহ্ম অধিবাসী। তখনো পর্যন্ত এইখানে খুব বেশি বসতি গড়ে ওঠে নি, মাত্র কয়েকটি ব্রাহ্ম-পরিবার তাঁদের স্ব স্ব গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করতে আরম্ভ করেছেন। কালীমোহনের পর বাসণ্ডার (বরিশাল) স্বনামধন্য চণ্ডীচরণ সেন এখানে বসতি স্থাপন করেন। দাশ-পরিবারের সঙ্গে এই সেন-পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং দুর্গামোহনের সঙ্গে চণ্ডীচরণের ছিল অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্য। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে চণ্ডীচরণ সেনের নামও সুবিদিত এবং এঁরই দ্বিতীয় পুত্র, প্রখ্যাত ব্যারিস্টার নিশীথচন্দ্র সেন উত্তরকালে দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। একসময়ে আইন-ব্যবসায়ে নিশীথচন্দ্র ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের একজন সুযোগ্য জুনিয়ার ছিলেন। এই দুই পরিবারের সন্তান-সন্ততিগণ সকলেই জাতীয়তা-বোধে উদ্দীপ্ত ছিলেন।

আগেই বলেছি, দাশ-পরিবারের সঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং এই সূত্রেই চিত্তরঞ্জন তাঁর শৈশবকালেই এই মনীষীর সংস্পর্শে এসেছিলেন ও উত্তরকালে তাঁর দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনের রাজনৈতিক মতামত বহুল পরিমাণে বিপিনচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শ অনুসারেই গড়ে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে এঁরই কাছে চিত্তরঞ্জন রাজনীতির প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন এবং বিপিনচন্দ্রকে তিনি তাঁর রাজনৈতিক গুরু বলেই শ্রদ্ধা করতেন। দেশবন্ধুর জীবনালোচনায় বিপিনচন্দ্রের উল্লেখ শুধু প্রাসঙ্গিক নয়, অপরিহার্য। যথাস্থানে আমরা তাঁর কথা সবিস্তারে বলব।

চিত্তরঞ্জনের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয় ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারি স্কুলে। এর প্রকৃত নাম ছিল 'লণ্ডন মিশনারি সোসাইটিজ ইনষ্টিট্যুসন'। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন দক্ষিণ কলকাতায় ইংরেজ মিশনারিদের পরিচালিত এই একটি মাত্র স্কুলই ছিল এবং কলকাতার মধ্যে তখন এটিই ছিল একটি প্রধান শিক্ষানিকেতন। ১৯২৪ সালের পর এই সুপরিচিত শিক্ষা-নিকেতনটির অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয়। বালক চিত্তরঞ্জন যখন এইখানে পড়তে এলেন তখন এর অধ্যক্ষ ছিলেন মিস্টার অ্যাসটন্ এবং নবাগত মিস্টার জে. এন. ফার্কুহার ছিলেন এর অন্যতম শিক্ষক। চিত্তরঞ্জন ছাত্র হিসাবে এখানে প্রবিষ্ট হন ১৮৭৮ সালে এবং আট বছর কাল তিনি এইখানে অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রথম-বার প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে ১৮৮৬ সালে তিনি এখান থেকে পাস করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। তাঁর এক সহপাঠী লিখেছেন: 'স্কুল-জীবনে সকল বিষয়েই চিত্তরঞ্জন তাঁর সহপাঠীদের অগ্রণী ছিলেন; অন্যান্য ছাত্রদের মতো তিনি যে একজন শান্তশিষ্ট, নিরীহ ও গ্রন্থকীট ছিলেন তা নয়, বরং তিনি ছিলেন তার বিপরীত—একজন স্কুল-পালানো ছেলে; কিন্তু

তাঁর বুদ্ধির প্রাচুর্য ও সজীবতা তাঁকে সকলের আকর্ষণীয় করে তুলেছিল।' * সহপাঠীরা চিত্তরঞ্জনের মধ্যে দেখতেন একটা সদা উৎফুল্লভাব—তাঁর পাশে বসলেই তাঁর প্রাণচাঞ্চল্য অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যেত। কথাবার্তায়, আচরণে সকলকে তিনি সহজেই আকর্ষণ করতে পারতেন। চিত্তরঞ্জনের স্বভাবের এই যে সজীবতা আর এই আকর্ষণী শক্তি, এ দুটোই যেন ছিল তাঁর সহজাত। নিখিল মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করবার জন্য যে মানুষটি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর মধ্যে যে এই স্বাভাবিক গুণ থাকবে, তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

চিত্তরঞ্জনের বয়স তখন ষোল বছর যখন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এলেন। তাঁর ভগ্নীপতি, দুর্গামোহনের অন্যতম জামাতা, ডক্টর পি. কে. রায় তখন এই কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁর আগে এই কলেজের অধ্যক্ষের পদে আর কোন ভারতীয় নিযুক্ত হন নি। বাংলাদেশের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি এই সময়ে এই কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু কলেজের ঐতিহ্যবাহী, নব-রূপান্তরিত এই শিক্ষানিকেতনে যাঁরাই অধ্যয়ন করেছিলেন তাঁরা সকলেই এই বলে গর্ববোধ করতেন যে, 'Anybody who is anybody in public life, is somebody from Presidency College.' আমরা দেখতে পাব যে, এই কলেজেরই একজন ছাত্র হিসাবে উত্তরকালে চিত্তরঞ্জন কিভাবে অনেকের মধ্যে 'একজন' হয়ে বাংলা তথা ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর নামের মুদ্রা অঙ্কিত করে দিয়েছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে চিত্তরঞ্জন সবসুদ্ধ চার বছর কাল অধ্যয়ন করেন ও ১৮৯০ সালে এখান থেকেই তিনি বি. এ. পাস করেন।

* *Life and Times of C. R. Das* : **P. C. Roy.**

তিনি অনার্স নিয়ে পাস করতে পারেন নি, পড়াশুনায় তিনি আদৌ মনোযোগী ছিলেন না এবং যে চার বছর তিনি এখানে অধ্যয়ন করেছিলেন সেই সময়টা কলেজের বিতর্কসভা, আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েটস্ এ্যাসোসিয়েসন ও ষ্টুডেণ্টস্ এ্যাসোসিয়েসন প্রভৃতির কাজকর্মে সমধিক উৎসাহী ছিলেন। তবে ইংরেজীটা তিনি ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন—বলতে এবং লিখতে। তাঁর কলেজ-জীবনের অন্যতম সহপাঠী পৃথ্বীশচন্দ্র রায় তাঁর লেখা 'দেশবন্ধু-জীবনী' গ্রন্থে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি এবং চিত্তরঞ্জন দু'জনে মিলে আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েটস্ এ্যাসোসিয়েসনের পক্ষ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে বাংলা ভাষাকে প্রবেশিকা ও ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় বিকল্প দ্বিতীয় ভাষার স্থান দেওয়ার জন্য আন্দোলন করেছিলেন। অবশ্য তাঁদের এই উদ্যম তখন ফলবতী হয় নি ; তথাপি এই ঘটনার ভিতর দিয়েই বাংলা ভাষার প্রতি চিত্তরঞ্জনের যে অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছিল উত্তরকালে তাই-ই তাঁকে বাংলা সাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত হতে সহায়তা করেছিল। চিত্তরঞ্জন অবশ্য তাঁর জীবিত-কালেই প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণীতে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি দেখে যেতে পেরেছিলেন। এটা সম্ভব হয়েছিল একটিমাত্র লোকের জন্য—স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনিই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হিসাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই যুগান্তর এনেছিলেন।*

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মুখে শুনেছি যে, দেশবন্ধুর বাগ্মিতার প্রথম বিকাশ সুরেন্দ্রনাথের ছাত্রসভার একাধিক অধিবেশনেই পরিলক্ষিত হয়েছিল। কলেজে পড়ার সময় থেকেই চিত্তরঞ্জন ছাত্রসভার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন বসু দু'জনে মিলে ১৮৭৫ সালে এই ছাত্রসভা

* লেখকের 'শিক্ষাগুরু আশুতোষ' দ্রষ্টব্য।

স্থাপন করেন। 'ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতি বর্জনীয় নয়'—ভারতবর্ষে এই কথাটি প্রথম বলেছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এবং তিনিই তাঁর দূরদৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, যদি এই দেশের শিক্ষিত লোকের মধ্যে সার্থকভাবে ও ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ সাধন করতে হয় তবে সকলের আগে দেশের তরুণ ছাত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যেই জাগিয়ে তুলতে হবে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। এই ছাত্রসভা গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে ('এ নেশন ইন্ মেকিং') লিখেছেন: 'In organising the Students' Association, I sought to kindle in the young the beginnings of public spirit, and to inspire them with a patriotic ardour, fruitful of good to them and to the motherland.' বাংলা দেশে এই সময় থেকে রাজনৈতিক চিন্তার যে উন্মেষ দেখা যায়, তার পরিণতি সাধনে সুরেন্দ্রনাথ-আনন্দমোহন স্থাপিত এই ছাত্রসভার একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও এই জাতীয় সভা স্থাপিত হয়েছিল প্রধানতঃ সুরেন্দ্রনাথের উদ্যোগেই। বিশ শতকের ভারতবর্ষের একাধিক রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাকে আমরা এই ছাত্রসভা থেকেই পেয়েছি। চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক প্রতিভার উন্মেষ সাধনে এই ছাত্রসভার সঙ্গে তাঁর কলেজ-জীবন থেকেই সংযোগটা যে বিশেষভাবেই সহায়ক হয়েছিল, তা বলা বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, কলেজে অধ্যয়নকালেই তিনি সাহিত্যে ও বাগ্মিতায় তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে সহপাঠী ও অধ্যাপকদের বিস্মিত করে তোলেন।

বি. এ. পাস করার অল্প কয়েক মাস পরেই চিত্তরঞ্জন এলেন বিলাতে সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষা দিতে। ভুবনমোহনের একান্ত ইচ্ছা ছিল চিত্তরঞ্জন এই পরীক্ষা দেন, কারণ কৃতকার্য হতে পারলেই মর্যাদাসহ বাঁধা মাইনের একটি চাকরি সুনিশ্চিত। দুর্গামোহনের ইচ্ছা ছিল যে চিত্তরঞ্জন ব্যারিস্টারি পড়েন, কিন্তু ভুবনমোহনের নিজের আর্থিক অবস্থা তখন সচ্ছল ছিল না; ব্যারিস্টারিতে কৃতকার্য হলেও সঙ্গে সঙ্গে পশার জমানো অনিশ্চিত, এই চিন্তা করেই ভুবনমোহন পুত্রকে সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষা দেওয়ার জন্যই বিলাত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাস-বিধাতার অভিপ্রায় ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাই বুঝি সিভিলিয়ান্ হতে গিয়ে চিত্তরঞ্জন ফিরে এলেন ব্যারিস্টার হয়ে। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর অন্যতম সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন জে. এন. গুপ্ত; ইনি পরবর্তীকালে স্বনামধন্য সিভিলিয়ান্ রমেশচন্দ্র দত্তের অন্যতম জামাতা হয়েছিলেন। এই জে. এন. গুপ্ত ও চিত্তরঞ্জন দু'জনে একসঙ্গে আই. সি. এস. পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বিলাত গিয়েছিলেন।

বিলাতে আসার পরে চিত্তরঞ্জন অবশ্য দু'বছর রেন ও গার্নে নামক দু'জন প্রথিতযশা অধ্যাপকের অধীনে আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্য যথারীতি কোচিং নিয়েছিলেন এবং ১৮৯২ সালে উক্ত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকায় তাঁর নাম দেখা গেল না। কলকাতায় বসে ভুবনমোহন এই সংবাদ জানতে পেরে যারপরনাই মর্মাহত হলেন এবং পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি পুত্রকে নির্দেশ দিলেন। চিত্তরঞ্জন অকৃতকার্য হলেন কেন? পড়াশুনায় অমনোযোগিতা এর একমাত্র কারণ ছিল না—প্রধান কারণ ছিল রাজনীতি। কথাটা একটু খুলে বলা দরকার। ইংলণ্ডে এসে অবধি চিত্তরঞ্জন লেখাপড়ার চেয়ে রাজনীতির চর্চা করেছিলেন একটু বেশি মাত্রায়। এর দুটো দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমটি জেমস্ ম্যাকলিন্-ঘটিত ব্যাপার। যে বছর তিনি প্রথমবার আই. সি. এস. পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হন, সেই সময়ে পরীক্ষার কিছু আগে জেমস্ ম্যাকলিন্ নামক পার্লামেণ্টের এক সভ্য একটি প্রকাশ্য বক্তৃতায় ভারতীয় মুসলমানদিগকে দাস (slaves) আর ভারতীয় হিন্দুদিগকে চুক্তিবদ্ধ দাস (indentured slaves) বলে অভিহিত করেম। চিত্তরঞ্জনের স্বাদেশিকতা এই আক্রমণ সহ্য করতে পারল না। তিনি অবিলম্বে লণ্ডনস্থ ভারতীয়গণকে সম্মিলিত করে লণ্ডনের এক্সেটর হলে এক সভা করেন এবং সেই সভায় তিনি ম্যাকলিনের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই প্রতিবাদের ফল হয়েছিল। বিলাতের বড় বড় কাগজে তাঁকে সমর্থন করে একাধিক সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন গ্লাডষ্টোন। লিবারেল নেতৃবৃন্দ ওল্ডহ্যামে গ্লাডষ্টোনের সভাপতিত্বে একটা সভা আহ্বান করলেন। তরুণ চিত্তরঞ্জন এই সভায় বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে ম্যাকলিনের কাজের তীব্র সমালোচনা করেন। এই স্মরণীয় সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন : 'ভদ্র মহোদয়গণ, আমি পার্লামেণ্টের বক্তৃতায় বহুবার এই রকম উক্তি শুনে দুঃখিত হয়েছি যে, ইংলণ্ড তরবারির সাহায্যে ভারত অধিকার করেছে ও তরবারির সাহায্যেই ভারত রক্ষা করবে। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য ভিন্নরূপ। ইংলণ্ড এমন কোন কাজই করে নি। বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য যে সঙ্গীনের দ্বারা বা তরবারির সাহায্যে অধিকার করে নি—এই গৌরব সামরিক শক্তির বলেও লব্ধ হয় নি, ইহা প্রকৃতভাবে নৈতিক জয়, নৈতিক গৌরব। তথাপি তরবারির উল্লেখ এবং ভারত-সাম্রাজ্য একমাত্র তরবারি-নীতির সাহায্যে শাসিত হবে—এই রকম উক্তি অশ্রদ্ধেয় ও ঘৃণাজনক এবং একথা ইংরেজের মুখে বিসদৃশ।' 'Quite unworthy of an Englishman'—চিত্তরঞ্জন তাঁর এই বক্তৃতায় ঠিক এই কথাগুলি ব্যবহার

করেছিলেন। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এর ফলে ম্যাকলিন্ সাহেব শুধু মৌখিক ক্ষমা চেয়ে নিষ্কৃতি লাভ করেন নি— পার্লামেণ্টের সদস্যপদ ত্যাগ করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটির উপলক্ষ ছিলেন দাদাভাই নৌরজি। ভারতের এই বয়োবৃদ্ধ মানুষটি ইংলণ্ডে ভারতবাসীর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সর্বজনমান্য নেতা ছিলেন চিত্তরঞ্জনের জন্মের আগে থেকেই। ১৮৬৮ সনে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ যখন তাঁর বন্ধু রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্তের সমভিব্যাহারে সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষা দিতে বিলাত গিয়েছিলেন তখন থেকেই কংগ্রেসের ভাবীকালের এই দুই সভাপতি রমেশচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ—দাদাভাই নৌরজির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সেদিন ছাত্রাবস্থায় রমেশচন্দ্রও রাজনীতির চর্চা থেকে বিরত ছিলেন না। ভারতে আয়কর-ব্যবস্থা স্থায়ী করার স্বপক্ষে তদানীন্তন ভারতসচিব ১৮৭০ সালের আগষ্ট মাসে যে এর প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন, লণ্ডনস্থ ভারতীয়দের (তখন অবশ্য ভারতীয়দের সংখ্যা খুব কমই ছিল এখানে) সম্মিলিত করে রমেশচন্দ্র এর প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করেন নি এবং 'এসিয়াটিক' পত্রে এই সম্পর্কে তাঁর একখানি সুদীর্ঘ পত্রও প্রকাশিত হয়েছিল।* ছাত্র হলেও রমেশচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ উভয়েই নৌরজির বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন এবং তাঁরা দু'জনেই ইংলণ্ডে থাকাকালীন সময়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ইংলণ্ডে অবস্থান করে নৌরজি সাহেব ভারতের রাজনৈতিক আদর্শকে শাসকজাতির সামনে তুলে ধরেছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের সময়ে নৌরজি ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের (হাউস্ অব্ কমনস্) সদস্যপদ প্রার্থী হন ও সেণ্ট্রাল ফিনস্‌বারি কেন্দ্র থেকে লর্ড স্যালিস্‌বারির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর আগে সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী লালমোহন ঘোষ ব্রিটিশ

* লেখকের 'রমেশচন্দ্র" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পার্লামেণ্টের সভ্য হওয়ার চেষ্টা করে বিফলকাম হয়েছিলেন। তাই নৌরজির সময়ে লণ্ডনের সমস্ত প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র তাঁর নির্বাচনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। চিত্তরঞ্জন তখন নিজের পড়াশুনার ক্ষতি করে, নৌরজির নির্বাচনী-প্রচার অভিযানের বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও নৌরজির স্বপক্ষে কয়েকটি বক্তৃতা করেন এবং ইংলণ্ডের মতো দেশে একজন বক্তা হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। লর্ড স্যালিস্‌বারি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে 'The black man of India' বলে কটাক্ষ করেছিলেন। নির্বাচনী বক্তৃতায় চিত্তরঞ্জন এর সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন। নৌরজির নির্বাচনী অভিযানে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গী ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। ভবিষ্যতে যাঁকে একদিন সুনিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তিনি রক্ষা করবেন, সেই অরবিন্দের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের প্রথম পরিচয় ঘটে এইখানে: ইনিও সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু ইচ্ছা করেই ঐ পরীক্ষা সম্পূর্ণভাবে দেন নি। চিত্তরঞ্জনের বহু আগে থেকেই (১৮৭৯) অরবিন্দ এখানে অবস্থান করছিলেন একজন ছাত্র হিসাবে। তিনি লণ্ডনে এসেছিলেন মাত্র সাত বছর বয়সের সময় আর সেই থেকে একাদিক্রমে চৌদ্দ বছর এখানে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেন। বাংলার দুই ভবিষ্যৎ চরমপন্থী নেতা এইভাবেই সেদিন এখানে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জনের জীবনী-প্রসঙ্গে অরবিন্দের কথা পরে আরো বলতে হবে।

নির্বাচনে নৌরজি জয়যুক্ত হলেন, চিত্তরঞ্জন কিন্তু সেবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেন। তাঁর সহপাঠী জে. এন. গুপ্ত অবশ্য পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে অক্সফোর্ডে চলে যান আর তাঁর বন্ধু লণ্ডনেই থেকে যান। ভুবনমোহনের কথামত চিত্তরঞ্জন আবার পরের বছর পরীক্ষা দিলেন। এই সময়ে তিনি অধ্যাপক কারডেব রীডের কাছে খুব যত্নের সঙ্গে দর্শনশাস্ত্র ও সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। এই তরুণ ছাত্রটিকে অধ্যাপক রীড নানাভাবেই পরামর্শ দিয়ে পরীক্ষায়

কৃতকার্য হতে সহায়তা করেছিলেন। দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিয়ে চিত্তরঞ্জনের মনে পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে কোন সংশয় ছিল না ; তাই তিনি এক তারবার্তায় ভুবনমোহনকে জানালেন, 'আশা করছি এবার আমি কৃতকার্য হব।' ১৮৯৩ সালে তাঁর সঙ্গে পরীক্ষা দিয়েছিলেন স্যার এ্যালবিয়ন ব্যানার্জী ; তিনিও তাঁর বন্ধুদের লিখে জানালেন ঃ 'চিত্ত এবার নিশ্চয়ই কৃতকার্য হবে।' ১৮৯৩ সালের পরীক্ষায় পঞ্চাশজনকে সার্ভিসে নেবার কথা ছিল, কিন্তু পরে ঘোষণা করা হয় যে মাত্র বিয়াল্লিশজনকে নেওয়া হবে। পরীক্ষার ফলাফল বেরুলে পরে দেখা গেল যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিয়াল্লিশ-জন ছাত্রের পরে তাঁর নাম, কাজেই সার্ভিসে প্রবেশ করা তাঁর হলো না।

সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় তাঁর অকৃতকার্য হওয়া সম্পর্কে চিত্তরঞ্জনের কোন কোন জীবনীকার ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেছেন যে, তিনি ইচ্ছা করেই নাকি দ্বিতীয় বারের পরীক্ষায় সমস্ত প্রশ্নপত্রের উত্তর লেখেন নি, কারণ দুই-তিনটি প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখবার পর চিত্তরঞ্জনের ধারণা হলো যে, উত্তর সন্তোষজনক হচ্ছে না, কাজেই পরীক্ষা দেওয়া নিষ্ফল। কিন্তু তাঁর বন্ধু জে. এন. গুপ্ত লিখেছেন যে, তিনি ঐ উত্তরপত্রগুলি দেখেছেন এবং সেগুলি যে সন্তোষজনকভাবেই লেখা হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, বাকী প্রশ্নপত্রগুলির উত্তর লিখলে তিনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য হতেন। আবার কেউ বলেন যে, তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্যই সিভিল সার্ভিস্ কমিশন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু এরকম ধারণার কোন ভিত্তি নেই। আসল কথা, ১৯১৭ সালের আগে পর্যন্ত অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণই অধিক সংখ্যায় এই পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করতেন। চিত্তরঞ্জন ঠিক সেই শ্রেণীর প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন না। এ কথা তিনি নিজেই বুঝতে পেরে-ছিলেন বলে, প্রথমবার অকৃতকার্য হওয়ার পর চিত্তরঞ্জন আইন পড়তে

থাকেন। দ্বিতীয়বার পুত্রের অকৃতকার্য হওয়ার সংবাদ পেয়ে ভুবনমোহনও ছেলেকে ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন। যথাসময়ে চিত্তরঞ্জন মিডল টেম্পল থেকে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, ১৮৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন ও কলকাতা হাইকোর্টে একজন ব্যারিস্টার হিসাবে যোগদান করেন। এইবার আরম্ভ হলো তাঁর কর্মজীবন—সংগ্রামপূর্ণ কর্মজীবন। পিতার গুরুভার ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়েই আরম্ভ হয়েছিল চিত্তরঞ্জনের কর্মজীবন।

॥ পাঁচ ॥

এইবার ব্যারিস্টার সি. আর. দাশের কথা।

চিত্তরঞ্জন যখন হাইকোর্টে প্র্যাকটিস্ করতে এলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র তেইশ বছর। এর ঠিক তেইশ বছর আগে বরিশাল থেকে এসে তাঁর মেজ জ্যাঠামশাই দুর্গামোহন এখানে আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে অল্পদিনের মধ্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রের অদৃষ্টে ঠিক তা ঘটল না। যিনি উত্তরকালে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে আইন-ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেছিলেন, তাঁর প্রথম জীবনের সংগ্রামের কথা শুনলে অবাক হতে হয়। মানুষের জীবনে দৈব যেমন সত্য, পুরুষকারও তেমনি সত্য। চিত্তরঞ্জনের জীবনটাই এর একটা বড় দৃষ্টান্ত। পিতার গুরুভার ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে আরম্ভ হয়েছিল তাঁর কর্মজীবন। সহায় না থাকলে শক্তির বিকাশলাভ সকল সময়ে ঘটে ওঠে না। তরুণ ব্যবহারজীব চিত্তরঞ্জনের ভাগ্যেও তাই ঘটল। কিছুকালের জন্য তাঁর প্রতিভা রুদ্ধ হয়েছিল সহায়-সম্পদের অভাবে।

হাইকোর্টে চিত্তরঞ্জন কিছুতেই সুবিধা করতে পারেন নি। এর অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রখ্যাত এ্যাটর্ণি এবং উত্তরকালে দেশবন্ধুর অন্যতম রাজনৈতিক সহকর্মী নির্মলচন্দ্র চন্দের মুখে শুনেছি যে, প্রধান কারণটা ছিল তাঁর তৎকালীন সামাজিক দুরবস্থা। ইন্‌সল্‌ভেণ্ট পিতার পুত্র তিনি, ভুবনমোহনেরও তখন এ্যাটর্ণি হিসাবে তেমন পসার বা প্রতিপত্তি কিছুই ছিল না। প্র্যাকটিস্ জমানোর পক্ষে এই দুটি কারণ বিশেষ প্রতিবন্ধক ছিল। তাছাড়া, স্বনামধন্য বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্রের পুত্র ব্যারিস্টার

বি. সি. মিত্র তখন চিত্তরঞ্জনের প্রবল প্রতিযোগী ছিলেন। এটাও অসুবিধার একটা কারণ হয়ে দাঁড়াল। রমেশচন্দ্রের নাম তখন সমাজে ও হাইকোর্টে বিখ্যাত; কাজেই তাঁর পুত্রকে পেলে কোন মক্কেলই চিত্তরঞ্জনকে জুনিয়র দিতে চাইত না। হাইকোর্ট-পাড়ায় দশ নম্বর হেস্টিংস্ স্ট্রীট বিখ্যাত এ্যাটর্ণি কুমারকৃষ্ণ দত্তের অফিস ছিল, এখনো আছে। প্রথম প্রথম এঁরই অফিসের একটি ছোট ঘরে চিত্তরঞ্জনের চেম্বার ছিল। পরে যখন তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন তখন টেম্পল চেম্বার্সের তিনতলায় তাঁর নিজস্ব একটি চেম্বার ছিল। তিনি যখন হাইকোর্টে যোগদান করেন তখন কলকাতার 'বার' একাধিক জ্যোতিষ্কে পরিপূর্ণ ছিল। তখনকার দিনে প্রখ্যাত আইনজীবীদের মধ্যে এখানে ছিলেন চার্লস্ পল, জন্ উড্রফ, গ্রিফিথ ইভানস্, মনোমোহন ঘোষ (ইনি অরবিন্দের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষের বন্ধু ছিলেন), উমেশ বাঁড়ুয্যে (W. C. Banerjee; তারক পালিত, সি. পি. হিল্, টি. এ. এপিয়ার ও এম. পি. গ্যাসপার। চিত্তরঞ্জন হাইকোর্টে যোগদান করার ছয় বছর আগে এখানে প্র্যাকটিস্ শুরু করেন লর্ড সিংহ (রায়পুরের সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ)। তিনি তাঁর সময়কার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে লিখেছেন: "আমি যখন হাইকোর্টে প্র্যাকটিস্ করতে এলাম তখন এখানে জুনিয়রদের মধ্যে ছিলেন রাজনারায়ণ মিত্র ও লালমোহন ঘোষ, উইলিয়াম গার্থ ও আর্থার ভান এবং জুনিয়র হিসাবে এঁদের প্রত্যেকেরই প্র্যাকটিস্ ভালই ছিল। এ ছাড়া ব্রীফলেস্ জুনিয়র-দের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না, এঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন ভারতীয়—এঁরা সকলেই বছরের পর বছর প্রতিদিন তাঁদের বাড়ি থেকে বার লাইব্রেরিতে আসতেন ও এখান থেকে বাড়ি ফিরে যেতেন। দীর্ঘকাল যাবৎ আইন-ব্যবসায়ে এঁরা কোন সাফল্যই অর্জন করতে পারেন নি।'*

* ১৯২৫, ডিসেম্বর, 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ

চিত্তরঞ্জনের অবস্থাটাও প্রথম প্রথম ঠিক ঐরকম ছিল—ভবানীপুর থেকে প্রত্যহ হাইকোর্টে আসেন, বার লাইব্রেরিতে বসে সতীর্থদের সঙ্গে গল্পগুজব করেন আবার বিকালে ফিরে যান রিক্তহস্তে। পয়সার অভাবে অনেক সময় তিনি ময়দানের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরতেন। এইসব কারণেই তিনি হাইকোর্টের আশা ত্যাগ করে মফঃস্বলের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং মাঝে মাঝে মফঃস্বল কোর্টে 'কেস' করে তাঁর কিছু অর্থাগম হতে থাকে। অর্থাগম হতে থাকল বটে, কিন্তু পিতৃঋণ পরিশোধের মতো আয় তাঁর তখনো পর্যন্ত হয় নি। পিতার ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ১৮৯৬ সালে তিনি উত্তমর্ণদের কাছে তুখানি ঋণপত্র নতুন করে সই করে সমগ্র ঋণ পরিশোধের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের একান্নবর্তী পরিবার, পোষ্যসংখ্যাও কম ছিল না—কনিষ্ঠ সহোদর তুইজনের শিক্ষার ভার তাঁকেই বহন করতে হতো। তার উপর উত্তমর্ণদের ঋণের তাগাদায় তাঁকে ব্যতিব্যস্ত হতে হয়। তখন তিনি তাদের প্রত্যেককে নিজের নামে তমস্থক (handnote) দিলেন; কিন্তু ঋণ পরিশোধে বিলম্ব হওয়ায় তাঁরা ক্রমাগত তাঁকে উৎপীড়িত করতে থাকেন। অবশেষে নিরুপায় হয়ে ১৯০৬, ১৯শে জুন তারিখে চিত্তরঞ্জন ইন্‌সল্‌ভেন্সি কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এটা করা ভিন্ন উপায় ছিল না, নতুবা আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে এমন কাজ করার মানুষ তিনি ছিলেন না। এজন্য তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। এই সময়টা তাঁর জীবনের একটা সংকটজনক অবস্থা ছিল বললেই হয়। দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণের ফলে একদিকে তাঁর সামাজিক গৌরবের যেমন হানি হয়, অন্যদিকে তেমনি আইন-ব্যবসায়ে পসারেরও ক্ষতি হলো। হাইকোর্টে তাঁর প্রতিভা অনাদৃতই রয়ে গেল। আগের মতোই তিনি রংপুর, মালদহ, রাজসাহী প্রভৃতি মফঃস্বল কোর্টে সামান্য ফী নিয়ে

প্র্যাকটিস্ করতে থাকেন। তাঁর সহপাঠী ও বন্ধু জে. এন. গুপ্ত যখন মালদহের ম্যাজিস্ট্রেট, তখন চিত্তরঞ্জন একবার একটি ফৌজদারি মকদ্দমা উপলক্ষে সেখানে গিয়েছিলেন এবং বন্ধুর এজলাসে দাঁড়িয়েই তাঁর মক্কেলের পক্ষে সওয়াল করছিলেন। শ্রীগুপ্ত লিখেছেন: 'His able arguments surprised me and I was sure that Chitta would one day shine in the profession as a leading figure in the Bar.' বন্ধুর এই ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয় নি।

হাইকোর্টের আদিম বিভাগে দেওয়ানি মামলায় অনেক আইনজীবী খ্যাত হয়েছেন, কিন্তু আদিম বিভাগে পসার জমানো সময়সাপেক্ষ। তখনকার অবস্থায় চিত্তরঞ্জনের পক্ষে অতদিন ধৈর্য ধরে আদিম বিভাগে পসার জমানো অসম্ভব ছিল। তিনি তাই ফৌজদারি মামলার দিকেই মনোনিবেশ করেন। তখন মফঃস্বল আদালতেই এই জাতীয় মকদ্দমার বাহুল্য ছিল—তিনি তাই সেই দিকেই ঝুঁকলেন। নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় দেশবন্ধুর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি লিখেছেন: 'একবার কলকাতায় গিয়ে আমি যখন তাঁদের রসা রোডের বাড়িতে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, তখন তাঁকে খুবই নিরুৎসাহ দেখেছিলাম। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর প্র্যাকটিস্ আশানুযায়ী হচ্ছে না। আর একবার দেখা করতে গিয়ে দেখলাম তিনি বেশ ভাল মেজাজেই আছেন। তখন তাঁর হাতে তিনশত টাকা ফীতে একটি মকদ্দমা এসেছিল। এমন যৎসামান্য ফীতে তাঁকে মকদ্দমা গ্রহণ করতে দেখে আমি বিস্ময়বোধ করেছিলাম। তিনি আমাকে বলছিলেন যে, এইটাই তিনি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছেন, কারণ সংসারের সামান্যতম প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার নির্বাহের মতো টাকা তখন বাড়িতে ছিল না।*

* ১৩৩২, শ্রাবণ, 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায় জগদীন্দ্রনাথ রায়ের প্রবন্ধ।

চিত্তরঞ্জনের সংগ্রামপূর্ণ জীবনের আশা ও নৈরাশ্যের এই চিত্র আমাদের সামনে রেখে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, প্রতিকূল অদৃষ্টের কাছে তিনি নতি স্বীকার করেন নি, স্বীয় পুরুষকারের উপর নির্ভর করেই তিনি সংকট-আবর্তের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের জয়রথ চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। বছরের পর বছর কাটে, প্র্যাকটিস্ জমে ওঠে না; তার উপর পিতার বিপুল ঋণের বোঝা, বাড়িতে অতগুলি পোষ্য—নৈরাশ্যপূর্ণ এবং তমোলীন তাঁর যৌবন-কালের সেই দিনগুলিতেই চিত্তরঞ্জন শুরু করেছিলেন কাব্যচর্চা। বাস্তব জীবনের রূঢ়তা তিনি ভুলতে চাইলেন কাব্যলক্ষ্মীর উপাসনা করে। এই সময়েই চিত্তরঞ্জনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মালঞ্চ' প্রকাশিত হয়। তাঁর এই সময়কার জীবনের ছায়াপাত আছে 'মালঞ্চের' অনেকগুলি কবিতার মধ্যে। এ বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে চিত্তরঞ্জন বাসন্তীদেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বাসন্তীদেবী ছিলেন আসামের বিজনী এস্টেটের দেওয়ান বরদানাথ হালদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা। তিনি সর্বাংশেই দেশবন্ধুর যোগ্য সহধর্মিণী। ব্রাহ্মরীতিতে ১৮৭৩ সালের তিন আইন অনুসারে এই বিবাহ হয়, তবে ব্রাহ্মসমাজের সম-কালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কেউই তাঁর বিয়েতে আচার্যের কাজ করতে সম্মত হন নি, কারণ তাঁদের বিবেচনায় চিত্তরঞ্জন ছিলেন একজন নাস্তিক ও জীবনাচরণে একজন পুরোদস্তুর বোহেমিয়ান। কথিত আছে, মালঞ্চের 'বারবিলাসিনী' কবিতাটিই ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয়দের বিরূপতার অন্যতম কারণ ছিল। মালঞ্চ কাব্যের অন্তর্গত আদিরসাত্মক কয়েকটি কবিতা—বিশেষ করে 'বারবিলাসিনী' শীর্ষক কবিতাটি লিখে চিত্তরঞ্জন সমাজের অপ্রিয়ভাজন হয়েছিলেন। এর ফলে তাঁর বিয়ের সময়ে পৌরোহিত্য করবার জন্য একজন ব্রাহ্ম আচার্য পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। এমন কি তাঁর

পিতৃব্য-বন্ধু শিবনাথ শাস্ত্রী পর্যন্ত বিবাহ-সভায় উপস্থিত থাকতে সম্মত হন নি। শেষে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই বিবাহে আচার্যের কাজ করে সমাজে নিন্দাভাজন হন। ব্রাহ্মসমাজের এই সংকীর্ণতায় চিত্তরঞ্জন বিশেষ ক্ষুব্ধ হন এবং তখন থেকেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁর বিরাগ প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকে।

আসল কথা কিন্তু এ নয়। ব্রাহ্ম পিতামাতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি চিত্তরঞ্জনের কোন অনুরাগ বা আকর্ষণ তাঁর যৌবনকাল থেকেই ছিল না। পিতা ভুবনমোহনও যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেও, আচারে-আচরণে একজন হিন্দুই ছিলেন এবং হিন্দুধর্মের অদ্বৈতবাদের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। উৎকট বা গোঁড়া ব্রাহ্ম তিনি ছিলেন না। পিতার এই উদারতা স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁর পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকবে। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন যে, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের উপদেশেই পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্মধর্মে আন্তরিক আস্থাবান হয়ে উঠেছিলেন, এবং অনেক বৎসর ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন। কিন্তু গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। শেষজীবনে তাই তিনি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর রসপিপাসু ও ভাবপ্রবণ হৃদয় তাঁকে এই পথে টেনে এনেছিল। তিনি স্বয়ং অসবর্ণ বিয়ে করেছিলেন এবং সন্তানগণেরও অসবর্ণ বিয়ে দিয়েছিলেন। তাই দেখা যায় যে, তাঁর ধর্মমতের পরিবর্তন হয়ে থাকলেও, সামাজিক বিষয়ে তাঁর মত বরাবর ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপই ছিল।

প্রকৃত কথা, মানুষটা হিন্দু, কি ব্রাহ্ম ছিলেন, নাস্তিক কি আস্তিক ছিলেন, এসব প্রশ্ন নিরর্থক। তাঁর মধ্যে ছিল একটা বিরাট হৃদয় ও সর্বসংস্কারমুক্ত একটা সার্বজনীন ভাব। তাই জাতি, বর্ণ ও ধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষই তাঁর কাছে সমান প্রিয় ছিল আর বিশ্বের সকল ধর্মমতই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য না হলেও শ্রদ্ধেয় ছিল। তাঁর এই উদার মানসিকতার একটি সুন্দর ছবি

আমরা দেখতে পাই তাঁরই সমমর্মী ও সমধর্মী বিদ্রোহী কবি নজরুলের সেই বিখ্যাত কবিতাটির মধ্যে ঃ

পয়গম্বর ও অবতার যুগে জন্মিনি মোরা কেহ ;
দেখিনিক মোরা তাঁদেরে , দেখিনি দেবের জ্যোতির্দেহ ;
কিন্তু যখনি বসিতে পেরেছি তোমার চরণ-তলে
না জানিতে কিছু না বুঝিতে কিছু ভরেছে নয়ন-জলে !
সারা প্রাণ যেন অঞ্জলি হয়ে ও-পায়ে পড়েছে লুটি,
সকল গর্ব উঠেছে মধুর প্রণাম হইয়া ফুটি !
....
তোমারে দেখিয়া কাহারও হৃদয়ে জাগেনিক সন্দেহ
হিন্দু কিংবা মুসলিম্ তুমি, অথবা অন্য কেহ !
তুমি আর্তের, তুমি বেদনার, ছিলে সকলের তুমি,
সবারে যেমন আলো দেয় রবি, ফুল দেয় সবে ভূমি ।
হিন্দুর ছিলে আকবর, মুসলিমের আরংজীব,
যেখানে দেখেছ জীবের বেদনা, সেখানে দেখেছ শিব ! *

এই চিত্তরঞ্জন দাশকে বাঙালী কতটুকু গ্রহণ করেছে আর কতখানি করে নি, উত্তরপুরুষ একদিন নিশ্চয়ই তার বিচার করবে ।

এক-আধ বছর নয়, দীর্ঘ বার বৎসর কাল চিত্তরঞ্জনকে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হয়েছিল ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতা অর্জন করবার জন্য । এই দুশ্চর সাধনায় তাঁর একমাত্র ভরসা ছিল স্বীয় প্রতিভা এবং পুরুষকার । ১৯০৫ সাল পর্যন্ত তাঁকে ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে একাকী এবং কি তাঁর সাহিত্য-প্রয়াসে ও কি আইন-ব্যবসায়ে কোনটাতেই তিনি তখনো পর্যন্ত আশানুযায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন নি । তাঁর এক জীবনীকার চিত্তরঞ্জনের এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে লিখেছেন ঃ 'From

* চিত্তনামা ঃ কাজী নজরুল ইসলাম ।

this time to 1905, Chittaranjan was ploughing a lonely furrow, making no headway either as a lawyer or as a man of letters... ..but he lost neither nerve nor heart over the situation.' *
এর উপর ১৯০৬ সালে এলো ভাগ্যের সেই নিদারুণ পরিহাস—বৃদ্ধ পিতা ও পুত্রকে নিরুপায় হয়ে একত্রে দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে হলো।

কালক্রমে কলকাতা হাইকোর্টে চিত্তরঞ্জনের পসার বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর এই সাফল্যের পিছনে ছিলেন তাঁর এক বন্ধু—শরৎচন্দ্র সেন। ইনি তখন আলিপুর ফৌজদারি আদালতের একজন খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। এঁরই সহায়তায় চিত্তরঞ্জন কয়েকটি দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা খুব সাফল্যের সঙ্গে হাইকোর্টে পরিচালনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সেই খ্যাতি আর কখনো ম্লান হয় নি এবং তখন থেকেই মফঃস্বল কোর্টে ছুটাছুটি বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি কলকাতা হাইকোর্টেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা নিয়োগ করতে থাকেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই কয়েকটি বিখ্যাত রাজনৈতিক মকদ্দমা পরিচালনা করে ব্যবসায়ের সর্বোচ্চশিখরে অধিরোহণ করেন।

১৯০৭।

ব্যারিস্টার সি. আর. দাশের জীবনে দিক্-পরিবর্তন সূচিত হয় এই বছর থেকেই। 'বন্দে মাতরম্' ও 'সন্ধ্যা'—জাতীয়তাবাদী দলের এই দুখানি মুখপত্রের বিরুদ্ধে আনীত দুইটি মকদ্দমাকে উপলক্ষ করে চিত্তরঞ্জনের প্রতিভার যে পরিচয় আমরা পাই, তারই পরিণতি ছিল পরবর্তীকালে তাঁর দেদীপ্যমান রাজনৈতিক জীবন। ১৯০৭, ২৭শে ও ২৮শে জুন তারিখের 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায়

* *Life and Times of C. R. Das* : **Ray**

দুটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় 'India for the Indians' ও 'The Yugantar case' এই শিরোনামায়। পত্রিকার সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ, এই অনুমানে এই দুটি আপত্তিজনক প্রবন্ধের জন্য ১৬ই আগষ্ট তারিখে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিনিই যে এই পত্রিকার সম্পাদক এটা প্রমাণ করবার জন্য সরকার পক্ষ থেকে এই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপিনচন্দ্র পালকে সাক্ষীরূপে আহ্বান করা হয়। এইভাবে বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ দু'জনেই এই মামলায় জড়িয়ে পড়েন। এখন যেমন প্রত্যেক সংবাদপত্র সম্পাদকের নাম প্রকাশ করতে বাধ্য, তখন এ নিয়ম ছিল না। সুতরাং সম্পাদক হিসাবে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় কারো নামই মুদ্রিত হতো না। বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর ও অরবিন্দ—প্রধানতঃ এই তিনজনই ছিলেন এর সম্পাদকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ১৯০৫ সালের আগষ্ট মাসে এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়েছিল।

২৬শে আগষ্ট বন্দে মাতরমের মামলা উঠল তৃতীয় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট আর. এন. সিংহের এজলাসে। বিপিনচন্দ্র চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক গুরু, তাঁর কাছেই তিনি রাজনীতির প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। তদুপরি তিনি তাঁর পিতৃবন্ধু। কাজেই চিত্তরঞ্জন বিপিনচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করতে এগিয়ে এলেন। আদালতে উপস্থিত হলে বিপিনচন্দ্রকে চিরাচরিত প্রথামত শপথ নিতে বলা হলো। চিত্তরঞ্জনের পরামর্শক্রমেই সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিপিনচন্দ্র বললেন: 'এই মকদ্দমায় সাহায্য করতে ও শপথ গ্রহণ করতে বিবেকানুযায়ী আমার আপত্তি আছে।' আপত্তি! ইংরেজের আদালতে দাঁড়িয়ে এমন কথা বলা সেদিন কম সাহসের পরিচায়ক ছিল না। বিপিনচন্দ্র যখন কিছুতেই সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হলেন না, তখন আদালত অবমাননা করার অপরাধে তিনি রাজদ্বারে অভিযুক্ত হলেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর এই মামলার বিচার আরম্ভ হলো। বিপিনচন্দ্রের পক্ষে দাঁড়িয়ে সেদিন চিত্তরঞ্জন তাঁর সওয়ালে

বলেছিলেন : 'I honestly consider this prosecution of Bande-mataram to be unjust and injurious—injurious because it is calculated to stiffle freedom of thought and speech—it is subversive of the rights of the people.' ভবিষ্যতের নেতা দেশবন্ধুকে যেন তাঁর এই সুযুক্তিপূর্ণ সওয়ালের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। বিচারে বিপিনচন্দ্রের ছয়মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। তিনি সাক্ষ্য না দেওয়াতে পুলিশের পক্ষে প্রমাণ করা কঠিন হলো যে আপত্তিজনক প্রবন্ধ দুটির লেখক অরবিন্দ ঘোষ। সুতরাং তিনি সসম্মানে মুক্তিলাভ করলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, অরবিন্দের এই গ্রেপ্তার উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' শীর্ষক সুবিখ্যাত কবিতাটি লিখে তাঁকে তাঁর স্বদেশপ্রেমের জন্য অভিনন্দিত করেছিলেন।

এই মকদ্দমায় জয়লাভ করতে না পারলেও, চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতাশক্তি, আইনজ্ঞান ও কূটতর্কের পরিচয় পেয়ে সবাই বুঝল যে, 'C. R. Das is the rising star of the Bar.' তখন থেকেই পরবর্তীজীবনের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনবিদ্‌দের সূচনা হয়। এর পর 'সন্ধ্যা' পত্রিকার মকদ্দমায় তিনি এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের (১৮৬১-১৯০৭) পক্ষ সমর্থন করেন। সেই সময়ে ইহাও একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক মকদ্দমা হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। ১৯০৭, ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের এজলাসে 'সন্ধ্যা'র মামলার প্রাথমিক বিচার আরম্ভ হয়। চিত্তরঞ্জন 'সন্ধ্যা'-র পক্ষ সমর্থনে দাঁড়ালেন এবং প্রথমেই কিংসফোর্ডের এজলাস থেকে অন্য হাকিমের কোর্টে মকদ্দমা স্থানান্তরিত করার জন্য একটি আবেদন করলেন। এর কারণ ছিল। 'সন্ধ্যা' কাগজে কয়েকটি রাজনৈতিক মকদ্দমায় কিংসফোর্ডের বিচার-প্রণালী ও ব্যবহার সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করা হয়, সেজন্য তিনি স্বভাবতঃই

এই পত্রিকা ও এর সম্পাদক সম্পর্কে বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। সুতরাং তাঁর এজলাসে এই মকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত নয়—এই ছিল চিত্তরঞ্জনের যুক্তি। বিচারপতি ক্যাস্‌পারের সঙ্গে তাঁর এই বিষয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদ হয় এবং শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের বিচারে এই আবেদন অগ্রাহ্য হয়। তারপর ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখ থেকে কিংসফোর্ডের এজলাসেই 'সন্ধ্যা'-পত্রিকার বিচার আরম্ভ হলো।

'সন্ধ্যা, পত্রিকায় প্রকাশিত পাঁচটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রাজদ্রোহ-জনক বলে সরকার কর্তৃক বিবেচিত হওয়ার ফলেই এই মকদ্দমার সৃষ্টি। সেই প্রবন্ধ কয়টির নাম: ১। 'আমাদের পোয়া বারো, ফিরিঙ্গির তেরো' (১৯০৭, ৯ই আগষ্ট); ২। 'আজ কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা, একটা কালো, একটা সাদা' (১৯০৭, ৯ই আগষ্ট); ৩। 'এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে' (১৯০৭, ১৩ই আগষ্ট); ৪। 'ঢেঁকি অবতার' (১৯০৭, ৩০শে আগষ্ট) ও ৫। 'ছ্‌শো মজা, তিলে খাজা' (১৯০৭, ৪ঠা সেপ্টেম্বর)। এই পাঁচটি প্রবন্ধের মধ্যে তৃতীয় প্রবন্ধটিই বিশেষভাবে রাজদ্রোহমূলক বলে বিবেচিত হয়। ৩১শে আগষ্ট উপাধ্যায় ও 'সন্ধ্যা'-র ম্যানেজার সারদাচরণ সেন গ্রেপ্তার হলেন। চিত্তরঞ্জন এগিয়ে এলেন ও বিনা পারিশ্রমিকে উভয়ের পক্ষে মামলা চালাবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, উপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর আগে থেকেই গভীর যোগাযোগ ছিল। মামলার প্রথম দিনেই প্রধান আসামীর জবাব হিসাবে আদালতের সামনে চিত্তরঞ্জন তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন এইভাবে: 'I accept the entire responsibility of the paper and the articles in question. But I don't want to take any part in the trial, because I do not believe that in carrying out my humble share of this God-appointed mission of Swaraj, I am

in no way accountable to the alien people who happen to rule over us and whose interest is, and must necessarily be, in the way of our national development.' 'আমি ইংরেজের আদালতের বিচার মানি না' আর 'বিধাতৃ-নির্দিষ্ট এই স্বরাজব্রত সাধন'— এই কথাগুলি ছিল সেদিন অভিনব এবং কি শাসকবর্গ, কি বাঙালী, সকলেই এই জাতীয় স্পষ্ট ভাষণে চমকিত হয়ে ওঠে। উপাধ্যায়ের পরামর্শক্রমেই চিত্তরঞ্জন এই সওয়াল পেশ করেছিলেন এবং তার আগে চিত্তরঞ্জন যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকতে পারবেন তো?' তখন উপাধ্যায় তাঁকে বলেছিলেন, 'ইংরেজের সাধ্য নেই আমাকে জেলে পাঠায়।' কথিত আছে, এই মামলা চলবার কালে, উপাধ্যায় রসা রোডে চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে মকদ্দমাটি বোঝাতেন। কখনো কখনো বলতেন, 'আপনি সারদাকে defend করুন, ওর জন্য আমি বড় উদ্বিগ্নবোধ করছি।' মামলা চলবার সময়েই ১৯০৭, ২৭শে অক্টোবর ক্যাম্বেল হাসপাতালে উপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়।

'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় এই মামলা সম্পর্কে লেখা হয়েছিল: 'ভারতে সিডিশন মামলার ইতিহাসে এমন সাহসিক, এমন স্পষ্ট ও মর্যাদাপূর্ণ বিবৃতি আর কখনো দাখিল করা হয় নি। বিবৃতিটি সম্পূর্ণ 'সন্ধ্যা'-সম্পাদকেরই উপযুক্ত। আর এই নির্ভীক, স্বদেশপ্রাণ যোদ্ধার মৃত্যুর পরের দিন 'বন্দে মাতরমে' প্রকাশিত একটি সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল: 'The passing away of Upadhyay Brahmabandhab, the brave and renowned editor of 'Sandhya', in the Campbell Medical Hospital on Sunday morning when the bureaucracy was pursuing him with the most unedifying vindictiveness, proves beyond the

shadow of a doubt that when the infidel supposes that he can very well triumph with the prison, scaffold, handcuffs and iron necklace at his command, faith twists him with his audacity, and takes his victim far out of his reach.' হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের কাছে শুনেছি, এই অপূর্ব সম্পাদকীয়টির লেখক ছিলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'সন্ধ্যা' পত্রিকার বিরুদ্ধে যেমন রাজদ্রোহের মামলা আনা হয়েছিল, ঠিক অনুরূপ একটি মামলা চরমপন্থীদলের বাংলা মুখপত্র 'যুগান্তরের' বিরুদ্ধেও আনা হয়েছিল। এর সম্পাদক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। যুগান্তরের মামলাতেও চিত্তরঞ্জন ভূপেন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন করেন। এইসব স্বদেশী মকদ্দমা থেকে চিত্তরঞ্জনের কোনই অর্থাগম হতো না, অথচ এইসব মকদ্দমার জন্য তাঁকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হতো। তাতে তিনি কাতর হতেন না। তাঁর দেশপ্রেম এই সকল কাজে তাঁকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করতো। হিউম, গ্রেগরি, গার্থ, নর্টন—এইসব বড় বড় ইংরেজ ব্যারিস্টার তখন রাজদ্রোহের মামলায় সরকার পক্ষে নিযুক্ত হতেন। এঁদের সকলের বিরুদ্ধে আপন প্রতিভা নিয়ে চিত্তরঞ্জন একা লড়েছিলেন সব্যসাচীর মতো—ব্যারিস্টার হিসাবে এইটাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ও সাফল্য। 'Mr. C. R. Das was a terror to his English colleagues in many a political case during the early decades of this century.' তাঁর মৃত্যুর পরে একটি ইংরেজী পত্রিকায় চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে এই উক্তিটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য।

১৯০৭-০৮ সালের অগ্নিগর্ভ বাংলায় ব্যারিস্টার সি. আর. দাশের একটি প্রধান ভূমিকা ছিল—রাজনৈতিক কারণে অভিযুক্ত বিপ্লবীদের পক্ষ সমর্থন। এই সময়কারই বিখ্যাত মামলা হলো আলিপুর বোমার মামলা। রাজনৈতিক অপরাধের বিচার হিসাবে এ মামলাটি সম্ভবতঃ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য। অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন এই মামলার প্রধান আসামী। সাত বছর বয়স থেকে, একুশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি বিলাতে অবস্থান করে শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পর তিনি আরো চৌদ্দ বছর বরোদা রাজ্যে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। অবশেষে মাসিক হাজার টাকা মাইনের চাকরি ত্যাগ করে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং দেশবাসীকে একটি সম্পূর্ণ নতুন রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। একদিকে অরবিন্দ ঘোষ, অন্যদিকে তাঁর কৌঁসুলি চিত্তরঞ্জন দাশ—এই দুই স্বদেশপ্রেমিকের নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে আলিপুর বোমার মামলা একটি স্বতন্ত্র গৌরবের অধিকারী হয়েছে। কারণ এই মকদ্দমাকে উপলক্ষ করেই চিত্তরঞ্জন ন্যাশনালিজম্ বা স্বদেশানুরাগের এমন একটি বলিষ্ঠ দর্শন তাঁর স্বজাতিকে উপহার দিয়েছেন যার মূল্য শাশ্বত। আবার অন্যদিকে, এই মকদ্দমাই চিত্তরঞ্জনকে সৌভাগ্যের সোপানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, কারণ এর পর থেকেই দিগ্বিজয়ী ব্যারিস্টাররূপে সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর জীবনে এই সময়টায় দৈব ও পুরুষকারের একত্র সম্মিলন দেখা যায়।

সুপরিচিত এই মামলার সম্পূর্ণ বিবরণ এখানে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ ইতিপূর্বে অন্যত্র আমি এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। আমরা শুধু চিত্তরঞ্জনের জীবনের সঙ্গে এর যতটুকু সম্পর্ক তাই বলব। অরবিন্দ ছিলেন এই মামলার প্রধান আসামী এবং তাঁর সঙ্গে আরো ত্রিশ-চল্লিশজন বিপ্লবী গ্রেপ্তার হন—সকলের বিরুদ্ধেই রাজদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছিল পুলিশ। তবে অরবিন্দের

জন্যই সকলে বেশি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন—সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন বোধ করেন তাঁর অন্তরঙ্গ সতীর্থ শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও তাঁর মেশোমশাই, 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র। শ্যামসুন্দরই উদ্যোগী হয়ে অরবিন্দের মামলার খরচ চালাবার জন্য সাতাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। সকলেই জানত যে, এই মামলা দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে। এই সামান্য টাকার উপর নির্ভর করে এই মামলা চালানো এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। এই মামলায় অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করার জন্য প্রথমে নিযুক্ত করা হয় স্বনামধন্য ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও কে. এন. চৌধুরীকে। শুনানী আরম্ভ হয় ১৯০৮, ১৯শে অক্টোবর থেকে আলিপুরের সহকারী দায়রা জজ বীচক্রফটের এজলাসে ; ইনি কেমব্রিজে অরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন ও পরে সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শুনানী আরম্ভ হওয়ার অল্পকাল পরেই প্রায় বিশ হাজার টাকা খরচ হয়ে যায় এবং ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর পক্ষে এই মামলা পরিচালনা করা আর সম্ভব হয় না, কারণ অরবিন্দের মামলায় নিযুক্ত হওয়ার আগে থেকেই তিনি বাংলার বাইরে অন্য একটি মকদ্দমার ব্রীফ গ্রহণ করেছিলেন এবং তার শুনানী আরম্ভ হতেই তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন। তবে যাওয়ার আগে তিনি চিত্তরঞ্জনকে এই মামলায় কৌঁসুলি হিসাবে নিযুক্ত করার কথা বলে যান। চিত্তরঞ্জনকে প্রথমাবধি নিযুক্ত করার প্রস্তাব শুরুতেই উঠেছিল, কিন্তু তখন প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন অরবিন্দের শ্বশুর ভূপাল বসু স্বয়ং এবং কৃষ্ণকুমার মিত্রকে তিনিই বলেছিলেন : 'আমার জামাতার পক্ষ সমর্থনের জন্য আমি সি. আর. দাশের মতো একজন জুনিয়রকে নিয়োগ করার পক্ষপাতী নই।'

ব্যোমকেশ বাবু চলে গেলেন, অর্থের অনটন, এমন অবস্থায় এত বড় জটিল মামলা চালান একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। তখন ঠিক হলো এই বিষয়ে অর্থাৎ তাঁর defence সম্পর্কে অরবিন্দের অভিমত জিজ্ঞাসা করা হোক। এই মামলার এটর্নি

ছিলেন ম্যানুয়েল য়্যাণ্ড আগরওলা। তাঁদের পরামর্শক্রমে বিশিষ্ট এ্যাটর্ণি কুমারকৃষ্ণ দত্ত একদিন আলিপুর জেলে গিয়ে অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ও মামলার বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তখন 'I wish Chitta to defend me.'—এই অভিমত তিনি প্রকাশ করেন। অরবিন্দ তাঁর প্রিয় বন্ধু এবং দেশের জন্য তাঁর ত্যাগ, তাঁর নির্ভীক স্বদেশপ্রেম তাঁকে চিত্তরঞ্জনের প্রতি ১৯০৫ থেকেই গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার প্রথম মামলায় তিনি তাঁর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন অথচ আলিপুর বোমার মামলার সময়ে অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনের জন্য তাঁকে ডাকা হলো না, এজন্য চিত্তরঞ্জন যে মনে মনে একটু ক্ষুন্ন হয়েছিলেন, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। তখন থেকে অভিমানক্ষুব্ধ চিত্তে তিনি দূর থেকে এই মামলার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এমন সময়ে একদিন সকালে রসা রোডের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী।

—আমাদের বন্ধু, অরবিন্দের এই মামলাটা তুমি যদি নাও, তাহলে ভাল হয়, চিত্ত।

—অরবিন্দ কি কেবল তোমাদেরই বন্ধু, শ্যামসুন্দর? আমার কেউ নয়? হেসে বলেন চিত্তরঞ্জন। তারপর তিনি বলেন, আমি জানতাম, এ মকদ্দমা আমাকেই করতে হবে। মামলার কাগজপত্র পাঠিয়ে দিতে বল এখুনি। ম্যানুয়েল য়্যাণ্ড আগরওলার পক্ষ থেকেও তখন চিত্তরঞ্জনকে অনুরূপ অনুরোধ জানান হয়।

টাকার কোন প্রশ্নই তুললেন না চিত্তরঞ্জন। তাঁর এক চরিতকার এই প্রসঙ্গে যথার্থই লিখেছেন: 'চিত্তরঞ্জন এই মকদ্দমা গ্রহণ করলেন,—কিন্তু কি ক্ষতি স্বীকার, কি মহৎ হৃদয়ের পরিচয়, কি বন্ধু-বাৎসল্য, কি দেশপ্রাণতাই যে ইহার সহিত সংসৃষ্ট তাহা যাঁহারা তখন তাঁহাকে চিনিতেন, তাঁহার সহিত সংস্রব রাখিতেন তাঁহারাই জানেন, আর উত্তরকালে দেশবাসী তাহা বুঝিতে

পারিয়াছিল।'* আরো একজন জানতেন যে তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য শেষ পর্যন্ত চিত্তরঞ্জনকেই দাঁড়াতে হবে। তিনি অরবিন্দ ঘোষ। আলিপুর বোমার মামলায় সসম্মানে মুক্তিলাভ করায় তিনি তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা এই সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন: 'He came unexpectedly, a friend of mine....You have all heard the name of the man who put away from him all other thoughts and abandoned all his practice, who sat up half the night day after day for months and broke his health to save me—Srijut Chittaranjan Das. When I saw him I was satisfied.' অরবিন্দের এই উক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, চিত্তরঞ্জন এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ব্রত হিসাবে, সাধনা হিসাবে। সেই সাধনায় তাঁর যে মহতী সিদ্ধিলাভ ঘটেছিল, কবি তাকে ব্যক্ত করেছেন এইভাবে:

তুমিই রাজার ঐরাবতের পদতল হতে তুলে
বিষ্ণু-শ্রীকর-অরবিন্দরে আবার শ্রীকরে থুলে।

বস্তুতঃ চিত্তরঞ্জন আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনা করে যুগপৎ তাঁর প্রতিভা ও ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। প্রায় একটি বৎসর কাল তিনি অপর কোন মামলার ব্রীফ গ্রহণ করেন নি, অথচ অর্থাগম হয়, এমন কয়েকটি মামলা এই সময়ে তাঁর হাতে এসেছিল। অরবিন্দের এই মামলায় তিনি একটি কপর্দকও গ্রহণ করেন নি। উপরন্তু তাঁর নিজের জুড়ি গাড়িটি পর্যন্ত বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছিলেন; তাঁর সঞ্চিত অর্থ যখন নিঃশেষিত হতে থাকে তখন থেকে তিনি হ্যাণ্ডনোট কাটতে থাকেন। তারপর দেখা গেল যে, আলিপুর বোমার মামলার উপর যখন যবনিকাপাত হলো তখন চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিগত ঋণের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার টাকায়

* দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন: কুমুদ চন্দ্র রায়চৌধুরী।

দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কোন আইনজীবী তাঁর মক্কেলের জন্য এমনভাবে ঋণগ্রস্ত হয়েছেন বলে কখনো শোনা যায় নি। নিশীথচন্দ্র সেনের মুখে শুনেছি যে, চিত্তরঞ্জন যখন এই মামলা গ্রহণ করেন তখন তাঁর আর্থিক অবস্থা যারপরনাই সঙ্গীন ছিল—দরিদ্র বললেও অত্যুক্তি হয় না। হাইকোর্টে সবে একটু পসার হতে আরম্ভ হয়েছে, কিছু সুনাম হয়েছে বটে, কিন্তু তখনো পর্যন্ত অর্থাগম তেমন হয় নি। কারণ তিনি সমস্ত স্বদেশী মকদ্দমার পক্ষ সমর্থন করতেন বিনা পারিশ্রমিকে। সংসারের অবস্থা তখনো সচ্ছল নয়। কাজেই এরকম অবস্থায় একটি কপর্দক গ্রহণ না করে দীর্ঘ দশমাস কাল এত বড় একটা মকদ্দমার ভার গ্রহণ যে কতখানি মহত্ত্বের পরিচায়ক, তা সহজেই অনুমেয়। শুধু কি ঋণগ্রস্ত হওয়া? এই দশমাস কাল তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল, আইনের বহু নজীর অধ্যয়ন করতে হয়েছিল। যেদিন তিনি অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনের জন্য আদালতে অবতীর্ণ হলেন সেদিন থেকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস কোর্টে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করতেন। তারপর প্রতিরাত্রে প্রায় সারা রাত জেগে তিনি এই মামলার নথিপত্র নিয়ে একাগ্র-চিত্তে তন্ময় হয়ে থাকতেন। অরবিন্দকে খালাস করে নিয়ে আসা তাঁর চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল বললেই হয়। এর ফলে তাঁর স্বাস্থ্যেরও হানি হয়েছিল। পৃথিবীতে আর কোন্ ব্যবহার-জীব তাঁর মক্কেলের জন্য এমনভাবে স্বার্থত্যাগ করেছেন?

এ তো গেল তাঁর নিষ্ঠার কথা, ত্যাগের কথা। আইনজ্ঞানের কি অসামান্য পরিচয় দিয়েছিলেন এই ঐতিহাসিক মকদ্দমার ডিফেন্স কৌঁসুলি হিসাবে তা ভাবলে পরে বিস্মিত হতে হয়। এই মামলায় সরকার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন প্রখ্যাত ইংরেজ ব্যারিস্টার ইয়ার্ডলি নর্টন। আর এই মামলা পরিচালনা করবার ব্যাপারে সরকার পক্ষে ছিলেন তৎকালীন পুলিশের কুখ্যাত ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শামসুল হুদা। যিনি প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন বোমার আসামীদের

যেন অনেকগুলিকে ফাঁসিতে লটকাতে পারেন এবং প্রধান আসামী অরবিন্দ ঘোষই ছিলেন তাঁর লক্ষ্য। এই মকদ্দমা চলবার সময়ের একটি ঘটনা বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিচারে এঁর নির্বাসন-দণ্ড হয়েছিল) লিখেছেন ঃ

'দেশবন্ধুকে প্রথম দেখি ১৯০৮-০৯ সালে আলিপুর প্রথম বোমার সময়। আমরা তখন পিঁজরার ভিতর শিকল-বাঁধা। বীচক্রফট সাহেব আমাদের বিচারক। একদিন কি একটা আইনের অর্থ লইয়া চিত্তরঞ্জনের সহিত তাঁহার মতভেদ হইয়াছিল। খানিকটা তর্কবিতর্কের পর জজসাহেব বলিয়া উঠিলেন, 'You are talking nonsense, Mr. Das.' আমরা চিত্তরঞ্জনের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। তাঁহার চোখে-মুখে এমন একটা ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না। চিত্তরঞ্জন আইনের পুঁথি বন্ধ করিয়া বুক ফুলাইয়া একেবারে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। খুব ধীরে ধীরে প্রত্যেক কথাটা স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া, তীব্র গম্ভীরকণ্ঠে সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'You are on the Bench, Sir, and that language should not have come from your mouth. Had we been anywhere else, I would know how to answer.' সাহেবের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। চিত্তরঞ্জন আর সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া পূর্ববৎ আইনের তর্ক জুড়িয়া দিলেন। মানুষটার প্রাণের ভিতর যে কতখানি আগুন ছিল, এক মুহূর্তের জন্য তাহা চোখের কোণে ও ভাষার ভঙ্গির ভিতর দিয়া দেখা দিয়া চলিয়া গেল।'

কথিত আছে, এই ঘটনার পর থেকে বীচক্রফট অরবিন্দের কৌঁসুলির প্রতি আর কোনদিন অশিষ্ট আচরণ প্রদর্শন করেন নি। অরবিন্দ সন্ত্রাসবাদী দলের নেতা বলে এই মামলার প্রধান আসামী

হিসাবে আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং পুলিশের দিক থেকে তাঁকে দেশব্যাপী বোমার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে দেবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। সাক্ষীসাবুদও সেইভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন কিন্তু মামলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন অন্যভাবে এবং ব্যারিস্টার হিসাবে এইখানেই ছিল তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব। অরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বরোদা থেকে আসা অবধি অগ্নিগর্ভ বাংলার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তিনি তাঁর লেখনীর মারফত বন্দে মাতরমের পৃষ্ঠায় দিনের পর দিন রূপায়িত করেছেন। বলেছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়ঃ 'Political freedom is the life breath of a nation. It means the fulfilment of our national life. In fact, the true aim of the nationalist movement is to restore the spiritual greatness of the nation by the essential preliminary of its political generation. Our object, our claim is that we shall not perish as a nation, but live as a nation.'* মামলা পরিচালনা করবার সময়ে চিত্তরঞ্জনকে অরবিন্দের এই লেখাগুলি আবার নতুন করে পড়তে হয়েছিল। অরবিন্দের দেশপ্রেমকেই তিনি তাই তাঁর সওয়ালে বিশেষভাবে তুলে ধরতে চাইলেন। তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন যে, অরবিন্দ একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ, তাঁর ধর্মভাবনাই তাঁর দেশপ্রেম তথা রাজনৈতিক চিন্তাধারার উৎস এবং এই মানুষটির রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতামত, এমন কি তাঁর জীবনধারাও বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত।

একদিনের সওয়ালে চিত্তরঞ্জন বললেনঃ 'So far as the nation was concerned, he (Aurobindo) preached that lofty ideal of freedom. So far as the individual was concerned, his idea always was to

Bande Mataram, 1907

go there himself and look for the Godhead within. It is a familiar ideal of our country. It is difficult for those not familiar with it to understand it.' এখানে উল্লেখ্য, ভবিষ্যতের নেতা দেশবন্ধুর নিজস্ব কয়েকটি মত এবং বিশ্বাসও আদালতে প্রদত্ত তাঁর এই ধরনের সওয়ালের মধ্যে পরিষ্কারভাবেই আভাসিত হয়েছিল। এখন থেকে মাত্র আট-নয় বছর পরে যিনি ভারতবর্ষের রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে একত্রে আবির্ভূত হবেন দীপ্ত সূর্যের মতো, আলিপুরের দায়রা জজের এজলাসে মামলার প্রধান আসামীর কৌঁসুলির মধ্যেই যেন সেই মানুষটিকে দেখা গিয়েছিল।

১৯০৯, ২৩শে মার্চ থেকে ৩১শে মার্চ—এই নয়দিন চিত্তরঞ্জন যে সওয়াল-জবাব করেছিলেন তা ইতিহাস হয়ে আছে। হেষ্টিংস্-এর ইম্‌পিচমেণ্টের সময় এডমণ্ড বার্ক যেভাবে সওয়াল করেছিলেন, চিত্তরঞ্জনের এই নয়দিনের সওয়াল ঠিক তার সঙ্গে তুলনীয়—সেই যুক্তি, সেই আবেগ, মনুষ্যত্বের প্রতি সেই আবেদন এর প্রত্যেকটি কথায় ঝঙ্কৃত হয়েছে। তাঁর প্রতিভার চরম বিকাশ দেখা গিয়েছিল মামলার শেষে এই কয়দিনের সওয়ালের মধ্যে যেটা তিনি জুরিদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, যদিও এই মামলায় আসামী হিসাবে ত্রিশ-চল্লিশজন অভিযুক্ত হয়েছিলেন, তথাপি সরকারের প্রকৃত লক্ষ্য ছিলেন একজন—অরবিন্দ ঘোষ। এই মামলার বিচার চলেছিল ১২৬ দিন, জেরা করা হয়েছিল ২০০ সাক্ষীকে, যে বিপুল পরিমাণ নথিপত্র উপস্থিত করা হয় তার সংখ্যা ছিল চার হাজার আর প্রায় পাঁচশত বোমা, বিস্ফোরক প্রভৃতি পদার্থ প্রমাণ হিসাবে দাখিল করা হয়। দীর্ঘকাল স্থায়ী এই বিচার চলবার সময় একাদিক্রমে আটচল্লিশ দিন চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সরকার পক্ষের কৌঁসুলি নর্টনের সঙ্গে যে বাগ্‌যুদ্ধ হয়েছিল, এবং তাতে তিনি যে নৈপুণ্য প্রকাশ করেছিলেন, ভারতবর্ষের কোন আদালতে আর কোন রাজনৈতিক মামলায় তা দেখা যায় নি।

প্রধান আসামী অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনে চিত্তরঞ্জনের শেষ কয়দিনের ওজস্বিনী ও যুক্তিজালপূর্ণ ভাষণ সম্পর্কে একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে: 'Chittaranjan's speech for nine days and it was an epic of forensic art, and the peroration with which he ended will rank among the classics of legal addresses.'* সত্যিই তাঁর এই অভিভাষণ জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার অপূর্ব নিদর্শন, বর্ণনা-শক্তির অসাধারণ পরিচায়ক, সূক্ষ্ম আইনজ্ঞানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্বদেশপ্রেম অথবা পরশাসন থেকে নিজের দেশকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা, এটা যে অপরাধ নয়—এই শাশ্বত সত্যটাই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। উত্তরকালে দিল্লীর লালকেল্লায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র গঠিত ভারতীয় জাতীয় সৈন্যদলের (I. N. A.) তিনজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারের যে ঐতিহাসিক বিচার অনুষ্ঠিত হয়, তার প্রধান কৌঁসুলি হিসাবে ভুলাভাই দেশাই চিত্তরঞ্জনের এই রীতিরই অনুসরণ করে সফলকাম হয়েছিলেন।

১৯০৯, ৩১শে মার্চ।

আজ আলিপুর বোমার মামলার বিচারের শেষ দিন।

যথাসময়ে আদালতের কাজ আরম্ভ হলো। বিচারক ও জুরিগণ তাঁদের নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন। আসামীরা সবাই কাঠগড়ায় উপস্থিত। আদালতের বাইরে ও ভিতরে প্রচুর জন-সমাবেশ। আজ সওয়ালের শেষ দিন। সব্যসাচীর মতো দৃপ্ত-ভঙ্গিতে আদালত-কক্ষে প্রবেশ করলেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। উপস্থিত সকলের দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে নিবদ্ধ হয় তাঁর ওপর। তাঁর আজকের অভিভাষণের ওপর সবকিছু নির্ভর করছে—নির্ভর করছে প্রধান আসামী অরবিন্দ ঘোষের দণ্ড অথবা মুক্তি। যখন তিনি কখনো জজ, কখনো জুরি দু'জনকে লক্ষ্য করে ওজস্বিনী ভাষায় তাঁর

*_Sri Aurobindo_ : K. R. Srinivasa Iyenger.

সওয়াল শেষ করেন তখন কিছুক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত আদালতগৃহ নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ প্রতীয়মান হয়েছিল। প্রচুর জনসমাগম সত্ত্বেও মনে হয়েছিল সেখানে একটি জনপ্রাণীও বুঝি উপস্থিত নেই। আসামী, ফরিয়াদী, জজ, জুরি, উকিল, ব্যারিস্টার, দর্শকবৃন্দ যেন নিস্পন্দ মনে হয়েছিল। সওয়াল দ্বারা আদালতগৃহে যে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা যেতে পারে, এর আগে কেউ তা প্রত্যক্ষ করে নি, পরেও না। এইটাই ছিল এই মামলার বৈশিষ্ট্য।

সেই স্মরণীয় অভিভাষণের শেষাংশটি মাত্র এখানে উদ্ধৃত হলো। বীচক্রফটের এজলাসে দাঁড়িয়ে চিত্তরঞ্জন বলছেন : 'আপনার সমক্ষে আমি এইটুকু নিবেদন করছি যে, এর পরে যখন সকল বাদানুবাদ থেমে যাবে, যখন এইসব আন্দোলন ও কোলাহল স্তব্ধ হয়ে যাবে, এই আসামী অরবিন্দ ঘোষও যখন দেহত্যাগ করে পরলোকে চলে যাবেন, তারো পরে—বহুকাল পরে—জগতের লোকে বলবে যে, ইনি ছিলেন দেশপ্রেমের এক অমর কবি, জাতীয়তার অগ্রদূত আর সমগ্র মানবজাতির নিঃস্বার্থ প্রেমিক। ইনি যখন এ জগতে থাকবেন না, তখনো পর্যন্ত এঁর বাণী কেবল ভারতের মধ্যেই নয় এদেশ ছাড়িয়েও দূর-দূরান্তরের সাগরপারে সকল দেশবিদেশে ব্যাপ্ত হয়ে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হবে। তাই আমি বলছি, যে ঐ ব্যক্তি আজ কেবল এই আদালতেরই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচার চাইছেন না। ইনি এসে এখন দাঁড়িয়েছেন ইতিহাসের মহা আদালতের কাঠগড়ার সামনে।'

চিত্তরঞ্জনের এই আবেগ-উদ্দীপ্ত অভিভাষণে মিস্টার বীচক্রফট যারপরনাই চমৎকৃত হন। ১৩ই এপ্রিল জুরি দুইজন তাঁদের অভিমত জানালেন বিচারককে—প্রধান আসামী অরবিন্দ ঘোষকে তাঁরা নির্দোষ বলে ঘোষণা করলেন। এর প্রায় একমাস পরে, ৬ই মে রায় প্রকাশিত হলো—জুরিদের অভিমত গ্রহণ করে বীচক্রফট অরবিন্দকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করলেন এবং তিনি সসম্মানে মুক্তি-

লাভ করলেন। তখন সমবেত দর্শকদের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে চিত্তরঞ্জন বিজয়ী বীরের মতো তাঁর মক্কেল অরবিন্দের হাত ধরে আদালত-কক্ষ ত্যাগ করলেন। তাঁরা দু'জনে বাইরে আসামাত্র সমবেত জনতার কণ্ঠে উঠল তুমুল হর্ষধ্বনি। ৭ই মে তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় চিত্তরঞ্জনকে তাঁর সাফল্যের জন্য অভিনন্দিত করে লেখা হলো: 'বাবু অরবিন্দ ঘোষের পক্ষ সমর্থন মিস্টার সি. আর. দাশের অদ্ভুত কীর্তি।' অদ্ভুত কীর্তি, সন্দেহ নেই। তিনি যে অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে অরবিন্দের পক্ষ নিয়ে লড়েছিলেন তাতেই এই বিচার-বিবরণ স্থান-কালের সীমা অতিক্রম করে স্মরণীয় হয়ে আছে। আজ সেই স্মরণীয় নাটকের কুশীলবদের কেউই জীবিত নেই—কিন্তু চিত্তরঞ্জন ও অরবিন্দ—এই দুটি নাম বাঙালীর স্মৃতিপটে আজো বিরাজমান। এবং প্রধান আসামীর পক্ষ সমর্থনে তাঁর সম্পর্কে চিত্তরঞ্জন যে উক্তি করেছিলেন—'He will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity'—সেই উক্তি কি পরবর্তী কালে তাঁর নিজের জীবনেও অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে ওঠে নি? এই ঐতিহাসিক মামলার ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের মধ্যেই আমরা লক্ষ্য করি ভবিষ্যতের ভারত-বন্দিত নেতা দেশবন্ধুর জাগরণ। এই মামলায় তিনি যে অপূর্ব সওয়াল করেছিলেন তা শুধু তাঁর বন্ধুর কারামুক্তিতেই সার্থক হয় নি, প্রকৃতপক্ষে সেইটাই ছিল চিত্তরঞ্জনের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশের প্রথম বিরাট শঙ্খধ্বনি।

॥ ছয় ॥

আলিপুর মামলার দ্বিতীয় পর্ব হয় হাইকোর্টে।

দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বারীন্দ্র, উল্লাসকর, উপেন্দ্রনাথ প্রমুখ অন্যান্য আসামীদের জন্য যখন হাইকোর্টে আপিল করা হয় তখন সেখানেও দণ্ডিত আসামীদের পক্ষ সমর্থনে দাঁড়িয়ে চিত্তরঞ্জন তেমনি আইনজ্ঞান ও প্রতিভার পরিচয় দিলেন। হাইকোর্টে এই আপিলের মামলার শুনানী হয় ফুলবেঞ্চে। প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স, বিচারপতি কার্ণডফ ও বিচারপতি হ্যারিংটন—এই তিনজনকে নিয়ে ফুলবেঞ্চ গঠিত হয়েছিল। দায়রা জজের বিচারে বারীন্দ্র ও উল্লাসকর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। আপিলের মামলায় তাঁদের সেই দণ্ড মকুব হয় ও তাঁরা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের মকদ্দমা পরিচালনার রীতি দেখে এতদূর মুগ্ধ হন যে, তিনি তাঁর রায়ে আসামী পক্ষের কৌঁসুলি সম্বন্ধে এই মন্তব্যটি লিখেছিলেন যা সচরাচর কোনো রায়ে লেখা হয় না ঃ 'I desire in particular to place on record my high appreciation of the manner in which the case was presented to the Court by its leading advocate Mr. C. R. Das.'

এর পর আর একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক মামলা হলো ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা। এই মামলা আরম্ভ হয় ১৯১০ সালে এবং এর প্রধান আসামী ছিলেন অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিন দাস। চিত্তরঞ্জন পুলিন দাসের পক্ষ সমর্থন করলেন। এই মামলাতেও অভিযুক্ত আসামীর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না, পুলিন দাস সমেত মোট চুয়াল্লিশজনের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা

হয়েছিল, যদিও ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছিল পঞ্চান্নজনের নামে। বাকী এগারজন পলাতক ছিলেন। অনুশীলন সমিতির নামের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য এই মামলাটিও সেদিন বাংলার জনসাধারণের চক্ষে কম গুরুত্ব পায় নি; কারণ ১৯০৫ সাল থেকেই বাঙালী এই সমিতির নামের সঙ্গে পরিচিত ছিল এবং বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে এই সমিতির একটা বিশেষ ভূমিকাও ছিল। চিত্তরঞ্জন এ সবই জানতেন, কারণ তিনি স্বয়ং এই সমিতির জন্মকাল থেকেই এর কার্যকরী কমিটির অন্যতম সভ্য ছিলেন।* কাজেই চিত্তরঞ্জন যে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আসামীদের পক্ষ সমর্থনে এগিয়ে আসবেন, এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। সরকার পক্ষে এই মামলায় ছিলেন ইংরেজ ব্যারিস্টার মিস্টার গার্থ।

১৯০৭ সাল থেকেই বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিদিন নতুন নতুন দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছিল। প্রত্যেক দৃশ্যেই একজন মানুষকে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গিয়েছিল। তিনি ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। এই সময়টায় তাঁর কার্যকলাপের মধ্যে যেন আগামীকালের নেতার আগমনী বেজে উঠেছিল। প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক মামলায় তিনি দাঁড়াতেন আসামী পক্ষ সমর্থন করে। দাঁড়াতেন সব্যসাচীর মতো। দাঁড়াতেন সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে। তখন থেকেই কি ফৌজদারি, কি দেওয়ানী উভয় ক্ষেত্রেই দিগ্বিজয়ী ব্যবহারজীব হিসাবে তাঁর খ্যাতি সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হতে আরম্ভ হয়েছে—তাঁর জীবনের জয়রথ তখন থেকেই সগৌরবে ধাবিত হতে থাকে এবং ১৯২০ সাল পর্যন্ত তাঁর গতি ছিল দুর্বার। ভাগ্যলক্ষ্মী তখন থেকে যেন তাঁর প্রতি প্রসন্ন হলেন। সেই প্রসন্নতার প্রথম নিদর্শন ছিল প্রসিদ্ধ ডুমরাঁও মামলা—যার কথা আমরা পরে বলব। এখন ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার কথাই বলি।

* লেখকের 'বিপ্লবী রাসবিহারী বসু' ও 'বাঘা যতীন' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পুলিন দাস চিত্তরঞ্জনের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। এঁরই প্রচেষ্টায় '১৯০৬ সালের শেষভাগে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সূত্রপাত হয়। ১৯০৭ সালের প্রথম ভাগে সমিতি স্থাপিত হয় এবং সমিতির কার্যাদিও প্রথমে ধীরে আরম্ভ হইয়া ক্রমে দ্রুত-গতিতে বিভিন্ন বিভাগে বিস্তৃতি লাভ করিয়া দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই সমিতির কার্যকলাপ ১৯০৮ সালে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবেই বিচলিত করিয়া তোলে। আমাকেই ইহার মূল কল্পনা করিয়া গভর্ণমেণ্ট আমাকে নির্বাসনে পাঠাইয়া দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার অনুশীলন সমিতিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন।'* ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলার যে নয়জন নেতাকে রেগুলেশন আইনে গ্রেপ্তার করে বাংলার বাইরে বিভিন্ন স্থানে নির্বাসনে পাঠান হয়েছিল তাঁদের মধ্যে পুলিন দাস ছিলেন একজন। তাঁকে পাঞ্জাবের মণ্টগোমারি জেলে আটক রাখা হয়েছিল।

নির্বাসন থেকে মুক্তিলাভ করে কলকাতায় এসে পুলিন দাস যখন ব্যারিস্টার পি. মিত্রের† সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তখন তিনি তাঁর কাছ থেকে জানতে পারেন যে, তাঁকে শীঘ্রই একটি ষড়যন্ত্র মামলায় জড়াবার চক্রান্ত পুলিশ করছে। তারপর ঢাকা আসামাত্রই পুলিশ তাঁকে অস্ত্র আইনে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু তিনি অস্ত্র আইন মকদ্দমা থেকে মুক্ত হন, কারণ পুলিশ ইনস্‌পেক্টার বঙ্কিম চৌধুরীর পক্ষে তাঁকে সনাক্ত করা সম্ভব হয় নি। মুক্তি দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি ওয়ারেণ্টের জোরে পুলিন দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন সমিতির আরো অনেকেই ধৃত হয়েছেন। পুলিন দাস তাঁর আত্মজীবনীতে এই মামলার যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, অনুসন্ধিৎসু পাঠক তা পাঠ করতে পারেন। ঢাকার অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট বেণ্টিঙ্ক সাহেবের

* আত্মজীবনী : পুলিন দাস।

† লেখকের 'বাঘা যতীন' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এজলাসে এই মামলার প্রাথমিক শুনানী আরম্ভ হয়। ব্যারিস্টার পি. মিত্র কলকাতা থেকে এই মামলার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে স্থানীয় উকিল শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট দু' তিনখানা চিঠি লিখেছিলেন ও এর পরিচালনা-দায়িত্বও গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মিত্তির সাহেব সহসা গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অল্পকাল পরেই মারা যান। কথিত আছে, মারা যাওয়ার আগে তিনি চিত্তরঞ্জনকে এই মামলার আসামীদের পক্ষ সমর্থন করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এই মামলা প্রায় সাতমাস কাল চলেছিল। সরকার পক্ষ থেকে প্রথমে একলক্ষ টাকা পারিশ্রমিকে ব্যারিস্টার পি. এন. রায়কে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং ঢাকার তৎকালীন প্রসিদ্ধ সকল উকিলই আসামী পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজ কুট সাহেবের এজলাসে এই মামলার বিচার আরম্ভ হয় এবং তখন কলকাতা থেকে চিত্তরঞ্জন এসে আসামীদের পক্ষ সমর্থন হেতু প্রধান কৌঁসুলি নিযুক্ত হন। তিনি ঢাকায় এসে প্রথমেই জেলে পুলিন দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পুলিন দাস লিখেছেন: 'জেলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সি. আর. দাশ বলিলেন, নূতন ভাইস্‌রয় লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হইয়াছে। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ধৃত ব্যক্তিগণ যদি সাধারণ ভাবে দোষ স্বীকার করে, তবে মাত্র অল্প দুই-চারজনের সামান্য শাস্তি হইবে—অপর সকলকেই মুক্তি দেওয়া হইবে। আনন্দ রায়ও (ইনি তখন ঢাকার সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন) গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আপোষের পক্ষপাতী। এখন আপনার মত কি? আমি বলিলাম যে, যদি দেশের প্রকৃত কল্যাণ হয় এবং আপনারা যদি সিদ্ধান্ত করেন, তবে আমি বিনাবিচারেও যে-কোনরূপ শাস্তি গ্রহণে প্রস্তুত আছি। কিন্তু অন্যান্য উকিলগণ সি. আর. দাশের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ইহার কয়েক দিন পরে কোর্টে সি. আর. দাশ আমাকে

জানাইলেন যে, গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আপোষের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে।'*

১৯১১, ২২শে মে। চিত্তরঞ্জন সেসনস্ কোর্টে তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। এই মকদ্দমাতেও ব্যারিস্টার হিসাবে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। এখানে বিশেষভাবে একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করব। ১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ যখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন এর প্রতিবাদে সারা দেশে যে আন্দোলন হয় ইতিহাসে তাকেই বলা হয়েছে স্বদেশী আন্দোলন। তখন বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে নেতৃত্বের রাজদণ্ড পরিচালনা করছেন বাংলার মুকুটহীন সম্রাট, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ। সেই সময়ে ব্যারিস্টার পি. মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ঢাকায় এসে বেশ গরম গরম বক্তৃতা করেন এবং জনসাধারণকে দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে উৎসাহিত করেন। এইসব নেতাদের বক্তৃতার ফল ফলতে দেরি হয় নি। এরই ফলে পূর্ববঙ্গে কিছু সংখ্যক জাতীয় বিদ্যালয় ও অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র ও পি. মিত্রের সেই সব বক্তৃতার সঙ্গে এই মকদ্দমার সংস্রব স্থাপনের উদ্দেশ্যে সেসনস্ কোর্টে সরকার পক্ষের ব্যারিস্টার যে বক্তৃতা দেন, তার উত্তরে আসামী পক্ষের প্রধান কৌঁসুলি চিত্তরঞ্জন যা বলেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। উত্তরকালে রাষ্ট্রগুরুর বিরুদ্ধে দেশবন্ধুর বিদ্বেষ প্রমাণ করবার জন্য তাঁর বিপক্ষীয়গণ বিশেষ প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা যদি ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় চিত্তরঞ্জনের এই বক্তৃতা পাঠ করতেন তাহলে তাঁরা বুঝতে পারতেন সুরেন্দ্রনাথ বা বিপিনচন্দ্রের সম্বন্ধে দেশবন্ধু কি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। এখানে তাঁর সেই বক্তৃতার (যা তিনি আদালতে দাঁড়িয়ে এসেসরদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন) কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি:

'ভদ্রমহোদয়গণ, এই মামলায় সরকার পক্ষ থেকে যে-সব প্রমাণ

* আত্মজীবনী: পুলিন দাস

উপস্থাপিত করা হয়েছে, এইবার আমি সে বিষয়ে আলোচনা করব। কিন্তু তৎপূর্বে এই মামলার বহির্ভূত কয়েকটি বিষয় যা সরকার পক্ষের কৌঁসুলি উল্লেখ করেছেন—সেই বিষয়ে কিছু বলবার জন্য আমি আপনাদের অনুমতি চাইছি। প্রথমেই আমি বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নির্বিচারে আনীত অভিযোগের কথাটা উত্থাপন করছি। এই অভিযোগটি সর্বপ্রথম সেই ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে উঠেছিল যিনি মামলাটি দায়রা সোর্পদ করেন এবং যখন আমি জানলাম যে আমার বন্ধু মিস্টার গার্থ সরকার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন তখন আমি খুবই আশা করেছিলাম যে, এই কোর্টে সেই ভিত্তিহীন অভিযোগটি পরিত্যক্ত হবে। কিন্তু আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে আমার বন্ধু যখন সেই একই অভিযোগ উত্থাপন করলেন, তখন আমি যারপরনাই দুঃখিত ও বিস্মিত হয়েছিলাম। তখনি আমি এই প্রসঙ্গে তাঁকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হয়েছিলাম যে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ষড়যন্ত্রকারী—এইটাই কি সরকারের আনীত মামলা? উত্তরে আমাকে বলা হয়েছিল, হ্যাঁ, এইটাই সরকারের আনীত মামলা। ভদ্রমহোদয়গণ, এর অর্থ কি? এই প্রদেশের জনকতক সরকারী কর্মচারীর মনে যে ক্ষীণ সন্দেহ উঁকি মারছে, ইহা কি তাই-ই অথবা সরকার পক্ষের কৌঁসুলি যখন বলেন যে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ষড়যন্ত্রকারী তখন মামলাটি কি এই ইঙ্গিতই বহন করে না যে, কতকগুলি কারণকে ভিত্তি করেই এই বিশ্বাস খাড়া করা হয়েছে।

আদালত: আমার মনে হয় না, তিনি ঠিক এই কথা বলেছেন।

চিত্তরঞ্জন: মিস্টার গার্থ ঠিক এই কথাই বলেছেন।

আদালত: বাবু সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে সমালোচনাটি পাঠ করা হয়েছে। আমার তো মনে হয় না যে, তিনি একজন ষড়যন্ত্রকারী এমন কথা কেউ বলেছেন।

চিত্তরঞ্জন : তবে কিসের সম্পর্কে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে ?

আদালত : সমালোচনাটি সম্ভবতঃ তাঁর একটি বক্তৃতা সম্পর্কে যার বিষয়বস্তু ছিল শিখের বলিদান।

চিত্তরঞ্জন : হ্যাঁ, ইহা কেবলমাত্র সমালোচনা নয়—মিস্টার গার্থ এজন্য সরাসরি সুরেন্দ্রনাথের নিন্দা করেছেন।

আদালত : তিনি তো বলেন নি যে তিনি একজন ষড়যন্ত্রকারী।

চিত্তরঞ্জন : তাঁর ভাষণের উপসংহারে মিস্টার গার্থ নির্লজ্জ-ভাবেই এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন যাঁর নাম সমগ্র দেশে সুপরিচিত, যে নাম সর্বজন সম্মানিত। যিনি এই দেশের সর্বসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র ('idol of the people of the country.')। কেন সেই সর্বজনবরেণ্য ব্যক্তির নাম এই জাতীয় মামলার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হবে? যদি তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকে তবে তাঁর বিচার করা হোক, নতুবা শিখের বলিদান তিনি কি বলেছেন, সে প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হবে কেন?'

এই মামলা চলবার সময়ে বিপিনচন্দ্র বিলাতে ছিলেন ও পি. মিত্র তখন মারা গিয়েছেন। গার্থের ভাষণে তাঁকেও একজন ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। মিত্তির সাহেব তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর বক্তৃতায় এর সম্পর্কেও চিত্তরঞ্জন দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন : 'I will not allow the name of a departed member of the Bar to be aspersed in this way.' এইভাবে তিনি তাঁর বক্তৃতায় বিশেষভাবেই দেখিয়েছিলেন যে, পুলিশের পক্ষ থেকে সমগ্র মামলা-গুলি এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে যে, বোধগম্য হওয়া কঠিন। ১৩ই জুনের বক্তৃতায় তিনি দেখালেন : 'এই ষড়যন্ত্রের মামলায় ষড়যন্ত্রের চিহ্নমাত্র নেই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ধর্মতত্ত্বে শরীরচর্চার যে

উচ্চস্থান দিয়ে গেছেন, আত্মনির্ভরতার যে উপকারিতা দেখিয়েছেন, তাই-ই কার্যক্ষেত্রে সফল করবার জন্য পুলিনের এই অনুশীলন সমিতির সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই রাজদ্রোহ করবার জন্য বই লেখেন নি—পুলিনও রাজদ্রোহ উদ্দেশ্যে সমিতি স্থাপন করে নি। বঙ্কিম-চন্দ্রের যে বাণী বইয়ের পৃষ্ঠায় আবদ্ধ ছিল, পুলিন তাকেই কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেয়েছিল। ইহা যদি অপরাধ হয়, তবে পুলিন এই অপরাধে অপরাধী।'

এমন যুক্তিসমাকীর্ণ, এমন ওজস্বিতাপূর্ণ এবং জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা আদালতে দাঁড়িয়ে চিত্তরঞ্জন আর কখনো বলেন নি। এর থেকে লক্ষ্য করা যাবে যে সেদিন এই রকম এক-একটি রাজনৈতিক মামলা পরিচালনা কালে ধাপে ধাপে তাঁর মধ্যে সকলের অগোচরে জাগরণের প্রক্রিয়াটা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ২২শে মে থেকে ১৬ই জুন একাদিক্রমে এই পঁচিশদিন বক্তৃতার ফলে চুয়াল্লিশজন আসামীর মধ্যে আটজন মুক্তিলাভ করে ও ছত্রিশজনের শাস্তি হয়। পুলিন দাস যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। এই মামলা চলবার সময়ে প্রতিদিনই সন্ধ্যায় চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে আসামী পক্ষের উকিলদের আলোচনা-সভা বসত। এই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চে আপিল করা হয়। বিচারপতি হ্যারিংটন, বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখার্জি ও বিচারপতি ক্যাম্পারকে নিয়ে এই ফুলবেঞ্চ গঠিত হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, বিচারপতি আশুতোষের প্রভাবে হাইকোর্ট থেকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, হাইকোর্টের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার দণ্ডিত আসামীদের বিচারাধীন আসামীর পর্যায়েই রাখতে হবে। এখানেও আসামীদের পক্ষ সমর্থন করলেন চিত্তরঞ্জন। এখানেও তিনি তাঁর প্রতিভা, আইনজ্ঞান ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির সম্যক পরিচয় দিলেন এবং তার ফলে অনেকের দণ্ডের লাঘব হয়। পুলিন দাসের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের পরিবর্তে সাত বছরের দ্বীপান্তর হয়। আপিলে একুশজন মুক্তি-

লাভ করেছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আপিলের মকদ্দমা উপলক্ষে বিভিন্ন সাক্ষীদের কাছ থেকে প্রসঙ্গক্রমে অনুশীলন সমিতির কার্যক্রমের বর্ণনাদি শুনে বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখার্জী আদালত-গৃহেই বলেছিলেন: 'Then Pulin must be a laudable man'—পুলিন তবে অবশ্যই শ্লাঘনীয় ব্যক্তি। হাইকোর্টে প্রায় ছয়মাস কাল এই মামলা চলেছিল এবং রায় প্রদান করতে আরো দু'মাস দেরি হয়। এই সময়ে দিল্লীর দরবার শেষ করে সম্রাট পঞ্চম জর্জ কলকাতায় আসেন ও বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন।

এইবার কুতুবদিয়া রাজবন্দী মামলার কথা বলি।

বাংলার বুকে তখন উঠেছিল বিপ্লবের আগুন। সে আগুনের লেলিহান শিখা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল দিকে দিকে—আকাশে-বাতাসে তখন শোনা যেত শুধু অগ্নিবীণার ঝঙ্কার—দেশজননীর চরণের শৃঙ্খল মোচনের জন্য দুর্জয় সাহসে যেন বাংলার তরুণদের জীবনে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম শিখের বলিদানের সেই গৌরবমণ্ডিত ইতিহাস, যে ইতিহাস বাঙালী প্রথমে শুনেছিল রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের কম্বুকণ্ঠে—তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে। সেই আগ্নেয় পরিবেশে যখন একটার পর একটা রাজনৈতিক মামলা সরকার নিয়ে আসতে লাগলেন, তখন একা চিত্তরঞ্জন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আসামীদের পক্ষ সমর্থন করতে থাকেন। 'সন্ধ্যা,' 'যুগান্তর,' 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার মামলা ও তারপরে আলিপুর বোমার মামলা —এর প্রত্যেকটি ছিল সেদিনের অগ্নিগর্ভ বাংলার পরিচায়ক, নতুন রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালীর একটা বিচিত্র মানসিকতার অভিব্যক্তি। চিত্তরঞ্জন যে তাঁর হৃদয়-মন দিয়ে এই নবজাগৃতি অনুভব করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই এবং এইসব মামলায় আসামীদের পক্ষ সমর্থনে দাঁড়িয়ে শুধু যে নিজের আইনজ্ঞানের

পরিচয় দিয়েছিলেন তা নয়, আদালতে দাঁড়িয়ে তিনি যে-সব ভাষণ দিতেন, সওয়াল করতেন তার ভিতর দিয়ে তিনি সেই নবজাগৃতিরই এক নিপুণ ভাষ্য রচনা করে চলেছিলেন। সেদিন এর প্রয়োজন ছিল। প্রত্যেকটি মামলার তিনি দেশপ্রেমের আদর্শটাকে—যেভাবেই তা অভিব্যক্ত হোক না কেন—দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এইভাবেই তিনি সেদিন 'National lawyer' বলে অভিহিত হওয়ার দুর্লভ গৌরব লাভ করেছিলেন।

কুতুবদিয়া মামলাটি ছিল স্বতন্ত্র ধরনের। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারত-রক্ষা আইনে সতেরোজন রাজবন্দীকে অন্তরীণাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল চট্টগ্রামের সর্পসঙ্কুল কুতুবদিয়া নামক একটি গ্রামে। সাপের ভয়ে ও অন্যান্য কারণে তারা সেখান থেকে পলায়ন করে চট্টগ্রাম শহরে চলে আসতে বাধ্য হয়। সরকার তাদের বিরুদ্ধে মামলা আনলেন। চিত্তরঞ্জন শুধু যে বিনা পারিশ্রমিকে তাদের পক্ষ সমর্থন করেন তা নয়, তিনি নিজ অর্থব্যয়ে নানাভাবে এদের সহায়তাও করেছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি একপক্ষ কাল চট্টগ্রামে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর সওয়াল-জবাবে তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন যে, রাজবন্দীরা পলাতক নয়, তারা চট্টগ্রামের জিলা শাসকের কাছে খাদ্য, পানীয় জল ও অবস্থানের অসুবিধা সম্পর্কে তাদের বৈধ অভিযোগ জানাতে গিয়েছিল। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে আইন অমান্য করা বা আইনগত নির্দেশ অমান্য করার কোন অভিযোগই আনা যেতে পারে না। চট্টগ্রামের দায়রা জজের এজলাসে এই মামলার বিচার হয় এবং চিত্তরঞ্জনের যুক্তিপূর্ণ সওয়াল সত্ত্বেও জজ আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করেন। কিন্তু দণ্ডদান সম্পর্কে তিনি কঠোরতা প্রদর্শন করেন নি—মাত্র দুইমাস করে প্রত্যেকের কারাদণ্ড হয়। জয়লাভ না করলেও, তাঁর এক জীবনীকারের মতে এই মামলাতেও চিত্তরঞ্জন 'অসীম জ্ঞানবত্তা, বিচারবত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও দয়াবত্তার' পরিচয় দিয়েছিলেন।

ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার পর চিত্তরঞ্জনকে আমরা দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের পক্ষ সমর্থন করতে দেখতে পাই। এই রাজনৈতিক মামলাটিও সেদিন সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৯১২ সালে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা ফেলা হয়।* চৌদ্দজন ব্যক্তি এই মামলায় অভিযুক্ত হয়। তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, সরকারের উচ্ছেদ সাধন ও বড়লাটের জীবন-নাশের চেষ্টা—এইসব অভিযোগ আনা হয়েছিল। দিল্লীর দায়রা জজ মিস্টার হ্যারিসনের এজলাসে এই মামলার বিচার হয়েছিল। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন সংযুক্ত-প্রদেশের (বর্তমান নাম উত্তর-প্রদেশ) এ্যাডভোকেট-জেনারেল স্যার জন এ্যালস্টন। আসামীদের পক্ষ সমর্থনে প্রথমে যে-সব স্থানীয় উকিল দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের কেউই স্যার জনের সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁদেরই কয়েকজন কলকাতায় এসে চিত্তরঞ্জনকে এই মামলাটি গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। তখন এখানে তাঁর হাতে অনেকগুলি মকদ্দমা। তিনি দেখলেন মাত্র দু'দিনের জন্যও দিল্লী গেলে কমপক্ষে তাঁর ছয় হাজার টাকা লোকসান হবে। আবার অন্যদিকে তিনি তাঁর অন্তরের মধ্যে এই মামলায় অভিযুক্ত বিপ্লবী তরুণদের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য তাগিদ অনুভব করলেন। তখনি নিজের আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও তিনি এই মামলা গ্রহণে সম্মত হন। এই মামলার প্রাথমিক তদন্তের জন্যই পুলিশের লেগেছিল পুরো একটি বছর। ১৯১৪ সালের মে মাসে চিত্তরঞ্জন দিল্লী কোর্টে উপস্থিত হয়ে প্রথমেই প্রশ্ন তুললেন—এই ষড়যন্ত্র মামলা আইনানুগ কিনা এবং এই মামলায় উত্থাপিত প্রমাণগুলি যথার্থ কিনা। এতেই মামলার মোড় ঘুরে যায়, বিচারক চিত্তরঞ্জনের যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁকে চ্যালেঞ্জ করলেন স্যার জন। এমন কি তিনি এক সময়ে চিত্তরঞ্জনের কোন

* লেখকের 'বিপ্লবী রাসবিহারী বসু' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

একটি যুক্তিকে অসত্য বলে উল্লেখ করেন। শ্বেতাঙ্গ এ্যাডভোকেট-জেনারেল জানতেন না যে তিনি কার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। নর্টন ও গার্থের মতো ধুরন্ধর ব্যবহারজীবিগণ যাঁর বাক্‌পটুতার কাছে নাজেহাল হয়েছেন, স্যার জন তো তাঁর কাছে নগণ্য। চিত্তরঞ্জন তখন এমন কঠিন ভাষায় এ্যাডভোকেট-জেনারেলের কথার প্রতিবাদ করলেন যে, তা শুনে বিচারকও যারপরনাই বিস্মিত হন এবং তিনি চিত্তরঞ্জনকে স্যার জনের নিকট ক্ষমা চাইতে বলেন।

—There is no occasion for apology and I am not prepared to offer one.—বললেন চিত্তরঞ্জন। তাঁর এই দৃপ্তভঙ্গী দেখে বিচারকের মতিগতির পরিবর্তন হয় ও অতঃপর তিনি দুই পক্ষের কৌঁসুলিদের সঙ্গে সমান ব্যবহার প্রদর্শন করেন।

অমৃতবাজার পত্রিকার মামলাটিও উল্লেখযোগ্য। ১৯১৮ সালে কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের ক্ষমতা সম্পর্কে হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চের একটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় লেখা হয়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ল্যান্সলট সাণ্ডার্সন উক্ত পত্রিকার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ নিয়ে আসেন। তখন ঐ কাগজের পক্ষ সমর্থনে তৎকালীন প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবীরা নিযুক্ত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন জ্যাকসন, নর্টন, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি। কিন্তু এঁরা যখন হালে পানি পেলেন না, তখন মতিলাল ঘোষের অনুরোধে চিত্তরঞ্জন আসামীর পক্ষ সমর্থন করেন* এবং তাঁর আইনের কূটতর্কে মামলার চেহারা পালটিয়ে যায়—তিনি জয়লাভ করেন।

দেওয়ানি মামলায় তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন চিত্তরঞ্জন সুবিখ্যাত ডুমরাঁও মামলায়। ভারতবর্ষে দেওয়ানি মামলার ইতিহাসে এমন জটিল আর দীর্ঘকাল স্থায়ী মামলা খুব কমই দেখা

* *Memoirs of Motilal Ghosh* : P. Datta

গিয়েছে। সেদিন এই মামলাটি আইনজ্ঞ মহলে বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল। এই মামলাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইঃ ডুমরাঁও বিহারের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। এই রাজ্যের মহারাজা স্যার রাধাপ্রসাদ সিংহ অপুত্রক অবস্থায় মারা যাওয়ার পর গদির উত্তরাধিকারী নিয়ে গোলমাল বাধে। রাধাপ্রসাদের প্রথমা কন্যার বিয়ে হয় মান্দারের রাজার সঙ্গে এবং তিনিও বিয়ের অল্পকাল পরে অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। রাধাপ্রসাদের দ্বিতীয়া কন্যার বিয়ে হয় রেওয়ার রাজার সঙ্গে। ১৮৮৯ সালের মার্চ মাসে মহারাজা একটি দলিল সম্পাদন করেন; ঐ দলিলে তিনি এই মর্মে নির্দেশ রেখে যান যে, তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রী বক্সার, জগদীশপুর অথবা ডুমরাঁওর উজ্জয়িনী পরিবার থেকে একটি পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করতে পারবেন। দলিলটি কলকাতায় রেজিষ্ট্রি করা হয়। এক বছর পরে মহারাজা যখন উইল সম্পাদন করেন তাতে তিনি তাঁর পূর্ব দলিলে দত্তক গ্রহণের বিষয়টি পুনরায় উল্লেখ করেন। ১৮৯৪ সালে মহারাজার মৃত্যু হয় এবং তাঁর স্ত্রী মহারানী বেণীপ্রসাদ কোয়েরি মৃত্যুর ঠিক একদিন পূর্বে, ১৯০৭, ১২ই ডিসেম্বর তারিখে জগদীশপুরের জয়প্রসাদ সিংহের নাবালক পুত্র জংবাহাদুর সিংহকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। এইভাবেই জংবাহাদুর ডুমরাঁওর গদির ভাবী উত্তরাধিকারী হন ও তখন তাঁর নাম রাখা হয় মহারাজকুমার শ্রীনিবাসপ্রসাদ সিংহ। মহারানীর মৃত্যুর পরে ডুমরাঁও এস্টেট কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্-এর অধীনে আসে।

বাবু কেসোপ্রসাদ সিংহ ছিলেন ঐ বংশজাত এবং পরলোকগত মহারাজার নিকটতম আত্মীয়। যে-কোন কারণেই হোক, কেসো-প্রসাদ মহারানীর বিষনজরে পড়েন। মহারানী বরাবর তাঁর এস্টেট তাঁর দ্বিতীয় কন্যা, রেওয়ার রানীকে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন; মহারাজা কিন্তু রানীর এই ইচ্ছা কখনো অনুমোদন করেন নি, কারণ তাহলে তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তি একটি সম্পূর্ণ

ভিন্ন বংশে চলে যাবে। প্রথমে কেসোপ্রসাদকে দত্তক নেওয়ার ইচ্ছা করে তিনি সেই মর্মে কেসোপ্রসাদের পিতা বাবু রাজেশ্বরীপ্রসাদের কাছে প্রস্তাবও করেছিলেন, কিন্তু রাজেশ্বরীপ্রসাদ মহারাজার প্রস্তাবে সম্মত হন নি। অতঃপর মহারানী গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হন ও তখন তাঁর এস্টেটের ম্যানেজার ও তাঁর জামাতা, মানদারের রাজার সহায়তায় জংবাহাত্বরকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। মহারানীর মৃত্যুর পরে কেসোপ্রসাদ এই দত্তক গ্রহণ অবৈধ—এই মর্মে একটি মামলা আনেন। তিনি বহু আইনজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সকলেই তাঁকে বলেছিলেন যে, এ মামলায় জয়লাভের কোন আশা নেই। তিনি তখন তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য মাসিক দশহাজার টাকা পারিশ্রমিকে চিত্তরঞ্জনকে নিযুক্ত করেন। অপর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন কলকাতার প্রখ্যাত ইংরেজ ব্যারিস্টার মিস্টার গার্থ ও পাটনার খ্যাতনামা ব্যবহারজীব হাসান ইমাম। (শেষোক্ত ব্যক্তি পরবর্তীকালে কংগ্রেসে দেশবন্ধুর সঙ্গে একত্রে কাজ করেছিলেন।) চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে শর্ত্ত হয়েছিল যে, এই মামলায় জয়লাভ করতে পারলে তাঁর মক্কেল তাঁকে এমন একটি জমিদারি লিখে দেবেন যার বার্ষিক আয় পঞ্চাশ হাজার টাকা; বলা বাহুল্য, কেসোপ্রসাদ এতে সম্মত হয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন এই মামলায় জয়লাভ করেছিলেন, এক পথের ভিখারীকে রাজ-গদিতে বসিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মক্কেল প্রতিশ্রুতি পালন করে নি। ডুমরাঁওর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মামলাতেও চিত্তরঞ্জন কেসোপ্রসাদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু তৃতীয় মামলার আপিলের শুনানী যখন পাটনা হাইকোর্টে আরম্ভ হয় তখন চিত্তরঞ্জন কেসোপ্রসাদের পক্ষে আর দাঁড়াতে পারেন নি, কারণ তখন তিনি অসহযোগ-মন্ত্র গ্রহণ করে চিরকালের মতো প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দিয়েছেন। কথিত আছে, কেসোপ্রসাদ এই সময়ে চিত্তরঞ্জনকে আরো অধিক পারিশ্রমিক দিতে চেয়েছিলেন

শুধু আপিলের মামলায় দাঁড়াবার জন্য। চিত্তরঞ্জন তাতে সম্মত হন নি। তখন তাঁরই পরামর্শক্রমে স্যার আশুতোষ মুখার্জী ডুমরাঁওর রাজার এই আপিলের মামলা গ্রহণ করেন।

শীর্ষতম আইন-ব্যবসায়ী হিসাবে কলকাতা হাইকোর্টে যখন চিত্তরঞ্জনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, ব্যারিস্টার হিসাবে কি ফৌজদারি, কি দেওয়ানি উভয় ক্ষেত্রেই যখন তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে একমেবাদ্বিতীয়ম্ বলে স্বীকৃত হয়েছেন, তখনকার আর একটি মামলার বিবরণ উল্লেখ করে আমরা এই আলোচনা শেষ করব। প্রখ্যাত এ্যাটর্ণি শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত লিখেছেন: 'আমি তখন একজন জুনিয়র এ্যাটর্ণি; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তখন কলকাতা বারের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার। সেই সময়ে আমার এক মারোয়াড়ী মক্কেলের পক্ষে আমি মিস্টার দাশকে নিযুক্ত করি। আবেদনের মামলাটি ছিল বিচারপতি ফ্লেচারের নিজস্ব কক্ষে, প্রকাশ্য আদালতে নয়। স্যার বিনোদ মিত্র দাঁড়িয়েছিলেন অপর পক্ষে। আইনজ্ঞ হিসাবে তিনিও একজন দিকপাল ছিলেন। বিচারপতি দু'-তিন মিনিটের মধ্যেই আবেদনটি সম্পর্কে তাঁর রায় দিলেন এবং তারই মধ্যে স্যার বিনোদ ভারতীয় ও ব্রিটিশ আদালতের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছিলেন। রায় কিন্তু আমার মক্কেলের অনুকূলে প্রদত্ত হয় নি। তখন আমি আমার মক্কেলকে সঙ্গে নিয়ে আমার অফিসে এলাম। মামলায় হেরে যাওয়ায় সে আমাকে দোষারোপ করতে লাগল। তার ক্ষোভের বিশেষ কারণ যে, তার এই মামলায় আমি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবকে নিযুক্ত করেছিলাম। বেলা তিনটার সময়ে মিস্টার দাসের কেরানী আমার অফিসে এসে উপস্থিত। তিনি আমাকে বললেন যে, তাঁর চেম্বারে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য মিস্টার দাশ ডেকে পাঠিয়েছেন। মিস্টার দাশের চেম্বারে প্রবেশ করামাত্রই তিনি আমাকে এমন কয়েকটি কথা বললেন যা আমার স্মৃতিপটে আজো জ্বল্‌জ্বল্ করছে। বললেন, আমারই গাফিলতির

জন্যে তোমার মক্কেলের হার হয়েছে, ঘোষই (খ্যাতনামা ব্যারিস্টার বি. কে. ঘোষ; ইনি তখন বারের একজন জুনিয়র মেম্বর ছিলেন) এটা আমার দৃষ্টিতে নিয়ে এসেছে। সত্যিই আমি খুব মনোযোগের সঙ্গে ব্রীফটা দেখি নি। তখন তিনি আমাকে বিচারপতি ফ্লেচারের রায়ের ভিত্তিতে পুনরায় আপিল করার জন্য পরামর্শ দিলেন, নিজেই আপিলের মুসাবিদা করে দিলেন এবং বললেন যে, আপিলের শুনানীর সময়ে তিনি আমার মক্কেলের পক্ষে বিনা পারিশ্রমিকেই দাঁড়াবেন। আমার পঞ্চাশ বছরের এ্যাটর্ণি-জীবনে আমি এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখি নি যেখানে একটি মামলা পরিচালনার ব্যাপারে একজন কৌঁসুলি তাঁর গাফিলতি স্বীকার করেছেন। সাধারণতঃ মামলায় মক্কেলদের হার হলে তাঁরা বলে থাকেন, এ্যাটর্ণির দোষেই হার হয়েছে, অথবা বিচার-পতি কৌঁসুলির সওয়াল অনুধাবন করতে পারেন নি বলে হার হয়েছে। মিস্টার দাশ কিন্তু নিজের গাফিলতি স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নি। মানুষটির হৃদয়ের উদারতার এর চেয়ে আর কোন দৃষ্টান্ত হতে পারে না। সম্ভবতঃ এই গুণেই পরবর্তীকালে তিনি 'দেশবন্ধু' আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন। আপিলের শুনানীর দিন যখন ধার্য হয় তখন ডুমরাঁও রাজার মামলার জন্য তাঁর পক্ষে কলকাতায় থাকা সম্ভব হয় নি। কলকাতা ত্যাগের পূর্বে তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন এস. আর. দাশকে (সিনিয়র) নিযুক্ত করি এবং আরো বললেন যে, তাঁর পারিশ্রমিক যা লাগবে সেটা তিনিই বহন করবেন। এইবার আমার মক্কেলের জয়লাভ হয়েছিল।'*

মক্কেলের টাকা নিয়ে কাজ করতে অসমর্থ হলে টাকাটা মক্কেলকে ফিরিয়ে দেন এমন আইনজীবী খুব কমই দেখা যায়। চিত্তরঞ্জন কিন্তু এর ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি টাকা ফিরিয়ে দিতেন। আবার এমনও দেখা গিয়েছে যে, চারদিনের ফি নিয়েছেন,

* *Remi riscences of an Octogenerarian Lawyer* : **S. M. Dutt** (প্রেসিডেন্সি কলেজের ১৯৬৫ সালের 'Autumn Annual' পত্রিকা)।

তিনদিনে সওয়াল-জবাব হয়ে গেছে, মক্কেল মকদ্দমা জিতে আনন্দে চলে গেছে, চিত্তরঞ্জনকে চারদিন কাজ করতে হয় নি বলে, মক্কেলকে তিনি একদিনের টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন। বস্তুতঃ ব্যরিস্টার চিত্তরঞ্জন সম্পর্কেই একখানা স্বতন্ত্র বই লেখা যেতে পারে, কারণ বিশবছর কাল যাবৎ কলকাতায় ও কলকাতার বাইরে ফৌজদারি ও দেওয়ানি উভয় ক্ষেত্রেই বহু ও বিচিত্র রকমের অসংখ্য মামলায় দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি যে তাঁর সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে আইন-ব্যবসায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন এর কারণ শুধু তাঁর প্রতিভা বা বাক্‌পটুতা নয়, তদতিরিক্ত কিছু। আইনজ্ঞান অনেকেরই থাকে, আইনের নজির অনেকেই উপস্থাপিত করতে পারেন, চিত্তরঞ্জনেরও তীক্ষ্ণ আইনজ্ঞান ছিল, তিনিও আদালতে দাঁড়িয়ে যে-কোন মামলায় অবলীলাক্রমে একের পর এক আইনের নজির উল্লেখ করতে পারতেন। কিন্তু সেই সঙ্গে স্বীয় ব্যক্তিত্ব প্রভাবে তিনি আরো একটি জিনিস পারতেন—বিশ্লেষণ-সমৃদ্ধ সওয়ালের মুখে তিনি আদালত-কক্ষে চমকপ্রদ effect সৃষ্টি করতে পারতেন। এই শক্তিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁর আরো একটি বৈশিষ্ট্য ছিল; তিনি কোন বিচারকের অনুগ্রহপ্রার্থী হতেন না। এইসব বিবিধ গুণের জন্য আইন-ব্যবসায়ে তাঁর যশ-সৌরভ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এমন কি পাঞ্জাব তদন্ত কমিটির অন্যতম সদস্য হিসাবে তিনি যে অসাধারণ আইনজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন তা দেখে স্বয়ং গান্ধী পর্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ ব্যারিস্টার নর্টন পরবর্তীকালে তাঁর সতীর্থ সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন সেটি এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি লিখেছেন: 'Mr. C. R. Das always enjoyed a position of esteem among his colleagues. His was a household name as an eminent defence counsel. Among Indian lawyers he more than anyone else excelled

in political cases. His defence of Aurobindo Ghose in the Alipur Bomb case established him in the front rank of national lawyers. His concluding address took nine days, and his peroration will rank among the classics of forensic eloquence. But one cannot help asking oneself what would have been Aurobindo's fate if there had been no C. R. Das to work free for him.' নর্টনের এই অভিমত প্রাণিধানযোগ্য।

ব্যারিস্টার হিসাবে চিত্তরঞ্জন যে অসামান্য সফলতা লাভ করেছিলেন তার অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথম তাঁর বাগ্মিতা ও স্মরণশক্তি; দ্বিতীয় তাঁর কণ্ঠস্বর। একজন প্রধান আইনজীবীর মুখে শুনেছি যে, দাশ-সাহেব আদালতে দাঁড়িয়ে যখন সওয়াল-জবাব করতেন, তখন শ্রোতাদের মনে হতো তিনি বুঝি মিছরি সরবৎ খেয়ে কথা বলছেন—এমনি সুমধুর ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। মিষ্টতার সঙ্গে ছিল প্রত্যয়। তৃতীয়তঃ—অন্তর্দৃষ্টি ও সততা। অন্যান্য ব্যবহারজীবীদের চক্ষে যা না পড়ত, চিত্তরঞ্জনের দৃষ্টিতে তা আগেই পড়ত। অন্যে যে মকদ্দমায় কিছু খুঁজে পেত না, চিত্তরঞ্জন তা থেকে অপূর্ব রহস্য আবিষ্কার করতেন। ব্যারিস্টার বি. কে. লাহিড়ীর মুখে শুনেছি, চিত্তরঞ্জন যখনি কোন মকদ্দমা গ্রহণ করতেন তার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতেন; এ্যাটর্ণি ব্রীফ পাঠালে সেটি তন্ন তন্ন করে পাঠ করতেন এবং জুনিয়রকে ডেকে বলতেন, এর মধ্যে defence-এর কি কি সূত্র পাওয়া যায়, খুঁজে দেখ। পারিশ্রমিকের পরিমাণের দিকে না তাকিয়ে তিনি গৃহীত মকদ্দমা সম্বন্ধে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। আইন-ব্যবসায়ে তাঁর সাফল্যের মূলে আরো একটি জিনিস ছিল—সেটি তাঁর সাহিত্য-জ্ঞান। তাঁর প্রত্যেকটি সওয়ালের ভাষা তাই অপরূপ সাহিত্যমণ্ডিত হয়ে উঠত। তাঁর বক্তৃতার মধ্যে কৃত্রিমতার লেশমাত্র থাকত না। কলেজে ও ছাত্রসভায় বিতর্কে

তিনি ছিলেন অপরাজেয়; তারই পরিণতি দেখা গেল উত্তরকালে ব্যবসায়ক্ষেত্রে ও রাজনৈতিক মঞ্চে। প্রতিপক্ষকে সমুচিত জবাব দিয়ে নিরস্ত করতে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না। নোয়াখালিতে এক মকদ্দমায় ম্যাজিস্ট্রেট কারগিল সাহেব যখন চিত্তরঞ্জনের জেরার মুখে নাজেহাল হয়ে ক্রুদ্ধস্বরে তাঁকে 'বাবু' বলে সম্বোধন করেন, তখন সমস্ত আদালতগৃহ প্রকম্পিত করে তিনি গর্জন করে বলে উঠেছিলেন: Mr. Cargil, you must not go out of the bounds of courtesy and behave accordingly.'

এই দুর্লভ সাহস আর ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনকে এনে দিয়েছিল খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও সম্পদ। তাঁর সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের আইন-জগতে সত্যিই তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

॥ সাত ॥

চিত্তরঞ্জন যেমন ধাপে ধাপে আইন-ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে লাগলেন, কমলা তেমনি প্রসন্ন হয়ে তাঁর সোনার পদ্মের আসনখানি পাতলেন ১৪৮ নম্বর রসা রোডের বাড়িতে। সেই সঙ্গে বীণাপাণিরও চরণপদ্ম পড়ল সেখানে। কর্মব্যস্ত জীবনের অবসরে তিনি সাহিত্য ও কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন এবং এক্ষেত্রেও তিনি তাঁর নিষ্ঠা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। আইন তাঁর পেশা ছিল, সাহিত্য ছিল তাঁর প্রাণ। এই সাহিত্য ও কাব্যসাধনার ভিতর দিয়ে চিত্তরঞ্জনের মানসিকতার বিকাশ ও পরিণতির কথা আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করব। কিন্তু তৎপূর্বে চিত্তরঞ্জনের কর্মজীবনের এই স্বর্ণযুগে তাঁর পিতৃঋণ পরিশোধের সেই আশ্চর্য কাহিনীটি উল্লেখ করতে হয়।

আগেই বলেছি, পিতার ঋণের বোঝা মাথায় নিয়েই চিত্তরঞ্জন প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করেন। পসার জমতে সময়ও তাঁর কম লাগে নি। কতদিনে তিনি তাঁর পিতাকে এই ঋণভার থেকে মুক্ত করতে পারবেন —এই ছিল তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের সর্বক্ষণের চিন্তা। তিনি প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করেন ১৮৯৪ সনে—সেই সময়ে এবং তার পরেও কয়েক বছর যাবৎ উপার্জনের স্বল্পতা হেতু তাঁকে কতদিন হাইকোর্ট থেকে পদব্রজে ভবানীপুর আসতে হতো। তখনো তাঁর গাড়ি হয় নি, ট্রামের পয়সাও সব সময় থাকত না। এই অর্থের জন্যই তো তিনি অনেককাল যাবৎ স্থায়ীভাবে হাইকোর্টে বসতেই পারেন নি—সামান্য টাকার জন্য তাঁকে মফঃস্বলে ছুটতে হতো। ১৯১৩ সালে যখন তিনি আইন-ব্যবসায়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেন, তখন থেকেই তিনি তাঁর পিতার ঋণ পরিশোধ করে দেউলিয়া আদালত থেকে মুক্ত হওয়ার কথা

বিশেষভাবেই চিন্তা করতে থাকেন। এই বছরের মে মাসে তিনি সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দেউলিয়া নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন। তাঁর পক্ষ থেকে মিস্টার এস. পি. সিংহ (পরে লর্ড সিংহ) হাইকোর্টের জজ মিস্টার ফ্লেচারের নিকট চিত্তরঞ্জনকে দেউলিয়া অপবাদ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। মিস্টার সিংহ তখন হাইকোর্টের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টার। তিনি এই ব্যাপারে চিত্তরঞ্জনের কৌঁসুলির কাজ করেছিলেন। সেদিন বিচারপতি ফ্লেচার বলেছিলেন—'কোন ব্যক্তি দেউলিয়া হবার পরে স্ব-ইচ্ছায় সেই ঋণ স্বীকার করে তা সুদে-আসলে পরিশোধ করেন, এ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আমি প্রথম দেখলাম।'

পুরুলিয়ায় বসে ভুবনমোহন যখন এই সংবাদ জানতে পারলেন, আমরা অনুমান করতে পারি, বৃদ্ধ তখন নিশ্চয়ই মুক্তির নিশ্বাস ফেলে স্বস্তি অনুভব করেছিলেন। চিত্তরঞ্জনের এই ঋণ-পরিশোধের বিষয়টি সেদিন একটি ঘটনার মধ্যে গণ্য হয়েছিল। আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বলে ঘোষিত হওয়ার পর তিনি আইনত এই ঋণ থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন; কিন্তু সত্যের কাছে, ধর্মের কাছে, সর্বোপরি বিবেকের কাছে নিজের মনুষ্যত্ব প্রমাণ করবার জন্যই চিত্তরঞ্জন এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বাঙালীকে দেখালেন যে, তিনি অর্থসর্বস্ব মানুষ ছিলেন না। টাকার চেয়ে ইজ্জত বড়, অর্থ অপেক্ষা বৃদ্ধ পিতার মর্যাদা সহস্রগুণে বড়—এই বোধ চিত্তরঞ্জনের ছিল বলেই না তিনি সুপুত্রের কাজ করেছিলেন। দুর্গামোহনের ভবিষ্যদ্বাণী এইভাবেই সার্থক হয়েছিল। আধুনিক কালে এমন সততার দৃষ্টান্ত আর কোন বাঙালী দেখাতে পারেন নি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এইরূপ পিতৃঋণ পরিশোধের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ খুল্লতাত দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এক্ষেত্রে অবশ্য ঋণের পরিমাণ সামান্যই ছিল—মাত্র দু'হাজার টাকা এবং দুর্গাপ্রসাদের পিতা দেউলিয়া বলে ঘোষিত

হন নি। তবে তমাদিস্‌সূত্রে উত্তমর্ণগণের পক্ষে এই ঋণের দাবী করা সম্ভব ছিল না। দুর্গাপ্রসাদ কিন্তু স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পিতৃঋণ পরিশোধ করেছিলেন।

এইবার কবি চিত্তরঞ্জনের কথা।

রাশিয়ার বিখ্যাত নাট্যকার ও ছোট গল্প-লেখক চেকভ যেমন বলেছিলেন, 'Medicine is my lawful wife and literature my mistress.'—চিত্তরঞ্জনও ঠিক তেমনি বলতে পারতেন—'আইন আমার জীবিকা, কবিতা আমার জীবন।' তাই তাঁর জীবনী আলোচনার প্রসঙ্গে তাঁর কাব্যসাধনার পরিচয় নিতে হয়; তাঁর জীবন-রহস্যের মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে হলে তাঁর সাহিত্যকর্মের সংবাদ রাখতে হয়। কারণ মানুষটি ছিলেন জীবন-রসিক। তাঁর কবিতায় তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ অনাবৃতভাবেই তুলে ধরেছেন। বিপিনচন্দ্র যথার্থ বলেছেন, 'চিত্তরঞ্জনের দেশচর্যার সঙ্গে তাঁর সাহিত্য-চর্চাকে মিলিয়ে দেখতে হবে।' তিনি যেমন কল্পনাপ্রবণ তেমনি আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন এবং সেই কারণেই তাঁর পক্ষে সাহিত্য থেকে দূরে থাকা সম্ভব ছিল না। তাঁর সাহিত্যানুরাগ গভীর ছিল; সমকালীন বাংলার সাহিত্য পরিবেশ এই অনুরাগ বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছিল। তাঁর জীবনের বহুবিধ উচ্চাভিলাষের মধ্যে—যার অনেকগুলিই চরিতার্থ হয়েছিল—সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল তিনি কবি হবেন। কবি তিনি হয়েছিলেন ঠিকই, তবে যে পরিমাণ কবিত্ব-শক্তি তাঁর মধ্যে ছিল, সময়াভাবে সেই শক্তির যে সম্যক পরিণতি লাভ ঘটতে পারে নি, এটা সত্য। তাঁর সাহিত্য-সাধনা বা কাব্যচর্চা দুয়ের কোনটাই একটানা হতে পারে নি, তাই তাঁর কাব্যজীবনের বিকাশ আছে, বিস্তার আছে, কিন্তু পরিণতি নেই। তথাপি একথা সত্য যে, ব্যারিস্টার সি. আর. দাশ. বাংলার সাহিত্য-সমাজে একসময়ে 'কবি

চিত্তরঞ্জন' হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। প্রথম শ্রেণীর কবি তিনি না হতে পারেন, মৌলিকতা তাঁর মধ্যে খুব বেশি না থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর মধ্যে যে একটি সহজ কবি-প্রাণ ছিল, সেটা অনস্বীকার্য।

'সত্যকে ছাড়িয়া দিলে কোন কবিতাই সম্ভব হয় না।'

কবি চিত্তরঞ্জনকে বুঝবার এই হলো মূল সূত্র—এটি তাঁর নিজেরই কথা। তাঁর কবিতার মধ্যে তিনি নিজেকে অনেকখানি প্রকাশ করেছেন এবং তা সার্থকভাবেই করেছেন। বাংলার কাব্যসংসারে তিনি একটি সহজাত কবি-প্রতিভা নিয়েই প্রবেশ করেছিলেন। সে প্রতিভা চেষ্টাকৃত বা আয়াসলব্ধ কোন সৌখিন সাহিত্যকর্ম ছিল না। এই কবি চিত্তরঞ্জনকে না জানতে পারলে বা বুঝতে পারলে তাঁর বিচিত্র বৈভবমণ্ডিত জীবনের অনেকখানিই আমাদের কাছে অজানা থেকে যায়। তথাপি দুঃখের সঙ্গেই একথা বলতে হয় যে, বাংলা কাব্যজগতে, কেন জানি না, 'মালঞ্চ' ও 'সাগর-সঙ্গীত'-এর কবি বর্তমান কালে অনেকখানি অবহেলিত ও উপেক্ষিত। বিস্মৃত বললেও চলে। দেশবন্ধু যে একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন, কাব্যরসিক ছিলেন—এই তথ্যটা আজকালকার কয়জন ছেলে জানে? তাঁর জীবনে দেখা যায় যে, আইন-ব্যবসায় ও সাহিত্য-কর্ম—এই দুটি জিনিসই একসঙ্গে আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু দীর্ঘ একটি দশক উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত চিত্তরঞ্জন দুইয়ের কোনটাতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন নি, স্বীকৃতি তো দূরের কথা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি চিত্তরঞ্জনের নামের উল্লেখ নেই বললেই হয়। কোন পাঠ্যপুস্তকে নির্বাচিত কবিতাবলীর মধ্যে তাঁর কবিতা অনুপস্থিত। তিনি বড়লোক, ব্যারিস্টার, তাঁর পক্ষে কাব্যচর্চা করা অনধিকার, অথবা নিছক বিলাসিতা—এই রকম একটা ধারণা সেকালে রবীন্দ্র-ভক্তদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এমন কি 'প্রবাসী' পত্রিকায় একবার তাঁর একটি কাব্য-গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল; (সম্ভবতঃ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

এই সমালোচনাটি লিখেছিলেন) ঃ 'চিত্তরঞ্জনের এই নতুন কাব্যগ্রন্থ-খানি নয়নরঞ্জন হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা পাঠকদের হৃদয়রঞ্জন হইবে কিনা সন্দেহ'। শোনা যায়, এই বিদ্রূপ সমালোচনাটি কবিকে ব্যথিত করেছিল।

আমরা কিন্তু বলব চিত্তরঞ্জন একজন খাঁটি কবি ছিলেন। কবিতার অর্থ যদি হয়—'The yearning for the mystery of love that lives not in the flesh.' অথবা 'The inter weaving of the influences of Nature into the passions and emotions of the human breast.'—তাহলে চিত্তরঞ্জনকে কবি বলতে বাধা কোথায়? আমরা জানি ব্রাউনিং, কীট্‌স, শেলি ও সুইনবার্ণের কবিতা তাঁর খুব প্রিয় ছিল। ইংরেজী কাব্যপ্রীতি কিন্তু তাঁর বাঙালী কবি-মনকে আদৌ প্রভাবিত করতে পাড়ে নি—বাংলার মাটি, বাংলার প্রাণ, বাংলার গীতি-কবিতার ঐতিহ্য থেকেই তিনি আহরণ করেছিলেন নিগূঢ় কাব্যরস যা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মন্দাকিনীর নির্মল ধারায় বয়ে গিয়েছিল তাঁর কাব্য-মালঞ্চের উপর দিয়ে। তাঁর এক জীবনীকার এই প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করেছেন ঃ 'Chittaranjan was born an heir to the rich legacy of the emotional poetry of an earlier age and was temperamentally fitted to enjoy his spiritual heritage.'* তাঁর কবি-মানস তথা কাব্যচেতনা নিঃসন্দেহে এই ঐতিহ্য দ্বারা সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট হয়েছিল। আবার, 'কবি যদি তিনি হয়ে থাকেন, তবে তিনি ছিলেন বাংলার কবি, বাঙালীর নিজস্ব কবি। বাংলার প্রাণস্পন্দনের অনুভূতি শুধু তাঁর কাব্যেই নয়, সাহিত্য-সাধনায়ও তা জেগে উঠেছিল।'—এই মন্তব্যটিও বিশেষভাবে ধর্তব্য।† এর থেকেই আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, বাংলার যা চিরন্তন প্রাণধারা

* *Life and Times of C. R. Das* : **Ray**

† মানুষ চিত্তরঞ্জন ঃ অপর্ণা দেবী।

তার সঙ্গে অখণ্ডভাবে তাঁর নিজের আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা ও অভিজ্ঞতাপুষ্ট প্রাণধারা মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েই তো ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন কবি চিত্তরঞ্জন হয়ে ফুটে উঠেছিলেন। বাংলার কাব্য-জগতে তাঁর কবিতায় নতুন সুর ছিল কিনা জানি না, তবে তার মধ্যে যে প্রাণের স্পর্শ ছিল, অনুভূতির তীব্রতা ছিল, অভিজ্ঞতার গাঢ়তা ছিল, অধ্যাত্মচেতনার ছাপ ছিল, তা বলতে বাধা নেই। চিত্তরঞ্জনের সাহিত্য-সাধনা ও দেশচর্যা যে একই সূতায় গাঁথা ছিল—এটা বুঝতে পারলেই আমরা তাঁর কবিতার সৌন্দর্য ও ভাব, বক্তব্য ও প্রেরণা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। এক সময়ে হয়ত চিত্তরঞ্জনের কবিতা বা কবিতার মূল্য সাহিত্যে বিতর্কের বিষয় ছিল, কিন্তু আজ তো আমরা সেই অতীত দিনের মনোভাব থেকে মুক্ত হতে পারি। আরো একটি কারণে তাঁর কবি-কর্মের মর্মানুধাবনের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাঁর সকল কর্মপ্রয়াসের উৎস অনুসন্ধানে, বিশেষ করে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণে, তাঁর কবিতার আলোচনা অপরিহার্য।

চিত্তরঞ্জন মুখ্যত একজন উৎকৃষ্ট গীতিকবি ছিলেন। বাংলার গীতি-কবিতার মধ্যে বাঙালী জীবন-ধর্মের অনেকখানি অভিব্যক্তি আছে। চিত্তরঞ্জনের জীবন-ধর্মের সহজ প্রবণতা তাঁকে তাই গীতি-কবিতার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। জাগ্রত পৃথিবী, আর স্বপ্নের পৃথিবী, বাস্তব ও আদর্শ—এই যদি গীতি-কবিতার যথার্থ প্রকৃতি হয়, তবে চিত্তরঞ্জনকে আমরা নিঃসন্দেহে একজন উৎকৃষ্ট গীতিকবি বলতে পারি। তাঁর কবিতার lyric intensity-ই এর অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে। তারপর কালক্রমে তিনি যখন বৈষ্ণব কবিতার ভাবরস ও মাধুর্যের সন্ধান পেলেন তখন থেকেই তাঁর কবিতায় ঝঙ্কৃত হতে থাকে ভক্তির অনাবিল সুর যা একদিন তাঁর আত্মনিবেদনে সার্থকতা লাভ করেছিল। চিত্তরঞ্জনের রচনার পরিমাণ সামান্যই, মাত্র পাঁচখানি স্বল্পায়তন কাব্যগ্রন্থ। তথাপি কাব্যরসিক পাঠক এইগুলির মধ্যে

তাঁর কবি-মন ও কবি-কর্মের ক্রমবিবর্তন সহজেই লক্ষ্য করতে পারবেন।

'মালঞ্চ' চিত্তরঞ্জনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।

কবি ও ব্যবহারজীবরূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ একই সময়ের ঘটনা। তখন তাঁর বয়স ছাব্বিশ বছর। নবীন যুবক, বিবাহ হতে তখনো এক বছর বিলম্ব আছে। কিন্তু কবিতা লেখা শুরু হয়েছিল এর আট-দশ বছর আগে থেকেই। সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষা দিতে বিলাত যাবার সময় জাহাজেই তিনি অনেকগুলি কবিতা রচনা করে 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশ সমাজপতিকে (ইনি বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র) পাঠিয়েছিলেন। সেই কবিতাগুলিই একত্র করে বাণীর চরণে তাঁর প্রথম অর্ঘ্য নিবেদন করলেন 'মালঞ্চ' নাম দিয়ে। সমাজপতি মহাশয়ের সাহিত্য প্রেস থেকেই এ বই তিনি নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করে বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। কবিতা জীবনের অনুভূতি ভিন্ন আর কিছু নয়—এ কথা চিত্তরঞ্জন বুঝতেন। সেই অনুভূতির প্রথম প্রকাশ পরিলক্ষিত হলো তাঁর 'মালঞ্চে'র কবিতাগুলির মধ্যে। চিত্তরঞ্জনের জীবনের তৃতীয় অধ্যায় সুখে-দুঃখে ও দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে কেটেছে। সেই জীবনের প্রতিফলন আছে 'মালঞ্চের' কবিতায়। এই কাব্যে রবীন্দ্র-নাথের প্রভাবের কথা কোন কোন সমালোচক উল্লেখ করেছেন। আবার কারো মতে, 'মালঞ্চে যৌবনের উদ্দামতা ও ঈশ্বরের প্রতি যথেষ্ট অভিমানের পরিচয় পাওয়া যায়।' প্রথম বয়সের কবিতায় ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু সহানুভূতিরও নিদর্শন এর কয়েকটি কবিতার মধ্যে দেখা যায়। এই গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয় তখন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ হয় নি, কিন্তু হৃদয়ের স্তরে স্তরে সঞ্চিত রয়েছে কত আশা, কত কল্পনা এবং সেই সঙ্গে বাস্তব জগতের রূঢ়তা নিয়ে আসে মানসিক চাঞ্চল্য। মোটকথা, যৌবনের অস্থিরতা, ন-যন্ত্রণা ও হতাশার কথা, হার্বার্ট স্পেন্সারের অজ্ঞেয়তাবাদ,

ব্রাহ্মসমাজের সংকীর্ণতা, স্নেহ-ভালবাসা ও প্রেমপ্রবণতা—ইহাই 'মালঞ্চের' মূল বক্তব্য। 'মালঞ্চ' কাব্য-সঙ্গীত নয়, কাব্যের আধারে জীবনের বাস্তব চিত্র। একটা অতৃপ্ত প্রেমের সুর বর্ণিত হয়েছে এখানে। যেমন :

তোমার ও প্রেম সখি! শাণিত কৃপাণ!
দিবানিশি করিতেছে হৃদি-রক্ত পান।
নিত্য নব সুখ-ভরে
ঝলসিছে রবি-করে
রজনীর অন্ধকারে সে আলো নির্বাণ!
তোমার ও প্রেম সখি! ভুজঙ্গের মত,
জীবন জড়ায়ে মোর আছে অবিরত!
প্রতি নিঃশ্বাসেই তার
বরিষে মরণ ধার;
আকুল চুম্বন আর, দংশিছে সতত!

এই কাব্য গ্রন্থখানি মোট তিপ্পান্নটি কবিতার সমষ্টি। প্রতিটি কবিতার ভাষা সরল, রচনা সুন্দর, ভাব মর্মস্পর্শী। কয়েকটি কবিতা যথার্থই রসোত্তীর্ণ ও সাধারণ পর্যায়ের অনেক উচ্চস্তরের। কিন্তু যে জন্য 'মালঞ্চ' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবি খ্যাতি ও অখ্যাতি দুই-ই অর্জন করেছিলেন তা হলো এর অন্তর্গত নিরীশ্বরবাদমূলক কয়েকটি কবিতা এবং বিশেষভাবে 'বারবিলাসিনী' শীর্ষক কবিতাটি। এই কবিতাটির জন্যই ব্রাহ্মসমাজের সর্বজন-শ্রদ্ধেয় পুরুষ ভুবন-মোহন দাশের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জন সেদিন ব্রাহ্মসমাজে যারপরনাই ধিক্কৃত হয়েছিলেন ও প্রচুর দুর্নাম কিনেছিলেন। কন্যা অপর্ণা দেবী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'বাবার বিয়ের সময়ে এই দুর্নামটা কলকাতার সমাজে বেশ ভালভাবেই রটে গিয়েছিল যে তিনি লম্পট ও মদ্যপ।'* যদিও কবিতাটি তাঁর সামাজিক

* মানুষ চিত্তরঞ্জন : অপর্ণা দেবী।

দুর্নামের কারণ হয়েছিল তথাপি একথা তো কিছুতেই অস্বীকার করবার নয় যে, বেদনা-কাতর একটি সহৃদয় হৃদয়ের স্পর্শ আছে এই কবিতাটির মধ্যে। সে স্পর্শ আজো অম্লান। নীতিবাগীশদের আদালতে যে রায়ই দেওয়া হোক না কেন, চিত্তরঞ্জনের 'বার-বিলাসিনী' ও রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' সমকালীন বাংলা কাব্যজগতের দুটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। 'পতিতা' কবিতাটির রচনাকাল কিছু পূর্ববর্তী। রুচির প্রশ্ন এই জাতীয় কবিতায় নিরর্থক, আসলে দেখতে হবে, কবি তাঁর হৃদয়ের সহানুভূতি কতখানি সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। বাংলা কবিতার বিষয়বস্তু হিসাবে পতিতার জীবন সবেমাত্র স্বীকৃতি পেয়েছে; 'পতিতা'র পর 'বারবিলাসিনী' এই জাতীয় দ্বিতীয় কবিতা। আবেদনে ও অনুভূতিতে দুটিই সমমূল্যের কবিতা বলে গণ্য হওয়ার দাবী রাখে; দুইয়েরই ছন্দ ও ভাবমাধুর্য মর্মস্পর্শী। যেমন,

কোন মহাপ্রাণে ব্যথা
দিয়েছিনু, তাই হেথা
প্রাণহীন প্রেম-বিলাসিনী
সবারে বিলসি তাই বারবিলাসিনী
তারি শাপে চির-কলঙ্কিনী।

অথবা,

ওগো আমি যৌবনে যোগিনী।
এ বিশ্ব লালসা ছাই,
সর্বাঙ্গে মাখিয়া তাই,
চলিয়াছি কলঙ্কবাহিনী!
মর্মহীন কর্মহীন, কলঙ্কবাহিনী!
চিরদিন যৌবনে যোগিনী।

এই মর্মদাহী আক্ষেপ আমাদের অন্তরকে স্পর্শ না করেই পারে না। এই পঙক্তিগুলি যখন পাঠ করা যায় তখন আমরা কি যুগপৎ আত্মপ্রবঞ্চনা-ব্যথিত একটি হৃদয়ের করুণ কাহিনী আর তার প্রতি

কবির সহানুভূতি অনুভব করি না। চিত্তরঞ্জনের 'বারবিলাসিনী' টমাস হুডের 'The Bridge of Sighs' কবিতাটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। হুডের এই কবিতাটি তাঁরও খুব প্রিয় ছিল। কিন্তু এর প্রকৃত সাদৃশ্য পাওয়া যাবে সুইনবার্ণের 'Dolerеs' কবিতাটির মধ্যে। এডমণ্ড গস্ সুইনবার্ণের এই কবিতাটির সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন: 'It becomes one of the most poignantly moral poems in our literature by its very rejection of conventional morality.' চিত্তরঞ্জনের 'বারবিলাসিনী' কবিতাটি সম্পর্কেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য।

'মালঞ্চ' কাব্যে কেউ কেউ রবীন্দ্র-প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। চিত্তরঞ্জন অবশ্য তাঁর কবিতায় এই জাতীয় প্রভাব স্বীকার করতেন না। বরং তিনি অনেক সময় বলতেন যে, তাঁর কবি-কর্মের মধ্যে যদি কারো প্রতিফলন থাকে তা হলো সুইনবার্ণের। 'আমি সুইনবার্ণের শিষ্য'—এই কথা তাঁর নিজের, চিত্তরঞ্জন যখন কাব্য-সংসারে প্রবেশ করেন সুইনবার্ণ তখন জীবিত ছিলেন। ভিক্টোরীয় যুগের এই কবির সাবলীলতা ও romantic individualism চিত্তরঞ্জনের কবিতার মধ্যে বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়। 'মালঞ্চ' কবির প্রথম জীবনের ইতিহাস। সেই সময়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনার মধ্যে নবযুগ-জীবনধর্ম বিশেষভাবেই প্রকট—তখনো পর্যন্ত তিনি গভীর রসানুভূতির তীর্থলোকে উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। তবে একথা সত্য যে, মানুষকে ভালবাসবার প্রথম সুরটা 'মালঞ্চে' ভাল-ভাবেই বেজে উঠেছিল। তাই এই প্রথম কাব্যগ্রন্থে চিত্তরঞ্জনের কবি-খ্যাতি একেবারে সুপ্রতিষ্ঠিত না হলেও অনেকখানি ছড়িয়ে পড়ল। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন 'মালঞ্চে'র খুব প্রশংসা করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁরই উদ্যোগে ১৯১২ সালে এর একটি নতুন সংস্করণ দেবেন্দ্রনাথের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়েছিল; সেই ভূমিকায় তিনি চিত্তরঞ্জনের কবি-প্রতিভাকে 'অসামান্য' বলেই উল্লেখ করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে 'মালঞ্চে'র কবির সঙ্গে সনেটসিদ্ধ দেবেন্দ্রনাথের একটা আন্তরিক প্রীতির সম্পর্ক ছিল। এই কাব্যে সন্নিবেশিত দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশে রচিত একটি সনেট তার প্রমাণ।

'মালা' চিত্তরঞ্জনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ।

ইহাও একত্রিশটি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। ছয় বছরের ব্যবধানে এই কাব্য প্রকাশিত হয়। দেখা যায় যে, এই ছয় বছরের মধ্যে কবি অনেকখানি আত্মস্থ হয়েছেন। তাঁর কবিচেতনার প্রথম পর্বে ছিল 'বিদ্রোহের সুর, অবিশ্বাস, সংশয়, জ্বালা ও যন্ত্রণার তীক্ষ্ণ অনুভূতি'; দ্বিতীয় পর্বে তাঁর কবি-কর্মে পরিলক্ষিত হয় 'শান্ত, গম্ভীর, মৌন বিষাদের সুর। কবির কণ্ঠস্বরে এসেছে গভীরতার স্পর্শ, এবং একটা নতুন প্রত্যয়ের তটপ্রান্ত যেন তাঁর কবিদৃষ্টির সামনে আভাসিত হয়ে উঠেছে'। এই কাব্যের সম্পুটে তাই বিধৃত হয়েছে যুগপৎ পার্থিব প্রেম ও ঐশ্বরিক প্রেম। চিত্তরঞ্জনের সকল কাব্যের মর্মকথা প্রেম। আবার দেখি, এই মানুষটির জীবনের মূল সুরটাও তাই—তাঁর জীবন-বীণায় সারাজীবন এই একটিমাত্র সুরই ঝঙ্কৃত হয়েছে। বৈষ্ণব-কবিতার নিগূঢ় ভাবরসে স্নাত ছিলেন তিনি, তাই মনে হয় অমন প্রেমিকরূপে তিনি নিজেকে অবারিতভাবেই তাঁর সকল চিন্তায়, কর্মে ও কাব্যসাধনায় প্রকাশ করতে পেরেছিলেন।

একজন বিশিষ্ট সমালোচকের মতে এই কাব্যে চিত্তরঞ্জনের 'কবি-প্রতিভা মধ্যাহ্ন-ভাস্কর দীপ্তিতে গম্ভীর, রস ঘন ও আরো সংযত' হয়ে উঠেছে। এখানে তাঁর প্রেমানুভূতি গীতিকাব্যের সকল সৌন্দর্য ও মাধুর্য নিয়ে বিলসিত হয়ে উঠেছে। 'প্রেম ও প্রদীপ' এই গ্রন্থের একটি আশ্চর্য সুন্দর গীতি-কবিতা এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতা। প্রত্যয়ের সুরে কবি লিখেছেন ঃ

আজি এ সন্ধ্যার মাঝে তব বাতায়নে
কেন রাখিয়াছ ওগো! প্রদীপ জ্বালিয়া?

তোমার ও প্রদীপের কনক-কিরণে
আমার সকল মন উঠে উজলিয়া।

গভীরভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, এই কবিতাটির 'রহস্যময়ী' আর রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী' যেন একই কবিচেতনা থেকে উৎসারিত হয়েছে। ঠিক তেমনি দেখা যায় যে 'মালা' কাব্যের 'তুমি' শীর্ষক কবিতায় কবি যাঁকে 'প্রিয়' বলে সম্বোধন জানিয়েছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতার' সগোত্র। কনক-কিরণোজ্জ্বল প্রদীপের আলো আসলে কবির প্রাণেরই আলো। সেই আলোয় তিনি তাঁর জীবনের পথ খুঁজে নিতে চান। কার জন্য এই অন্বেষণ? কবি বলছেন:

ওগো প্রিয়, তুমি মোর সর্বজীবনের
চির প্রেমার্জিত শত তপস্যার ফল।

নিজের জীবনকে তিনি তাঁর জীবনদেবতার চরণভূমি ভিন্ন আর কিছু ভাবতে পারছেন না। এই কাব্যে কবির চরম অনুভূতি যখন লয়ে এসে দাঁড়াল তখন তাঁর কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হলো নিখিল মানবের শাশ্বত সঙ্গীত:

আমার পরান ভরে ওঠে যত গান
তোমার পরান হতে পায় যেন প্রাণ।

এই কাব্যের প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবনীকার যথার্থই মন্তব্য করেছেন: 'Chittaranjan's next production was another collection of lyrics called *The Garland* (*Mala*), published in 1904.....A new light of spiritual experience shines through most of the poems. The poet feels the influence of a Presence that disturbs his soul with the joy of elevated thoughts....Unto this light-giving Presence the whole soul of the poet turns with an ineffable yearning, such as could be paralleled

only by the essential spirit of some of the loveliest devotional lyrics of Tagore's *Gitanjali.* শ্রীঅরবিন্দও 'মালা' কাব্যের কবিতাগুলিকে 'intensely spiritual and sublime.' বলেছেন। কাব্যখানি প্রকাশিত হলে কবি একখানি গ্রন্থ উপহারস্বরূপ বরোদায় অরবিন্দের কাছে পাঠিয়েছিলেন তাঁর অভিমতের জন্য। রবীন্দ্রনাথকেও দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এই বিষয়ে কোন অভিমত দিয়েছিলেন কিনা তা জানা যায় না।

মোটকথা, এক অপার্থিব প্রেমের পূর্বরাগ ঝঙ্কৃত হয়েছে এই কাব্যের প্রত্যেকটি কবিতায়। কাব্যখানির নামকরণের মধ্যেই আছে কাব্যের নিগূঢ় পরিচয়—নিজের ঐশ্বর্যমণ্ডিত জীবনকে কবি যেন একখানি পুষ্পমাল্যের মতো সমর্পণ করেছেন তাঁর জীবনদেবতার চরণে। কাব্যের এই আত্মসমর্পণ পরবর্তীকালে যখন দেশপ্রেমের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেল তখন আমরা সবিস্ময়ে দেখতে পেলাম—আত্মনিবেদিত একটি রিক্ত হৃদয় যেন সহসা মানবপ্রেমে পূর্ণ হয়ে উঠল। 'মালা'র সর্বশেষ কবিতায় কবি তাই বলতে পেরেছেন ঃ

> পূর্ণ করে দাও আজি শান্ত এ হৃদয়
> হে অনন্ত! হে সম্পূর্ণ! নীরবে নিভৃতে
> নিঃশব্দে ভরিয়া দাও অন্তর-নিলয়
> ওই তব শব্দহীন সঙ্গীতে!

'সাগর-সঙ্গীত' চিত্তরঞ্জনের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ।
চিত্তরঞ্জনের কবি-প্রতিভার এক সার্থক সৃষ্টি।

যে বছর তিনি সপরিবারে দ্বিতীয়বার বিলাত যান, এই কাব্যখানির রচনার সূত্রপাত হয় তখন। আদি-অন্তহীন বিশাল জলধির বিভিন্ন রূপের তরঙ্গ-ভঙ্গিমাকে ছন্দের বাঁধনে নিয়ে এসে ছন্দাতীতকে অন্তরে বেঁধে কবি চিত্তরঞ্জন নিঃসন্দেহে একটা অসাধ্য সাধন

করেছিলেন। বাংলা কাব্য-সংসারে এমন গভীর ও উচ্চগ্রামে বাঁধা সুর এর আগে আর শোনা যায় নি। এই সঙ্গীতের অন্তরালে যে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব নিবদ্ধ আছে, বৈষ্ণবের আত্মসমর্পণ ও বৈদান্তিকের মায়াবাদের যে সমন্বয় আছে, সেইটাই হলো এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য।

বাংলার গীতি-কবিতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কি? অসীমের মিলনাকাঙ্ক্ষা। আমরা দেখতে পাই যে, চিত্তরঞ্জন তাঁর কবি-জীবনের এই পর্বে বিশ্বপ্রকৃতির অসীমতার দিকে মুখ ফেরালেন। শুরু হয় অসীমের সন্ধান। কিন্তু এহো বাহ্য। এই কাব্যের যেটা প্রধান সুর তা হলো আত্মসমর্পণ। তাইতো কবি গেয়ে উঠলেন:

সকল সুখের রাশি পুষ্প হয়ে ফুটে
সব দুঃখ আজ মোর গীত হয়ে উঠে।
... ...
তোমারি এ গীত প্রাণে সারা দিনমান,—
আমি যে হয়েছি তব হাতের বিষাণ!
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী!—বাজাও আমারে
দিবস-রজনী ভরি আলোকে আঁধারে।

এর মধ্যে যেন বৈষ্ণব-প্রেমের আত্মসমর্পণের সুরটা অনুরণিত হয়েছে। তেমনি, একজন সমালোচকের মতে, 'কবিত্বের দিক হইতে এসকল পঙক্তি শেলির 'Make Me Thy Lyre,' অথবা রবীন্দ্রনাথের 'আমারে কর তোমার বীণা, লহ গো লহ তুলে'—মনে করাইয়া দেয়। সমালোচকের এই মন্তব্য সত্ত্বেও আমরা বলব চিত্তরঞ্জনের 'সাগর-সঙ্গীত' স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বাংলা সাহিত্যে এমন ভাবরসসমৃদ্ধ কাব্য অল্পই আছে এবং এই কাব্যের জন্যই কবি হিসাবে তিনি বেঁচে থাকবেন, অন্ততঃ থাকা উচিত, যদি না কবি ও তাঁর কাব্য-সৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের মূল্যবোধ বা রসবোধ কখনো সংকীর্ণতা বা আবিলতায় আচ্ছন্ন হয়।

একটি সম্পূর্ণ স্তবক এখানে উদ্ধৃত করছি। আমার বিবেচনায়

এই স্তবকটির মধ্যেই আমরা দেখতে পাই যে, কবি নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁর প্রেমাস্পদের উদ্দেশে যা বলেছেন তা একমাত্র বৈষ্ণব কবি ভিন্ন আর কারো লেখনী থেকে নির্গত হওয়া সম্ভব নয়ঃ

বিদ্যুৎবিহীন নিশা অশনি বরজে
ছিন্নভিন্ন বক্ষে তব মরণ গরজে!
উন্মত্ত তরঙ্গে তব অযুত বর্ণিনী
বিস্তারি অসংখ্যের ফণা অনন্ত রঙ্গিণী
ঘন ঘোর ঝঞ্ঝা বায়ু আঁধার পরশে
ভীষণ-ভৈরব এ কি প্রলয় বরষে।
লক্ষ লক্ষ দানবের বিকট চীৎকারে
মন্দ্রিছে মরণ-গীতি অনন্ত আঁধারে।
অনন্ত এ প্রভঞ্জন মোর বক্ষ ভরি
ছিন্ন পাল ভগ্ন হাল ডুবে মন-তরী!
প্রলয়পয়োধি জলে মরণের পারে
আশ্রয়বিহীন প্রাণ অনন্ত আঁধারে।
এস তবে মৃত্যুরূপে ওগো সিন্ধুরাজ!
আবরিত বক্ষ মাঝে তুমি রবে আজ।

গীতিকবি মাত্রেই প্রকৃতির উপাসক। তাঁরা প্রকৃতির রূপ দেখে মুগ্ধ হন। তারপর মুগ্ধচিত্তে রূপাতীতের সন্ধান করেন। আমরা জানি, চিত্তরঞ্জন 'যেমন হিমালয়ের গভীরতায় ধ্যানমগ্ন হতেন, তেমনি সীমাহীন সমুদ্রের রূপের প্রতিও তাঁর একটা আকর্ষণ ছিল।' আবার আমরা এও জানি যে, তিনি মাঝে মাঝে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে গভীর তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। আলিপুর বোমার মামলায় বন্ধু অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনে দাঁড়িয়ে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন যে এক বছরকাল অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন তার ফল-শ্রুতিটা শুধু সেই অপূর্ব ভাষণের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়ে নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার কথা নয়; বরং সেই সঙ্গে কবি চিত্তরঞ্জনের মানস-লোকেও একটা রূপান্তর ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল। আমরা

তাই অনুমান করতে পারি, তখন থেকেই তাঁর কাব্যচিন্তায় সকলের অগোচরে দার্শনিকতার যে অনুরঞ্জন লেগেছিল তা তাঁর কবি-কর্মকে প্রভাবিত না করেই পারে না। সেই অনুরঞ্জন, সেই প্রভাব তাঁর মনোজগতে এনে দিয়েছিল একটা প্রবল আলোড়ন। 'সাগর-সঙ্গীত' কাব্যে সেই আলোড়ন যেন সঙ্গীতের একটা মূর্ছনা নিয়ে প্রকাশ পেল। তাই দেখা যায় যে, এই কাব্যে প্রকৃতির বহিরঙ্গ রূপের বর্ণনা যতখানি আছে, তার চেয়ে বেশি আছে রূপাতীতের স্তব। কোন কোন সমালোচকের মতে চিত্তরঞ্জনের 'সাগর-'সঙ্গীত' দ্বিতীয় স্তরের কবিতা (second-rate poem)। কাব্য-মাধুর্যের বিচারে হয়ত এ অভিমত স্বীকার্য, কিন্তু দার্শনিকতায় ইহা যে একখানি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাব্য তা অস্বীকার করবে কে ?

এখানে বিশেষভাবেই উল্লেখ্য যে, 'সাগর-সঙ্গীতে' আমরা কবির 'যে হৃদয়ের পরিচয় পাই, তাঁর পরবর্তীকালে রাজনীতি-চর্চার মধ্যেও সেই হৃদয় তেমনই নিটোল, তেমনই আবেগময় ছিল।' কাব্যের পঞ্চম স্তবকটিতে এর সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে :

> তরঙ্গে তরঙ্গে আজ সেই গীত বাজে,
> সোনার স্বপনভরা প্রভাতের মাঝে ;
> সেই গীতে ভরি গেছে হৃদয় আমার,
> গগনে পবনে বহে সেই গীতধার !
> কি মোরে করেছ আজ! মনখানি মম,
> শত শত তন্ত্রীভরা গীতযন্ত্র সম,
> পরশি তোমার করে কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
> গরবে গরবে আজি উঠিছে বাজিয়া।

একজন সমালোচক লিখেছেন—'এই মায়াতীত বিশাল সাগরকে মায়ার সহিত, অসীমকে সসীমের সহিত সংযুক্ত করিতে যে সঙ্গীতের প্রয়োজন, 'সাগর-সঙ্গীতে' সেই সঙ্গীত, এই অন্তহীন দিশাহারার সহিত কবিচিত্ত সংযুক্ত করিবার যে ছন্দ এও সেই ছন্দ, ছন্দাতীতকে

অন্তরে বাঁধিবার সুর, এ সেই সুর'। কাব্যের আরম্ভেই কবি তাই গেয়েছেন ঃ

হে আমার আশাতীত হে কৌতুকময়ি!
দাঁড়াও ক্ষণেক তোমা ছন্দে গেঁথে লই।
আজি শান্ত সিন্ধু ওই ম্লান চন্দ্রকরে
করিতেছে টলমল কি যে স্বপ্ন ভরে!
সত্যই এসেছ যদি হে রহস্যময়ি!
দাঁড়াও ক্ষণেক! আমি ছন্দে গেঁথে লই।

কাব্যের উপসংহারে কবির আত্মসমর্পণের সুরটা যেন অসংশয়িত ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে ঃ

হে মোর আজন্ম সখা! কাণ্ডারী আমার
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার।

চিত্তরঞ্জনের এই 'কাণ্ডারী' আর রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' তত্ত্বের দিক দিয়ে এক ও অভিন্ন। বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে 'সাগর-সঙ্গীত' কি স্থায়ী স্বীকৃতি দাবী করতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে, নইলে অরবিন্দ এই কাব্যটির ইংরেজী অনুবাদ করতেন না। এর একটা ইংরেজী অনুবাদ কবি নিজেও করেছিলেন বলে জানা যায়। অরবিন্দের পর জে. এ. চ্যাপমানও এই কাব্যখানির একটি ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন। অরবিন্দ-কৃত 'সাগর-সঙ্গীতে' কাব্যের প্রথম স্তবকের ইংরেজী অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

Unhopped for, wondrous one, ever elusive,
Wait awhile that I weave thee in my song.
The calm sea lapped in dreams
Trembles today in the pale light of the moon!
If it be that thou has truly come,
Then, O smiling mystery! dwell in my heart,
What time I weave thee into song!*

---

* *Songs of the Sea*: : **Translation by Sri Aurobindo**

কোন কোন স্তবক তিনি মিল রেখেও অনুবাদ করেছিলেন, যেমন ঃ

And from today, O ocean without strand,
Thy song, I'll sing, wandering from land to land.

চিত্তরঞ্জনের পরবর্তী কাব্যে যে ক্রমোত্তরণটা আমরা লক্ষ্য করি সেটা হলো বৈষ্ণব কবির সর্বসাধ্যসার কান্তভাবের অভিব্যক্তি। 'সাগর-সঙ্গীতে' তারই পূর্বাভাষ আছে ঃ

সোনার কমলে আমি মালিকা গেঁথেছি,
দোলাইব আজ তব সোনার গলায়!
একসূত্রে বাঁধা রব আমরা দুজনে
তরুণ উষার কোলে স্বপন বিজনে।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ঈপ্সিতের সন্ধান এই কাব্যেই শেষ হয়েছে ; কবির চিত্ত এখন অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে অভিসার করতে ব্যগ্র। সেই ব্যগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে এইভাবে ঃ

কার পানে, কোন্ মন্ত্র করি উচ্চারণ?
কোন্ পূজা লাগি বল এত আয়োজন?
দীক্ষা দাও ওগো গুরু! মন্ত্র দাও মোরে,
পূজার সঙ্গীতে তব প্রাণ দাও ভরে।

বাঞ্ছিতের জন্য এই যে ব্যগ্রতা, এই সন্ধান, এই অভিসার অবশেষে সার্থকতায় উত্তরিত হলো তাঁর পরবর্তী কাব্যে।

'অন্তর্যামী' চিত্তরঞ্জনের চতুর্থ কাব্য।

কবি এখানে ভক্ত। 'অন্তর্যামী' একান্তভাবেই কবির অন্তর-জীবনের দর্পণ। কবিতায় অভিব্যক্ত এ তাঁর ভাবজীবনের ইতিহাস। পার্থিব প্রেমের উদগ্র বাসনা এখানে রূপান্তরিত হয়েছে ঐশ্বরিক প্রেমের প্রশান্ত অভীপ্সার মধ্যে। এ কাব্যের আস্বাদ তাই স্বতন্ত্র, আবেদন গভীর।

সকল দরশ মাঝে তুমি উঠ ভেসে।
সকল গগন মাঝে তুমি উঠ হেসে।
সকল গণনা মাঝে তোমারেই গুণি!
সকল গানের মাঝে তব গান শুনি!
ওগো তুমি মালাকর মন-মালিকার!
সাথী তুমি সাক্ষী তুমি সব সাধনার।

কবির সমস্ত মন-প্রাণ এখন যেন আলোয় আলো হয়ে উঠেছে, তাঁর অনুভূতির কেন্দ্রবিন্দুতে এখন বিরাজ করছেন নিখিল কবি-চিত্তের অনুভূতির স্রষ্টা। তাইতো কবির কাব্য-বীণায় বেজে উঠল ঃ

কেমনে লাগিয়া গেছ, মন-তটে!
কেমনে ছড়ায়ে গেছ, আঁখি-পটে!

চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি ও রামপ্রসাদের কাব্যরসে যাঁর মন ছিল অভিসিঞ্চিত সেই কবির পক্ষেই এমন মহিমান্বিত আত্মনিবেদন সম্ভব। এখানে একটা কথা বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিগত জীবনে যে মুহূর্তে লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ হয়েছে, যখন তাঁর জীবনে ঘটল হতাশার মেঘমুক্তি, ঠিক সেই সময়েই—সেই মোহঘুমপুরীতে ইন্দ্রের তুল্য ভোগৈশ্বর্যবিলাসের মধ্যে বাস করেও কেমন করে যে তাঁর কাব্য-চিন্তায় এসে গেল ঈশ্বর-নির্ভরতা, তা এক পরমাশ্চর্যের বিষয়। বিপিনচন্দ্র মিথ্যা বলেন নি, 'চিত্তরঞ্জনের সাহিত্য-সাধনার চাবিকাঠি দ্বারাই তাঁহার জীবন-রহস্য উদ্ঘাটন করিতে হইবে।' জীবনের এই পরম মুহূর্তে তাই তাঁর মন বলে উঠল ঃ

এ পথেই যাব বঁধু? যাহ তবে যাই!
চরণে বিঁধুক কাঁটা তাতে ক্ষতি নাই।
যদি প্রাণে ব্যথা লাগে, চোখে আসে জল
ফিরিয়া ফিরিয়া তোমা ডাকিব কেবল।

ঈশ্বরকে তিনি জানলেন মৃত্যুঞ্জয় ও অবিনাশীরূপে, অন্তরে শুনলেন তাঁর অভয় বাণী। তথাপি কবির অন্তরে কি যেন একটা ফাঁক, কি যেন একটা শূন্যতা বা অতৃপ্তি তাঁর কাব্য-সাধনার এই

পর্বেও অনুভূত হতে থাকে। সেই ফাঁক, সেই শূন্যতা দূর হয়ে নিবিড় প্রেমরসানুভূতিতে তাঁর কাব্যলোক আচ্ছাদিত হলো 'কিশোর-কিশোরী' নামক তাঁর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থে। চিত্তরঞ্জনের কবি-চিত্ত শৈশবে অর্থাৎ তাঁর স্কুল-জীবনে ছিল জাতীয়তাবাদের ভাবরাশিতে পূর্ণ; যৌবন ও যৌবনোত্তর কালে তা ছিল একান্তভাবেই বৈষ্ণব-কবির ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত।

'কিশোর-কিশোরী' কাব্যে আছে এই ভাবের পরাকাষ্ঠা। এখানে কবি একেবারে উত্তীর্ণ হয়েছেন বৃন্দাবনলীলার মাধুর্যের স্বর্ণপুরীতে।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের নিবিড় সংযোগ ছিল। এ ক্ষেত্রে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের কথা আমাদের মনে এসেই পারে না। কিন্তু সত্যের খাতিরে আমরা বলব যে, বৈষ্ণব-সাহিত্যের সঙ্গে এঁদের সংযোগটা অতখানি নিবিড় ছিল না। চিত্তরঞ্জনের কীর্তন-প্রীতি প্রসিদ্ধ। তিনি বলতেন, 'এইখানেই বাংলার বৈশিষ্ট্য বাঙালীর প্রাণ'। কীর্তন গানের মধ্যে তিনি একেবারে ডুবে যেতেন, তাঁর রসা রোডের বাড়িতে কীর্তন-গায়কদের নিয়মিত আসর বসত। যখন মফঃস্বলে 'কেস' করতে যেতেন, তখন সেখানেও কীর্তন-গায়কের অনুসন্ধান করতেন। মাইকেল বা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কীর্তনের প্রতি এমন অনুরাগ কোথায়? এই কীর্তনের ভিতর দিয়েই তো চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণব কবির ভাবতীর্থে পৌঁছতে পেরে-ছিলেন।

এই কাব্যের ভিতর দিয়ে আমরা শুনতে পেলাম বৈষ্ণব কবিদের সেই অপূর্ব গীতিময় পদাবলীর মূর্ছনা, যা বাঙালীর মনকে যুগ যুগ ধরে অনুপ্রাণিত ও রসসিঞ্চিত করে এসেছে। কবি-মানসের realism এখানে যেন idealism-এর পরাকাষ্ঠায় পৌঁছেছে—দেহাতীত যে প্রেমের অনাবিলধারা বৈষ্ণব-সাহিত্যে প্রবাহিত ছিল, 'কিশোর-কিশোরী' এক কথায় তারই নতুন পরিবেশন। তাঁর

পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এইটিই পরিপূর্ণ, নিটোল গীতিকাব্য। এই ক্ষুদ্রায়তন কাব্যে কবি কামনার রূপান্তরের কথা বলেছেন—সে রূপান্তর বিশুদ্ধ প্রেমের রূপান্তর; এই প্রেমে দেহসুখ-স্পৃহা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, আছে শুধু কামলেশহীন পবিত্র প্রেম যা হোম-হবির মতো সুরভিত। এই কাব্যে কবি যে ভাষায় কথা বলেছেন তা নিছক কবিতার কারুকার্যখচিত ভাষা নয়—তা একান্ত ভাবেই প্রাণের উৎস থেকে উৎসারিত মনের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ :

> কাছে কাছে নাই বা এলে তফাৎ থেকে বাসব ভাল,
> দুটি প্রাণের আঁধার মাঝে প্রাণে প্রাণে পিদীম জ্বাল।
> এপার থেকে গাইব গান, ওপার থেকে শুনবে ব'লে,
> মাঝের যত গণ্ডগোল, ডুবিয়ে দেব গানের রোলে।

এই রকম সহজ সরল প্রাণখোলা ভাষার স্রোত একটানা বয়ে গিয়েছে এই গীতিকাব্যখানির দুই তট দিয়ে। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও ভাবসম্পদে কবি চিত্তরঞ্জনের ইহাও একটি চমৎকার সৃষ্টি। গাঢ় অনুরাগের অঞ্জন-মাখা দৃষ্টি দিয়ে প্রেমিক যখন তাঁর দয়িতকে দর্শন করেন, তখন তিনি রূপান্তরিত হন সাধকে। তখন সর্বক্ষণের জন্য তাঁর হৃদয়ে জেগে থাকে সেই 'সকল লাবণ্যে গড়া রূপে ঢলঢল মূর্তিখানি।'

কবি চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে আর অধিক আলোচনায় প্রয়োজন নেই। কাব্যচর্চা তাঁর পেশা ছিল না অর্থাৎ তিনি একজন পেশাদার কবি ছিলেন না যদিও আশৈশব তিনি স্বপ্ন দেখেছেন যে, বড় হয়ে তিনি একজন কবি হবেন। তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের অনেকখানিই গ্রাস করেছিল আইন ও রাজনীতি এবং তারই ঘূর্ণাবর্তে নিপতিত হয়ে তিনি কাব্যসাধনায় অখণ্ড মনোযোগ কখনো দিতে পারেন নি। কিন্তু সতত সংগ্রাম-বিক্ষুব্ধ প্রাত্যহিক জীবনের ধূলি তাঁর অন্তরের আইডিয়ালিজমের গোপন উৎসকে কোনদিনই রুদ্ধ করতে পারে নি। সর্বপ্রকারে আধুনিকতার স্পর্শমুক্ত এই যে নির্মল আদর্শবাদ, এর

প্রতি চিত্তরঞ্জনের ছিল একটা গভীর অনুরাগ এবং এটা তাঁর জীবনে নানাভাবে কখনো হিউম্যানিট্যারিয়ান কাজের ভিতর দিয়ে, কখনো বা জনহিতকর দাক্ষিণ্যের ভিতর দিয়ে, কখনো দেশপ্রেমমূলক কর্মপ্রয়াসের ভিতর দিয়ে এবং কখনো বা কবিতা ও সাহিত্য-কর্মের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে দেখা যায়। কবি তিনি এইভাবেই হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবনীকার যথার্থই বলেছেন: 'It was but the inner-urge of an idealistic longing that having seen must ever be.' কাজেই কবিতা-রচনা তাঁর অবসর-বিনোদনের কাজ বা বিলাসিতা ছিল না। কবিতার ভিতর দিয়ে তিনি নিজেকে অনেকখানি প্রকাশ করেছেন; তাঁর শিল্পে ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন আছে এবং গীতি-কবিতার যে সুর তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে তা অভিনয় নয়, অনুকরণ নয়—তা তাঁর অন্তরের গভীরতম অনুভূতির উৎস থেকেই উৎসারিত হয়েছে। সকলের উপর, চিত্তরঞ্জন খাঁটি বাঙালী কবি—পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের রীতিনীতির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবেই মুক্ত বাঙালী কবি। তাঁর কবিত্ব প্রতিভায় বাঙালী তাই গৌরব বোধ না করেই পারে না।

একথা হাজারবার সত্য যে, 'চিত্তরঞ্জনের জীবন তাঁহার সাহিত্য-সাধনার সহিত অবিচ্ছেদ্যরূপে সম্পৃক্ত। জীবনে সাধনার স্তরে স্তরে রসানুভূতির উচ্চতার সোপানে সোপানে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তাঁহার সাহিত্য-সাধনার ক্রমোন্নতি হইয়াছে। তাঁহার রচিত কাব্য তাঁহার জীবনকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হয় নাই।'* চিত্তরঞ্জন জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, প্রাচীন বাংলার কবিকুলের সাধন জীবনকেও অঙ্গীকার করেই সার্থক হয়েছিল। তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার প্রতিফলন ছিল তাঁর কর্মের মধ্যে। কবি চিত্তরঞ্জন এই ধারার একজন একনিষ্ঠ ধারক ও বাহক ছিলেন—সাহিত্যিকে, কবিতাকে তিনি জাতির জীবনধর্মের

---

* দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন: কুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

অঙ্গীভূত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যপট যেইমাত্র পরিবর্তিত হলো, অমনি কবি পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলেন তাঁর কাব্যসাধনায়। পরিণতির সোপানে যখন তিনি সবেমাত্র পৌঁছেছেন অমনি দেশ-জননীর কণ্ঠ আশ্রয় করে এলো আহ্বান—সে আহ্বানে সাড়া দিলেন কবি তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে। বাঁশী ও কদম্বমালা রইল পিছনে পড়ে—কবি বাণী-বিতান ত্যাগ করে বেড়িয়ে পড়লেন দেশসেবার কণ্টকময় পথে। এখানেও দেখা যায়, তাঁর দেশচর্যা শুধু কথার তুবড়ি ফুটিয়ে নয়, কাজের ভিতর দিয়ে তাঁর আরাধনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। ছন্দে ও সুরে যা পূর্ণ হয় নি, এইবার কর্মে তা সার্থক করবার জন্য, পূর্ণ করবার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন। কবি চিত্তরঞ্জন এবার রূপান্তরিত হলেন দেশসেবক চিত্তরঞ্জনে—স্বরাজরথের সারথিরূপে। এই দিক দিয়ে বিচার করলে, দেশবন্ধুর সমগ্র জীবন-টাকেই আমরা একখানি মহাকাব্য বলে গণ্য করতে পারি।

॥ আট ॥

রসা রোডের বাড়িতে 'নারায়ণ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দেশবন্ধু। নির্জীব কোন শালগ্রাম শিলা নয়—'নারায়ণ' নাম দিয়ে তিনি কিছুকাল একখানি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। এই পত্রিকাখানি বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে যেমন একটি দিক্‌চিহ্নের গৌরব অর্জন করেছিল, তেমনি চিত্তরঞ্জনের সাহিত্য-কর্মের একটি বিশেষ নিদর্শন এই পত্রিকাখানি। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা তাই এই পত্রিকাখানি সম্পর্কে কিছু বলব।

দেশবন্ধুর সমগ্র জীবনটা ছিল এগিয়ে চলার জীবন। কর্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে অবধি হিমালয়ের কোলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগের দিনটি পর্যন্ত দেখা যায় যে, জীবনের নানা পর্বে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তিনি সমানে এগিয়ে গিয়েছেন। কাব্য সাধনার ক্ষেত্রে যেমন রসানুভূতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি একটা নতুন শক্তির, একটা নতুন ভাবের উদ্বোধন করার জন্য 'নারায়ণ' পত্রিকা প্রকাশে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিত্তরঞ্জন দাশ ও প্রমথ চৌধুরী—এই ত্নটি নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁদের সম্পাদিত 'নারায়ণ' ও 'সবুজপত্র'—এই সাময়িক পত্রিকা ত্ন'খানির জন্য। ত্ন'জনেই ছিলেন বিদগ্ধ সাহিত্যরসিক ও সুলেখক কবিও। আবার ত্ন'জনেই ছিলেন ব্যারিস্টার। আইন-ব্যবসায়ে অবশ্য চৌধুরী মশাই বিশেষ মনোযোগ দেন নি—সে প্রতিভাও তাঁর ছিল না, কিন্তু তিনি ছিলেন জাত-সাহিত্যিক। উভয়েরই ছিল অসাধারণ সাহিত্যপ্রীতি এবং সাহিত্যে একটা নতুন দিগন্তের সন্ধান প্রয়াসে ব্রতী হয়েছিলেন ত্ন'জনেই। চিত্তরঞ্জন যখন একখানি নতুন মাসিক পত্রিকা বের করবেন ঠিক করেছেন, প্রমথ চৌধুরীও ঠিক সেই একই সময়ে একখানি নতুন

মাসিক পত্রিকা বের করার কথা চিন্তা করছিলেন। দু'জনেই সঙ্গতিসম্পন্ন, তাই দু'জনেই সম্পূর্ণ নিজব্যয়ে এই সাহিত্যকর্মে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং উভয়েই নিজ নিজ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন ছিলেন 'নারায়ণ' পত্রিকার সম্পাদক, প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্রে'র। উভয়েই নিজ নামের মুদ্রাঙ্কিত করে দিতে পেরেছিলেন তাঁদের স্ব স্ব পত্রিকায়। প্রমথ চৌধুরীর বিশেষ সুবিধা ছিল এই যে, তিনি তাঁর এই সাহিত্যপ্রয়াসে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ও সহায়তা দুই-ই লাভ করেছিলেন। এর একটা বিশেষ কারণ ছিল। চৌধুরী মশাই ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির জামাই ও কবির বিশেষ স্নেহের পাত্র। বিদগ্ধ সাহিত্যরসিক ও কবি এবং একজন প্রথম শ্রেণীর সমালোচক ও প্রাবন্ধিক হিসাবেই তিনি জোড়াসাঁকোর সাহিত্য-দরবারে একটা সহজ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

অন্যদিকে চিত্তরঞ্জনের সে সুবিধা ছিল না, এবং তিনি সে সুবিধাপ্রার্থীও ছিলেন না। তাঁর নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস ছিল। তা ছাড়া, তাঁর সাহিত্যের আদর্শই ছিল স্বতন্ত্র, কিছুটা revivalist; সেইজন্য বাংলার ঐতিহ্যে, বাঙালীর ঐতিহ্যে বিশ্বাসী বলে যাঁরা নিজেদের মনে করতেন, চিত্তরঞ্জন সেই সব বিশিষ্ট লেখকদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করতে পেরেছিলেন। পত্রিকা দু'খানিই ছিল স্বল্পায়ু, চার-পাঁচ বছরের বেশি কোনটাই স্থায়ী হতে পারে নি, কিন্তু তাদের সেই স্বল্পায়ু জীবনেই 'নারায়ণ' ও 'সবুজপত্র' স্ব স্ব আদর্শ অনুযায়ী সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে নিজ নিজ নামের স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছে। পত্রিকা দু'খানির সুর ছিল আলাদা, আদর্শ পৃথক আর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরুতে যতখানি তফাৎ, চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণ' ও প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্রে'র মানসিকতার মধ্যে ঠিক সেই ব্যবধান। তথাপি এ কথা সত্য যে সেদিনের কলকাতার সাহিত্য-জগতে 'নারায়ণে'র

পূজারীবৃন্দের যেমন অভাব হয় নি, 'সবুজপত্রে'র নিশান তুলে ধরবার জন্য যোগ্য লেখকগোষ্ঠীরও তেমনি অভাব হয় নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এর ললাটে জয়-তিলক এঁকে দিয়েছিলেন এই বলে ঃ

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।*

চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণ' পত্রিকার কথা আলোচনা করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। 'নারায়ণ' তাঁর পরিণত সাহিত্য-প্রতিভার ফল। দেশবন্ধু-দুহিতা এই প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ 'বাংলার প্রাণধারার সন্ধান নিবার এবং দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই এ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আমাদের তথা-কথিত ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজে তখন বাংলার সংস্কৃতির আদর ছিল না; বিশেষ করে দেশের সংস্কৃতির দিকে এ সমাজের তেমন দৃষ্টি ছিল না বললেই চলে। তাই বাবা 'নারায়ণ' পত্রিকা বার করে সমাজের এ অংশটিকে সচেতন করবার এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যকে একটা নতুন রূপ দিয়ে তার হৃতমান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পান।' এখানে 'নারায়ণ' পত্রিকা প্রকাশ করবার প্রধান উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়টা জানা গেল। চিত্তরঞ্জন স্বয়ং শিক্ষিত-সমাজের একজন প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, বিলাতে তিনি কিছুকাল শিক্ষাও লাভ করেছিলেন এবং একবার নয় দুইবার তিনি পাশ্চাত্ত্য দেশ ঘুরে এসেছেন ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার নিকট সংস্পর্শেই এসেছিলেন। এমন কি, যে পরিবারের মধ্যে তিনি শৈশব ও কৈশোরে মানুষ হয়েছেন সেখানকার আদব-কায়দা বা রীতিনীতির মধ্যে যে নির্ভেজাল বাঙালী-সংস্কৃতি বা বাঙালী জীবন-বিন্যাসপ্রীতি ছিল তা নয়। বিপিনচন্দ্র পালের সাক্ষ্যে জানা যায় যে, 'চিত্তরঞ্জন পিতৃ-পরিবারে আধুনিক ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের রীতিনীতি ও আবহাওয়ার

* সবুজপত্র, প্রথম সংখ্যা, ১৩২১ : সবুজের অভিযান : রবীন্দ্রনাথ।
মানুষ চিত্তরঞ্জন : অপর্ণা দেবী।

মধ্যেই বাড়িয়াছিলেন।' কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিলাত-ফেরৎ এবং ব্রাহ্ম-পরিবারের সন্তান হয়েও চিত্তরঞ্জন খাঁটি বাঙালী ছিলেন—মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন বাংলার নিজস্ব জীবনধর্মের অনুরাগী। স্বদেশের সাধনা ও সভ্যতার প্রতি তিনি চিরকালই একটা তীব্র ও গভীর অনুরাগ পোষণ করতেন। 'নারায়ণ' ছিল সেই অনুরাগের চন্দনে চর্চিত একটি সাহিত্য-বিগ্রহ। পূজারীর নিষ্ঠা ও ভক্তি নিয়েই তিনি এই পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং বাংলা দেশের সমকালীন জ্ঞানী-গুণীদের আহ্বান জানিয়েছিলেন নারায়ণের অর্চনার জন্য। তাঁদের সকলেই তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন এবং এঁদের সকলের সহযোগিতায় সেদিন রসা রোডের বাড়িতে যেরকম ষোড়শোপচারে 'নারায়ণ'-পূজার ধূম পড়ে গিয়েছিল, তা অনেককেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

বস্তুতঃ 'নারায়ণ' ও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা দুইটির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।* ইংরেজী শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর সমকালীন শিক্ষিত সমাজের অবহেলা উপেক্ষা দেখে কলম ধরেছিলেন, বাঙালীকে বাংলার মর্ম দর্শন করাতে অভিলাষী হয়েছিলেন, এই শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে চিত্তরঞ্জনও ঠিক অনুরূপ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই এই পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন এবং এই আদর্শকে রূপায়িত করবার জন্য তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবানুসারী খ্যাতনামা সাহিত্যিকগোষ্ঠীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন নারায়ণের অর্চনার জন্য। চিত্তরঞ্জন স্বয়ং ছিলেন এর পূজারী অর্থাৎ সম্পাদক আর পত্রিকা-সম্পাদনে তাঁকে সহায়তা করতেন গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ও প্রকাশচন্দ্র দত্ত। এই গিরিজাশঙ্কর পরবর্তীকালে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন প্রথম শ্রেণীর মননশীল লেখক হিসাবে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

* লেখকের 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, দীনেশচন্দ্র সেন, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, নাটোরাধিপ জগদীন্দ্রনাথ রায়, ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী, যতীন্দ্রমোহন সিংহ, কালিদাস রায়, কিরণশঙ্কর রায়, হেমন্তকুমার সরকার, সুকুমাররঞ্জন দাস, হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, প্রিয়ংবদা দেবী প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে যাঁরা বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ ছিলেন তাঁদের অনেকেই উত্তরকালে বাংলা সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও কবি বলে পরিচিত হয়েছিলেন। কিরণশঙ্কর রায় 'সবুজপত্রে'র লেখকগোষ্ঠীরও অন্তর্গত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কোন রচনা কখনো 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। যেমন শরৎচন্দ্রের কোন লেখা কখনো 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয় নি। এখানে উল্লেখ্য যে তাঁর পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে আর একজনকে চিত্তরঞ্জন পেতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর বন্ধু অরবিন্দ। কিন্তু তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি, কারণ অরবিন্দ নিজেই তখন পণ্ডিচেরী থেকে 'আর্য' নাম দিয়ে ইংরেজীতে একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা বের করেছেন এবং ঐ পত্রিকার জন্য বেশির ভাগ লেখা একা তাঁকেই লিখতে হতো। তবে জানা যায় যে, বন্ধু চিত্তরঞ্জনের এই উদ্যমকে অভিনন্দিত করে তিনি একখানি পত্র তাঁকে লিখেছিলেন।

'নারায়ণ' আরো একজন কবিকে স্থান দিয়েছিল। তিনি গোবিন্দচন্দ্র দাস। কলকাতার কোন মাসিক পত্রিকায় যখন ভাওয়ালের এই নির্যাতিত ও নির্বাসিত স্বভাব-কবির রচনা প্রকাশিত হয় নি, তখন চিত্তরঞ্জন এই কবিকে যে সম্মান দিয়েছিলেন তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। 'নারায়ণে'র পূজার প্রথম ফুলটি ছিল গোবিন্দ দাসের প্রদত্ত। এর প্রথম সংখ্যায় সর্বপ্রথমে যে দীর্ঘ কবিতাটি প্রকাশিত

হয়েছিল সেটির নাম ছিল 'নারায়ণ'; রচয়িতা—গোবিন্দচন্দ্র দাস। স্বভাব-কবির এটি একটি অবিস্মরণীয় রচনা। এই সুদীর্ঘ কবিতাটির মধ্যে কবি দশাবতারের যে নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তার ছন্দ, ভাব ও ভাষা জয়দেব-রচিত দশাবতার-স্তোত্র অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। চিত্তরঞ্জন এই কবিতাটি পাঠ করে এতদূর মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি কবিকে এজন্য পারিশ্রমিক হিসাবে একশত টাকা দিয়েছিলেন*। বাংলা দেশে একটি কবিতার জন্য একশত টাকা পারিশ্রমিক পাওয়ার দৃষ্টান্ত সেই প্রথম। 'সবুজপত্রে'র প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনাটিও ছিল কবিতা; রবীন্দ্রনাথের 'সবুজের অভিযান।' গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরীর মুখে শুনেছি যে গোবিন্দ দাস যেদিন কবিতাটি লিখে নিয়ে এলেন ও চিত্তরঞ্জনকে সেটি পাঠ করে শোনালেন, সেদিন তিনি মুগ্ধচিত্তে কবিকে বলেছিলেন, 'নারায়ণ' সম্বন্ধে আমার মনের ছবিকেই দেখছি আপনি ফুটিয়ে তুলেছেন এই কবিতায়। তাঁর চরণে এই ফুলটি নিবেদন করেই আমাদের যাত্রা শুরু হবে। আপনাকে এজন্য একশত টাকা পারিশ্রমিক দেব, কিন্তু হাজার টাকা দিলেও এর প্রকৃত মূল্য দেওয়া যায় না। আপনি আমার কাগজে নিয়মিত লিখবেন।'

এখানে একটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করব, কারণ দেশবন্ধুর জীবনের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। ভাওয়াল জমিদারির একজন সামান্য কর্মচারী হিসাবে গোবিন্দ দাসের উপর কি রকম নির্যাতন হয়েছিল, সে মর্মন্তুদ কাহিনী আজ আমাদের বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেছে। 'বান্ধব'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ (ইনি তখন ভাওয়ালের ম্যানেজার ছিলেন) রাজকুমারের লালসা চরিতার্থ করার জন্য এই কবির জীবনকে কিভাবে বিষময় করে তুলেছিলেন, সে কাহিনী সুবিদিত। এরই ফলে কবিকে শেষ পর্যন্ত দেশত্যাগী

হতে হয়। ভাগ্যবিড়ম্বিত কবি তখন কলকাতায় এসে একমাত্র চিত্তরঞ্জনের কাছেই সহানুভূতি লাভ করেছিলেন। সেই সময়ে তাঁর নির্যাতিত জীবনের ইতিহাস অবলম্বনে তিনি 'মগের মুলুক' নাম দিয়ে একটি সুদীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন। একদিন তিনি ঐ কবিতাটি চিত্তরঞ্জনকে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। শুনতে শুনতে চিত্তরঞ্জন অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি। কবির ইচ্ছা ছিল, 'মগের মুলুক' মুদ্রিত হয়ে প্রচারিত হয়। চিত্তরঞ্জন এর মুদ্রণ-ব্যয়ভার বহন করবেন বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু এই সংবাদ অবগত হয়ে কবিতাটি যাতে প্রকাশিত হতে না পারে সেজন্য কালীপ্রসন্ন ঘোষ হাইকোর্টে আবেদন করে কবির উপর একটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করান। সেই কারণে কবিতাটি আর ছাপা হতে পারে নি। অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল গত হয়ে গিয়েছে—যে ঘটনা ও যাদের উদ্দেশ করে 'মগের মুলুক' লেখা হয়েছিল, সেই ঘটনা তো আজ সুদূর অতীতকালের বিষয় এবং কবিতায় উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের কেউই এখন ইহলোকে নেই, কবিও জীবিত নেই—এমন অবস্থায় হাইকোর্ট প্রদত্ত স্থায়ীনিষেধাজ্ঞা (Permanent injunction) লর্ড কর্ণওয়ালিশের সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো অনন্তকাল ধরে বলবৎ থাকতে পারে কিনা—সাহিত্যানুরাগী সুধী সমাজের কাছে এই প্রশ্নটি আমি রাখলাম।

গোবিন্দ দাসকে দেশবন্ধু কতখানি ভালবাসতেন তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ্য। ১৯১৫ সালে কবি যখন অস্ত্র-চিকিৎসার জন্য ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি হন, তখন সেই সংবাদ পেয়ে দেশবন্ধু যারপরনাই উদ্বিগ্ন হন। তিনি তখন ভাগলপুরে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে তিনি ঢাকার ব্যারিস্টার প্রাণকৃষ্ণ বসুকে তারযোগে জানান—'গোবিন্দ দাসের জন্য যেন চিকিৎসার ভাল রকম ব্যবস্থা হয়। সমস্ত খরচের দায়িত্ব আমার। কবি যখন যেমন

থাকেন, আমাকে সংবাদ দিবেন।' এই মহাপ্রাণতার জন্যই তো দেশবন্ধু—দেশবন্ধু।

'নারায়ণ' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একশ্রেণীর পাঠকের নিকট যেমন সমাদৃত হয়েছিল, তেমনি তথা-কথিত প্রগতিবাদীদের নিকট সংরক্ষণশীল বলে উপহাসিতও হয়েছিল। চিত্তরঞ্জনের কয়েকটি গান, প্রবন্ধ, দুটি ছোট গল্প ব্যতীত তাঁর 'অন্তর্যামী ও 'কিশোর-কিশোরী' কাব্য দুখানি এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর প্রথম জীবনের সেই 'বারবিলাসিনী' কবিতাটি নিয়ে যেমন, তেমনি 'নারায়ণে' প্রকাশিত তাঁর 'ডালিম' গল্পটি নিয়েও অনেকে চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিগত জীবনের উপর কটাক্ষপাত করতে দ্বিধা করেন নি। মহাপুরুষের নিকট নিন্দা-স্তুতি সবই কিন্তু তুল্য-মূল্য ছিল—কারণ কবি ও সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জনের অন্তর ছিল নির্মল ও উদার—সেখানে লেশমাত্র সংকীর্ণতার স্থান ছিল না। 'বাংলা কবিতার প্রাণধারা' * চিত্তরঞ্জনের একটি চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ। চণ্ডীদাস থেকে কৃষ্ণকমল গোস্বামী পর্যন্ত কবিতার যে ধারাটি অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত রয়েছে তারই একটি মূল্যায়ন তিনি করেছেন এই প্রবন্ধটিতে। তিনি যে একজন কত বড় বৈষ্ণব সাহিত্য-রসিক ছিলেন, এটি তারও একটি অভ্রান্ত নিদর্শন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ছাত্রদের পড়বার জন্য যে-সব পাঠ্য পুস্তক আছে সেগুলির মধ্যে চিত্তরঞ্জনের এই সুচিন্তিত প্রবন্ধটি সন্নিবেশিত হওয়া উচিত। 'নারায়ণ' পত্রিকায় তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হলো—'বাংলার গীতি-কবিতা' চণ্ডীদাস সম্পর্কে এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুন্দর রচনা খুব কম সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই দেখা গিয়েছে। চণ্ডীদাস তাঁর প্রিয় কবি,

* 'নারায়ণ', ফাল্গুন, ১৩২১

চণ্ডীদাসের তিনি ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তাই বলে ভক্তের অনুরাগসিক্ত মন বা চিন্তা নিয়ে তিনি যে এই প্রবন্ধটি রচনা করেন নি, তা এটি পাঠ করলেই বোঝা যায়। অপূর্ব যুক্তি সহকারে চণ্ডীদাসের প্রাধান্যকে তিনি তুলে ধরেছেন। ১৯১৭ সালে বাঁকীপুর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে চিত্তরঞ্জন 'বাংলার গীতি-কবিতা', সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন, সেটিই ঈষৎ মার্জিত আকারে 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দীনেশচন্দ্র সেন এই প্রবন্ধটি পাঠ করে এতদূর মুগ্ধ হন যে, একদিন সন্ধ্যায় তিনি রসা রোডের বাড়িতে এসে চিত্তরঞ্জনকে অভিনন্দিত করে বলেনঃ 'আপনি কত বড় ব্যারিস্টার তা আমি জানি না, কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যের আপনি যে একজন অধিকারী পুরুষ তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। আমিও তো সারাটা জীবন এই নিয়ে কাটালাম, কই এমন ভাবে আমি তো নিজেকে কখনো প্রকাশ করতে পারি নি। আপনি যথার্থ বৈষ্ণব।'*

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে বিশেষভাবেই করা দরকার। কলকাতার শিক্ষিত সমাজে, বিশেষ করে সংস্কৃতিবান পরিবারে কীর্তন জিনিসটা বহুকাল উপেক্ষিত ও অনাদৃত ছিল। এই মহানগরীতে সেই কীর্তনকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার মূলে ছিল দীনেশচন্দ্রের অক্লান্ত প্রয়াস আর তাঁর এই সাধু প্রচেষ্টায় তিনি সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভ করেছিলেন চিত্তরঞ্জনের কাছ থেকে। তিনি নিজেই লিখেছেন; 'একদা আমি চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের নিকট প্রস্তাব করিলাম যে, আমরা যদি এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করি, যাহাতে প্রতি বৎসর কলকাতায় কীর্তনের প্রতিযোগিতা হয় এবং শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়াদিগকে কয়েকটি পুরস্কার দেওয়া হয়—তবে বোধ হয় বাংলা দেশের এই বিশিষ্ট সঙ্গীত-

* লেখক একদা বেহালায় দীনেশচন্দ্র সেনের বাসভবনে চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে তাঁর স্বমুখে এই কথা শুনেছিলেন।

ধারাটি প্রোৎসাহিত হইতে পারে। অজ্ঞ পল্লীবাসীর মধ্যে এখন উহা আবদ্ধ আছে। অথচ মহাপ্রভু-প্রণোদিত কীর্তন বঙ্গীয় সংস্কৃতির একটি উৎকৃষ্ট সামগ্রী। চিত্তরঞ্জন ইহার অনেক পূর্বেই কীর্তনের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তিনি আমার কথাটা খুব আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন—টাকা আমি তুলিয়া দিব, তজ্জন্য ভাবনা করিবেন না।'* স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন এবং তাঁকে সভাপতি, চিত্তরঞ্জনকে সহঃ সভাপতি এবং দীনেশচন্দ্রকে সম্পাদক করে একটি কমিটিও গঠিত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এর অব্যবহিত পরে দীনেশচন্দ্রের গুরুতর অসুস্থতার জন্য প্রস্তাবটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। তবে দীনেশচন্দ্রের অনুরোধে চিত্তরঞ্জন তাঁর বাড়িতে প্রাচীন বাংলা-পুঁথির একটি সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এইবার চিত্তরঞ্জনের প্রবন্ধের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। এই সুচিন্তিত আলোচনায় তিনি বৈষ্ণব-কবিতাকে বাংলার প্রাণের অভিব্যক্তি বলেই দেখিয়েছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে তখনো পর্যন্ত বৈষ্ণব-কবিতা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ-মূলক যথার্থ সাহিত্যিক আলোচনা খুব বেশি দেখা যায় নি বললেই হয়। চিত্তরঞ্জনের গদ্য-রচনা ও সাহিত্য-চিন্তার নিদর্শন হিসাবে এই প্রবন্ধটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে দিলাম। তিনি লিখেছেন:

'কেহ কেহ বলেন বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য রূপক। মানুষের নিজের অর্থাৎ বৈষ্ণব কবিগণের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও সত্যের উপরে নাকি তাহার প্রতিষ্ঠা নহে। কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা তাহাকে কল্পনা করিয়া লইয়া ও ইউরোপীয় সাহিত্যের অভিজ্ঞতাকে সেই কল্পনার সাহায্যে আপনার অভিজ্ঞতা মনে করিয়া লইয়া সেই অভিজ্ঞতা দিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্য ও বৈষ্ণব-কবিতা বুঝিতে গেলে বোধ হয় রূপকের আবশ্যক হয়। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদিগের

* আশুতোষ স্মৃতি-কথা: দীনেশচন্দ্র সেন

প্রত্যেকের অনুভূতি যে তাঁহাদের হৃদয় ও প্রাণের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার উপরেই স্বাধিষ্ঠিত। বৈষ্ণব-কবিতার মধ্যে প্রাণের সাড়া পাই। বৈষ্ণব কবিদিগের শ্রীকৃষ্ণ কাল্পনিক নহে। বৈষ্ণবের শ্রীরাধা তাঁহাদের জীবনের প্রাণের মর্মের শতদলের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই যুগল আমাদের সভ্যতা-সাধনা শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে শত শত বিচিত্র রূপ প্রকাশিত করিয়াছে। চণ্ডীদাসের কবিতাই বৈষ্ণব কবিদের ভাব-মাধুর্যের আদর্শ।'

'নারায়ণে' প্রকাশিত চিত্তরঞ্জনের আর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ—'রূপান্তরের কথা।' এই প্রবন্ধটিও সুন্দর ও সারগর্ভ। তিনি লিখেছেন: ভাব যখন সত্যই রূপের কাছে ধরা দেয় তখনই তাহা শুধু মধুর ও সুন্দর। সত্য যখন মানব-মনে প্রতিভাত হয়, ভাব যখন সেই আকারে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে, তখন সে ভাব কাল্পনিক নহে, সত্যের আভাস নহে, তাহা রূপ, তাহাই সত্য স্বরূপ। সত্যের রাজ্যে নিত্য যে লীলা চলিয়াছে তাহাতে ভাব ও আকারে পার্থক্য নাই। সে লীলা কাব্যলোকের নিভৃত মিলনক্ষেত্র।'—এমন কথা অনুভূতি-সিদ্ধ লেখক ভিন্ন আর কারো লেখনী থেকে সম্ভব নয়।

"বঙ্কিম-সংখ্যা" নারায়ণ এই পত্রিকার একটি অক্ষয় কীর্তি। চিত্তরঞ্জনের কবি-চেতনার মূলে যদি থাকেন চণ্ডীদাস, তাহলে আমরা বলব যে তেমনি তাঁর স্বদেশ-চেতনার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর জীবনেতিহাসে দেখতে পাই যে, চিত্তরঞ্জন যখন স্কুলের ছাত্র তখন "আনন্দমঠ" প্রথম প্রকাশিত হয়; সেই সময়েই যুগান্তকারী সেই উপন্যাস পাঠ করে তিনি স্বদেশ-সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকবেন। তিনি যথার্থ বঙ্কিম-ভাবের ভাবুক ছিলেন—কি সাহিত্য-সাধনায়, কি রাজনৈতিক কর্মে। ব্যারিস্টার হিসাবে চিত্তরঞ্জনের হাইকোর্টে যোগদান ও বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু একই বছরের ঘটনা। সাহিত্য-সম্রাটের লোকান্তর গমনের দুই দশক পরে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার ও সাহিত্য-সৃষ্টির মূল্যায়নের জন্য সংঘবদ্ধ প্রয়াস বাংলাদেশের সাহিত্য-

জগতে সেই প্রথম। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের নাম করতে হয়। বাংলাদেশে তিনিই ছিলেন বঙ্কিম-পূজার প্রবর্তক এবং চিত্তরঞ্জনের অনেক আগেই তিনি বঙ্কিম-উৎসবের আয়োজন করেছিলেন সেই স্বদেশী যুগের প্রাক্কালে। তাঁর এই প্রয়াসের প্রশংসা করেছিলেন চিত্তরঞ্জন ও এই ব্যাপারে তাঁকে কিছু অর্থ সাহায্যও করেছিলেন বলে জানা যায়।

সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে নারায়ণ পত্রিকার 'বঙ্কিম-সংখ্যা' প্রবন্ধ গৌরবে সত্যিই অতুলনীয় হয়ে আছে। ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে যখন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকগণের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে 'বঙ্কিম-সংখ্যা' নারায়ণ প্রকাশিত হলো তখন শিক্ষিত বাঙালী একবাক্যে চিত্তরঞ্জনের এই প্রয়াসের জন্য সম্পাদক হিসাবে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিল। ছবি, ব্লক, রচনার পারিশ্রমিক প্রভৃতি বাবদ এই সংখ্যাটির জন্য তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করেছিলেন। এতটা তিনি কেন করেছিলেন? এর উত্তরে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি একজন যুগপুরুষ বলেই মনে করতেন। তাঁর নিজের কথায়— "বঙ্কিমচন্দ্র একজন ব্যক্তি নহেন, তিনি একটি যুগ।" সেই যুগপুরুষকে তিনি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন বঙ্কিমের কয়েকজন মনস্বী ভক্ত-প্রদত্ত নৈবেদ্য সাজিয়ে। অনুসন্ধিৎসু কোন পাঠক যদি নারায়ণের এই সংখ্যাটি আজও পাঠ করেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন।

চিত্তরঞ্জন গান রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর পিতা ভুবনমোহন একজন সুগায়ক ছিলেন। ব্রহ্মসঙ্গীত বইতে তাঁর লেখা অনেক গান আছে। পুত্র চিত্তরঞ্জন উত্তরাধিকারসূত্রে এই প্রতিভার অধিকারী হয়েছিলেন। 'গান ও কবিতা আমি ছেলেবেলা থেকেই লিখতাম,' বলতেন চিত্তরঞ্জন। তবে পিতার মতো তিনি গায়ক ছিলেন না, কিন্তু সঙ্গীতপ্রিয়তা তাঁর স্বভাবের একটি লক্ষণীয়

বৈশিষ্ট্য ছিল। 'নারায়ণ' পত্রিকায় তাঁর লেখা কয়েকটি গানের মধ্যে যেটি সেই সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এবং তৎকালীন একজন প্রসিদ্ধ সুরকার যে গানটিতে সুর-সংযোজনা করেছিলেন, চিত্তরঞ্জনের সেই গানটি এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম ঃ

নামিয়ে নাও জ্ঞানের বোঝা
সইতে নারি বোঝার ভার
(আমার) সকল অঙ্গ হাঁপিয়ে ওঠে
নয়নে হেরি অন্ধকার।
সেই যে শিরে মোহন-চূড়া,
সেই ত হাতে মোহন-বাঁশী,
সেই মূরতি হেরব বলে
পরাণ বড় অভিলাষী ;
বাঁকা হয়ে দাঁড়াও হে
আলো করি কুঞ্জদুয়ার
এস আমার পরশমাণিক
বেদ-বেদান্তে কাজ কি আর।

কি কবিতা, কি গান—এই নিবিড় আধ্যাত্মিক অনুভূতিই ছিল তাঁর এই জাতীয় রচনার উৎস। চিত্তরঞ্জন এখানে একাধারে কবি ও সাধক।

কথাশিল্পেও 'নারায়ণ' নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। এই পত্রিকার মাধ্যমেই আমাদের দেশের নাটক, কাব্য, ধর্ম, সঙ্গীত, চারুকলা, সংস্কৃতি, অনুবাদ-সাহিত্য ও উচ্চমানের সমালোচনা স্বজাতির সামনে এক নতুন দৃষ্টিতে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি এবং চার বছর কালের মধ্যে কতখানি সম্ভব তা তিনি অনন্যমনেই করেছিলেন। পাশ্চাত্ত্য ভঙ্গির প্রগতি নয়, আধুনিকতার নামে উন্মার্গগামিতাও নয়, জীবনের বিশিষ্ট অনুভূতির সত্য রূপকেই আবেগহীন অথচ দৃঢ় প্রত্যয়ের ভাষায় প্রতিধ্বনিত করতে চেয়ে-

ছিলেন চিত্তরঞ্জন এই পত্রিকার মাধ্যমে এবং পত্রিকাটির স্বল্পায়ু জীবনে এই বিষয়ে তিনি যে অনেকখানি সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তা না বললেও চলে। সাহিত্যে, গল্পে, কবিতায়, প্রবন্ধ গৌরবে—সব দিক থেকেই নারায়ণের রত্নবেদীর উপরে নবযুগের নিশান উড়েছিল।

অপ্রিয় হলেও এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ্য। নারায়ণের প্রায় সংখ্যাতেই থাকত রবীন্দ্রনাথের লেখার কঠোর সমালোচনা। অনেকের মতে এটা না থাকলে পত্রিকাখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারত। সেই সময়ে সাহিত্যিক মহলে চিত্তরঞ্জনের একটা অপবাদ রটে গিয়েছিল—তিনি নাকি একজন প্রচণ্ড রবি-বিদ্বেষী এবং কবির সম্পর্কে একটা বিদ্বিষ্ট মন নিয়েই তিনি নারায়ণ পত্রিকা বের করেন। কেউ কেউ বলতেন যে, তিনি পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্নকে মাসিক বেতনে নিযুক্ত করেছিলেন নারায়ণের লেখক হিসাবে শুধু রবীন্দ্রনাথের রচনার ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করবার জন্য। শরৎচন্দ্রকেও তিনি নাকি একবার রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লেখার জন্য অনুরোধ করে-ছিলেন। আমার মনে হয়, এই জাতীয় ধারণার কোন ভিত্তি নেই, অন্ততঃ শরৎচন্দ্রের মুখে লেখক দেশবন্ধুর প্রসঙ্গে কখনো শোনেন নি যে, তিনি কখনো এইভাবে নারায়ণ-সম্পাদক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন। তবে নারায়ণের পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের লেখার বিরূপ সমালোচনা যে থাকত তা সত্য এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই সবুজ পত্রে চিত্তরঞ্জনও সময় সময় কঠোরভাবে সমালোচিত হতেন। পত্রিকা আরম্ভ হওয়ার কিছুকাল পরে বারীন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি আলিপুর বোমার মামলার দণ্ডিত আসামীরা যখন মুক্তিলাভ করেন তখন বারীন্দ্র ও উপেন্দ্র এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীতে যোগদান করেছিলেন।

নারায়ণ পত্রিকায় যখন সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের 'কমলের দুঃখ' শীর্ষক উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, তখন এর সম্পাদকের প্রতি অনেকেই কটাক্ষ করেছিলেন এই বলে যে, এমন

অশ্লীল লেখা সি. আর. দাশের কাগজেই বেরুন সম্ভব। এর উত্তরে তিনি শুধু বলতেন—কথা-সাহিত্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। পাঠকের রুচিই এখানে একমাত্র বিচারক।

নারায়ণের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ভাষা-বিরোধে এর ভূমিকা। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন মাসিক পত্রিকায় বাংলা-ভাষার গাম্ভীর্য ও সাবলীলতা নষ্ট হওয়ার উপক্রম দেখে 'নারায়ণ' তীব্র প্রতিবাদ করে। বঙ্কিমচন্দ্রই আলালী ভাষা ও বিদ্যাসাগরী ভাষার মিলন ঘটিয়ে বাংলা ভাষার এক অশেষ কল্যাণময় যুগের সূচনা করে গিয়েছিলেন। নারায়ণ ছিল এই ভাষার পক্ষপাতী; সবুজপত্র ছিল এর বিপরীত দিকে। সাহিত্যে চলতি ভাষার বা কথ্যভাষার স্বপক্ষে ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। সেই সময়ে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ প্রদান করেন, সেটি সবুজপত্রের একটি গোটা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, কারণ সে ভাষা সহজ, সরল, সুঠাম ও সুপাঠ্য। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথোপকথনের ভাষাই প্রকৃত সাধুভাষা'। নারায়ণের পৃষ্ঠায় এর জবাব দিয়েছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও যতীন্দ্রমোহন সিংহ। শেষোক্ত লেখকের 'ভাষার কথা' নারায়ণের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। ইনি ছিলেন চিত্তরঞ্জনের সহপাঠী ও একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক। বলা বাহুল্য, সাহিত্যে সাধুভাষারই পক্ষপাতী ছিল এই 'নারায়ণ'।

এই পত্রিকার সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জড়িত ছিল। 'কিশোর-কিশোরী'-তে যেমন তাঁর কবি-জীবনের পরিসমাপ্তি, তেমনি এই পত্রিকাখানি উঠে যাওয়াতে তাঁর সাহিত্য সাধনায় ছেদ পড়ে এবং তখন থেকেই কবি চিত্তরঞ্জন, সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জন ভাবের জগৎ থেকে কর্মের জগতে মুখ ফেরালেন, সাহিত্য-কর্ম বর্জন করে রাজনৈতিক কর্মে ঝাঁপ দিলেন। এই অধ্যায় শেষ

করবার আগে প্রসঙ্গতঃ আরো দু'-একটি বিষয়ের উল্লেখ করব। ধর্ম ও জাতীয়তার একত্র সংযোগেই চিত্তরঞ্জনের সাহিত্য। এ তিনি পেয়েছিলেন নিঃসন্দেহে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে। কাব্যচর্চা তাঁর কাছে যেমন অবসর বিনোদনের বিষয় ছিল না, সাহিত্য-কর্মও তেমনি তাঁর কাছে নিছক বিলাসিতার বিষয় বলে কোনদিনই গণ্য হয় নি। এই দুটির মাধ্যমেই তো তাঁর ভিতরকার জাগরণের প্রক্রিয়াটা সকলের অগোচরে সম্পূর্ণভাবে, সার্থকভাবে সাধিত হয়েছিল। 'নারায়ণ' পত্রিকার জন্য তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করেছিলেন। এছাড়া, তিনি আজীবন, অর্থাৎ ১৯১০ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলা দেশের বহু সাহিত্য-সভা ও মাসিক পত্রিকার জন্য অকাতরে সাহায্য করেছেন বলে জানা যায়। এর দৃষ্টান্ত 'মানসী' ও 'সাহিত্য'। গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয়ের মুখে শুনেছি যে, 'মানসী'-র প্রথমাবস্থায় এই পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চিত্তরঞ্জন নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন এবং এককালীন অনেক টাকাও দিয়েছিলেন। তেমনি 'সাহিত্য' পত্রিকা তাঁর যেমন প্রিয় ছিল, এর সম্পাদকও ছিলেন তাঁর পরম স্নেহের পাত্র। একবার অর্থাভাবে পত্রিকাটি যখন বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয় তখন চিত্তরঞ্জন সমাজপতি মহাশয়কে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সাহায্য করেন। 'নির্মাল্য' নামক আর একখানি মাসিক পত্রিকার আবশ্যকীয় পরিচালনার ব্যয়ভার তিনি অনেক দিন যাবৎ বহন করেছিলেন; এই পত্রিকাখানির সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ। এই পত্রিকায় তাঁর 'মালঞ্চ' ও 'মালা'-র অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর শত্রুপক্ষের লোকেরা বলত, দাশ সাহেব বিদ্যাবিনোদকে টাকা দেন বিনা স্বার্থে নয়, তাঁর কাগজে তাঁর কবিতা ছাপান হয় বলেই না দেন। তিনি শুনে শুধু হাসতেন। চিত্তরঞ্জনের স্বভাবই ছিল এইরকম। কারো নিন্দায়ই তিনি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। এর একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত দিই। এটি শুনেছিলাম কুমুদবন্ধু সেন মহাশয়ের কাছে।

চিত্তরঞ্জন একবার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসবে কুমুদবন্ধুর অনুরোধে বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন। 'সাহিত্য' সম্পাদক যখন এই সংবাদটি জানতে পারলেন তখন তিনি তাঁর পত্রিকায় লিখলেনঃ 'বেলুড়ে যেন এইরূপ স্বর্ণ গর্দভ গিয়া স্থানটি অপবিত্র না করে'। মন্তব্যটি কঠিন এবং নিতান্ত অশালীন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এজন্য চিত্তরঞ্জনের অনুরাগীরা সমাজপতির উপর ক্রুদ্ধ হন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাঁর উদ্দেশে এই মন্তব্য করা হয়েছিল, দেখা গেল, তিনি নির্বিকার চিত্তে ঐটি গ্রহণ করলেন। শুধু বলেছিলেন, সুরেশ, ভুল করেছে, তার কলম থেকে এটা আশা করি নি। স্বর্ণ গর্দভ তাকেই বলে যে শুধু টাকার বোঝা বয়। আমি তো তা নই। আমি দু'হাতে টাকা রোজগার করি, খরচ করি দশ হাতে। সুরেশ নিজেই তো তা জানে। টাকা দিয়ে আমিই তো তার কাগজটাকে বাঁচিয়েছিলাম। আমি তাহলে কেমন করে স্বর্ণ গর্দভ হলাম? শোনা যায়, সমাজপতি মহাশয় নাকি পরে এজন্য অনুতপ্ত হয়ে চিত্তরঞ্জনের কাছে ক্ষমা চাইতে গিয়েছিলেন। তখন তিনি এই মানুষটির যে মূর্তি দেখেছিলেন ও তাঁর মুখে যে দু'-একটি কথা শুনেছিলেন তা ছিল তাঁর কল্পনার বাইরে। 'সুরেশ, তোমরা আমাকে চিনলে না, টাকা আমার কাছে তুচ্ছ।'—এই কথা বলেছিলেন সেদিনের চিত্তরঞ্জন দাশ যাঁর ওপর তখন লক্ষ্মীর প্রসাদ বর্ষিত হচ্ছিল অজস্রধারায় ও মুক্তহস্তে।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে যেমন, নটগুরু গিরিশচন্দ্র সম্পর্কেও চিত্তরঞ্জন তেমনি অশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।* গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা তাঁর কাছে শেক্সপীয়রের নাট্যপ্রতিভার তুল্যই মনে হতো। গিরিশচন্দ্রের নাটকের অভিনয় দেখতে তিনি ভালবাসতেন। তাই তিনি কুমুদবন্ধু সেনকে দিয়ে 'নারায়ণ' পত্রিকায় গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়ে ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র

* লেখকের 'শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

উভয়েরই রচনার বহু অংশ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জনের সাহিত্যপ্রীতির শেষ নিদর্শন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তাঁর বিপুল সাহিত্য সংগ্রহ দান। রসা রোডের বাড়িতে যেমন বহু সহস্র টাকার আইনের কেতাব ছিল, তেমনি ছিল বহু পুরাতন বাংলা গ্রন্থ, যা তিনি প্রচুর অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের পর সবই তিনি পরিষদ্ গ্রন্থাগারে দান করেন। এর পরেও কি বলতে হবে বাংলা সাহিত্যে 'নারায়ণ' তথা এর সম্পাদক চিত্তরঞ্জনের স্থান কোথায়? স্বদেশপ্রেম ছিল তাঁর সকল সাহিত্য-কর্মের উৎস—এই সত্যটি আমরা যেন কখনো বিস্মৃত না হই।

॥ নয় ॥

চিত্তরঞ্জনকে আমরা রাজনীতির আসরে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে প্রথম দেখতে পাই সেই ১৯০৫ সাল থেকে—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকেই। বাংলায় তখন এক নবজাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছে। এই শতকের প্রথম দশকে কার্জনী-বিধানকে উপলক্ষ করে বাংলায় যে ঝড় উঠেছিল, সেদিনের বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ আকাশে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য যে নতুন চেতনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, সেই ইতিহাসটা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব, কারণ দেশবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের প্রেক্ষাপটের এটা একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ।

১৯০৫

বাংলার রাজনীতিতে আরম্ভ হলো একটি নতুন অধ্যায়। লর্ড কার্জন তখন ভারতবর্ষের বড়লাট ও গভর্ণর-জেনারেল। প্রশাসনিক কাজের সুবিধা হবে, এই ওজুহাতে তিনি গোটা বাংলা প্রদেশকে ভেঙে দুই ভাগে ভাগ করলেন—পূর্ব-বাংলার ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগকে আসামের ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকা জেলা দুটির সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়ে 'পূর্ববঙ্গ' এই নাম দিয়ে একজন নতুন ছোট-লাটের অধীনে একটি নতুন প্রদেশ ও বিহার-উড়িষ্যা সমেত বাংলার প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান বিভাগের জিলাগুলি নিয়ে আর একজন ছোট-লাটের অধীনে আর একটি প্রদেশ গঠিত হয় এবং এর পুরাতন নাম বাংলা প্রদেশ—বহাল থাকে। লর্ড কার্জনের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু ছিল সমগ্র প্রদেশের ক্রমবর্ধমান জাতীয় সংহতি নষ্ট করা এবং নব-জাগ্রত হিন্দু-মুসলমান যাতে মিলিতভাবে সরকারের বিরোধিতা করতে না পারে সেজন্য এইরূপ বিভাগের দ্বারা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করা। এই বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধেই সেদিন সমগ্র

বাঙালীর কণ্ঠে গর্জে উঠেছিল তুমুল প্রতিবাদ—গঙ্গা ও পদ্মার কূলে কূলে জ্বলে উঠেছিল আগুন। সেই আগুনের লেলিহান শিখা থেকেই জন্ম নিয়েছিল ইতিহাস-বিখ্যাত 'স্বদেশী আন্দোলন'। কংগ্রেসের জন্মের পর থেকে (১৮৮৫) স্বাধীনতা লাভের বৎসর পর্যন্ত—এই বাষট্টি বছর কালের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে বাংলার এই স্বদেশী আন্দোলনের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, কারণ এই আন্দোলনের ফলশ্রুতি ছিল আমাদের এতকালের পোষিত রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায় যুগোপযোগী একটি সম্পূর্ণ New spirit বা নতুন চেতনার উন্মেষ। এই নতুন ভাবাদর্শের প্রবক্তা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। এঁরই মধ্যে চিত্তরঞ্জন দেখতে পেয়েছিলেন একজন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী স্বদেশপ্রেমিক ও চিন্তাশীল এক ব্যক্তিকে। বিলাতে থাকতেই অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল এবং দু'জনেই তখন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যপদপ্রার্থী দাদাভাই নৌরজির নির্বাচনে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে পুনরায় এই দুই সহমর্মীর মিলন বোধ হয় ইতিহাস-বিধাতার অভিপ্রেত ছিল।

বিগত শতাব্দীর শেষ বছরে জর্জ নাথানিয়েল কার্জন ভারত-বর্ষের বড়লাট হয়ে এসেছিলেন (১৮৯৯-১৯০৫) একমাত্র বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের মতলব নিয়ে নয়। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তাঁর শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারতে আসার অনেক আগে থেকেই। এই কংগ্রেসের বিনাশ সাধন করার কথাটা তিনি ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেই চিন্তা করতে থাকেন। ১৯০০ সালের শেষ ভাগে ভারত-সচিবকে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন: 'My own belief is that the Congress is tottering to its fall and one of my greatest ambitions, while in India, is to assist it to a peaceful demise'* কিন্তু ভারতের জাতীয়

---

* *Confidential Letters* : Lord Curzon

মহাসমিতির অন্তর্নিহিত শক্তিকে (আবেদন-নিবেদন নীতি সত্ত্বেও) কার্জন ঠিকমতো বুঝতে পারেন নি। রোমসম্রাট সীজারের মতো জাঁকজমকপ্রিয় লর্ড কার্জন যখন দেখলেন কংগ্রেসকে উৎখাত করা কোন মতেই সম্ভব নয়, তখনি তিনি বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের কথাটা বিশেষ-ভাবে চিন্তা করতে থাকেন। বিলাতে যতদিন তিনি পার্লামেণ্টে (হাউজ অব কমন্স) ছিলেন ততদিন তিনি প্রতিভার কোন পরিচয় দিতে পারেন নি। তাই একটা কিছু করে খ্যাতিলাভ করতে হবে— এই রকম একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই তিনি বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনাটা রচনা করে থাকবেন। ১৯০৩ সালে দিল্লীতে দরবার বসিয়ে তিনি অখ্যাতি অর্জন করেন। 'A pompous pageant to a perishing people.' দিল্লী দরবার সম্পর্কে লালমোহন ঘোষের এই তীব্র মন্তব্যটি স্মর্তব্য। তাঁর বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনাটি যে চরম নির্বুদ্ধিতার কাজ হয়েছিল, সে কথা তাঁরই পরবর্তী বড়লাট লর্ড মিণ্টো স্বীকার করেছিলেন। কার্জনের মতো আর কোন বড়লাট ব্রিটিশ শাসনকে এদেশে অমন অপ্রিয় করে তোলেন নি।

বঙ্গবিভাগ তথা স্বদেশী আন্দোলনের আনুপূর্বিক ইতিহাস এখানে আলোচনা করবার প্রয়োজন নেই। সে ইতিহাস আমি ইতিপূর্বে অন্যত্র বিস্তারিতভাবেই বলেছি, বিশেষ করে আমার 'রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র-নাথ' গ্রন্থে। ইতিহাসের বুকে যখন তরঙ্গ ওঠে, আরম্ভ হয় যখন এক একটা আন্দোলন তখন সেই আন্দোলনের গর্ভ থেকে কতকগুলি মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়। এঁরাই অংশতঃ এই আন্দোলনের স্রষ্টা। আবার এই আন্দোলনই এঁদের অংশতঃ সৃষ্টি করে থাকে। আন্দোলনের ফলেই এঁদের আবির্ভাব, এটা সত্য এই কারণে যে, এই পটভূমিকা এবং আন্দোলন সঞ্জাত প্রেরণা না থাকলে এঁদের চিন্তা ও কর্ম বাস্তবে রূপায়িত হতে পারত না। অথবা যদি হতো, তা কোনমতেই ফলপ্রসূ হতো না। আবার এঁরাই যে আন্দোলনের জন্মদাতা, এটাও সত্য। কারণ এর আবেগ ও

আস্পৃহাকে একটা সুবলয়িত রূপ দিয়ে ঠিক পথে পরিচালনা করার জন্যই এই সব ব্যক্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গিয়েছে যে, মহৎ ব্যক্তিরা তাঁদের যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গঠন করতে ও প্রকাশ করতে সহায়তা করে থাকেন এবং এটা করতে গিয়েই তাঁদের নিজস্ব উপলব্ধিকে তাঁরা নিয়ে আসেন বাস্তব রাজনীতির নাগালের মধ্যে।

১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলনকে ভগিনী নিবেদিতা—'An upsurge of the peoples spirit in Bengal'—এই বলে উল্লেখ করেছেন। সত্যিই এই আন্দোলন ঠিক তাই-ই ছিল—বাংলার জন-মানসের একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভ। জাতীয়তার সেই তরঙ্গাভিঘাতে ইতিহাসের গর্ভ যখন স্পন্দিত হলো, তখন কার্জনী-বিধানকে উপলক্ষ্য করে বাংলার রাজনীতিতে একে একে দেখা দিলেন অশ্বিনীকুমার, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব, শ্যামসুন্দর, চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ প্রভৃতি এমন কতকগুলি মানুষ যাঁদের হৃদয় ছিল নব-জাগ্রত জাতীয়তাবাদের ভাবরাশিতে পূর্ণ। স্বদেশের সমস্যা ও এই রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তিচিন্তায় এঁরা সকলেই অবহিত ছিলেন। আনন্দ-মোহন বসু ও রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন এঁদের পূর্ববর্তী এবং এঁদের মত ও পথ স্বতন্ত্র হলেও, স্বদেশী আন্দোলনে এঁরাও ছিলেন উল্লেখযোগ্য নেতা। এই আন্দোলনের কালে চিত্তরঞ্জন বিশেষভাবে যে তিনজনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন তাঁরা হলেন বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর ও অরবিন্দ। চিত্তরঞ্জনের এই সময়কার রাজনৈতিক জীবনের পটভূমি এই তিনজনকে বাদ দিয়ে যেমন সম্পূর্ণ নয়, তেমনি পরবর্তীকালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাংলার প্রথম অসহযোগী নেতা শ্যামসুন্দরকে বাদ দিয়ে অসহযোগী দেশবন্ধুর কথা বলা যায় না। আমরা তাই পরবর্তী একটি অধ্যায়ে বিপিনচন্দ্র-শ্যামসুন্দর-অরবিন্দের কথা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করব। সমকালীন বাংলার অনেক প্রবীণ ও নবীন দেশপ্রেমিক ও মনীষী ব্যক্তিকে এই

স্বদেশী আন্দোলন প্রবলভাবেই আকর্ষণ করেছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, আব্দুল রসুল, সখারাম গণেশ দেউস্কর, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং আরো অনেকে। দুইজন কংগ্রেস সভাপতি—আনন্দ-মোহন ও সুরেন্দ্রনাথ—এই আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে সেদিনের বাংলায় আনন্দমোহনই ছিলেন সর্বজন-শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ভারতবর্ষের জাতীয়তায় যে দিক্-পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল সেটা যে একমাত্র বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বা তার প্রতিবাদে স্বদেশী আন্দোলনের ফলেই ঘটেছিল তা মনে করলে ভুল হবে। এটা সম্ভব হয়েছিল ১৮৯৯ থেকে ১৯০৫-এই সাত বছর কালের মধ্যে সংঘটিত একাধিক ঘটনা যার প্রভাব শুধু ভারতবর্ষের উপরে নয়, সমগ্র এশিয়ার উপরেই পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই ঘটনাবলীর মধ্যে ১৯০৪-১৯০৫-এর রুশ-জাপান যুদ্ধ ছিল একটি। প্রাচ্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় অধৈর্য ও বলদর্পী রাশিয়া যেদিন নবজাগ্রত ক্ষুদ্র জাপানের শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করল, সেদিন তার প্রতিক্রিয়াটা অনিবার্যভাবেই সমস্ত এশিয়া মহাদেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। জাপানের এই অপ্রত্যাশিত বিজয়লাভ সেদিন শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীর ক্ষমতার প্রতীক বলে গণ্য হয়েছিল এবং এর ফলেই এই মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রাষ্ট্র-নৈতিক মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল। স্বনামধন্য ভারত-বন্ধু এণ্ড্রুজ সাহেব তখন এই দেশে অবস্থান করছিলেন। তিনি এশিয়ার এই সর্বব্যাপক মানসিক জাগরণের ধারা লক্ষ্য করে লিখে-ছিলেন :

'At the close of the year 1904 it was clear to those who were watching the political horizon that great changes were impending in the East. Storm clouds

had been gathering thick and fast. The air was full of electricity. The war between Russia and Japan had kept the surrounding people on the tiptoe of expectation. A stir of excitement passed over the North of India. There has been nothing like it since the Mutiny.'*

এণ্ড্রুজ-কথিত এই 'stir' বা চাঞ্চল্য ছিল বাংলার স্বদেশী আন্দোলন। প্রবল পরাক্রান্ত একটা সম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জাপানের মতো একটি ক্ষুদ্রশক্তির এই জয়লাভ সেদিন যে পরোক্ষ-ভাবে এই স্বদেশী আন্দোলনকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল এবং প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ভারতবাসীকে অনু-প্রেরনা জুগিয়েছিল, সে বিষয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। প্রদীপ থেকেই তো প্রদীপ জ্বলে থাকে; তেমনি ইতিহাসেও দেখা যায় যে একটি শক্তির স্ফূরণ থেকেই আশেপাশের অন্য প্রসুপ্ত শক্তির মধ্যেও স্ফূরণ দেখা দিয়ে থাকে। ইহাই ইতিহাসের নিয়ম—ইহাই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার চিরন্তন ধারা। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন তাই একমাত্র কার্জনী-বিধানের জন্য সম্ভব হয় নি, এর পিছনে ছিল সদ্য জাগ্রত এশিয়ার শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী তীব্র মনোভাব। লর্ড মিণ্টো ও য়্যানি বেশান্ত উভয়েই এই সাক্ষ্য দিয়েছেন। মিণ্টো বলেছেন: 'All Asia was marvelling at the victories of Japan over a European power....there was an awakening of the Eastern world.'† আর য়্যানি বেশান্ত লিখেছেন: 'The so-called unrest in India was as much the inevitable result of English education, of English ideals of democracy, as of the Japanese

* *The Renaissance in India* : C. F. Andrews

† *India : Morley and Minto* : Lady Minto

victory over Russia and of the changing conditions in the outer world.' * সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সমকালীন পৃথিবীর পরিবর্তনের অবস্থা, ইংরেজী শিক্ষা, ইংরেজদের গণতন্ত্রের আদর্শ ও রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ—এরই ফলশ্রুতি ছিল স্বদেশী আন্দোলন।

বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অনুমোদন করার পর ১৯০৫-এর ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে সিমলা শৈলশিখরে 'দি বেঙ্গল পার্টিশন বিল' আইনে পরিণত হয় ও অক্টোবরের ১৬ তারিখে (১৩১২, আশ্বিন ৩০) এই আইন সরকারীভাবে কার্যে পরিণত হয় অর্থাৎ বঙ্গ-বিভাগ আইনত বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে এবং লর্ড কার্জন তখন সদম্ভে 'The Bengal partition is now a settled fact'—এই বলে ভারত ত্যাগ করেন। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান সেদিন মিলিতভাবে এই কার্জনী-দম্ভের সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য—এই পাকা-পোক্ত ব্যবস্থাকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য—চার-পাঁচ বছর ধরে যে তীব্র আন্দোলন চালিয়েছিল তার ইতিহাস সুপরিচিত। মোটকথা, লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থা ও বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের মতো একটি অপরিণামদর্শী বিধানই যে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ইতিহাসের অভিপ্রেত পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে দিয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর ফলে দেশের মধ্যে যে একটি জাতীয় সংগ্রাম আসন্ন হয়ে উঠবে, সুরেন্দ্রনাথ তাঁর 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় 'A grave National disaster' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তেমন আশঙ্কা প্রকাশ করে রাজশক্তিকে পূর্বাহ্ণেই সাবধান করে দিয়েছিলেন।

দেশব্যাপী প্রতিবাদ আন্দোলন কেবল রাজনৈতিক বক্তৃতা বা সভা-সমিতির মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না—গঠনমূলক প্রচেষ্টার ভিতর দিয়েও তা আত্মপ্রকাশ করেছিল। শিক্ষার দিক দিয়ে জাতীয় পুনর্গঠনের

* *Awakening of Asia* : **Annie Bessant**

প্রশ্নটি বাংলা দেশে সকলের আগে যাঁর মনে জেগেছিল তিনি হলেন আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যিনি ১৯০২ সালে 'ডন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করে নীরবে কাজ করে চলেছিলেন। তারপর এই ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বদেশী সমাজের' পরিকল্পনা নিয়ে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ হওয়ার পর জাতির বিশিষ্ট নেতৃবর্গ নিশ্চেষ্ট রইলেন না। তাঁরা এই সময়ে দেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের কথা চিন্তা করতে থাকেন এবং এরই ফলে কলকাতায় স্থাপিত হয় 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্'। যে দুইজন বাঙালী সন্তানের অর্থানুকূল্যে বাঙালীর এই বৃহত্তম প্রয়াসটি সেদিন সার্থক হয়েছিল তাঁরা হলেন মৈমনসিংহের সূর্যকান্ত রায় চৌধুরী ও কলকাতার সুবোধচন্দ্র মল্লিক। যেদিন (নভেম্বর ১৭, ১৯০৬) পাস্তিরমাঠে পনের হাজার লোকের সামনে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপনের সিদ্ধান্ত ও এই মহৎকার্যে সুবোধচন্দ্র মল্লিকের এক লক্ষ টাকা দানের কথা ঘোষিত হয়, সেদিন সমবেত জনতার মধ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল তা এক কথায় অবিস্মরণীয়। এই দানের জন্য তাঁর সকৃতজ্ঞ দেশবাসী সুবোধচন্দ্রকে 'রাজা' উপাধি দান করেন।

পটলডাঙ্গার বিখ্যাত মল্লিক পরিবারের সন্তান সুবোধচন্দ্র মল্লিকের নাম আজ বিস্মৃতির অন্তরালে বললেই হয়। সুবোধচন্দ্র (১৮৭৯-১৯২০) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিলাতে গিয়ে কিছুকাল কেমব্রিজে অধ্যয়ন করেন ও ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যও প্রস্তুত হন। কিন্তু পারিবারিক কারণে শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে তিনি এই শতকের প্রথমেই দেশে প্রত্যাবর্তন করেন ও স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। বাংলা দেশে অসহযোগ আন্দোলনের সময় ১৪৮ নম্বর রসা রোডের বাড়ি যেমন ঐ আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল, তেমনি রাজা সুবোধ মল্লিকের ১২ নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারের (বর্তমান নাম 'রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার') বাড়িটা ছিল স্বদেশী আন্দোলনের

অন্যতম কেন্দ্র। বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতারা তখন এইখানেই মিলিত হয়ে কর্তব্য নির্ধারণ করতেন, পরামর্শ করতেন। বরোদা থেকে বাংলায় এসে এই বাড়িতেই অরবিন্দ ঘোষ কয়েক বছর বাস করেছিলেন। ১৯০৬ সালের সুরাট কংগ্রেসে বাংলা দেশ থেকে যে বিরাট প্রতিনিধি দল গিয়েছিলেন তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছিলেন একা সুবোধচন্দ্র এবং তাঁরই ক্রীক রোর বাড়িতে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার কার্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯০৮ সাল রেগুলেসন আইনে (Regulation III of 1818) ধৃত ও নির্বাসিত নয়জনের মধ্যে ইনি একজন ছিলেন।*

কথিত আছে, সুবোধচন্দ্র একদিন কথা প্রসঙ্গে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর কাছে বলেন যে, দেশে জাতীয় শিক্ষা প্রচারের এই সুবর্ণ সুযোগ। নেতৃবর্গ যদি এই ধরনের একটা প্রয়াস করেন তাহলে তিনি একাই এই কাজের জন্য একলক্ষ টাকা দিতে পারেন। সুবোধ মল্লিকের এই সাধুসংকল্পের কথা শ্যামসুন্দরের কাছে চিত্তরঞ্জন যখন জানতে পারলেন তখন তাঁর বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইল না। 'একলক্ষ টাকা! জাতীয় শিক্ষার জন্য সুবোধ একা এই টাকা দেবে—চলো তার কাছে আমি একবার যাই।'—এই কথা বলেছিলেন চিত্তরঞ্জন। বস্তুতঃ সুবোধচন্দ্রের এই দান সেদিন তাঁকে বিশেষভাবেই অনুপ্রাণিত করে থাকবে। একেই বলে যথার্থ দেশপ্রেম। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন যে আন্দোলন মাত্র ছিল না, এটা ছিল প্রকৃত পক্ষে ন্যাশনালিজমের একটা অভ্যুদয়। সেদিন অনেকের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই আভ্যুদয়িক রচনা করেছিলেন সুবোধচন্দ্র। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বকালের বাঙালীর প্রাণের 'রাজা'।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ বিধিবদ্ধভাবে স্থাপিত হলো ১৯০৬-এর জুন মাসে। এর গঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে চিত্তরঞ্জনের একটি প্রধান ভূমিকা ছিল। এই পরিষদের উদ্যোগে স্থাপিত হলো একটি

* জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল। এই কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে বরোদা থেকে অরবিন্দ এলেন বাংলা দেশে। সেখানে হাজার টাকা মাইনের সম্মানিত চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানে তিনি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করলেন মাত্র পঁচাত্তর টাকা বেতনে ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষের চাকরি। এরও পিছনে চিত্তরঞ্জনের হাত ছিল। বন্ধুর আহ্বানেই অরবিন্দ এসেছিলেন অমন চাকরি ছেড়ে দিয়ে। অরবিন্দের এই ত্যাগটিও সেদিন চিত্তরঞ্জন নির্বাক বিস্ময়ে দেখে থাকবেন। উভয়ের মধ্যে যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়েছিল বিলাতে ছাত্রাবস্থায়, আজ তাঁদের পরিণত বয়সে সেই বন্ধুত্বটাই হয়ে উঠল প্রগাঢ়, নিবিড়। যখন অরবিন্দ ন্যাশনাল কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে জাতীয়তাবাদী দলের মুখপত্র 'বন্দে মাতরম্'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন থেকে প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় চিত্তরঞ্জনকে দেখা যেত ক্রীক রোতে বন্দে মাতরমের আসরে। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আসতেন আরো একজন। তিনি ব্যারিস্টার রজতনাথ রায়, চিত্তরঞ্জনের বিশেষ বন্ধু। প্রকৃত-পক্ষে এঁরা দু'জনে যদি সেদিন স্বেচ্ছায় বন্দে মাতরম্ পত্রিকার আর্থিক দায়িত্বের অনেকখানি গ্রহণ না করতেন, তাহলে কাগজখানি চলা মুস্কিল হতো। ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা'র জন্যও এই দুই বন্ধু অকাতরে টাকা দিতেন। এঁদের এই নেপথ্য সাহায্যের কথা সেদিন খুব কম লোকেই জানত। এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে শ্যামসুন্দর লিখেছিলেন: 'সন্ধ্যা ও বন্দে মাতরমে কাটা কাটা বোল বেরুত আর টাকা টাকা করে প্রাণ যেত চিত্ত ও রজতের।' রজতনাথ রায় ছিলেন চিত্তরঞ্জনের সমসাময়িক একজন খ্যাতনামা ব্যারিস্টার। তিনি চিত্তরঞ্জনের বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন কিন্তু তাঁর খুব স্নেহের পাত্র ছিলেন। ইনি স্বনামধন্য রজনীনাথ রায়ের পুত্র এবং এঁরাও বিক্রম-পুরের অধিবাসী ছিলেন এবং এই সূত্রেই দাশ-পরিবার ও রায়-পরিবারের মধ্যে খুব সখ্যতা ছিল। রজত রায় রাজনীতিতে টিলক-পন্থী ছিলেন। এই রজত রায় যখন অকালে মারা যান তখন

ব্যথিত চিত্তে দেশবন্ধু বলেছিলেন—'রজতটা ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।' আবার অসহযোগ আন্দোলনের প্রাক্কালে মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে যখন সুবোধ মল্লিকের মৃত্যু হয়, সেদিনও তেমনি ব্যথিত চিত্তে তিনি বলেছিলেন: 'সুবোধ বেঁচে থাকলে আজ আমাদের ভাবনা?' এই যে সহৃদয়-সংবেদনশীল হৃদয়—এইটাই তো দেশবন্ধুর চরিত্রকে করেছে মহিমান্বিত।

কার্জনকে ধন্যবাদ এইজন্য যে তিনি তাঁর অজ্ঞাতসারে ইতিহাসের হাতে যন্ত্রস্বরূপ হয়ে এক অসতর্ক মুহূর্তে কলমের একটি খোঁচায় এক বাংলা ভেঙে দু'টুকরো করে দিয়েছিলেন, যার ফলে বাঙ্গালীর অন্তরে সহসা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল এক অভিনব স্বর্যচেতনা যার অপর নাম ন্যাশনালিজম। নবজাগ্রত এই জাতীয়তাবাদের আদর্শকে সম্বল করেই তো দেখা দিয়েছিল স্বদেশী আন্দোলন যার প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। চিত্তরঞ্জনের মানস জাগরণের পক্ষেও এই আন্দোলনটা ছিল একান্ত-ভাবেই অপরিহার্য। অরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের যে সুযোগ তিনি এই সময়ে পেয়েছিলেন তা তাঁর জীবনে বৃথা হয় নি। তাঁর রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের সেই উষাকালে আমরা দেখতে পাই প্রথমেই তিনি সংযুক্ত হলেন অনুশীলন সমিতির সঙ্গে, তারপর বিপিনচন্দ্রের ভাবধারার সঙ্গে। বিপিনচন্দ্র যখন প্রথমবার বিলাত থেকে ফিরে এসে তাঁর নিজস্ব পত্রিকার (*New India*) সম্পাদনায় ব্রতী হন তখন থেকেই চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মজীবনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়। 'নিউ ইণ্ডিয়া' যে নতুন স্বাদেশিকতার বীজ বপন করে, 'বন্দে মাতরমে' তাই-ই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছিল। চিত্তরঞ্জনের দেশচর্যায় প্রকৃত দীক্ষা হয় স্বদেশী আন্দোলনের সময়। বিপিনচন্দ্র নিজেই বলেছেন: 'দেশচর্যায় আমি তাঁহার ভার বহন করিতাম, সংসার-ধর্ম প্রতিপালনে তিনি আমার ভার বহন করিতেন। এইরূপে প্রায় দশ-পনর বৎসর

কাল আমার সাংসারিক দায়-অদায় কেবল প্রসন্নচিত্তে নহে, পরন্তু অনাবিল শ্রদ্ধাসহকারে চিত্তরঞ্জন বহন করিয়াছিলেন।* চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক চিন্তার উন্মেষসাধন ও পরিপুষ্টি বিধানে বিপিনচন্দ্রের অবদান বড় কম ছিল না। অবশ্য তাঁর ছাত্রাবস্থা থেকেই চিত্তরঞ্জনের হৃদয় সেদিনকার নবজাগ্রত দেশপ্রেমের ভাবরাশিতে—যা রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের কবিতায় ফুটে উঠেছিল—পরিপূর্ণ ছিল। বিপিনচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ তাই-ই প্রথম দানা বাঁধে।

তারপর স্বদেশীর সময়ে অরবিন্দ-চিত্তরঞ্জন মিলনটা ছিল ইতিহাস-বিধাতারই অভিপ্রেত। এই সময় থেকেই বাংলা তথা ভারতের রাজনীতি দুইটি শিবিরে পৃথক হয়—Moderate ও Extremist অর্থাৎ নরমপন্থী ও চরমপন্থী। অরবিন্দ ছিলেন শেষোক্ত দলের, বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর প্রভৃতি আরো অনেকেই তখন এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। চরমপন্থীদের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের প্রথম সংযোগের ইতিহাসটা এই। ১৯০৫, ২৪শে ডিসেম্বর। স্থান—১৪৮, রসা রোড। এই দিন এইখানে চরমপন্থীদের একটি সভা হয়। এই সভায় চরম-পন্থীদের একটি কার্যকরী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই 'স্বদেশী মণ্ডলী' নামে পরিচিত হয়। এইভাবে দেখা যায় যে, 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়িতেই বাংলার স্বদেশী যুগের চরমপন্থী দল প্রথম ভূমিষ্ঠ হইল।† কাশী কংগ্রেস এর মাত্র দু-তিন দিন পরের ঘটনা। চরম-পন্থী নেতারা এই কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের সেই প্রথম সংযোগ। অবশ্য তখনো পর্যন্ত তিনি অন্ত-রালবর্তী হয়েই ছিলেন—প্রকাশ্যে চরমপন্থীদলের নেতা তখন ছিলেন বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ এর অনেক পরে।

১৯০৬। বরিশাল কনফারেন্স। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সেদিন ব্যারিস্টার আব্দুল রসুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই

* বিপিনচন্দ্র পালের প্রবন্ধ: দেশবন্ধু সংখ্যা মাসিক বসুমতী, ১৩৩২

† শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ: গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

কনফারেন্স ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন-চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব ও অরবিন্দের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনও এই কনফারেন্সে গিয়েছিলেন। তারপর এই বছরেই জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল কলকাতায়, নরমপন্থীরা চাইলেন বৃদ্ধ নৌরজিকে। এই নিয়ে দুইদলে বাধল তুমুল বিরোধ। এই কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতিতে একশত টাকা চাঁদা দিয়ে চিত্তরঞ্জন এর একজন সভ্য হয়েছিলেন, কিন্তু সভাপতি নির্বাচন ব্যাপারে বিরোধের মূলে তিনি আছেন জেনে, মডারেটদলের নেতা সুরেন্দ্রমাথ অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যপদ থেকে চিত্তরঞ্জন ও তাঁর সহকর্মী আরো কয়েকজনকে অপসৃত করেন। চিত্তরঞ্জন এজন্য যারপরনাই ব্যথিত হন। টিলক, ডাক্তার মুঞ্জে, খাপার্দে প্রভৃতি তখন তাঁর রসা রোডের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। তথাপি দাদাভাই নৌরজি সভাপতি হবার দরুণ তিনি কংগ্রেসের এই অধিবেশনে উপস্থিত তো ছিলেনই না, উপরন্তু তিনি অধিবেশন চলাকালীন সময় কলকাতা ত্যাগ করে পুরুলিয়া চলে যান এবং কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়ে গেলে তিনি আবার কলকাতায় এসে টিলক প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হন। টিলকের প্রতি চিত্তরঞ্জন আজীবন গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। বলতেন ঃ 'লোকমান্য লোকমান্যই বটে।' ১৯১৯ সালে অমৃতসর কংগ্রেসে টিলকের সঙ্গে তিনি আবার মিলিত হয়েছিলেন, সে কথা পরে বলব।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার যে ১৯০৬ সালে টিলক কলকাতায় এসেছিলেন শুধু কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষেই নয়—বাংলা দেশে শিবাজী-উৎসব ও ভবানীপূজার প্রবর্তন করতে। এর আয়োজন করেছিলেন 'স্বদেশী মণ্ডলী' অর্থাৎ বাংলার চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ। সে-দিনের অগ্নিগর্ভ বাংলায় এই উৎসব ছিল একটি বিশেষ ঘটনা—বিশেষ ঘটনা এই কারণে বলছি যে, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রথম যুগের কংগ্রেস নেতৃবর্গ কর্তৃক প্রচারিত ও অনুসৃত পাশ্চাত্ত্য জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে ভারতের রাজনীতিতে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয়

ঘটে এই সময়ে। লোকমান্য টিলক, বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর ও অরবিন্দ ছিলেন এর ধারক ও বাহক। চিত্তরঞ্জনের পক্ষে এই জাতীয়তাবাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কলকাতায় শিবাজী-উৎসব উপলক্ষে যে বিরাট জনসভা হয়েছিল তাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বরচিত 'শিবাজী-উৎসব' কবিতাটি পাঠ করেছিলেন। এই সভায় টিলক যে বক্তৃতা করেন তা ছিল অনেক দিক দিয়েই স্মরণীয়। বাংলার বাইরে সেদিন একমাত্র টিলকের মহারাষ্ট্রই স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিল এবং টিলক স্বয়ং তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় কয়েকটি চমৎকার সম্পাদকীয় লিখেছিলেন যা শাসক-জাতির নিকট অপ্রিয় সত্য বলে গণ্য হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় লিখেছিলেন: 'The speech of Mr. Tilak on the occasion gave a distinct impetus to the just started self-relying politics of Bengal. He had ensured his place in the hearts of the Hindu Community of Calcutta as the only true democratic leader of India.' গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এমন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিকের প্রতি চিত্তরঞ্জন যে আকৃষ্ট হবেন, এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না, কারণ তাঁরও রাজনৈতিক চেতনা তখন এই সরল রেখা ধরেই উন্মেষিত হচ্ছিল।

১৯০৬, ১৬ই অক্টোবর।

স্থান: হিন্দু হল, দার্জিলিঙ।

যে দার্জিলিঙ শৈলে দেশবন্ধুর জীবনের অবসান, সেইখানেই প্রকৃতপক্ষে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের আরম্ভ। বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাব যখন সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হলো, চিত্তরঞ্জন তখন পূজার ছুটি উপলক্ষে সপরিবারে দার্জিলিঙে অবকাশ যাপন করছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতাও তখন এখানে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা দু'জনেই স্থানীয় হিন্দু হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। * চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির সম্যক পরিচয় পেতে হলে তাঁর এই ভাষণটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা দরকার। প্রথমে বক্তৃতা করেন নিবেদিতা, তারপর চিত্তরঞ্জন। সেদিন বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন :

'আমাদের দেশে আজকাল অল্পসংখ্যক অতি বিজ্ঞ লোকের মত ছাড়িয়া দিলে প্রায় সকলেই মনে করেন যে, এই যে নূতন জীবন সঞ্চার—যাহাকে আমাদের সংবাদপত্র সকল স্বদেশী আন্দোলন নামে অভিহিত করিয়াছেন—ইহাই অচিরে আমাদের এই অধঃপতিত দেশের মুক্তির একমাত্র কারণ হইয়া উঠিবে। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী দারিদ্র্য বিনাশ করিতে হইলে এই স্বদেশী আন্দোলনই একমাত্র উপায়, এবং সেই কারণেই এই আন্দোলন অবশ্য বাঞ্ছনীয়। এই কথা আজকাল আমাদের দেশের অনেক কথার মত একেবারে মিথ্যা না হইলেও সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে। জাতীয় দারিদ্র্য সমস্ত জাতীয় অধঃপতনের অঙ্গমাত্র, সমস্ত জাতীয় অধঃপতনের সঙ্গে ইহার একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে, এবং একথা অতি সত্য যে, সমস্ত জাতির উন্নতি না হইলে এ দারিদ্র্য কিছুতেই ঘুচিবে না; কিন্তু এই যে নবজীবন-সঞ্চারিনী আশা—যাহা আমাদের সমস্ত দেশটাকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছে, ইহা কি একমাত্র দারিদ্র্য-বিনাশের কারণ? ইহার মধ্যে কি গভীরতর সত্য নিহিত নাই? ইহা কি আমাদের চক্ষে আঙুল দিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতেছে না? ইহা কি সমস্ত বাঙালী জাতির শ্রবণ-বিবরে এক আশ্চর্য অপূর্ব স্বাধীনতা-সঙ্গীত ঢালিয়া দিতেছে না?

'আমার কাছে এই নব আন্দোলন যে যে কারণে সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ এই যে, ইহা ফলত ও মূলত বাঙালী জাতির আত্মনির্ভর পথে প্রথম পদক্ষেপ। এইকারণেই আমার ধ্রুব ধারণা যে, এই আন্দোলনের সফলতার উপরেই আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা নির্ভর করিতেছে। জগতের ইতিহাসে বারে বারে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, এক

* লেখকের 'নিবেদিতা' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

জাতিকে অন্য কোন জাতি হাতে ধরিয়া স্বাধীনতা তুলিয়া দিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন আপনার মুক্তির আন্দোলন আপনাকেই সাধন করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জাতির মুক্তিও সেই জাতিকেই সাধন করিয়া লইতে হয়। সহস্র বৎসর ধরিয়া অন্য জাতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলেও প্রকৃত মুক্তির পথ কখনো মিলিবে না।

আমরা এতদিন ধরিয়া ইংরাজের মুখাপেক্ষী হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, ইংরাজ আমাদের অনেক দৈন্য ঘুচাইবে, ইংরাজ আমাদিগের সকল লজ্জা নিবারণ করিবে এবং আমাদিগকে হাতে ধরিয়া মানুষ করিয়া তুলিবে। এখন সে কথা যদিও স্বপ্নের মত মনে হয়, কিন্তু ইহা অবশ্য সত্য যে একদিন আমরা ইংরাজের বাক্‌চাতুরীতে মুগ্ধ হইয়া শুধুমাত্র তাহার মুখের কথার উপর আমাদের মনে আশা-ভরসার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলাম। এমনি করিয়া ক্রমে ক্রমে আমরা ইংরাজদের ক্ষমতা দেখিয়া আত্মপ্রভাব হারাইয়াছিলাম, ইংরাজের ছলাকলায় প্রতিনিয়তই প্রতারিত হইয়াছিলাম, ইংরাজের কথার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়াছিলাম। মহারাণীর যে ঘোষণা (Proclamation) লইয়া আমরা এত গর্ব করি, তার মধ্যে যে আমাদের সকল আশা-ভরসাকে উপেক্ষা করিবার জন্য 'so far as it may be'—এই মারাত্মক বাক্যটি লুক্কায়িত ছিল, তাহা একবারও অনুভব কবিতে পারি নাই। কার্জন বাহাদুরকে ধন্যবাদ, তিনি আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। আমরাও এখন ভাল করিয়া মহারাণীর ঘোষণার এই গূঢ় তত্ত্ব মর্মে মর্মে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। ভগবান আমাদের সহায় হউন, এই সত্যজ্ঞান যেন চিরদিন আমাদের জাতীয় জীবনকে সচেষ্ট ও সচকিত করিয়া রাখে।

এক শ্রেণীর লোকের ধারণা এই যে, Pax Britanica-র প্রসাদে ভারতে এখন মহাশান্তি বিরাজ করিতেছে। হায় রে ব্রিটিশ রাজ্যের শান্তি, হায় আমরা অভাগ্য! আমরা এতদিন বুঝিতে পারি নাই যে, এই দেশব্যাপী নিছক শান্তি আমাদের জীবনকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিবার উপায় মাত্র। ইহা যদি শান্তি হয়, আমি বলিব ইহা মৃত্যুর শান্তি। ইহার উপরে কোনদিন কোন কালে জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

ঈশ্বরের প্রসাদে আমাদের জাতীয় জীবন হইতে মরণ-ছায়ারূপী এই কুহেলিকা অপসৃত হইয়াছে। এই নব-উন্মেষিত জাতীয়তার প্রভাতালোকে আমাদের জাতীয় জীবনের সত্য অবস্থা আমাদের চক্ষের সম্মুখে সুন্দর পরিষ্কার-

রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই নব-আন্দোলন আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়; ইহাই আমাদের আত্মনির্ভরের প্রথম পদক্ষেপ। আজিকার দিনে এই দেশব্যাপী আন্দোলনে শতলক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত বন্দে মাতরম্ ধ্বনির মধ্যেও যে মাতার আহ্বান শুনিতে পায় নাই, সে নিতান্ত হতভাগ্য।'

চিত্তরঞ্জনের সৌভাগ্য এবং সেই সঙ্গে এই জাতির সৌভাগ্য যে, সেদিন তিনি এই আহ্বান শুনতে পেয়েছিলেন। শুধু শুনতে পাওয়া নয়—এ আহ্বান কানের ভিতর দিয়ে একেবারে তাঁর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করেছিল। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে কোন প্রত্যক্ষ বা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ না করলেও, তাঁর সমস্ত হৃদয়-মন দিয়ে তিনি যে এর উত্তাপ অনুভব করেছিলেন এবং তারই ফলে তাঁর মানস-লোকে জাগরণের প্রক্রিয়াটা যে সম্পূর্ণ হয়েছিল তা আমাদের অনুমান-সাপেক্ষ নয়, একেবারে ধ্রুব সত্য। স্বদেশীযুগের ঠিক এক দশক পরের বাংলা তথা ভারতের সর্বজনমান্য নেতারূপে যিনি ফুটে উঠবেন তাঁরই মানস-জাগরণের মধ্যে কি স্বদেশী আন্দোলন তার চরম সার্থকতা লাভ করে নি? চিত্তরঞ্জনের দার্জিলিঙের বক্তৃতার আসল গুরুত্বটা তো এইখানেই।

॥ দশ ॥

বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও অরবিন্দ ঘোষ—যেন এক সুরে বাঁধা তিনটি প্রাণ। এই তিনজনের হৃদয়তন্ত্রীতে দেশপ্রেমের একই সুর বাজত, জাতীয়তার একই আদর্শে এঁরা ছিলেন উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত। এঁদের কাছে ধর্ম ও জাতীয়তা ছিল এক ও অভিন্ন এবং এঁরা যে রাজনীতির ধারক ও বাহক ছিলেন তার উৎস ছিল ধর্ম। সমমর্মী এই তিনজন জাতীয়তাবাদী নেতার কাছ থেকে স্বদেশী যুগের বাংলা ও বাঙালী যা পেয়েছিল তার সম্পূর্ণ মূল্যায়ন বোধ হয় আজো হয় নি। কিন্তু এঁদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা যে রূপে ও রেখায় অনেকখানি সুবলয়িত হয়ে উঠতে পেরেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আবার এই তিনজনের মধ্যে অরবিন্দই তাঁকে প্রভাবিত ও মুগ্ধ করেছিলেন সবচেয়ে বেশি। তার একটা বিশেষ কারণ ছিল। বিলাতে ছাত্রাবস্থায় যাকে তিনি বন্ধু হিসাবে প্রথম পেয়েছিলেন তাঁর মধ্যে তিনি যেন দেখতে পেয়েছিলেন সর্বাঙ্গসম্পন্ন একটি অপূর্ব মানবীয় ব্যক্তিত্ব—শান্ত, স্বল্পভাষী ও আত্মপ্রচারে বিমুখ একটি আশ্চর্য মানুষ।

আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ ছিলেন এঁরা তিনজনেই—বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর ও অরবিন্দ। বিপিনচন্দ্রের (১৮৫৮-১৯৩২) কথাই আগে বলি, কারণ বয়স ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে স্বদেশীযুগের এই ত্রয়ীর মধ্যে তিনিই ছিলেন জ্যেষ্ঠ। তাঁর ভূমিকা ছিল মুখ্যত দার্শনিকের ও সমকালীন রাজনৈতিক গতি প্রকৃতির এক নিপুণ ভাষ্যকারের এবং এই ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সত্যিই অদ্বিতীয়। তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা তাঁকে দিয়েছিল একটি অনন্যসুলভ স্বাতন্ত্র্য। বিপিনচন্দ্র একাধারে ছিলেন ভাবুক ও বক্তা। যে

যুগে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বাগ্মিতায় একমেবাদ্বিতীয়ম্ হিসাবে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ স্বমহিমায় বিরাজ করছিলেন, সেই যুগেই কংগ্রেসে বিপিনচন্দ্র পালের বাগ্মিতাও সমগ্র দেশে এক আশ্চর্য চমকের সৃষ্টি করেছিল। ভ্যালেনটাইন চিরোল তাঁর *Indian Unrest* গ্রন্থে বলেছেন যে, বাগ্মিতাকে বিপিনচন্দ্র একটা নতুন ব্যঞ্জনা দিতে পেরেছিলেন। ইংরেজী ও বাংলায় তাঁর ছিল সমান দখল যেটা সুরেন্দ্রনাথের ছিল না; সম্ভবতঃ সেই কারণে বক্তা বিপিনচন্দ্রের প্রসিদ্ধি ছিল শিক্ষিত ও সর্বসাধারণের মধ্যে। তাঁর বাগ্মিতার সঙ্গে মিশেছিল দার্শনিকতা এবং এইজন্যই বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতার আবেদন ছিল স্বতন্ত্র। তাঁর লেখনী ও রসনা প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল যাবৎ সমান-ভাবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চিন্তাকে প্রভাবিত ও পরিপুষ্ট করেছিল।

বিপিনচন্দ্রকে বলা হয়েছে 'stormy petrel of Indian politics.'—অর্থাৎ, ঝড়ের পাখি। কথাটা যিনিই বলে থাকুন না কেন, তিনি এই একটিমাত্র অভিধা দ্বারা অতি সুন্দর ভাবেই বিপিনচন্দ্রের রাজনৈতিক সত্ত্বাকে প্রকাশ করেছেন। কারণ তাঁর সময়ে কংগ্রেসে কোন একটি বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মতো আর কোন নেতাই অমন ঝড় তুলতে পারেন নি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যে-সব অগ্রগণ্য ব্যক্তি সংগ্রাম করেছেন, বলিষ্ঠ কণ্ঠে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেছেন ও সেজন্য অশেষ দুঃখকষ্ট এবং নির্যাতন ভোগ করেছেন তাঁদেরই অন্যতম ছিলেন বিপিনচন্দ্র। সে-দিনের রাজনীতিতে পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও বাংলার যে তিনজন জাতীয়তাবাদী নেতা 'ত্রয়ী' হিসাবে—'লাল-বাল-পাল' বলে খ্যাত হয়েছিলেন ও ব্রিটিশ রাজশক্তির শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছিলেন; তাঁরা হলেন লাজপৎ রায়, বালগঙ্গাধর টিলক ও বিপিনচন্দ্র পাল। কংগ্রেসের জন্মকাল থেকেই এর সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, কিন্তু এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রথম পর্বে যে নীতি অনুসৃত হতো

সেই policy of mendicancy বা আবেদন-নিবেদন নীতিতে তিনি আদৌ বিশ্বাস করতেন না। এই বিখ্যাত ত্রয়ীর একজনের পক্ষেও সেদিন এই আদর্শের প্রতি উৎসাহ প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। কারণ এঁদের কেউই বিশ্বাস করতেন না যে, স্যার ফিরোজ শা মেটা, গোপালকৃষ্ণ গোখেল, স্যার দীনশা ওয়াচা ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ মডারেট নেতৃবৃন্দের রাজানুগত্যদ্বারা কংগ্রেসের যথার্থ কোন উন্নতি সম্ভব। সে যুগের কংগ্রেসে লাল-বাল-পাল—এই ত্রয়ী তাই চরমপন্থী বা জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবেই খ্যাত হয়েছিলেন। ১৯১৭ সালে য়্যানি বেশান্তের সভাপতিত্বে কলকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে টিলকের পাশে দাঁড়িয়ে বিপিনচন্দ্র স্বরাজের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা কংগ্রেসের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

বিপিনচন্দ্র সম্পর্কে অরবিন্দের একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করছি: 'Babu Bipin Chandra Pal is one of the mightiest prophets of nationalism—perhaps the best and most original thinker in the country.' অরবিন্দ অত্যুক্তি করার মানুষ ছিলেন না এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর একযোগে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। বিপিনচন্দ্রের প্রতিভার আর একটি পরিচয়—তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিক ছিলেন এবং এই ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রেখে গিয়েছেন 'নিউ ইণ্ডিয়া', 'সন্ধ্যা', 'বন্দে মাতরম্', 'ইণ্ডিপেনডেণ্ট' প্রভৃতি সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায়। শেষোক্ত পত্রিকাখানি ছিল মতিলাল নেহরুর নিজেস্ব কাগজ; তিনি মাসিক একহাজার টাকা বেতন দিয়ে বিপিনচন্দ্রকে এর সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত করেন। তারপর মতিলাল যখন অসহযোগী হলেন তখন তিনি তাঁর কাগজের সুর পালটিয়ে লিখবার জন্য বিপিনচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁর স্বাধীন প্রকৃতি মালিকের এই অনুরোধে সায় দিল না—তিনি এক কথায় সেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। তাছাড়া বিপিন-

চন্দ্র গান্ধীর অসহযোগ আদর্শ বিশ্বাস করতেন না। 'নিউ ইণ্ডিয়া, ছিল বিপিনচন্দ্রের নিজস্ব কাগজ ; ১৯০১ সালে বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন তখন থেকেই বিপিনচন্দ্রের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন ও তাঁরই কাছে তিনি রাজনীতির প্রথম পাঠ গ্রহণ করতে থাকেন।

'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার প্রথম মামলায় বিপিনচন্দ্রের ছয় মাস কারাদণ্ড হয়, সে কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। কারামুক্তির পর তিনি আবার বিলাতযাত্রা করেন এবং দীর্ঘকাল ঐ দেশে অবস্থান করেন। তখন তাঁকে ভারতের রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকতে দেখে অনেকেই দুঃখিত ও বিস্মিত হয়েছিলেন। এই সময়ে তাঁর মতেরও পরিবর্তন তাঁর সহকর্মীদের বিস্মিত করেছিল। স্বরাজের দাবী একসময়ে যাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠ হতে প্রচারিত হয়ে তাঁর স্বদেশবাসীকে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করত, সেই বিপিনচন্দ্র এখন যেন হয়ে গেলেন একজন মডারেট। 'ভারতবর্ষকে আমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই দেখতে পাই'—তাঁর এই সময়কার এই উক্তিটি সেদিন অনেককেই যারপরনাই বিস্মিত ও ব্যথিত করেছিল। পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী যাঁর কণ্ঠ হতে একদিন বজ্রনাদে নির্গত হতে শোনা গিয়েছিল, সেই মানুষটি যেন আজ কি নিভে গেলেন ? অথবা, 'Politics is a very unstable mistress'—এই কথাটির সত্যতা আমরা বিপিনচন্দ্রের জীবনে যেন প্রত্যক্ষ করলাম। ১৯১৮ সালে যখন ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক দৃশ্যপট পরিবর্তিত হলো ও তার ফলে যখন ভারতের রাজনীতিতে গান্ধী ও চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাব ঘটল, তখন থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত দেশের মুক্তিসংগ্রামে বিপিনচন্দ্রের কোন ভূমিকা ছিল না। তাঁর জীবনের শেষ দশটি বছর নিঃসঙ্গতা, কঠোর দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। তথাপি ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তাঁর দান শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দেশবন্ধুর রাজনৈতিক গুরু হিসাবেও তিনি আমাদের

স্মৃতিপটে বিরাজ করবেন। আর কিছু না হোক, ভারত-আত্মার মর্ম-ব্যাখ্যাতা হিসাবেও 'বিপিনচন্দ্র পাল'—এই নামটি ভারতবাসীর নিকট কোনদিনই বিস্মৃত হবে না। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলির কথা বাদ দিলেও, আমার মনে হয়, 'দি সোল অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থখানিই বিপিনচন্দ্রকে অমর করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী (১৮৬৯-১৯৩২) মনে-প্রাণে একজন খাঁটি স্বদেশী ছিলেন। তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে তিনি 'স্বদেশী শ্যামসুন্দর' বলে পরিচিত ছিলেন। এই নির্লোভ ব্রাহ্মণ ছিলেন যেন ত্যাগের প্রতিমূর্তি আর দেশপ্রেমের একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। স্বদেশী আন্দোলনের কণ্ঠ আশ্রয় করে দেশজননী যখন তাঁর সন্তানদের ডাক দিয়েছিলেন, তখন অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে, সংসার-চিন্তা দূরে রেখে শ্যামসুন্দর আর সকলের সঙ্গে সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। সর্বভারতীয় নেতৃত্বের গৌরব লাভ না করলেও, জাতীয়তাবাদী নেতা, সুদক্ষ সাংবাদিক এবং বাগ্মী হিসাবে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর খ্যাতি সারা দেশেই পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। সেকালের টিলক, মালব্য, মুঞ্জে থেকে আরম্ভ করে, একালের গান্ধী, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি সকলেই তাঁর স্বদেশপ্রেমের আন্তরিকতা ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে তাঁর নির্ভীকতা ও তেজস্বিতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং এঁদের অনেকেই তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। শুধু একজন নেতা হিসাবেই নয়, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর অটুট নিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্যের জন্যও। গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন শ্যামসুন্দর। গায়ত্রী-মন্ত্র জপ না করে জল স্পর্শ করতেন না, তাই বলে জীবনাচরণে তিনি কোনদিনই গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতার পরিচয় দেন নি। মৌলভী লিয়াকৎ হোসেনের মৃতদেহ সৎকারের ব্যাপারে তিনিই তো অগ্রণী ছিলেন। হিন্দুসংস্কৃতির মধ্যে আবাল্য লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়েও এবং নিজে

হিন্দুভাবাপন্ন হলেও, তাঁর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না এবং এই গুণেই ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ শ্যামসুন্দরকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে হিন্দুর আচার-ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রক্ষা করেও কেমন করে যে তিনি সার্বজনীনতার স্তরে পৌঁছতে পেরেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে সেইটাই হলো সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা। সর্বোপরি শ্যামসুন্দর ছিলেন নির্লোভ ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মানুষ—যার দৃষ্টান্ত সেদিনের বাংলার রাজনীতিতে খুব বেশি দেখা যায় নি।

বিপিনচন্দ্র পাল 'স্বরাজ্য' পত্রিকায় শ্যামসুন্দর সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন: 'Shyamsunder was essentially a child of reaction between ancient and modern. Nationalism was not a mere creed with him, indeed it was almost an article of faith with this Brahmin whose love for country and hatred for the alien rule was as genuine as was found in the case of others who were his close contemporaries.' বিপিনচন্দ্রের এই উক্তির মধ্যে শ্যামসুন্দর-চরিত্রের অনেকখানিই স্পষ্টভাবেই আভাসিত হয়েছে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্র ছিলেন তিনি সত্য, কিন্তু দারিদ্র্য তাঁর জীবনে কোনদিন অভিশাপ হয়ে উঠতে পারে নি, বরং তা হয়ে উঠেছিল পরম শ্লাঘার বিষয়। সেই দারিদ্র্য তাঁকে দুর্ভেদ্য বর্মের মতো সর্বদা ঘিরে থাকত এবং সেই বর্মে ঠেকে অন্যের অনুগ্রহ প্রতিহত হয়ে ফিরে যেত। ভিতরে ও বাহিরে মানুষটি ছিলেন একজন আন্তরিক দেশভক্ত। তাই বুঝি তাঁর দেশপ্রেমের আন্তরিকতা দেখে গান্ধী মুক্ত-চিত্তে বলেছিলেন—'I can never forget Shyamsunder's transparent sincerity.' সহজ, সরল ও উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন শ্যামসুন্দর—ঋষিতুল্য বললেই হয়। যৌবনে রাজনীতি তাঁকে আকর্ষণ করেছিল সত্য, কিন্তু রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে তিনি কোন-

দিনই আত্মহারা হন নি। এমন কি, অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশবন্ধুর কারাদণ্ডের পর তিনি যখন বাংলার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের নিয়ামক বা ডিক্টেটরের পদে আসীন হয়েছিলেন তখনো নেতৃত্ব-গর্বে তাঁকে কেউ আত্মহারা হতে দেখে নি। স্বদেশীযুগ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ যুগ পর্যন্ত বাংলা দেশে দলমত-নির্বিশেষে এমন অজাতশত্রু ও সর্বজন-শ্রদ্ধেয় নেতা বোধ হয় আর একজনও ছিলেন না। তথাপি দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, শ্যামসুন্দরের ত্যাগের মূল্য আমরা যেমন দিই নি, তেমনি একথাও সত্য যে তাঁর প্রাপ্য সম্মানও তাঁকে কখনো দেওয়া হয় নি। শেষ জীবনে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ জীবনের বিড়ম্বনা ও দেশবাসীর অনাদর ও উপেক্ষার ভিতর দিয়েই শ্যামসুন্দরকে নিঃশব্দে এই পৃথিবী থেকে চলে যেতে হয়েছে। আজ তাই 'পতিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী' —এই নামটি বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গিয়েছে বললেই হয়। কিন্তু সেই আত্মভোলা তেজস্বী মানুষটিকে, সেই 'স্বদেশী' শ্যামসুন্দরকে কি সত্যিই বিস্মৃত হওয়া যায়?

না—তাঁকে বিস্মৃত হওয়া কঠিন। যাঁর কাছে রাজনীতি ছিল সাধনার জিনিস, প্রাণের জিনিস, যাঁর শোণিতে ও ধমনীতে নিত্য প্রবাহিত ছিল স্বদেশপ্রেমের অনাবিল ধারা, যাঁর দেবোপম চরিত্রের সংস্পর্শে এসে সকলেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবনত হতো, একদা প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর কাছে যে নামটি ছিল কোটি কোটি ভারতীয়ের মধ্যে মুষ্টিমেয় বিশিষ্টের একজন, সরকারের চক্ষে যিনি ছিলেন একজন 'রাজদ্রোহী'—সেই শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীকে বাঙালী প্রথম জানল সেই স্বদেশীযুগে জাতীয়তাবাদী ও চরমপন্থীদলের একজন নেতা হিসাবে। অবশ্য তার বহু আগেই কলকাতায় অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে শ্যামসুন্দরের পরিচয় তখন থেকেই। এঁরা উভয়েই ছিলেন অনুশীলন সমিতির কার্যকরী কমিটির প্রথম

সদস্য। আর তখন থেকেই সরকারের শ্যেন চক্ষু নিবদ্ধ হয় এই ব্রাহ্মণের উপর। স্বদেশী আন্দোলনের শুরু থেকেই শ্যামসুন্দর এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাগ্মিতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাংবাদিক প্রতিভারও স্ফূরণ দেখা যায় এই সময়ে। তিনি উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা'র সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 'সন্ধ্যার' আসরে যে ঐকতান বসত, তার মধ্যে শ্যামসুন্দরেরও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শোনা যেত—উপাধ্যায়ের লেখনীর মতো ব্যঙ্গে ও বিদ্রূপে তাঁরও লেখনী ছিল সুতীক্ষ্ণ। তারপর ১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসে রণভেরী বাজিয়ে এল 'বন্দে মাতরম্' যার পৃষ্ঠায় দিনের পর দিন তিনজনের লেখনী—বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর ও অরবিন্দ—মিলিত ভাবে অগ্নিবর্ষণ করত। বস্তুতঃ 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় শ্যামসুন্দরের সাংবাদিক প্রতিভা এক নতুন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল, যার পরিণতি দেখা গিয়েছিল পনর বছর পরে তাঁর নিজস্ব 'সার্ভেন্ট' পত্রিকায়।

'বন্দে মাতরম্'-এর সম্পাদকীয় লেখার দায়িত্ব ছিল প্রধানতঃ বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর ও অরবিন্দের উপর। এই তিনজন শক্তিশালী লেখকের সমাবেশ ঘটেছিল বলেই না অল্পদিনের মধ্যেই 'বন্দে মাতরম্' ভারতের রাজনীতিক চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন সাধন করে দিয়েছিল। সম্পাদক হিসাবে যদিও কারো নাম থাকত না, তথাপি পত্রিকার guiding spirit ছিলেন একজনই—অরবিন্দ ঘোষ। তবে তিনজনেরই হৃদয় ছিল এক সুরে বাঁধা, তাই কোন্‌টা যে কার লেখা সহজে বোঝা যেত না। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের এক জীবনীকার লিখেছেন :

'Some of these editorial articles and other snappy items like satiric compositions and paradoxes were the work of Shyamsunder Chakravarty, not of Sri Aurobindo. Shyamsunder was a witty parodist and could write with much humour as

also with a telling rhetoric ; he had besides caught up some imitation of Sri Aurobindo's prose style and many could not distinguish between their writings. Whenever Sri Aurobindo was away from Calcutta, it was Shyamsunder who wrote most of the editorials for the *Bande-mataram*.'*

এই 'বন্দে মাতরম্'-এর আসরেও প্রায় সন্ধ্যায় চিত্তরঞ্জন এসে মিলিত হতেন বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর ও অরবিন্দের সঙ্গে। এখানে না এসে তিনি যেন থাকতেই পারতেন না। একবার শ্যামসুন্দরের একটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা—'Mock petition to honest John' সারা ভারতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। সাপ্তাহিক বন্দে মাতরমের উদ্বোধনী সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং তারপর ঐ প্রবন্ধটি যখন গ্লাস-গোর বিখ্যাত *News* পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয় তখন ইংলণ্ডে যথেষ্ট আলোড়ন দেখা গিয়েছিল, আর ভারতে সরকারি মহলেও এর প্রতি-ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল। কথিত আছে, চিত্তরঞ্জন শ্যামসুন্দরের এই রচনাটির প্রশংসা করে বলেছিলেন—'শ্যামসুন্দর যেন আমাদের জোনাথান সুইফট—সুইফটের মতোই তিনি ব্যঙ্গাত্মক রচনায় সিদ্ধহস্ত।' শেক্সপিয়র ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ, তাই তাঁর লেখনী ব্যঙ্গে ও বিদ্রূপে অমন তীক্ষ্ণধার হয়ে উঠতে পেরেছিল।

দেশসেবার পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন একাধিকবার। আলি-পুর বোমার মামলা শুরু হওয়ার অল্পকাল পরেই রেগুলেশন আইনের বজ্র নেমে এল তাঁর মাথার উপরে। ১৯০৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনে শ্যামসুন্দর অন্যান্য আর আটজন জাতীয়তাবাদী নেতার সঙ্গে ধৃত, বন্দী ও নির্বাসিত হন। তাঁর লেখা *Through solitude and sorrow* নামক স্মৃতি পুস্তিকা পাঠে জানা যায় যে, সেই সময়ে তাঁকে সুদূর ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত

* *Sri Aurobindo* : K. R. Srinivasa Iyenger

করা হয়েছিল। চৌদ্দ মাস পরে নির্বাসন থেকে প্রত্যাগত শ্যামসুন্দরকে অভ্যর্থনা করবার জন্য কলকাতার জাহাজঘাটে উপস্থিত ছিলেন অরবিন্দ। এই সময়ে তিনি কয়েক বছর 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তারপর প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ে আলি ভ্রাতৃদ্বয় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ভারতরক্ষা আইনে শ্যামসুন্দরকেও আবার আটক করা হয় এবং এই সময়ে তিনি দীর্ঘকাল কালিম্পং-এ অন্তরীণাবদ্ধ ছিলেন। শ্যামসুন্দরকে যখন ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয় তখন তার প্রতিবাদ করে কলকাতার এক জনসভায় চিত্তরঞ্জন বক্তৃতা করেন ও সুরেন্দ্রনাথ তাঁর কাগজে দুই-তিনবার সম্পাদকীয় লেখেন।

কালিম্পং থেকে প্রায় চার বছর পরে মুক্তিলাভ করে শ্যামসুন্দর দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় যা করণীয় তাই করলেন—গান্ধীর অসহযোগ নীতিকে সমর্থন জানালেন। শুধু সমর্থন জানানো নয়, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে তিনি এই আন্দোলনকে সফল করবার প্রয়াসে 'সার্ভেন্ট' (*The Servant*) নামে নিজস্ব একখানি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনিই ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয় তখনি অসহযোগ মন্ত্রকে সমগ্র দেশে প্রচার করবার জন্য সেদিন এই পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। শ্যামসুন্দরই বাংলা দেশের প্রথম অসহযোগী-নেতা। 'সার্ভেন্টে'র যুগ নানা দিক দিয়েই ছিল ভারতের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটি নবযুগ, তেমনি শ্যামসুন্দরের রাজনৈতিক জীবনেও এই সময়টা ছিল বিশেষ গৌরব-প্রদীপ্ত। শ্যামসুন্দরের 'সার্ভেন্ট' স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল এবং বছর পাঁচেক চলবার পর উঠে যায়। বাংলার অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করার পিছনে শ্যামসুন্দর ও তাঁর 'সার্ভেন্ট' পত্রিকার অবদান কম ছিল না। তাঁর আজীবন দেশসেবার

পুরস্কার স্বরূপ শ্যামসুন্দর যশোহর প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাংলার রাজনীতিতে তাঁকে সেই শেষবারের মতো দেখা গিয়েছিল এবং সভাপতিরূপে তিনি যে ভাষণটি দিয়েছিলেন তার মধ্যে আভাসিত হয়েছিল তাঁর পরিণত রাজনৈতিক চিন্তা।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মী ও বন্ধু দেশবন্ধুর মৃত্যু শ্যামসুন্দরের জীবিত কালের ঘটনা। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে শেষের দিকে কাউন্সিল-প্রবেশ-নীতি নিয়ে তাঁর প্রবল মতবিরোধ হয়েছিল সত্য, কিন্তু দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে শ্যামসুন্দর যে রকম মর্মাহত হয়েছিলেন তার নিদর্শন আছে 'সার্ভেণ্ট' পত্রিকায় তাঁর লেখা সেই শোকজ্ঞাপক অবিস্মরণীয় সম্পাদকীয় নিবন্ধটি। এই উপলক্ষে কাগজটির একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এখানে সেই প্রবন্ধটি থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করে আমরা শ্যামসুন্দর-প্রসঙ্গ শেষ করছি। অশ্রুভারাক্রান্ত অন্তরে সমগ্র জাতির বেদনাকে প্রকাশ করে শ্যামসুন্দর লিখেছিলেন ঃ—

'দেশবন্ধু দাশ আর নাই। বাঙালী, যদি পার, কাঁদ। দৈবের এ নিদারুণ আঘাতে সকলের বাক্‌শক্তি রুদ্ধ। আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের আধার দেশবন্ধু আজ দেশের জন্য—দেশকে শক্তিশালী করিতে গিয়া প্রাণ হারাইলেন। মুক্তিকামনার উদ্দীপনা অগ্নিতে ইন্ধনের মত তাঁহার দেহ আজ নষ্ট হইল। এ মৃত্যু মরজগতে প্রার্থনীয়। তাঁহার সকল কথার মাঝে এই কথাই বুঝা যাইত যে, দেশের দুরবস্থায় তাঁহার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছিল। আজ তাঁহার অপ্রত্যাশিত মৃত্যু দেখিয়া সকলেই সেই কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। দার্জিলিঙ-এর জলবায়ুও তাঁহার জ্বর আরাম করিতে পারিল না। সেই জ্বরের কারণ দৈহিক নহে। রাজ-ঐশ্বর্যের অধিকারী হইলেও তিনি তাঁহার দেশবাসীর জন্য দারিদ্র্য বরণ করিয়াছিলেন। মিথ্যা ও কপটতা বলিয়া তিনি যাহা মনে করিতেন তাহা

ধ্বংস করিবার জন্য তিনি অসীম অধ্যবসায়ের সহিত আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সে কার্য সমাধা হইয়াছে। তাই তিনিও আজ মহাপ্রস্থান করিলেন। এইরকম গৌরবের মাঝে মৃত্যু অতি অল্প-লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। এইরূপ মৃত্যুর মাঝেই আমরা আমাদের বীরদের চিনিব।'*

ইতিহাসে যাঁরাই স্বকীয়তন্ত্র মানুষ বলে চিহ্নিত হয়েছেন তাঁদের পুরস্কার দিয়ে থাকেন মানব-ভাগ্যবিধাতা যিনি তাঁদের দুঃসাধ্য সাধন করতে সংসারে পাঠিয়ে থাকেন। শ্যামসুন্দরও বিপিনচন্দ্রের মতো শেষ জীবনে স্বজাতির হাতে অনাদর ও উপেক্ষা লাভ করে-ছিলেন সত্য। কিন্তু জাতির পরাধীনতার বেদনা এই সর্বস্বত্যাগী ব্রাহ্মণের অন্তরে যেভাবে অনুভূত হয়েছিল এবং মুক্তিসংগ্রামে তিনি যেভাবে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, সে ইতিহাস তো কোন দিনই মুছে যাবার নয়। ইতিহাস-বিধাতার স্বহস্তে দেওয়া সম্মানের টীকাই ব্রাহ্মণ শ্যামসুন্দরের, স্বদেশী শ্যামসুন্দরের ও দেশসেবক শ্যামসুন্দরের ললাটে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে চিরকাল। তাঁর সম্পর্কে আরো একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য। 'মাদার ইণ্ডিয়া' নামক কুখ্যাত গ্রন্থের লেখিকা, মার্কিন মহিলা মিস মেয়ো যখন ভারতবর্ষের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে উপহাস করে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ *The Slaves of the Gods* প্রকাশ করেন তখন ভারতবর্ষে একমাত্র শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীই তার প্রতিবাদ করে *My Mother's Picture* নাম দিয়ে চিন্তাগর্ভ যে অপূর্ব বইখানি লিখেছিলেন, স্বজাতিকে তাই ছিল তাঁর শেষ দান।

চিত্তরঞ্জনের জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়ের সঙ্গে অরবিন্দের জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায় গ্রথিত ছিল। ইতিহাসের কাজ কি প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয় তা দুর্জ্ঞেয়। তেমনি কোন একটি ঐতিহাসিক

* লেখক কৃত অনুবাদ

ঘটনার কার্য-করণ সম্বন্ধ নির্ণয়ও সুকঠিন। বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের গর্ভ থেকে সশস্ত্র বিপ্লব জন্মগ্রহণ করেছিল এবং সেদিন এই বিপ্লবের রণগুরু হিসাবে একজনই চিহ্নিত হয়েছিলেন। তিনি অরবিন্দ ঘোষ। সেই বিপ্লবের পরিণতি আলিপুর বোমার মামলা আর সেই মামলার প্রধান আসামী অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন সেদিনের উদীয়মান ব্যবহারজীবী চিত্তরঞ্জন দাশ। তার আগে আমরা তাঁকে দেখেছি রাজদ্বারে অভিযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও বাগ্মিপ্রবর বিপিনচন্দ্র পালের পক্ষ সমর্থনে দাঁড়াতে। সেদিন যা ছিল এতকাল কতকটা লুক্কায়িত, তা প্রকাশ হলো। সকলে সবিস্ময়ে দেখল যে, আইনের কূট তর্কজালের আবরণে চাপা রয়েছে একটা বিরাট মণিমাণিক্যের ব্যাপার—স্বদেশপ্রেমের পরশপাথর যার সংস্পর্শেই পরবর্তীকালে বাংলার ও বাংলার বাইরে লক্ষ লক্ষ হৃদয় সোনা হয়ে গিয়েছিল। আজ তাই মনে হয়, চিত্তরঞ্জনকে ফুটিয়ে তোলার জন্য, তাঁর সঙ্গে অরবিন্দের সংহতিটা—যার প্রথম আভাস বিলাতে তাঁদের ছাত্রজীবনে দেখা গিয়েছিল—যেন ইতিহাস-বিধাতারই অভিপ্রেত ছিল। তাই চিত্তরঞ্জনের জীবনালোচনার প্রসঙ্গে অরবিন্দের জীবনকথা কিছুটা উল্লেখ করতে হয়।

অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫৩) সেই শ্রেণীর মানুষ যাঁদের বলা হয় সহস্রের মধ্যে একজন। স্বদেশকে তিনি মাত্র ভৌগোলিক সত্তা হিসাবে দেখতেন না। একে তিনি জানতেন মা বলে এবং সেইভাবেই তিনি একে ভক্তি করতেন, পূজা করতেন। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ 'এই ভাব লইয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার জন্মগত।' বরোদা থেকে যখন তিনি স্বদেশী আন্দোলনের ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ বাংলায় এলেন তখন তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ত্যাগের মন্ত্র যা চিত্তরঞ্জনকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। দেশের কাজ করতে হলে যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে হয়—এটা বাঙালী প্রথম দেখল অরবিন্দের মধ্যে এবং তার অনেক কাল পরে তাঁরই বন্ধু দেশবন্ধুর মধ্যে। অরবিন্দ

ছিলেন মুখ্যত বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবের উত্তরসাধক এবং কি দেশপ্রেম, কি রাজনীতি—এসব বিষয়ে সেদিনের বাংলায় তিনিই বোধ হয় ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তার একমাত্র যোগ্য উত্তরাধিকারী। বঙ্কিমের ধ্যান-ধারণা বঙ্কিমের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দের মধ্যে যে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল তার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে সেই সময়ে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় লেখা বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর সেই প্রবন্ধাবলী। বিবেকানন্দের স্বদেশচিন্তাও অরবিন্দের স্বদেশচিন্তাকে সুবলয়িত করতে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। এইভাবে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে আসবার আগে থেকেই রাজনীতি ও দেশসেবা —এই দুটি বিষয়ে অরবিন্দের মানসিক প্রস্তুতি অনেকখানিই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

কংগ্রেসের জন্মের পর থেকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনা ও কার্যপদ্ধতি যে খাতে বইতে থাকে তার ফল যে একেবারে কিছু হয় নি তা বললে ভুল বলা হবে এবং উমেশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দ-মোহন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রয়াসকে লঘু করে দেখা হবে। কার্জনী-বিধান যখন দেশকে একটা নতুন পথে দাঁড় করিয়ে দিল, তখন আমাদের এতকালের পোষিত ও অনুসৃত রাজনৈতিক চেতনার একটা পরিবর্তন আসন্ন ও অনিবার্য হয়েই উঠেছিল। বলা বাহুল্য, মুখ্যত অরবিন্দকেই কেন্দ্র করে এসেছিল এই পরিবর্তন যার প্রথম অভিব্যক্তি ছিল 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় তাঁর লেখা 'New spirit' প্রবন্ধটি। স্বনামধন্য রাসবিহারী ঘোষ বলেছিলেন: 'We charge Lord Curzon having set Bengal in a blaze.' কথাটি মিথ্যা নয় এবং সেদিনের সেই অগ্নিগর্ভ বাংলার পক্ষে যে নতুন চেতনার প্রয়োজন ছিল তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এলো অরবিন্দের লেখনী থেকে।

টিলক বলেছিলেন: 'Swaraj is my birthright'—অর্থাৎ 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার'। অরবিন্দ আরো একধাপ এগিয়ে

গেলেন। বললেন : 'Political freedom is the life-breath of a nation.' অর্থাৎ—'একটা জাতির পক্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা হলো তার জীবনধারণের অত্যাবশ্যক শ্বাসবায়ু। এ জিনিস ছাড়া কোনো জাতি বাঁচতেই পারে না, বাড়তেই পারে না। জাতির বন্ধনমুক্তি করা হলো অতি মহৎ ও পবিত্র কাজ, আর বিদেশী বর্জন, স্বদেশী গ্রহণ, জাতীয় শিক্ষা ও আরো সব ছোটো বড়ো জিনিস, এগুলি হলো তারই আনুষঙ্গিক। এই যজ্ঞের ফলরূপে আমরা চাই স্বাধীনতা, ফিরে চাই আমাদের মাতৃভূমিকে, যাতে তাঁরই পায়ে আমাদের এই যজ্ঞফল সম্পূর্ণ নিবেদন করতে পারি। এই যজ্ঞের প্রজ্জ্বলন্ত সপ্তশিখার মুখে এখন আমাদের নিজেদেরকে ও আমাদের সব কিছুকেই আহুতি দিতে হবে, এমন কি আমাদের দেহের রক্ত দিয়ে আর জীবন দিয়ে। আত্মীয়বন্ধুর সুখ-শান্তির আশাকে বিসর্জন দিয়েও এই যজ্ঞে অঞ্জলি প্রদান করতে হবে।'

তিনি আরো বললেন : 'Nationalism depends for its success on the awakening and organizing of the whole strength of the nation.' এইখানে অরবিন্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। 'জাতির সর্বশক্তির জাগরণ ও সংগঠন' —এই কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একথা যখন তিনি বলছেন তখন কংগ্রেস তার জন্মের পর থেকে দুই দশকেরও অধিককাল অতিক্রম করেছিল। কিন্তু সেই বাইশ বছরের মধ্যেও ভারতের জনজীবনের অতি সামান্য অংশকেই সে স্পর্শ করতে পেরেছে। একটা জাতির রাজনৈতিক জীবন তো শুধু তার উপরতলার মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে নিয়ে নয়, তার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান নির্বিচারে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের স্থান থাকবে, তবেই না আমাদের রাজনৈতিক জীবন সর্বাবয়বে সম্পূর্ণ হবে, সার্থক হবে। ভারতবর্ষের এতকালের প্রচলিত রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার মধ্যে এই নতুন ভাব এনে দিয়েছিলেন অরবিন্দ। তিনি শুধু একজন নেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন

প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তি। ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত চিন্তাশীল নেতা খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। সে যুগে টিলকের পরেই অরবিন্দ ছিলেন একজন যথার্থ চিন্তাশীল পলিটিসিয়ান। আর কারো সম্বন্ধে আমরা এই উক্তি করতে পারি না। টিলক ও অরবিন্দ যে পর্যায়ের নেতা ছিলেন ঠিক সেই পর্যায়ের নেতা সেদিন কংগ্রেসের মধ্যে আর কেউ ছিলেন না।

কংগ্রেসের রাজনীতিতে অরবিন্দের র‍্যাডিক্যাল মতবাদ সেদিন যদি গৃহীত হতো তাহলে, অনেকের মতে, আমাদের স্বাধীনতা লাভ আরো ত্বরান্বিত হতে পারত এবং হয়ত আরো সম্মানজনক ভাবেই আমরা তা অর্জন করতে পারতাম। ভারত-বিভাগের প্রয়োজন হতো না। তাঁর রাজনৈতিক কৌশল পরবর্তীকালে তাঁর বন্ধু চিত্তরঞ্জন কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কংগ্রেসের রাজনীতিতে একটা যুগান্তর এনেছিলেন। যাঁরাই অরবিন্দের *Doctrine of Passive Resistance* শীর্ষক ম্যানিফেস্টোখানি পাঠ করেছেন তাঁরাই বলবেন যে, অরবিন্দ কেবলমাত্র একজন ভাব-বিলাসী নেতা ছিলেন না—প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনের একটি সম্পূর্ণ কার্যসূচীও দেশের সামনে রেখেছিলেন। যে পাঁচ বছর তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলেন, সেই সময়ে দেখা যায় যে, অরবিন্দ দ্বৈতভূমিকায় সমান তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন—একদিকে তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী দলের নেতা, আর অন্যদিকে ছিলেন সন্ত্রাসবাদী দলের নেপথ্য নায়ক। চিত্তরঞ্জন তাঁর বন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের এই পরিচয় রাখতেন। সম্ভবতঃ সেই কারণে চিত্তরঞ্জনের পক্ষে বোমার মামলার আসামী অরবিন্দ সম্পর্কে দূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। তিনি যে একজন সাধারণ রাজনৈতিক আসামী মাত্র নন, পরন্তু একজন 'Remarkable person of high destiny'—এটা বোধ হয় চিত্তরঞ্জনই সেদিন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

অরবিন্দের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী দলের প্রাধান্য যখন মডারেট নেতাদের বিচলিত করল তখন তাঁরা ১৯০৬ সালের কংগ্রেসের অধিবেশন (এই অধিবেশন হয় কলকাতায়) তাঁদের শক্তির পরীক্ষা করেন ও জয়লাভ করেন। কংগ্রেসের নেতৃত্ব তাঁদেরই হাতে থেকে গেল এবং ১৯০৭ সালে সুরাটে কংগ্রেসের যে দ্বাবিংশ অধিবেশন হয় তাতে জাতীয়তাবাদী দলকে কংগ্রেস থেকে সরে আসতে হয়। পরবর্তী এক দশক মডারেটরাই কংগ্রেসকে নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং প্রকৃতপক্ষে সুরাট কংগ্রেসে জাতীয়তাবাদী দলের পরাজয়ের পর দীর্ঘ দশ বৎসর কাল চিত্তরঞ্জনকে আর কংগ্রেসের মঞ্চে দেখা যায় নি।

আলিপুর জেল থেকে অরবিন্দ যেন এক নতুন মানুষ হয়ে বের হলেন। কারাবাসের ফলে তাঁর মধ্যে দেখা গেল এক রূপান্তর। তাঁর উত্তরপাড়ার ভাষণ থেকেই বোঝা গেল যে, তখন তাঁর সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে বদলে গেছে আর তাঁর প্রকৃতির মধ্যে লেগে গেছে আধ্যাত্মিকতার গাঢ় রঙ। ১৯০৫ সালে যে অরবিন্দ বলেছিলেন: 'এই আন্দোলন নিছক রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, আর আমাদের জাতীয়তাও ঠিক রাজনীতি নয়। এ একটা বিশেষ ধর্ম, একটা বিশ্বাস, একটা নিষ্ঠা।'—কারামুক্তির পর সেই অরবিন্দ বললেন—'আমাদের এই সনাতন ধর্মটাই হলো আসল জাতীয়তা।' অতঃপর রাজনীতির ক্ষেত্র একেবারে পরিত্যাগ করে তিনি দিব্যজীবনের সন্ধানে বাংলা দেশ ত্যাগ করে পণ্ডিচেরী চলে যান। কিন্তু অরবিন্দের এই রূপান্তর এবং রাজনীতি থেকে তাঁর অবসর গ্রহণ, তাঁর বন্ধু চিত্তরঞ্জনের মনে তখন কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা জানা যায় না।

তবে ইতিহাসে এইটুকু সত্য বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকবে যে, বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে যখন ভারতের বড়ো বড়ো নেতারা এখানকার ব্রিটিশ শাসনকে ভগবানের কৃপা বলেই জ্ঞান করছেন, তারই মধ্যে এক ইংরেজী-শিক্ষিত তরুণ যুবক এসে ভারতে এক নতুন রকমের

স্বাধীনতার ধূয়া তুলেই ক্ষান্ত হলেন না, যাতে সেই পূর্ণ স্বাধীনতা (অরবিন্দের নিজের কথায় : 'Absolute autonomy free from British control') প্রকৃতই লাভ করা যায় সেজন্য রীতিমত বাস্তব ধরনের চেষ্টাতেও নিযুক্ত হলেন। অরবিন্দ শুধু যে নতুন এক জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন তা নয়, দেশের উৎসাহী যুবকদের মধ্যে তিনি কালাতীত শাশ্বত ভারতের অমর বাণীগুলিও প্রচার করেছিলেন তাঁর নিজস্ব 'বন্দে মাতরম্' এবং পরবর্তীকালে 'কর্মযোগিন্' ও 'ধর্ম' পত্রিকার মাধ্যমে। তিনি শুধু কৃতকার্য হন নি একটি ক্ষেত্রে —কংগ্রেসকে তিনি বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টার যন্ত্রস্বরূপ করে তুলতে পারেন নি। তবে ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক যখন নিরপেক্ষভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করবেন তখন তিনি অরবিন্দ সম্পর্কে এই কথাই বলবেন যে—দেশকে তিনিই প্রথম অসহযোগের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন তাঁর পরিকল্পিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পাঁচ দফা কার্যসূচীর ভিতর দিয়ে। ঐতিহাসিক আরো বলবেন যে, অরবিন্দই ভারতে স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করার পথ মুক্ত করে দিয়েছিলেন সেইদিন যেদিন তিনি আদালতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন : 'To preach the ideals of freedom is no sedition.' অর্থাৎ, 'স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা রাজদ্রোহিতা নয়।' দেশের জন্য এত বড় একটা অধিকার তিনি অর্জন করেছিলেন বলেই না চিত্তরঞ্জন তাঁর প্রতি অমনভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আরো একজনের নাম উল্লেখ করতে হয়, কারণ তাঁরো সঙ্গে চিত্তরঞ্জন স্বদেশীযুগের কিছু আগে থেকেই পরিচিত হয়েছিলেন এবং সেই পরিচয় নিবিড় ও আন্তরিক ছিল। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা, ভগিনী নিবেদিতা। পরাধীন ভারতবর্ষের বেদনা এই বিদেশিনী আইরিশ দুহিতার অন্তরে যেন আগুন জ্বালাত। ভারতবর্ষে বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটাবার জন্য অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনিও মুক্তি আন্দোলনে কিভাবে

যোগ দিয়েছিলেন, সে ইতিহাস আমরা আজ বিস্মৃত হয়েছি—সেই শিখাময়ী নিবেদিতার পরিবর্তে এখন ভক্তিময়ী নিবেদিতার কথাই যেন বেশি প্রচারিত হয়ে থাকে। নিবেদিতার কথা আমি অন্যত্র বলেছি, এখানে শুধু তাঁর সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের সম্পর্কের কথাটাই সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

এই শতাব্দীকে স্পর্শ করে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যখন ইহলোক থেকে বিদায় গ্রহণ করেন তখন নিবেদিতা সর্বপ্রথম পরিচিত হন অরবিন্দের সঙ্গে। বরোদায় এঁরই কাছে তিনি চিত্তরঞ্জনের কথা, তাঁর স্বদেশপ্রেমের কথা জানতে পারেন। কলকাতায় ফিরে এসে নিবেদিতা স্বয়ং একদিন রসা রোডের বাড়িতে এসে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে পরিচিত হন। অরবিন্দের মধ্যে যেমন তিনি দেখতে পেয়েছিলেন একটি স্বদেশপ্রেমিককে, চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে কথা বলে তেমনি তাঁরো মধ্যে তিনি পেলেন একজন খাঁটি স্বদেশপ্রেমিককে। তারপর স্বদেশী আন্দোলনের সময় উভয়ের মধ্যে এই পরিচয় নিবিড় হয় ও নিবেদিতার মৃত্যু পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ণ ছিল। আলিপুর বোমার মামলায় বিনা পারিশ্রমিকে অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনে দাঁড়িয়ে চিত্তরঞ্জন যে ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন, নিবেদিতা শতমুখে তার প্রশংসা করতেন। তারপর অরবিন্দের কারামুক্তির কিছুকাল পরে চিত্তরঞ্জন যখন দার্জিলিঙ বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন সেইখানে একদিন রাস্তায় নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর দৈবক্রমে সাক্ষাৎ হয়। নিবেদিতার হাতে ছিল একটি রক্ত গোলাপ, দেখতে বেশ বড়ো। সামনাসামনি হতেই নিবেদিতা সহাস্যবদনে চিত্তরঞ্জনকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর সার্টের উপরে সেই রক্ত গোলাপটি এঁটে দেন স্বহস্তে। বলেন—'I knew you to be great, but I did not know that you were so great.' পরবর্তীকালে তাঁর বন্ধুদের কাছে এই ঘটনার উল্লেখ করে দেশবন্ধু বলতেন: 'Nivedita was truly a great soul. Miss Noble was

really a noble woman.' মহৎ মহৎকেই আকর্ষণ করে। মহাপ্রাণ মহাপ্রাণকেই চিনতে পারে।

বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর ও অরবিন্দ এই তিনজন জাতীয়তাবাদী নেতার ত্যাগ ও দেশপ্রেমিকতা চিত্তরঞ্জনকে শুধু মুগ্ধ করে নি, এঁদের প্রতি আকৃষ্টও করেছিল গভীরভাবে। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের আদিপর্বের ইতিহাস এই তিনজনের জীবনেতিহাসকে বাদ দিয়ে চিন্তা করা যায় না। এঁদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র ছিলেন চিন্তাশীল রাজনীতিজ্ঞ দার্শনিক, শ্যামসুন্দর আপন মহত্ত্বে উদাসীন এক ভাবোন্মাদ আর অরবিন্দ নীরব সাগ্নিক বিপ্লবী। তবে তিনজনেই ছিলেন স্বরাজ বা স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক এবং তিনজনই ছিলেন ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও ধর্মভাবপ্রবণ মানুষ। চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক জীবনে এই তিনজনেরই বিভিন্ন গুণের ছাপ সুস্পষ্ট এবং চিত্তরঞ্জনের আধারে যে দেশবন্ধু বিগ্রহটি পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছিল, তার গঠনে বিপিনচন্দ্র-শ্যামসুন্দর-অরবিন্দের ভাবধারা যে বহুল পরিমাণে সহায়ক হয়েছিল তা বলা চলে। দেশবন্ধুর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা তাঁর নিজস্ব সম্পদ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এই তিনজন স্বদেশ-প্রেমিকের সাহচর্য ও বন্ধুত্ব যে সেই ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার বিকাশ সাধনে সহায়ক ছিল, তা প্রতিবাদের আশঙ্কা না রেখেই বলা চলে। আরো একটি কথা। মতবিরোধ সত্ত্বেও, এই তিনজন নেতাই ছিলেন চিত্তরঞ্জন-অন্ত প্রাণ। এই চারজনের মধ্যে যে কী গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্পর্ক ছিল, সেটা না জানলে, বা না বুঝলে দেশবন্ধুর জীবনের মহিমা সম্যকভাবে ধারণা করা যায় না। এইজন্যই আমরা এই অধ্যায়ে এই তিনজনের কথা কিছুটা আলোচনা করলাম।

জননায়ক দেশবন্ধু

দ্বিতীয় খণ্ড

১৯১৭-১৯২২

বিস্ফোরণ

তব আহ্বান আসিবে যখন
সে কথা কেমনে করিব গোপন,
সকল বাক্য সকল কর্ম প্রকাশিবে তব আরাধনা।

॥ এগারো ॥

'আজ বাঙালীর মহাসভায় আমি বাংলার কথা বলিতে আসিয়াছি। দেশের নায়ক হইবার অধিকারের যে অহঙ্কার, তাহা আমার নাই। কিন্তু আমার বাংলাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি। যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য, সকল অযোগ্যতা, অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার বাংলার যে মূর্তি, তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানস-মন্দিরে সেই মোহিনীমূর্তি আরো জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। যে সত্য আমার হৃদয়ে জ্বলিতেছে, যাহাকে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে হইলে যে পাটোয়ারী বুদ্ধির আবশ্যক তাহা আমার নাই। আর নাই বলিয়া তার জন্য কোন অনুতাপও হয় না। তাই আজ যে কথাগুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, সেই কথাগুলি প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, অম্লানবদনে অকুণ্ঠিতচিত্তে আপনাদের কাছে নিবেদন করিব।'

এই কথাগুলি বলেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে। এ ঘটনা ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসের কথা এবং বাংলার সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসে এটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। বস্তুতঃ ১৯১৭ সালটি চিত্তরঞ্জনের জীবনে যেমন, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসেও তেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর এই ভাষণের কথা আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের কথাও কিছু উল্লেখ করতে হয়। সে ইতিহাস আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব, এখানে চিত্তরঞ্জনের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত যেটুকু ইতিহাস তাই-ই উল্লিখিত হলো। আগেই বলা হয়েছে, ১৯০৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাতে সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে মডারেট ও চরমপন্থীদের মধ্যে ঘোরতর মতদ্বৈধ দেখা দেয় যার ফলে শেষোক্তদল অভ্যর্থনা সমিতি থেকে বিতাড়িত হন। এর মধ্যে চিত্তরঞ্জনও ছিলেন।

দুই দলের মধ্যে বিরোধের যথার্থ কারণটা যে কি ছিল—টিলক বা নৌরজিকে সভাপতি নির্বাচন করা, না অন্য কিছু—সে বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে কিছুই উল্লেখ করেন নি। এটা খুবই আশ্চর্যের কথা। তবে একটা জিনিস অনুমান করা যেতে পারে। বিলাতে ছাত্রাবস্থায় যে চিত্তরঞ্জন ছিলেন দাদাভাই নৌরজির প্রবল অনুরাগী (সে সময়ে তিনি সুরেন্দ্রনাথেরও অনুরাগী ছিলেন), আজ পরিবর্তিত রাজনৈতিক পটভূমিকায় তাঁকে সেই নৌরজির বিরোধিতা করতে হলো—এ জিনিসটা স্বভাবতঃই তাঁর কাছে একটা বেদনাদায়ক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এর পর ১৯০৭ সালে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীতে দুই দলের মধ্যে এই বিরোধ চরমে উঠল যার ফলে এই সম্মেলন ঠিকমতো হতেই পারে নি। সুরাট কংগ্রেসের কয়েক মাস পরের ঘটনা এবং কংগ্রেসের দুই দলের মধ্যে—নরমপন্থী ও চরমপন্থী—অনৈক্যটা যখন রীতিমতো প্রকট হয় তখন থেকে দীর্ঘ একদশক কাল কংগ্রেসের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের কোন সংস্রব ছিল না বললেই চলে। এই সময়টা তাঁকে সাহিত্য ও আইন-ব্যবসায়ের কাজেই ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। ১৯০৮ সালে টিলকের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। টিলক দণ্ডিত হয়ে মান্দালয় জেলে চলে গেলেন, অরবিন্দ কারামুক্তির পর রাজনীতি থেকে চিরকালের মতো অবসর নিলেন, বাংলার বিপ্লবীরা আন্দামানে ঘানি টানতে অথবা নারকোলের দড়ি পাকাতে লাগলেন, সুরেন্দ্রনাথ অতিমাত্রায় ইংরেজের পক্ষে ঝুঁকে পড়লেন, বিপিনচন্দ্র পাল নরমপন্থী হলেন, বিপ্লবী নায়িকা নিবেদিতার মৃত্যু হলো—১৯০৮ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে। একটির পর একটি এইসব ঘটনার ফলে বাংলার রাজনীতি ও সমাজ-জীবন যেন একটা প্রচণ্ড পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলা শুরু করল। তারপরেই ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন তখন থেকে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত

একরকম নিষ্ক্রিয় স্থিতাবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল। এই রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার (Politics in suspense) পটভূমিতেই কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের শেষ বছরে, ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে, ভবানীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ও উক্ত অনুষ্ঠানে চিত্তরঞ্জনকে সভাপতিত্ব করতে আহ্বান জানান হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, মুখ্যত সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ও দুই দলের যৌথ উদ্যোগে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই মেদিনীপুর কনফারেন্সের পর এই দীর্ঘকালের মধ্যে এই জাতীয় সম্মেলন বাংলা দেশে আর হয় নি। সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ও সভামঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে তিনি নির্বাচিত সভাপতিকে সকলের নিকট পরিচিত করে দিয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জনের জীবনে এইটাই ছিল তাঁর প্রকৃত রাজনৈতিক অভিষেক—ভারতের রাজনীতিতে ভবিষ্যতের এক মহান্ নেতার অভ্যুদয়।

য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের অন্ধকারাচ্ছন্ন পটভূমিকায় এবং দেশের এক দুর্যোগপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেই এই সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল। আগের দিনে প্রাদেশিক সম্মেলনের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। এখানে আলোচিত বিষয়গুলিই কংগ্রেসের সর্বভারতীয় রাজনীতিকে পরিচালিত করতো এবং সম্ভবতঃ সেই কারণে প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকার এই জাতীয় সম্মেলনের উপর, বিশেষ করে সভাপতির ভাষণের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। সি. আর. দাশ সভাপতি, কাজেই কলকাতার পুলিশের বড়কর্তা উদ্বিগ্ন না হয়েই পারলেন না। তাঁর এক জীবনীকার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'চিত্তরঞ্জন যখন এই সম্মেলনের জন্য তাঁর ভাষণটি বাংলা ভাষায় রচনা করছিলেন, তিনি সেই সময়ে তাঁর এক তরুণ বন্ধুকে সেটি ইংরেজীতে অনুবাদ করার ভার দেন। সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার ঠিক একদিন আগে কলকাতার পুলিশ কমিশনার সেই অনুবাদককে লালবাজার

পুলিশের সদর দপ্তরে ডেকে পাঠান। পুলিশের এই তৎপরতার সংবাদ জানতে পেরে চিত্তরঞ্জন খুব উদ্বিগ্ন হন ও বিনিদ্ররজনী যাপন করেন। মনে হয়, তাঁর মূল ভাষণ অপেক্ষা তিনি এর ইংরেজী অনুবাদের নিরাপত্তার কথাই বেশি চিন্তা করে থাকবেন। তবে এজন্য তিনি তাঁর ভাষণের মূল বক্তব্যের কোন পরিবর্তন সাধন করেন নি, কারণ আগে থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, তাঁর ভাষণে চিরাচরিত বিতর্কমূলক রাজনীতির উল্লেখ তিনি আদৌ করবেন না। তারপর সম্মেলনের মঞ্চ থেকে তিনি যখন তাঁর ভাষণটি পাঠ করলেন, তখন দেখা গেল যে, বিতর্কমূলক রাজনীতির উল্লেখ তিনি যৎসামান্যই করেছেন।'*

চিত্তরঞ্জনের এই স্মরণীয় ভাষণটির নাম ছিল 'বাংলার কথা।' তাঁর এই ভাষণে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ছায়াপাত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে ইংরেজীতে বক্তৃতা দেওয়ার প্রচলিত রীতিভঙ্গ করে তিনি পরিষ্কার বাংলায় তাঁর ভাষণ প্রদান করলেন। আজ, এই সুদূর কালের ব্যবধানে, সেই অপূর্ব ভাষণটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতির এখানে কোন প্রয়োজন নেই; আমরা শুধু এর একটা বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা এই অধ্যায়ে করব এবং সেই আলোচনা-প্রসঙ্গে যখন যেখানে যতটুকু উদ্ধৃতির প্রয়োজন, মূল ভাষণ থেকে তা তুলে ধরব। লর্ড রোনাল্ডশে তাঁর 'দি হার্ট অব্ আর্যাবর্ত' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ে চিত্তরঞ্জনের এই ভাষণটির বহুল উদ্ধৃতিসহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং এর থেকেই ভাষণটির গুরুত্ব অনুমিত হয়, যদিও রোনাল্ডশে চিত্তরঞ্জনের সকল বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁর বিরূপ সমালোচনাও করেছেন। তথাপি দেশের এক উচ্চ ও যথার্থ কৃতবিদ্য রাজপুরুষ যে চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা গভীর আগ্রহের সঙ্গে সেদিন লক্ষ্য করেছিলেন, এটা বড় কম কথা নয়।

---

* *Life and Times of C. R. Das* : Ray

এখানে একটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করব। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বিরচিত *A Nation in Making* নামক গ্রন্থখানি যে সাধারণ পর্যায়ের আবেগ-উচ্ছ্বাসে উত্তপ্ত আত্মচরিত নয়, তা ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই স্বীকার করবেন। সমকালীন রাজনৈতিক ভাবধারার উন্মেষ ও বিকাশের ইহা একটি প্রামাণ্য দলিল বললেই হয়। তবে রাজনীতিতে তিনি যে দলের নেতা ছিলেন সেই মডারেটদের কথা ও তাঁদের রাজনৈতিক কর্মপ্রয়াসের প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে যতখানি আলোচিত হয়েছে এবং পক্ষপাতদুষ্ট যে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে আলোচিত হয়েছে, দুঃখের বিষয়, অন্যদের কথা, বিশেষ করে তাঁর বিরোধীপক্ষীয়দের কথা ঠিক সেইভাবে তিনি এই গ্রন্থে আলোচনা করেন নি। তাই এই গ্রন্থে বিপিনচন্দ্র, টিলক, শ্যামসুন্দর, ব্রহ্মবান্ধব ও চিত্তরঞ্জনের কথা তেমন বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয় নি, যেমনটা হওয়া উচিত ছিল। তাই দেখা যায় যে, তাঁর এই গ্রন্থের ত্রিংশ অধ্যায়ে যেখানে তিনি স্মরণীয় ১৯১৭ সালের আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিবিধ ঘটনাবলীর উল্লেখ করেছেন, সেখানে ঐ বছরেই ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের কথা অথবা এই সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণের কথা তিনি আদৌ উল্লেখ করেন নি। এর থেকেই আমরা কি সিদ্ধান্ত করতে পারি না যে, সুরেন্দ্রনাথ ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন সত্য, কিন্তু সেই ইতিহাসের নিরপেক্ষ লেখক তিনি হতে পারেন নি। তা নইলে লর্ড রোনাল্ডশে যাঁর উল্লেখ করলেন, তিনি সেই বিষয়ে একেবারেই নীরব রইলেন। অথচ এই চিত্তরঞ্জনই ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আসামীদের পক্ষ সমর্থনকালে সুরেন্দ্রনাথকে 'the idol of the nation' বলে উল্লেখ করতে দ্বিধা করেন নি। রাষ্ট্রগুরুর পক্ষে চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে এই যে অনুদারতা, এটা প্রশংসাযোগ্য কিনা, উত্তরপুরুষ তার বিচার করবেন। নেতৃত্বের মোহ মানুষকে কতখানি বিভ্রান্ত করতে পারে, বাংলার সমকালীন রাজনীতিতে এটা বোধ হয় তারই একটা নিদর্শন।

এইবার 'বাংলার কথা' প্রসঙ্গে ফেরা যাক। ভবানীপুরে প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে প্রদত্ত চিত্তরঞ্জনের এই ভাষণটিকেই আমরা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য ভাষণ, অর্থাৎ, 'first major political pronouncement' হিসাবে গণ্য করতে পারি। এই বক্তৃতাদানের মধ্য দিয়েই তিনি বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে ও প্রকাশ্যে অবতীর্ণ হলেন। আমরা দেখতে পাব যে অতঃপর তিনিই হয়ে দাঁড়ালেন বাংলার তথা ভারতের প্রধান নেতা। মডারেট অধ্যুষিত যে কংগ্রেস থেকে তিনি দীর্ঘ একদশক কাল দূরে ছিলেন, এখন থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেই কংগ্রেসকে কেন্দ্র করেই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা আবর্তিত হতে থাকে। এতকালের চিরাচরিত 'প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স' পরিণত হলো 'প্রাদেশিক সম্মিলনে' আর সেই সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষিতের 'পলিটিক্যাল্ এজিটেসন্' রূপান্তরিত হলো 'বাংলার কথায়'। এখানে উল্লেখ্য যে, চিত্তরঞ্জনের এই ভাষণটি 'বাংলার কথা' এই নামেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩২৪ সালের নববর্ষে বাঙালী সত্যিই তাঁর কাছে স্বদেশের দীক্ষা গ্রহণ করেছিল। শুধু দীক্ষা গ্রহণ নয়। এতকাল আমাদের দেশে যে একটা বিশাল জীবনস্রোত বয়ে চলেছিল, যে জীবনের সন্ধান আমরা, ইংরেজী শিক্ষিতেরা, বড় বেশি পাই নি, সেই নববর্ষের বৈশাখে প্রাদেশিক সম্মিলনে প্রদত্ত চিত্তরঞ্জনের ভাষণের মধ্যে আমরা যেন সেই জীবনের সন্ধান পেলাম। এর ছত্রে ছত্রে তাঁর যে বাংলা-প্রীতি, স্বজাতির জন্য যে মমত্ববোধ প্রকাশ হয়েছে, তারই মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি চিত্তরঞ্জনের হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। ভবানীপুর থেকে ফরিদপুর—১৯১৭ থেকে ১৯২৫—এই আট বছরকাল তিনি যেন একনিষ্ঠভাবে বাংলার কথাই ভেবে গিয়েছেন এবং এই কয়বছর একই সংকল্পে তিনি ছিলেন অবিচল। বাঙালী এই কারণেই বুঝি চিত্তরঞ্জনকে তাদের প্রাণের সিংহাসনে বসিয়েছিল। একথা সত্য যে,

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের মতোই তিনি স্বীয় রাজনৈতিক প্রতিভাবলে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের উত্তুঙ্গ শিখর স্পর্শ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তিনি মনে-প্রাণে বাঙালীই ছিলেন—বাংলার রূপের ধ্যানেই তন্ময় হয়ে থাকতেন।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী এই সম্মেলনের বিবরণ প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'চিত্তরঞ্জনের অভিভাষণ পাঠের সময় আমরা তাঁর সম্মুখে বসিয়াই তাহা শুনিতেছিলাম। এখনও মনে পড়ে কিরূপ সেই ধীর প্রশান্ত ও বীরত্বব্যঞ্জক মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব জ্যোতি প্রতিফলিত হইতে দেখিয়া দর্শকবৃন্দ যেন চিত্রার্পিতের ন্যায় মুগ্ধনেত্রে তাঁর সমস্ত কথাগুলি শ্রবণ করিতেছিল।' বাঙালী চিত্তরঞ্জন বাংলার কথা বাংলা ভাষার বলে একদিনেই যেন এতকাল একটানা বয়ে আসা রাজনীতির স্রোতোমুখ ঘুরিয়ে দিলেন। তাঁর সেই ঐতিহাসিক অভিভাষণের ছত্রে ছত্রে যেন বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন সত্য ও জীবন্ত হয়ে উঠেছিল—বঙ্কিমের সেই হৃদয়-মন আকর্ষণ করা আহ্বান-বাণীই যেন এই শতকের দ্বিতীয় দশকে চিত্তরঞ্জনের বাংলার কথায় অনুরণিত্ হয়ে উঠল। বাংলা যেমন বঙ্কিমের ধ্যানের বিষয় ছিল, সেই বাংলাই তেমনি ছিল চিত্তরঞ্জনের হৃদয়ের সবখানি জুড়ে। বঙ্কিম দিয়েছিলেন ভাব, এখন চিত্তরঞ্জন দিলেন একটা নিখুঁত কর্মসূচী। দেশগঠনের, জাতিগঠনের এমন একটি সুষ্ঠু ও সার্বিক পরিকল্পনা নিয়ে তিনি সেদিন প্রাদেশিক সম্মিলনীর মঞ্চের উপর দাঁড়িয়েছিলেন যা সকলকেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

চিত্তরঞ্জন তাঁর এই ভাষণটির নাম 'বাংলার কথা' দিয়েছিলেন কেন? এইরকম একটা পলিটিক্যাল্ কনফারেন্সে বাংলার কথা বলার কি থাকতে পারে? সম্মিলনে উপস্থিত শ্রোতাদের মনের এই কৌতূহল নিরসন করে তাঁর ভাষণের প্রথমেই তিনি তাই বলেছিলেন:

'প্রথমেই হয়ত অনেকেরই মনে হইবে যে, এই মহাসভা শুধু রাজনৈতিক আলোচনার জন্য, এই সভায় বাংলার কথার আবশ্যক কি? এই প্রশ্নই

আমাদের ব্যাধির একটি লক্ষণ। সমগ্র জীবনটাকে টুকরো টুকরো করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া আমাদের শিক্ষাদীক্ষা ও সাধনের স্বভাববিরুদ্ধ। আমরা ইউরোপ হইতে ধার করিয়া এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি এবং ধারকরা জিনিস ভাল করিয়া বুঝি নাই বলিয়া আমাদের অনেক পরিশ্রম, অনেক চেষ্টাকে সার্থক করিতে পারি নাই। যে জিনিসটাকে রাজনীতি বা politics বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহার সঙ্গে কি সমস্ত বাংলাদেশের সমগ্র বাঙালী জাতির একটা সর্বাঙ্গীন সম্বন্ধ নাই? কেহ কি আমাকে বলিয়া দিতে পারে আমাদের জাতীয় জীবনের কোন্ অংশটা রাজনীতির বিষয়, কোন্ অংশটা অর্থনীতির ভিত্তি, কোন্ অংশটা সমাজনীতির প্রাণ, আর কোন্ অংশটা ধর্মসাধনের বস্তু? জীবনটাকে মনে মনে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া, এইসব মনগড়া জীবনখণ্ডের মধ্যে কি আমরা অলক্ষ্য প্রাচীর তুলিয়া দিব? এই কাল্পনিক প্রাচীরবেষ্টিত যে কাল্পনিক জীবনখণ্ড ইহারই মধ্যে কি আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা আন্দোলনের যে বিষয়, তাহাকে কি বাঙালী জাতির যে জীবন, সেই জীবনের সবদিক দিয়া কি দেখিতে চেষ্টা করিব না? যদি না দেখি, তবে কি সত্যের সন্ধান পাইব?···বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের অর্থ এই যে, আমাদের দেশে রাজা-প্রজায় যে সম্বন্ধ, তাহা পরীক্ষা করা ও কিরূপ হও উচিত, তাহাই বিচার করা।

'কিন্তু ঐ যে রাষ্ট্রীয় চিন্তা বা চেষ্টা, ইহার সার্থকতা কোথায়? এক কথায় বলিতে হইলে, বাঙালীকে মানুষ করিয়া তোলা। বাঙালী যে অমানুষ, তাহা আমি কিছুতেই স্বীকার করি না। আমি যে আপনাকে বাঙালী বলিতে একটা অনির্বচনীয় গর্ব অনুভব করি, বাঙালীর যে একটা নিজের সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, কর্ম আছে, ধর্ম আছে, বীরত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে। বাঙালীকে যে অমানুষ বলে সে আমার বাংলাকে জানে না।

'আমাদের যে রাজনৈতিক আন্দোলন, ইহা একটা প্রাণহীন, বস্তুহীন, অলীক ব্যাপার। ইহাকে সত্য করিয়া গড়িতে হইলে বাংলার সবদিক দিয়াই দেখিতে হইবে। বাংলার যে প্রাণ, তাহারই উপর ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাই আজ এই মহাসভায় কয়টি বাংলার কথা বলিতে আসিয়াছি। বাঙালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রীস্টান হউক, বাঙালী বাঙালী। বাঙালীর একটা বিশিষ্টরূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে। একটা স্বতন্ত্র ধর্ম

আছে। এই জগতের মাঝে বাঙালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্তব্য আছে। বাঙালীকে প্রকৃত বাঙালী হইতে হইবে।'

'বাঙালীকে প্রকৃত বাঙালী হইতে হইবে'—চিত্তরঞ্জনের এই কথা কালের প্রান্তর অতিক্রম করে আজো আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয়। বাঙালীর হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শোনা গেল 'বাংলার কথার' মধ্যে। দশ বছর আগে দার্জিলিঙ-এ প্রদত্ত সেই ভাষণটির সঙ্গে এর একটা ভাবগত সদৃশ্য আছে। তবে ভবানীপুরের ভাষণ যেন আরো জমাট, আরো পরিষ্কার, আরো প্রাণস্পর্শী। এক কথায় 'বাংলার কথা' মামুলি বক্তৃতা ছিল না, এ ছিল চিত্তরঞ্জনের প্রাণের কথা আর তাই দিয়েই তিনি রচনা করলেন বাংলার রাজনীতির এক নব-সংহিতা।

স্বদেশপ্রেমকে একটা নতুন ব্যঞ্জনা দিলেন চিত্তরঞ্জন তাঁর এই ভাষণের মধ্যে। যে স্বদেশপ্রেম এতকাল ছিল পাশ্চাত্ত্য পলিটিক্সের অন্ধ অনুকরণ, যার গতি ছিল রাজসরকারমুখী, স্বদেশপ্রেমের সেই অন্ধ গতিকে তিনি ফেরাবার চেষ্টা করলেন—তাকে আহ্বান করলেন রাজসরকারের দিক থেকে প্রজাসাধারণের দিকে, লোককল্যাণের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য। তিনি দেখেছিলেন, এতকাল ধরে পলিটিক্যাল্ এজিটেশনের সমুদ্রমন্থনে গরলই বেশি উঠেছে, অমৃতের কোন সন্ধান নেই। দেশের অসহিষ্ণু যুবশক্তির হৃদয়াবেগকে ঠিক কোন্ পথে পরিচালিত করতে পারলে তাদের স্বদেশপ্রেম ধর্মে-কর্মে সমাজ-শিক্ষায় ও রাজনৈতিক কর্মপ্রয়াসে লোককল্যাণের পথে সার্থক হবে, তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন চিত্তরঞ্জন। বললেন, দেশের যুবকদের দেশের কাজে লাগাতে হবে—তাদের প্রকৃত দেশের কাজ দিতে হবে। প্রাচীন ভারতে দেশের কাজের প্রকৃতিটা যে কি ছিল, তা চিত্তরঞ্জন তাঁর ভাষণের গোড়াতেই স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন :

'আমাদের কৃষিকার্য হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় সামাজিক ব্যবহার পর্যন্ত, আমাদের সকল ভাব, ভাবনা, সকল চেষ্টা ও সকল সাধনার সঙ্গে আমাদের ধর্মের কি সম্বন্ধ ছিল ও আছে, তার বিচার অবশ্য কর্তব্য সেদিকে চোখ না রাখিলে সব দিকই যে অন্ধকার দেখিবে। সব প্রশ্নই যে অকারণে অস্বাভাবিক ভাবে জটিল ও কঠিন হইয়া উঠিবে। সেইদিকে দৃষ্টি না রাখিলে কোন মীমাংসাই সম্ভবপর হইবে না।'

ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণের মূল কথা প্রকৃত দেশের কাজের প্রতি আমাদের আহ্বান করা। আমরা এতকাল রাজনীতি পড়েছি ও রাজনীতি করতে গিয়েছি, দেশের কাজ ভাল করে বুঝিও নি, করতেও যাই নি। তাইতো চিত্তরঞ্জন বললেন :

আমাদের অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি বিপদ যে, আমরা ক্রমশঃই আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, আচার-ব্যবহার অনেকটা ইংরাজীভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। রাজনীতি বা politics শব্দটি শুনিবামাত্র আমাদের দৃষ্টি আমাদের দেশ একেবারে অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ডে গিয়া পঁহুছায়। ইংরাজের ইতিহাসে এই রাজনীতি যে আকার ধারণ করিয়াছে, আমরা সেই মূর্তিরই অর্চনা করিয়া থাকি। বিলাতের জিনিসটা আমরা যেন একেবারে তুলিয়া আনিয়া এই দেশে লাগাইয়া দিতে পারিলে বাঁচি। এই দেশের মাটিতে তাহা বাড়িবে কিনা, তাহা ত একবারও ভাবি না।…ইউরোপে রাজনীতির যত স্কুল আছে, সব স্কুলের কেতাবে ও কোরানে যত ধারাল বাক্য আছে, একবারে এক নিশ্বাসে মুখস্থ করিয়া ফেলি, আর মনে করি এইবার আমরা বক্তৃতা ও তর্কে অজেয় হইলাম, দেখি আমাদের শাসনকর্তারা কেমন করিয়া আমাদের তর্ক খণ্ডন করেন। মনে করি, রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু তর্ক-বিতর্কের বিষয়, বক্তৃতার ব্যাপার মাত্র। আমরা বক্তৃতা করিয়া, তর্ক করিয়া জিতিয়া যাইব। আমাদের সকল উদ্যম ও সকল চেষ্টার উপরে আমাদের ধার করা কথার ভাব লাগাইয়া দিই। যাহা স্বভাবতঃ সহজ সরল তাহাকে মিছামিছি বিনা কারণে জটিল করিয়া তুলি। শুধু যাহা আবশ্যক তাহা করি না; দেশের প্রতি মুখ তুলিয়া চাই না; বাংলার কথা, বাঙালীর কথা ভাবি না, আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে সর্বতোভাবে তুচ্ছ করি। কাজেই আমাদের

রাজনৈতিক আন্দোলন অসার, বস্তুহীন। তাই এই অবাস্তব আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাণের যোগ নাই; এই কথা হয়ত অনেকে স্বীকার করিবেন না।'

দেশের বর্তমান পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় চিত্তরঞ্জনের এই কথাগুলি যে আজো তার মূল্য হারায় নি এবং বর্তমানের স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে এই মন্তব্যগুলি যে আজো প্রযোজ্য, তা আমরা প্রতিবাদের আশঙ্কা না করেই বলতে পারি। বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-টিলক যে কথা বলেছেন, চিত্তরঞ্জনও প্রাদেশিক সম্মিলনের মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে সেই কথাই ঘোষণা করলেন—পাশ্চাত্ত্য পলিটিক্সের আদর্শে মুগ্ধ না হয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করার জন্য আহ্বান জানালেন। 'বাংলার কথায়' আরো দুটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের সদ্বিচার আছে,—একটি পাশ্চাত্ত্য ইনডাস্ট্রিয়ালিজম্ সম্বন্ধে ও দ্বিতীয়টি আমাদের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে।

আমাদের লুপ্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার ও কৃষিকার্যের উন্নতিসাধন করতে হলে কি কি করা দরকার, চিত্তরঞ্জন তাও বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং এই কাজ কিভাবে করা সম্ভব তারো একটা সুস্পষ্ট নির্দেশ তাঁর এই ভাষণের মধ্যেই আছে। চৌদ্দ দফা কর্মসূচী সেদিন তিনি আমাদের সামনে রেখেছিলেন। তাঁর সেই কাজের তালিকা অর্থাৎ কি কি করতে হবে আর কাজের প্রণালী, অর্থাৎ—কি করে করতে হবে—তাঁর ভাষণের এই দুই অংশ যাঁরা গভীরভাবে পাঠ করেছেন তাঁরাই লক্ষ্য করেছেন যে, পল্লীগ্রামের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর আসল বক্তব্য। দেখা যাচ্ছে, গান্ধীর অনেক আগেই দেশবন্ধু গ্রামোন্নয়নের কথাটা চিন্তা করেছেন। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য যে ১৯১৭ সালে একটা প্রাদেশিক সম্মেলনে উপস্থাপিত সেই চৌদ্দ দফা কার্যসূচী পরবর্তীকালে সর্বভারতীয় কর্মসূচী বলে স্বীকৃত বা গৃহীত হয় নি; তা যদি হতো, তা হলে দেশের চেহারা অনেক আগেই আমূল পরিবর্তিত হয়ে যেত। তাঁর

অকালমৃত্যু ও গান্ধীর নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব—প্রধানতঃ এই দুটি কারণে চিত্তরঞ্জনের গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচী ঠিক তাঁরই চিন্তার ছক ধরে সফল হয়ে ওঠে নি। 'গাঁও মে কংগ্রেস' কংগ্রেসের জীবনে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক ছিল সত্য, কিন্তু গ্রামকে কি করে ভালবাসতে হয়, তা বোধ করি সেদিন একমাত্র চিত্তরঞ্জনই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সমগ্র ভারতের জাতীয় জীবনে পল্লীজীবন কিভাবে কেন্দ্রস্থানীয়, তা বোধ হয় আজ আমরা কিছুটা উপলব্ধি করতে শিখেছি।

'বাংলার কথা' বক্তৃতার উপসংহারে তিনি স্বদেশবাসিগণের কাছে তাঁর প্রাণের নিবেদন যেভাবে ও যে ভাষায় জানিয়েছিলেন তার সঙ্গে ১৯০৪ সালে এ্যালবার্ট হলে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার অনেকখানি সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করে আমরা এই অধ্যায় শেষ করছি। চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন:

'বাংলার কথা যেন অচিরে বাঙালীর কার্যে পরিণত হয়। সমবেত চেষ্টা চাই, সকলের উদ্যম চাই, বাঙালীর স্বার্থত্যাগ চাই। এই যে জীবন-যজ্ঞ ইহা শুদ্ধচিত্তে পবিত্র প্রাণে আরম্ভ করিতে হইবে। সকল বিদ্বেষ, সকল স্বার্থ ইহাতে আহুতি দিতে হইবে। ইহাতে বর্ণধর্মনির্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিতে হইবে। কর্মক্ষেত্রে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না। যে অধিকার আজি আমরা দাবী করিতেছি তাহা যুক্তিসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, আমাদের স্বভাবধর্মসঙ্গত। এই অধিকার হইতে কেহ আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।'

এই প্রাদেশিক সম্মেলন থেকেই চিত্তরঞ্জনের জীবনে দিক্‌পরিবর্তন সূচিত হয়। অতঃপর আমরা দেখিতে পাইব যে, তখন থেকে তিনি বাংলা তথা সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব নিয়ে। এখান থেকেই শুরু হয় তাঁর জীবনের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

॥ বারো ॥

১৯১৭ সাল নানা কারণে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। সেই ইতিহাস বলার আগে তার আগের আট বছরের ইতিহাস কিছু উল্লেখ করতে হয়। ১৯০৫ সনে তাঁর কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই লর্ড কার্জনকে বিদায় নিতে হয়। তাঁরই অদূরদর্শিতার ফলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হয়েছিল বলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কার্জনের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর স্থলে এলেন নতুন ভাইস্‌রয় লর্ড মিণ্টো। তারপর ১৯০৬ সালে ইংলণ্ডে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন উদারনৈতিক দল আর সেই সময়ে ভারতসচিবের পদে নিযুক্ত হলেন লর্ড মর্লি। লর্ড মিণ্টো ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে দেখলেন যে, কার্জনের স্বৈরাচারী শাসনের ফলে ভারতবাসীর মনে তিক্ততা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আরো উপলব্ধি করলেন যে ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করার জন্য, বিশেষ করে কংগ্রেসের মডারেট নেতাদের খুশি করার জন্য একটা কিছু করা দরকার। তিনি অগ্রণী হয়ে ভারতসচিবের সঙ্গে পরামর্শ করে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য কতকগুলি প্রস্তাব রচনা করেন। কার্যভার গ্রহণ করার অব্যবহিতকাল পরেই লর্ড মিণ্টো ভারতের সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে যে 'মিনিট' রচনা করেছিলেন, তার একস্থলে তিনি উল্লেখ করেন : 'The political atmosphere is full of change; questions are before us which we cannot afford to ignore, and which we must attempt to answer; and to me it would appear all important that the initiative should emanate from us'.*

* *Minute of Lord Minto*: M. C. Report.

মুখে যাই বলুন, অন্তরে যে সদিচ্ছাই থাকুক, কার্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেল যে, লর্ড মিণ্টো স্বৈরাচারিতার দিক দিয়ে তাঁর পূর্ববর্তী রাজপ্রতিনিধির চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না। বিক্ষুব্ধ ভারতবাসীকে শান্ত বা সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁরই শাসনকালে এবং ভারতসচিব লর্ড মর্লির অনুমোদনক্রমে যে কয়টি দমনমূলক আইন প্রবর্তিত হয় সেগুলির মধ্যে এই কয়েকটি বিশেষভাবেই উল্লেখ্য, যথা —দি নিউজ পেপার্স য়্যাক্ট ও দি এক্সপ্লোসিভস্ য়্যাক্ট। প্রথমটির উদ্দেশ্য ছিল সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা দেওয়া। বলা বাহুল্য, ক্লাইভ ষ্ট্রীটের য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বণিক ও ধনিকগোষ্ঠীর চাপে পড়েই এইসব আইন প্রবর্তন করে তিনি অসন্তোষের মাত্রা আরো বাড়িয়ে তুলেছিলেন। এই সময়ে (১৯০৮, জুন) ছয় মাসের জন্য সারা বাংলাদেশে সভাসমিতি নিষিদ্ধ হয়েছিল। তারপর এই বছরের শেষভাগে রাজনৈতিক আসামীদের সরাসরি বিচারের জন্য ও বিশেষ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে বেআইনী বলে ঘোষণা করার জন্য স্পেশাল ক্রাইমস্ য়্যাক্ট নামে একটি নতুন আইন প্রবর্তিত হয়।

এছাড়া, লর্ড মিণ্টোর আমলেই পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও আমলাতন্ত্র এবং পুলিশের অত্যাচার ও জুলুমের সীমা-পরিসীমা ছিল না বললেই হয়। ১৯০৬ সালের শেষ-ভাগেই তিনি ভারতসচিবের সম্মতিক্রমে সেই পুরাতন ও মরচেপড়া অস্ত্রটি (Bengal Regulation III of 1818) পুনরায় ব্যবহার করেন এবং আইনের ক্ষমতাবলে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাংলার জাতীয়তাবাদীদলের নয়জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নির্বাসিত করেন। সেদিন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল ভারতের তৎকালীন সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখেলের কণ্ঠে। লণ্ডনের রিফর্ম ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি গ্রেটব্রিটেনের শা[illegible]কগোষ্ঠীর নিকট লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ অবিলম্বে রহিত করার

জন্য একটি বলিষ্ঠ আবেদন জানিয়েছিলেন কিন্তু জন মর্লি সে কথায় কর্ণপাত না করে পার্লামেণ্টের উভয় সভায় বলেছিলেন : 'The Partition is settled and sacrosanct'. এই বিক্ষুব্ধ পটভূমিকাতেই প্রবর্তিত হয়েছিল ১৯০৯-এর ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ য়্যাক্ট তথা মর্লি-মিণ্টো রিফর্ম। এখানে উল্লেখ্য যে, নতুন শাসন-সংস্কারের পরিকল্পনা যখন রচিত হয় ও পার্লামেণ্টে নতুন রিফর্ম বিল উত্থাপিত হওয়ার কিছু আগে ভারতসচিব নিজের দায়িত্বে একটি কাজ করে বসেন। বড়লাটের মন্ত্রিসভায় তিনি সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহকে (ইনি তখন কলকাতা হাইকোর্টের একজন উদীয়মান ব্যারিস্টার এবং পরবর্তীকালে লর্ড সিংহ) ভারতীয় সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করেন। ভারতের শাসনব্যবস্থায় যোগ্য ভারতীয়কে নিয়োগ করা হবে, এই প্রতিশ্রুতি যদিও ১৮৩৩ সালের সনদে (Charter Act of 1833) ও পরবর্তীকালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এযাবৎকাল তা কার্যত পরিণত হয় নি। লর্ড মর্লির এই প্রয়াসের ফল ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে ইহাই পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে মণ্টেগু প্রবর্তিত শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের পথ অনেকখানি সুগম করে দিয়েছিল। এর ঠিক দু'বছর আগে এই মর্লির চেষ্টাতেই হোয়াইট হলের দরজা ভারতীয়দের জন্য কিছুটা উন্মুক্ত হয় ও তখন কাউন্সিল্ অব্ ইণ্ডিয়াতে দুজন ভারতীয় সদস্যকে গ্রহণ করা হয় এবং ভাইস্‌রয়ের কেবিনেটে সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের নিয়োগের ক্ষেত্রে যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনি সমগ্র ভারতের শ্বেতাঙ্গ সমাজে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল।

একথা সত্য যে, মডারেটদের খুশি করার জন্যই এই নতুন শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যে প্রতিনিধিমূলক [illegible] শাসনের কোন ব্যবস্থা তো ছিলই না, বরং এর [illegible] এমন একটি মারাত্মক জিনিস—পৃথক সাম্প্রদায়িক

প্রতিনিধিত্ব—যার বিরোধিতা মডারেটরা পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরা বুঝলেন, মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করে সরকার একদিকে বিভেদের মাধ্যমে শাসন অর্থাৎ 'divide and rule' এই নীতি গ্রহণ করতে চাইলেন, আর অন্যদিকে ভারতের জাতীয় স্বার্থকে পদদলিত করতে উদ্যত হলেন। নতুন রিফর্মস্ প্রবর্তিত হলো ১৯০৯ সালে, আর পরের বছরে নতুন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ এসে মডারেটদের সাধ্যসাধনা করেও তাঁদের দিয়ে এটা গ্রহণ করাতে সক্ষম হলেন না। চরমপন্থীরা তো ভীষণ ভাবেই এর বিরোধিতা করলেন। কংগ্রেসের ষষ্ঠ-বিংশ অধিবেশনে (এই অধিবেশন কলকাতায় হয়েছিল ১৯১১ সালে) মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার সরাসরিভাবেই প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৯০৭ সালে যখন এই সংস্কারের প্রথম খসড়া তৈরি হয় তখন 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় কয়েকটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে (যা শ্যামসুন্দর ও অরবিন্দের লেখনীপ্রসূত ছিল) এর তীব্র নিন্দা করা হয়েছিল।

তবে এই নতুন সংস্কারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছিলেন একমাত্র অরবিন্দই। 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন: 'This offer of conciliation on one hand and the pressure of repression on the other is a dangerously double-edged policy. The Reforms are a mockery and a trap and the co-operation expected from the people is not true co-operation but merely a parody of the same'. সেই সময়ে ছয় দফা কার্যসূচী সম্বলিত যে নির্দেশ অরবিন্দ দিয়েছিলেন তাঁর দেশবাসীর সামনে, তার মূল কথাটা ছিল স্বাবলম্বন, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আর অসহযোগ। 'No control, no co-operation'—এই ইঙ্গিত দিয়ে সেদিন তিনি একদিকে যেমন তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, অন্যদিকে

দেশের স্তিমিত রাজনীতিতে একটা নতুন প্রেরণাও এনে দিয়েছিলেন। কথিত আছে, কর্মযোগিনের পৃষ্ঠায় তাঁর বন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তার এই শেষ উদ্ভাসন দেখে চিত্তরঞ্জন খুব খুশি হয়েছিলেন। যাই হোক, দলমতনির্বিশেষে ভারতের সকল নেতাই একযোগে এই সংস্কার প্রত্যাখ্যান করলেন, কারণ এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

বৈধ আন্দোলনের নেতা ও মডারেট-শিরোমণি সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'মর্লি-মিন্টো শাসন-সংস্কার ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সামান্যমাত্র অগ্রগতি এনেছিল। কেউই এর মধ্যে অসামান্য কিছু দেখে নি কারণ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য মাত্র এই ছিল যে, প্রস্তাবিত এই সংস্কার বেসরকারী সদস্যদের জনস্বার্থ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উত্থাপন করবার ক্ষমতা দিয়েছিল। মোট কথা, এই ভুয়া শাসন-সংস্কার মডারেটদের কিছুমাত্র উৎসাহিত করতে পারল না। মর্লির সেই প্রত্যাশা—'rally the moderates' অচরিতার্থই থেকে গেল। এই নতুন সংস্কার যখন প্রবর্তিত হয়, তখন বাংলার নেতৃস্থানীয় সকলেই একবাক্যে বললেন, 'যতক্ষণ না বঙ্গভঙ্গ রহিত হচ্ছে ততক্ষণ নতুন আইনসভা সম্পর্কে আমরা কিছুই করব না।' সুরেন্দ্রনাথ এই সময়ে ইংলণ্ডে গিয়েও প্রকাশ্যে বলে এসেছিলেন: 'The Morly-Minto Reforms is too iron, too wooden, too idealistic—there is nothing in it which can be acceptable to us. All that we wanted real economic freedom and real self-Government. This has not been granted to us.'

নতুন সংস্কার প্রবর্তিত হলো বটে, কিন্তু বাংলা তথা ভারতে অশান্তি ও বিক্ষোভ চলতে থাকল সমানভাবেই। তারপর ২৫শে আগষ্ট, ১৯১১, লর্ড হার্ডিঞ্জের গভর্ণমেণ্ট বঙ্গবিচ্ছেদ-ব্যবস্থা বাতিল

করবার সুপারিশ করে বিলাতে ভারতসচিবের নিকট এক ডেস্‌প্যাচ পাঠালেন। অবশেষে বিক্ষুব্ধ বাঙালী তথা ভারতবাসীকে খুশি করার জন্য এই বছরের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জের ঘোষণায় বঙ্গবিচ্ছেদ-ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় এবং সেই সঙ্গে আমাদের জাতীয় সংগ্রামের প্রথম অধ্যায় (১৯০৫-১৯১০) পরিসমাপ্ত হয়। সেদিন এই রাজকীয় ঘোষণায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে বলা হয়েছিল: 'Every heart is beating in unison with reverence and devotion to the British Throne, overflowed with revived confidence in and gratitude towards British statesmanship.' শোনা যায়, চিত্তরঞ্জন কৃতাঞ্জলিপুটে কংগ্রেসের এই কৃতজ্ঞতা নিবেদন সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছিলেন, 'Is this our National Congress?' তাঁর এই মন্তব্য থেকেই আমরা বুঝতে পারি কেন তিনি ১৯০৮-এর পর দীর্ঘকাল কংগ্রেসের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখেন নি। কথিত আছে, এই সময়ে তিনি তাঁর রাজনৈতিক সতীর্থদের বলতেন, 'কংগ্রেস তো আসলে সেটা মজলিস।' মর্লি-মিণ্টো রিফর্মস্ সম্পর্কেও চিত্তরঞ্জনের মন্তব্য ছিল স্বল্পাক্ষরে সুস্পষ্ট—'inadequate and insufficient' এবং এই সংস্কারকে গোখেল যখন সমর্থন জানিয়েছিলেন তখন চিত্তরঞ্জন যারপরনাই বিস্মিত হয়েছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, সম্রাট পঞ্চম জর্জের ঘোষণায় বঙ্গবিচ্ছেদ রহিত হলো, বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলন জয়যুক্ত হলো, কিন্তু সেই সঙ্গে বাঙালীকে আঘাত করা হলো দুদিক দিয়ে—প্রথম, কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানীকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হলো, যার ফলে বাঙালীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য চিরকালের মতো খর্ব করে দেওয়া হয়; দ্বিতীয়, বিহার ও উড়িষ্যাকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হয় এবং এর

ফলে খনিপ্রধান অঞ্চলগুলি বাংলার বাইরে চলে যায়। দুঃখের বিষয়, এইভাবে বাংলার যে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধন করা হয় তার বিরুদ্ধে সেদিন বাঙালী নেতাদের কণ্ঠে কোন প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় নি। একমাত্র পুরুষসিংহ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রাজধানী স্থানান্তরিত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কারণ এই বিষয়টাকে তিনি বাঙালীর জাতীয় জীবনের একটি সংকট বলে মনে করেছিলেন। সেদিন আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধাররূপে যে বিরাট শিক্ষাযজ্ঞের আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য ছিল কলকাতাকে শুধু বিদ্যানুশীলনের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত করা নয়, একেই তিনি ভারতের পলিটিক্যাল্ ও ইন্‌টেলেকচুয়াল্ রাজধানীতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের রাজধানী সহসা দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য তার এই স্বপ্ন শূন্যে বিলীন হয়ে যায়। ১৯১১-তে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়; ১৯১২ সালের কন্‌ভোকেসন্ বক্তৃতায় আশুতোষ এই প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন তা এখানে উল্লেখ্য। তিনি বলেছিলেন: 'Bengal has been for more than a century the leading province of India ; Calcutta has been the Capital in name no less than in fact, of a great empire ; and now these high distinctions are all at once passing away from us. Calcutta, Bengal, are discrowned and cannot help feeling dissolate.'*

আশুতোষের এই উক্তিটি সেদিন সংবাদপত্রে পাঠ করে, কথিত আছে, চিত্তরঞ্জন একখানি পত্র লিখে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন এই বলে: 'Let me frankly state that you have boldly and adequately given expression to the grievous bereavement that lives heavy on our minds due to

* লেখকের 'শিক্ষাগুরু আশুতোষ' দ্রষ্টব্য।

the transfer of the Capital from Calcutta to Delhi.' পরবর্তীকালে যখন তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন, তখন চিত্তরঞ্জনের খুবই আশা ছিল, আশুতোষকে তিনি সহযোগী হিসাবে পাবেন, কিন্তু তাঁর সে আশা ফলবতী হয় নি। আশুতোষের স্বজাতিপ্রীতি, সংগঠনী প্রতিভা ও স্বাধীনচিত্ততা চিত্তরঞ্জনকে বিশেষভাবেই আকৃষ্ট করেছিল। তারপর ১৯২৪ সালে আশুতোষ যখন লর্ড লিটনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তার সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন, তাঁর সেই ঐতিহাসিক পত্র চিত্তরঞ্জনের 'ফরওয়ার্ড' কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন ও আশুতোষ, বাংলার রাজনীতিতে সেদিন যদি এই দুইজন একত্রে কাজ করতে পারতেন তাহলে দেশের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় হতো সন্দেহ নেই।

১৯১৪।

এই বছরের জুলাই মাসে য়ুরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধল। যুদ্ধের সময় থেকেই ভারতরক্ষা আইনে এক বাংলাদেশেই বারো শত লোক বিনাবিচারে নির্বাসিত হয়েছিলেন। তার আগে ভারত-সরকার য়্যানি বেশান্তকে উটকামণ্ডে নির্বাসিত করেন এবং আলি ভ্রাতৃদ্বয়কেও (মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি) ভারতরক্ষা আইনের বলে নির্বাসিত করেন। এইসব অন্তরীণের প্রতিবাদে বাংলার রাজনৈতিক আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন ছিল। এইসব রাজনৈতিক প্রতিবাদে সেদিন অগ্রণী ছিলেন একজনই। তিনি চিত্তরঞ্জন। এই ব্যাপারে তিনি যেভাবে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন ও একাধিক সভায় স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে যে-সব বক্তৃতা করেছিলেন তা অবিস্মরণীয়। প্রথম মহাযুদ্ধে ভারত ১৫০ কোটি টাকা দিয়ে গ্রেট-ব্রিটেনকে সাহায্য করেছিল এবং দলে দলে ভারতীয় যুবক ফ্রান্স ও মেসোপটেমিয়ার রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিল। তাই প্রথম থেকেই

টিলক প্রমুখ নেতারা বক্তৃতার মাধ্যমে বলতে থাকেন, ভারতবর্ষ অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার দাবী করবার সম্পূর্ণ অধিকারী।

ঠিক এই সময়ে (অক্টোবর, ১৯১৫) লর্ড হার্ডিঞ্জ সিমলার ইউনাইটেড সার্ভিস্ ক্লাবে শ্বেতাঙ্গদের প্রতিনিধিস্থানীয় এক বিরাট সমাবেশে ঘোষণা করেন : 'Let it be realized that great as has been England's mission in the past, she has a far more glorious task to fulfil in the future, in encouraging and guiding the political self-development of the people···The day for the complete fulfilment of this ideal is not yet, but it is to this distant vista that the British official should turn his eyes.' হার্ডিঞ্জের এই ঘোষণার ঠিক তিন মাস পরে লর্ড সিংহ (তখন 'স্যার') বোম্বাইতে এক বক্তৃতায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে সরকারের সুস্পষ্ট নীতি ও অভিপ্রায় কি তা জানতে চাইলেন। এবং এটা তিনি জানতে চেয়েছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে। সে বছর তিনিই কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে ভাইস্রয়ের এগ্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রথম ভারতীয় সদস্য, ব্রিটিশ আমলে প্রথম ভারতীয় 'পিয়র' (Peer), রায়পুরের এই সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা গ্রহণ না করলেও তাঁর রাজনৈতিক মতামতের প্রতি চিত্তরঞ্জন যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।

'We insist on a declaration of the Government's policy and purpose.'—ভারতের জাতীয় মহাসভার সভাপতির এই দাবী লর্ড হার্ডিঞ্জ উপেক্ষা করতে পারলেন না এবং এই সর্বপ্রথম দেখা গেল যে, কংগ্রেসের একজন সভাপতির মন্তব্য সম্পর্কে বড়লাটকে গুরুত্ব দিতে হলো। অতঃপর আমরা দেখতে পাই যে লর্ড সিংহের এই উক্তির সূত্র ধরেই লর্ড হার্ডিঞ্জ বিলাতে

ভারতসচিবের সঙ্গে এক সুদীর্ঘ পত্রালাপ শুরু করলেন। এই পত্রালাপের উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে ভারতে শাসন-সংস্কারের একটি নতুন পরিকল্পনা রচনা করা যেতে পারে। ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের অভিপ্রায় ও লক্ষ্য সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ঘোষণা দাবী করে লর্ড সিংহ এক হিসাবে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন, অনেকের এইরূপ বিশ্বাস। কিন্তু এই ঘোষণার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল যুদ্ধ। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ তখন ঘোরালো হয়ে উঠেছে; এবং এই যুদ্ধের ফলাফল কি দাঁড়াবে সে বিষয়ে ইংরাজের উদ্বেগের সীমা-পরিসীমা নেই—মিত্রশক্তির সৌভাগ্য তখন দোদুল্যমান অবস্থায় বললেই হয়। আর এই সংকটের প্রত্যেকটি স্তরে গ্রেটব্রিটেনকে ভারতের অর্থবল ও জনবলের সাহায্য নিতে হলো। ভারত তাতে কার্পণ্য করে নি, কারণ তার প্রত্যাশা ছিল যে, এর বিনিময়ে সদাশয় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন দান করবেন। মিস্টার য়্যাস্‌কুইথ (পরবর্তীকালে লর্ড) তখন ইংলণ্ডের প্রধান-মন্ত্রী। লণ্ডনে ইম্পিরিয়াল্ কনফারেন্সের বৈঠক হবে। সেই বৈঠকে ভারতবর্ষের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকা দরকার—এই অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন য়্যাস্‌কুইথ। ভারতবর্ষকে সমান অংশীদারের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে—ভারতবাসীর বিশ্বাসলাভের পক্ষে এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়া যদিও সেদিন সুদূরপ্রসারী হয়েছিল, তথাপি ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে বিশেষ কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হলো না।

১৯১৬

লর্ড চেমস্‌ফোর্ড তখন বড়লাট। এই বছরের অক্টোবরের গোড়াতেই ভাইসরয়ের ব্যবস্থাপক পরিষদের নব-নির্বাচিত সদস্যগণ সিমলায় মিলিত হলেন ও আসন্ন শাসন-সংস্কার সম্পর্কে তাঁরা

একটি স্মারকলিপি রচনা করে নব-নিযুক্ত বড়লাটের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল বললেই চলে, কারণ পরবর্তীকালের মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্ম পরিকল্পনার এটাই ছিল প্রকৃত ভিত্তি এবং এদেশের শাসনতান্ত্রিক বিকাশের ইতিহাস যাঁরাই আলোচনা করবেন তাঁদের পক্ষে এটি যত্নসহকারে পাঠ করা উচিত। এই স্মারকলিপি এখন ইতিহাসে 'দি নাইন্‌টিন্‌ মেম্বরস্‌ মেমোর্যাণ্ডাম্‌' নামে অভিহিত হয়েছে। যে উনিশজন সদস্য এতে স্বাক্ষর প্রদান করেছিলেন তাঁদের নাম: মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ডি. ই. ওয়াচা, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বিষাণদত্ত স্তুকুল, মদনমোহন মালব্য, কে. ভি. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, মজহরউল হক, ভি. এস. শ্রীনিবাসন, তেজবাহাদুর সাপ্রু, ইব্রাহিম রহিমতুল্লা, বি. নরসিংহঈশ্বর শর্মা, মীর আসাদ আলী, কামিনীকুমার চন্দ, কৃষ্ণ সহায়, আর. এন. ভঞ্জদেও (কনিকার রাজা), এম. বি. দাদাভাই, সীতানাথ রায়, মহম্মদ আলি মহম্মদ ও মহম্মদ আলি জিন্না।

এই ঐতিহাসিক ও সুদীর্ঘ স্মারকলিপিতে বলা হয়েছিল:

'যুদ্ধের শেষে সমগ্র সভ্য জগতে, বিশেষ করে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশসমূহের শাসনব্যবস্থায় একটা বিরাট পরিবর্তন আশা করা যায়। দুর্বল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির স্বাধীনতা রক্ষার মহৎ আদর্শ দ্বারা প্রণোদিত হয়েই ইংলণ্ড এই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। ভারতবর্ষ তার অর্থবল ও জনবল দিয়ে ইংলণ্ডকে সাহায্য করেছে এই আশায় যে, যুদ্ধশেষে ভারতীয় শাসনব্যবস্থা একটা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হবে। ১৯০৯ সাল পর্যন্ত ভারতের শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে আমলাতন্ত্রের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে এসেছে, আর এই আমলাতন্ত্র একরকম অভারতীয় বললেই হয় এবং ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণের কাছে এদের কোন দায়িত্বই ছিল না। যদিও ১৯০৯ সালের শাসন-সংস্কারে ভারতের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কিছুসংখ্যক ভারতীয়কে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তথাপি আমাদের আশার তুলনায় ইহা পর্যাপ্ত নয়, বরং অত্যন্ত সীমিত বললেই চলে। ভারতবাসী এই সংস্কার গ্রহণ করেছিল

এই আশায় যে, অদূর ভবিষ্যতে তাদের হাতে দেশ-শাসনের আরো ক্ষমতা দেওয়া হবে। ১৯০৯ সালে শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের সময় ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন তা আজো অচরিতার্থ রয়ে গেছে। তাই আমাদের নিবেদন যে, যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক অবস্থা যদি আগের মতোই থাকে এবং লক্ষ্যণীয় কোন পরিবর্তন সাধিত না হয়, তাহলে এর ফলে সমগ্র দেশে তীব্র নৈরাশ্য ও অসন্তোষের সৃষ্টি হবে আর ভারতের জনসাধারণের মনে সেই অচরিতার্থ প্রত্যাশাজনিত বেদনার প্রতিক্রিয়া হবে সুদূরপ্রসারী।'

এইভাবে গৌরচন্দ্রিকা করার পর, স্মারকলিপিতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হলো: 'The lines on which the Reform should proceed must give to the people real and effective participation in the Government of the country.' এই কথা বলার পর স্মারকলিপিতে তেরো দফা প্রস্তাব করা হয় এবং অনুরোধ করা হয় যে, যেন এই প্রস্তাবগুলির ভিত্তিতেই নতুন শাসনতন্ত্র বিরচিত হয়। এর তিন মাস পরে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তা অনেকটা এই স্মারকলিপির ভিত্তিতেই রচিত হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, যুদ্ধের সময় থেকেই শোনা গিয়েছিল, যুদ্ধের শেষে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেবেন ঠিক করেছেন। তখন থেকেই ভারতের য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় এজন্য অস্বস্তিবোধ করতে থাকে ও তাদের পরিচালিত একাধিক পত্র-পত্রিকায় নানাভাবে তাদের গাত্রদাহটা প্রকট হয়ে উঠেছিল। চিত্তরঞ্জন এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন ; তাঁর 'বাংলার কথা' ভাষণে এদের এই মনোভাবের তীব্র নিন্দা করে তিনি বলেছিলেন :

'এক ভদ্রলোক নাকি বলিয়াছেন যে এদেশের লোকেদের জন্যই যদি শাসনকার্যের ব্যবস্থা হয়, এবং এদেশের লোকের হাতেই যদি শাসনকার্য ন্যস্ত হয়, তবে ধন-প্রাণ লইয়া এদেশে বাস করা কঠিন হইবে, ভবিষ্যৎ উন্নতিরও আশা থাকিবে না। ভবিষ্যৎ উন্নতি! ইহা ছাপার ভুল কিনা জানি না—

কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য এই যে, স্বায়ত্তশাসন চলিলে জীবন নিরাপদ নহে এবং উন্নতিরও আশা নাই। কিন্তু কাহার উন্নতি? ভারতবর্ষের উন্নতি—ভারতের জনসাধারণের উন্নতি, অথবা, স্যার আর্চিবার্কমায়ারের উন্নতি? ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত হইলে যদি স্যার আর্চিবার্কমায়ার দরিদ্র হইয়া পড়েন, তবে আমাদের ক্ষতি কি? আমরা স্বায়ত্তশাসন চাই।'

মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারের যথার্থ মূল্যায়ন আছে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টের মধ্যে। সেখানে বলা হয়েছে: 'The problem which Lord Minto's Government set themselves to solve was how to fuse in one single Government the two elements which they discerned in the origins of British power in India. They hoped to blend the principle of autocracy derived from Moghul emperors and Hindu kings with the principle of constitutionalism derived from the British Crown and Parliament, to create a constitutional autocracy.' কাজেই রিফর্মের নাম এই জাতীয় শাসনতান্ত্রিক স্বৈরাচার যে একটা বিক্ষুব্ধ জাতিকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না, এটা শাসকগোষ্ঠীর ভালভাবেই জানা ছিল। প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়ামূলক, অর্থাৎ Progressive and reactionary—যুগপৎ এই দুই বিপরীত বৈশিষ্ট্যদ্বারা চিহ্নিত এই সংস্কার নামেমাত্র সংস্কার ছিল। তাই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে ইহা একেবারেই ব্যর্থ হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন তাই মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারের নাম দিয়েছিলেন 'benevolent despotism' অর্থাৎ ছদ্মবেশী স্বৈরাচার। এবং এই কারণে বঙ্গবিচ্ছেদ বাতিল করে এই নতুন শাসন-সংস্কার সার্থক করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করেও লর্ড

হার্ডিঞ্জ-এর প্রতি ভারতবাসীর বিরূপ মনোভাব অপনোদন করতে সক্ষম হন নি। তারপর যুদ্ধের পরিবর্তিত অবস্থায় ভারতবর্ষের পক্ষে মর্লি-মিন্টো সংস্কারের অনুপযোগিতা উপলব্ধি করে ইংলণ্ডের বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্‌গণ আবার নতুনভাবে চিন্তা করতে শুরু করেন। এই চিন্তারই প্রতিধ্বনি সেদিন শোনা গিয়েছিল যথাক্রমে লর্ড চেমস্‌ফোর্ড ও লর্ড য়্যাস্‌কুইথের ঘোষণায়; চেমস্‌ফোর্ড ভারতের কার্যভার গ্রহণ করেই বললেন: 'British policy must seek a new point of departure, a fresh orientation.' আর য়্যাস্‌কুইথ বললেন—'We must look at the Indian problem from a new angle of vision.' এইভাবেই সেদিন পরবর্তী শাসন-সংস্কারের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল।

কিন্তু এই ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ার জন্য শুধু এই ঘোষণাই যথেষ্ট ছিল না। রিফর্ম প্রবর্তিত হলো ১৯১০ সালে, এর চার বছর বাদে এলো বিশ্বযুদ্ধ যার সংঘাতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত পরাধীন জাতিগুলির মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্নটা নতুন করে জেগে উঠতে থাকে এবং সেই সঙ্গে ছিল মিত্রশক্তির সেই গালভরা বাণী—'আমরা যুদ্ধ করছি বিশ্বের গণতন্ত্রকে নিরাপদ করার জন্য।' তারপর ১৯১৫ সালে ফিরোজ শা মেটা ও গোপালকৃষ্ণ গোখেলের মৃত্যুতে জাতীয় কংগ্রেসের দুইদল, মডারেট ও চরমপন্থী, পুনরায় মিলিত হন এবং কংগ্রেস তখন চরমপন্থীদের নেতৃত্বে (টিলক, য়্যানি বেশান্ত, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি এই দলভুক্ত ছিলেন) পরিচালিত হতে থাকে। য়্যানি বেশান্তের হোমরুল আন্দোলন তখন কংগ্রেসের দাবীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং বেশান্তের অন্তরীণের ফলে এই আন্দোলন সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এরই সঙ্গে কংগ্রেস-লীগ আঁতাত শাসকগোষ্ঠী তথা ইংলণ্ডের রাজনীতিবিদ্‌দের বিশেষভাবেই উদ্বিগ্ন করে তোলে।

শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য ১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মিলিতভাবে এক দাবী উত্থাপন করল। এইখানে উল্লেখ্য যে, ১৯১৬-তে লক্ষ্ণৌতে দুইদলের এই মিলিত দাবী 'কংগ্রেস-লীগ চুক্তি' নামে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আখ্যাত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্কের সুলতানের প্রতি ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্ট যে অবিচার করেন তারই ফলে ভারতের মুসলমানগণ কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে ব্রিটিশ-বিরোধী মঞ্চে মিলিত হন। লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট ছিল এই মিলনের নিদর্শন। এইভাবে পরিবর্তিত অবস্থায় একদিকে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মিলন, আর অন্যদিকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ঐক্যবদ্ধ দাবা, সরকারের উপর যে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে তা আর তখন উপেক্ষা করা কিংবা লঘু করে দেখা সম্ভবপর ছিল না।

আরো একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ্য। যুদ্ধের সময়ে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়েছিল, তাদের নিয়ন্ত্রণভার ছিল ভারত-সরকারের উপরে। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালনে ভারত-সরকার যে চূড়ান্ত অযোগ্যতার পরিচয় দেন তার ফলে সমগ্র অভিযানটি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয় ও লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় হয়। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে এই বিষয়টি নিয়ে তুমুল আলোচনা হয় ও ভারত-সরকারের এই অযোগ্যতার তীব্র সমালোচনা হয়। অতঃপর একটি তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের রিপোর্টে ভারত-সরকারের অপদার্থ শাসনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। পার্লামেণ্টে যখন এই রিপোর্ট প্রসঙ্গে আলোচনা হয় তখন হাউস্ অব্ কমন্স-এ দাঁড়িয়ে মণ্টেগু ভারত-সরকারের শাসনযন্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে এই প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেছিলেন:

'The machinery of the Government of India is too wooden, too iron, too inelastic, too antediluvian to be of any use for the modern purposes we have in

view.' বর্তমানকালে মান্ধাতার আমলের এই শাসনযন্ত্র অচল—এই কথা বলছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি দীর্ঘকাল যাবৎ সহকারী ভারতসচিব হিসাবে কাজ করার ফলে ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর এই মন্তব্যের ফলেই তৎকালীন ভারতসচিব মিস্টার অস্টেন্ চেম্বারলেনকে পদত্যাগ করতে হয় ও মণ্টেগু তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এখানে উল্লেখ্য যে, মণ্টেগুর ছিল উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁর ছিল গভীর সহানুভূতি ও সমর্থন। তাই ভারতসচিবের পদে তাঁর নিয়োগ ভারতের পক্ষে অনেকটা কল্যাণজনক হয়েছিল, বলা যায়। মেসোপটেমিয়ান কমিশনের রিপোর্টেই ইংলণ্ডে সকলের মনে এই ধারণা হয়েছিল যে, ভারত-সরকারের শাসনযন্ত্রের কাঠামোকে একেবারে ঢেলে সাজা ভিন্ন উপায় নেই—জোড়াতালি দিয়ে কাজ আর চলবে না। লয়েড জর্জের মন্ত্রিসভারও তখন ঠিক এই ধারণা জন্মেছে।

১৯১৭ সালে যুদ্ধ যখন একটা সংকটজনক স্তরে এসে দাঁড়াল তখনই ইংলণ্ডের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর সহযোগিতা ও স্বতঃপ্রণোদিত সমর্থন লাভের আশায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ সম্পর্কে বড় রকমের একটা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন। সেই প্রয়োজন আরো অনিবার্যতা নিয়ে দেখা দিল যখন রুশ-বিপ্লব সংঘটিত হলো এবং এই ঐতিহাসিক ঘটনাটিই যে মণ্টেগু-ঘোষণাকে ত্বরান্বিত করে দিয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এরই ফলস্বরূপ এই বছরের ২০শে আগষ্ট পার্লামেণ্টে ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটিশ-সরকারের নীতি ঘোষণা করলেন নতুন ভারতসচিব মিস্টার এডুইন মণ্টেগু। সকল দিক দিয়েই এটা ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘোষণা। এই ঘোষণা যখন করা হয় তখন আশা করা গিয়েছিল যে, এবারকার শাসন-সংস্কারে ভারতবাসীকে নিশ্চয়ই প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দেওয়া হবে। মণ্টেগুর সেই ঘোষণাটি এই রকম ছিল:

'The policy of His Majesty's Government, with which the Government of India are in complete accord, is that of increasing association of Indians in every branch of the administration and the gradual development of the self-governing institutions with a view to the progressive realisation of responsible Government in India as an integral part of the British empire.'

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য। এই বহু-বিতর্কিত মণ্টেগু-ঘোষণার প্রকৃত রচয়িতা ছিলেন লর্ড কার্জন ও অস্টেন্ চেম্বারলেন। এই ঘোষণা ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কিংবা ভারতের সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবে আদৌ করা হয় নি। এটা করা হয়েছিল মুখ্যত যুদ্ধোত্তর য়ুরোপের পরিস্থিতির প্রভাবে, বিশেষ করে রুশ-বিপ্লবের চাপে, কারণ দেখা যায় যে, জারের পতনের পাঁচ মাস পরেই আমরা ব্রিটিশ-সরকারের পক্ষ থেকে এই ঘোষণাটি পাচ্ছি। অর্থাৎ পরিবর্তিত বিশ্বপটভূমিকায় শাসকবর্গ কতকটা যেন বেসামাল হয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ভারত-সাম্রাজ্য সম্পর্কে এই ঘোষণাটি করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক যথার্থ মন্তব্য করেছেন যে: 'The rapid transformation of the world situation in 1917, following the Russian Revolution, affected the whole tempo of events and found its speedy reflection in the relations of British and India.'* তেমনি একথাও বলা চলে যে, ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টা রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে যতখানি সম্ভবপর না হয়েছিল, তার চেয়ে ঢের বেশি সম্ভবপর হয়েছিল

* *India Today* : R. Palme Dutt

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পরিবর্তিত অবস্থার ফলে। কাজেই 'জাতির জনক' (?) ভারতের স্বাধীনতা এনেছেন, এ দাবীর কোন ভিত্তি নেই। কিন্তু সে কথা থাক, আমরা মন্টেগু-ঘোষণার প্রসঙ্গেই ফিরে আসি।

'ক্রমে ক্রমে দায়িত্বশীল স্বায়ত্তশাসনের প্রচলন'—এই ছিল সেদিনকার প্রতিশ্রুতি এবং ইহাই ছিল ভারতসচিবের ঘোষণার সারমর্ম। এই ঘোষণাবাক্যে মডারেটগণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, কিন্তু জাতীয়তাবাদী দল অর্থাৎ চরমপন্থীরা এর মধ্যে কোন আশার আলোক দেখতে পেলেন না। মন্টেগুর ঘোষণার মধ্যে আরো একটি কথা ছিল—তিনি ভারতের জনসাধারণের ও নেতৃবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে আলোচনা করবার জন্য এই বৎসরের (১৯১৭) শেষভাগে ভারতে আগমন করবেন। জাতীয়তাবাদীদল তখন থেকেই দেশের স্থানে স্থানে সভাসমিতি করবার আবশ্যকতা অনুভব করলেন। উদ্দেশ্য—ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনলাভের যোগ্য—এই কথাটা দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল যাতে একবাক্যে বলতে পারে। কিন্তু স্বার্থত্যাগ করে, অর্থোপার্জনের আশা পরিত্যাগ করে কেউ মফঃস্বলে পরিভ্রমণ করতে সম্মত হলেন না। বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জনকে তাই একাই সেদিন এই কাজে নামতে হয়েছিল। মন্টেগুর ঘোষণার অল্পকাল পরেই শারদীয়া অবকাশে দীর্ঘকালের জন্য হাইকোর্ট বন্ধ হলো। চিত্তরঞ্জন তখন কলকাতা পরিত্যাগ করে পূর্ববঙ্গ সফরে বহির্গত হলেন। তিনি একে একে ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে স্বায়ত্তশাসনের ব্যাখ্যা প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। সেদিন দেশে নেতার অভাব ছিল না, কিন্তু সেই রাজনৈতিক সংকটের দিনে দেশের কল্যাণ কামনায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন, স্বার্থের কথা ভুলে যেতে পারেন, অর্থোপার্জনের স্পৃহা দূরে রাখতে পারেন, এমন নেতা বুঝি চিত্তরঞ্জন ব্যতীত আর কাউকেই দেখা যায় নি। ১৯২১ সালে তাঁর সর্বস্বত্যাগের আভাষটা তখনই পাওয়া গিয়েছিল।

ময়মনসিংহের বক্তৃতায় (১৯১৭, ১০ই অক্টোবর) তিনি বললেন :

'দেশই আমার ধর্ম, আমার চিরজীবনের আদর্শ—ঐ দেশ। দেশ বলিলে আমি আমার সম্মুখে আমার ভগবানকে দেখিতে পাই।...আপনারা দেশ ও রাজনীতি পৃথক করিবেন না। আপনাদের শিক্ষাদীক্ষা ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত যথেষ্ট সংস্রব আছে। উহা আপনাদের ধর্মের অভিব্যক্তি। এদেশের মধ্যে এমন লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন, মানবজীবন পৃথক পৃথক বিভাগে বিভক্ত। তাঁহাদের মতে রাজনীতি স্বতন্ত্র পদার্থ। তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, মানুষের আত্মা সর্বত্র সমান। প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মা যেমন এক, জাতির প্রাণও তেমনি এক।'

'বাংলার কথায়' জাতীয়তা ও বিশ্বমানবতার যে ব্যাখ্যা ছিল, এ যেন ঠিক তারই প্রতিধ্বনি। চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দু কোনদিন স্থানচ্যুত হয় নি।

ঢাকার বক্তৃতায় (১১ই অক্টোবর) স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে বললেন :

'স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে অধিকার দিবেন, কতটুকু অধিকার চাহিলে তাহা গভর্ণমেণ্ট শুনিবেন তাহা ভাবিবার আবশ্যকতা নাই। দেশের মঙ্গলের জন্য যতটুকু আবশ্যক তাহাই চাহিতে হইবে—ভীত হইবেন না, দেশের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা নির্ভয়ে দাবী করিতে হইবে। ইংরাজ রাজপুরুষগণ যে ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন স্বার্থ, অশিক্ষিতের সংখ্যাবাহুল্য স্বায়ত্তশাসনের পরিপন্থী বলে নির্দেশ করেন, আমি বলি সেইজন্যই স্বায়ত্তশাসন চাই। এই জাতিগত, ধর্মগত, বর্ণগত বৈষম্য দূর করিতে ও দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্যই আমরা স্বায়ত্তশাসন চাই—এই সমস্ত অনৈক্য দূর করিতে স্বায়ত্তশাসনই একমাত্র পন্থা।'

বরিশালের বক্তৃতায় বললেন : 'ইহা হিন্দুর স্বায়ত্তশাসন হইবে না, ইহা মুসলমানের স্বায়ত্তশাসন হইবে না—ইহা হইবে প্রজার স্বায়ত্তশাসন। ইহাতে সকলের স্বার্থ সমভাবে অক্ষুণ্ণ থাকিবে।' চট্টগ্রামের বক্তৃতায় তিনি মডারেটদের তীব্র নিন্দা করেন ও এই

দলের নেতা সুরেন্দ্রনাথকে একজন 'impostor', অর্থাৎ রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজ বলে অভিহিত করেন। অনেকের বিবেচনায় রাষ্ট্রগুরু সম্পর্কে তার এই উক্তি নিঃসন্দেহে শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছিল। আমরাও এই অভিমত পোষণ করি। সুরেন্দ্রনাথ আর যাই হোন, তিনি কখনই রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজ ছিলেন না।

চিত্তরঞ্জনের 'বাংলার কথা' ভাষণ এবং তারপর এইসব বক্তৃতা থেকে দেশের লোক তাঁকেই দেশের নেতা বলে বরণ করে নিল। অতঃপর আমরা দেখতে পাব, চিত্তরঞ্জন সর্বস্ব ত্যাগ করে সমগ্র ভারতবর্ষকে নেতৃত্ব দান করতে কেমন করে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। দেখতে পাব রাজনীতি তাঁর কাছে মানসিক বিলাস ছিল না, ছিল একান্ত ধ্যানের বস্তু, আর হৃদয়-মন দিয়ে সাধনার জিনিস। দেশ সেদিন বুঝি এমন একজন নেতাকেই চেয়েছিল।

॥ তেরো ॥

'I do not think the God of Humanity was crucified only once. Tyrants and oppressors have crucified humanity again and again. Every outrage on humanity is a fresh nail driven through his sacred flesh.'

য়্যানি বেশান্তের গ্রেপ্তারে এই ছিল চিত্তরঞ্জনের বলিষ্ঠ প্রতিবাদের ভাষা। ভারতের রাজনীতিতে শোনা গেল এক নতুন কণ্ঠস্বর—দৃপ্ত, ঋজু ও কঠিন। মণ্টেগুর ঘোষণার প্রায় একমাস আগে ১৯১৭ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে ভারত-সরকার মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড পেটল্যাণ্ডের নির্দেশে য়্যানি বেশান্তকে সহসা উটকামণ্ডে অন্তরীণাবদ্ধ করলেন। তাঁর অপরাধ তিনি তাঁর 'হোমরুল লীগের' মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের দাবী করেছিলেন ও সেই দাবীকে জোরদার করবার জন্য সর্বত্র বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছিলেন। ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এই বিদেশী মহিলা একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছিলেন যেমন করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে। যুদ্ধের শেষভাগে মিত্রশক্তি যখন গণতন্ত্রও আত্মনিয়ন্ত্রণের গালভরা বুলি প্রচার করেন তখন ভারতবাসীর পক্ষ থেকে দাবী করা হয় যে জয়লাভের পর ভারতবাসীকে যেন তাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু যুদ্ধশেষে যখন তেমন কোন প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে পাওয়া গেল না, তখন য়্যানি বেশান্তই অগ্রণী হয়ে টিলকের সহযোগিতায় 'হোমরুল লীগ' নামে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করেন ও স্বায়ত্তশাসনের দাবী করতে থাকেন। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, কংগ্রেস থাকতে আবার একটা নতুন ও পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজন হলো কেন? কিন্তু তখন কংগ্রেস নামেমাত্র কংগ্রেস;

নির্জীব ও নিষ্প্রাণ সেই প্রতিষ্ঠানের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের রাজানুগত্য ও শাসকগোষ্ঠীর সদিচ্ছার উপর বিশ্বাস দুই-ই ছিল প্রবল ও আন্তরিক। আবেদন-নিবেদনের থালায় অনুগ্রহের দান যা কুড়িয়ে পাওয়া যায় তাতেই তাঁরা সন্তুষ্ট। তাই কোনকিছু দাবী করবার মতো ইচ্ছা বা সাহস তাঁদের ছিল না। এঁরা ছিলেন নিতান্তই নিরামিষ রাজনীতির উপাসক ; নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের গণ্ডির বাইরে যাওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। চিত্তরঞ্জন যে ১৯০৬ সালের পর থেকে দীর্ঘকাল কংগ্রেসের বাইরে ছিলেন তার কারণ তো এইখানেই। 'কংগ্রেস, না মেটা মজলিস ?'—এ তাঁর নিজেরই কথা। এইজন্যই সেদিন ইতিহাসের প্রয়োজনেই ভারতের রাজনীতিতে হোমরুল লীগের অভ্যুদয় ঘটেছিল।

হোমরুল আন্দোলন যে অল্পদিনেই প্রবল হয়ে উঠেছিল তার সাক্ষ্য দিয়েছেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। তিনি লিখেছেন : 'The promise to grant the right of self-determination was not forthcoming, so an agitation for home rule was started in 1917 by Annie Bessant and Lokamanya Tilak. The Home Rule League was founded with branches throughout India and the country was swept by an unprecedented awakening. The Government was frightened and interned Annie Bessant and two of her colleagues'.* কিন্তু সরকার হিসাবে ভুল করেছিলেন—অ্যানি বেশান্তকে আটক করায় হোমরুল আন্দোলন বন্ধ হওয়া দূরে থাকুক, বরং উহা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ১৬ই জুলাই বেশান্তকে অন্তরীণাবদ্ধ করা হয়, আর ২৫শে জুলাই কলকাতায় ভারতসভার হলে প্রতিবাদ-সভায় দাঁড়িয়ে চিত্তরঞ্জন এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা করলেন। তাঁর কণ্ঠে যে মামুলি প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় নি তা

* *Autobiography* : **Rajendra Prasad.**

তাঁর সেই বক্তৃতার উদ্ধৃত অংশ থেকেই বোঝা যায়। তিনি ও বাংলার অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ হোমরুল লীগে যোগদান করেছিলেন। এই সভায় রবীন্দ্রনাথও বেশান্তকে আটক করার প্রতিবাদে একটি বক্তৃতা করেছিলেন।

সব্যসাচীতুল্য নেতা চিত্তরঞ্জন কিন্তু একটিমাত্র প্রতিবাদ-সভা করেই ক্ষান্ত হলেন না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই তিনি দেখে আসছেন যে, রাজনীতি কংগ্রেসে ছিল না, ছিল কারাগারে, ছিল বিচারালয়ে, ছিল ফাঁসিকাষ্ঠে। সেই সময় থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, রাজদ্রোহিতা ও রাজরোষের মধ্যে দাঁড়িয়ে জাতীয়তাবোধ-পুষ্ট দেশপ্রেমের আহিতাগ্নিকে তিনি আপন অন্তরে অনির্বাণ রক্ষা করে আসছিলেন। তখন তাঁর ভূমিকা ছিল স্বতন্ত্র। তাই আজ য়্যানি বেশান্তের গ্রেপ্তারে চিত্তরঞ্জনের অন্তরে যে বিস্ফোরণ দেখা গেল তা ছিল যেমন প্রচণ্ড তেমনি দুর্বার। প্রথম প্রতিবাদ-সভার এগারো দিন পরেই, ৬ই আগষ্ট টাউন হলে দ্বিতীয় ও বিরাট প্রতিবাদ-সভা করতে চিত্তরঞ্জন সংকল্প করেন, কিন্তু তিনি বাধা পেলেন সরকার পক্ষ থেকে। তাঁকে টাউন হলে সভা করতে দেওয়া হলো না। সেদিন তিনি এতদূর উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, তিনি বলেছিলেন: 'এ আদেশ সহ্য করা যায় না, বরং জেলে যাব।' এর পর কলকাতার অন্যত্র ২৪শে আগষ্ট তিনি আর একটি প্রতিবাদ-সভা করেন। তখন মণ্টেগু-ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছে। সেই ঘোষণায় বর্ণিত স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করে চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন: 'য়্যানি বেশান্তের অপরাধ কি? তিনিও তো স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী করেছেন। সে দাবী ভারতবাসীর দাবী—ভারতের প্রত্যেকটি মানুষের দাবী। এই দাবী করা যদি অপরাধ হয়, যদি রাজদ্রোহ বলে বিবেচিত হয়, তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করি, সরকার কি সমস্ত ভারতবাসীকে এইভাবে—এই রকম অন্যায়ভাবে অন্তরীণাবদ্ধ করবেন?'

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, তখন ভারতরক্ষা আইনে বাংলার অন্যতম জাতীয়তাবাদী নেতা শ্যামসুন্দর দীর্ঘকাল কালিম্পং-এ অন্তরীণাবদ্ধ রয়েছেন। ২রা অক্টোবর মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের এক জনসভায় চিত্তরঞ্জন শ্যামসুন্দরের গ্রেপ্তার সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতায় বলেন: 'The last name is that of Babu Shyamsunder Chakravarty. I have had personal acquaintance with him. I have been bound with him by ties of friendship and I can assure you gentlemen, that Shyamsunder Chakravarty is incapable of having done anything which deserved his internment.' এই সভাতে তিনি অন্তরীণাবদ্ধ আলি ভ্রাতৃদ্বয় ও য়্যানি বেশান্ত প্রমুখ সকলের কথাই উল্লেখ করেছিলেন।

বস্তুতঃ য়্যানি বেশান্তের গ্রেপ্তার ও মণ্টেগুর ঘোষণার পর থেকেই চিত্তরঞ্জন ঢাকা, ময়মনসিংহ ও বরিশাল প্রভৃতি স্থানে যতগুলি বক্তৃতা করেছিলেন তার প্রত্যেকটিতে তিনি যেমন হোমরুল অর্থাৎ স্বায়ত্ত-শাসন দাবী করার কথা বলতেন, তেমনি বলতেন অন্তরাণাবদ্ধ নেতাদের কথা। এই দুটি বিষয়ই ছিল তাঁর এইসময়কার বক্তৃতাবলীর প্রধান বক্তব্য। সমস্ত বক্তৃতায় থাকত তাঁর প্রাণের কথা। এইভাবেই ধীরে ধীরে তিনি দেশবাসীর হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। ময়মনসিংহে প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি যখন বললেন: 'আমার দেশসেবা য়ুরোপীয় রাজনীতির অনুকরণমাত্র নয়। এ আমার জীবনধর্মের অঙ্গীভূত—আমার জীবনের আদর্শবাদের উপাদানস্বরূপ।' —তখন দেশবাসীর বুঝতে বিলম্ব হয় নি যে, দেশের পরিবর্তিত পটভূমিকায় এখন এইরকম একজন দেশনেতারই প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে মণ্টেগুর ঘোষণাটি অনেক দিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভারত

আগমনের সংবাদটিও ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর পূর্বে আর কোন ভারতসচিব ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এই বৃহত্তম জমিদারি পরিদর্শন করতে আসেন নি। একা নয়, সঙ্গে একটি প্রতিনিধি-দলও থাকবে এবং ভারতে এসে তিনি ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবেন ও জনমতের সঙ্গেও পরিচিত হবেন। কাজেই এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর মণ্টেগুর আগ্রহ ও আন্তরিকতা সম্পর্কে কারো মনেই আর কোন সন্দেহ রইল না। সুরেন্দ্রনাথ তাই সমগ্র ব্যাপারটিকে চিরাচরিত সরকারী প্রথা থেকে একটি স্মরণীয় ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করেছেন। এবার সত্যিকারের কিছু পাওয়া যাবে, এই আশাটাই সেদিন ২০শে আগষ্টের ঘোষণা ও ভারতসচিবের ভারত পরিদর্শনের সংবাদ সকলের মনে জাগিয়ে তুলেছিল। চির-আশাবাদী সুরেন্দ্রনাথ তাই এই প্রসঙ্গে তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন: 'The pages of Anglo-Indian history were strewn with the fragments of broken promises, but perhaps a new chapter was now to be opened.

সেই নতুন অধ্যায়ের সূচনা দেখা গেল যখন নভেম্বর মাসের গোড়াতেই সদলে মণ্টেগু এলেন ভারতবর্ষে। নব শাসনতন্ত্র রচনার উপাদান সংগ্রহের জন্য তিনি কংগ্রেস অধিবেশনের কিছু পূর্বেই ভারতে এলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, তাঁর ঘোষণার পরেই সম্রাটের অনুমোদনক্রমে ও পার্লামেণ্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁর এদেশে আগমন সাব্যস্ত হয়। বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডও ভারতসচিবকে ভারতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মণ্টেগু যখন ভারতবর্ষে আসেন মডারেট নেতাদের প্রধান ও বিচক্ষণ দুইজন নেতা—ফিরোজ শা মেটা ও গোপালকৃষ্ণ গোখেল—তখন জীবিত ছিলেন না। ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ তখন উচ্চ রাজকর্মে নিযুক্ত হয়েছেন—একজন লণ্ডনের হোয়াইট

হলে, অপরজন বাংলা দেশে। অগত্যা মডারেটদলকে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে মণ্টেগুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হয়। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতাশক্তি যে পরিমাণে ছিল, তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক সেই পর্যায়ের ছিল না এবং এইটাই ছিল রাষ্ট্রগুরুর নেতৃত্বের প্রধান ত্রুটী। যদি তিনি ও তাঁর অনুগামীরা মণ্টেগু-মিশনের প্রলোভন দ্বারা সম্মোহিত না হতেন, তাহলে ১৯১৯ সালে ভারতশাসন আইন নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র আকারে রচিত হতো। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল না, আর ছিল না দৃঢ় প্রত্যয়। তাই দেখা গেল যে, সুরেন্দ্রনাথ ও মডারেটদল সেদিন যে সুযোগ হারিয়েছিলেন তারই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক দাবী নিয়ে জাতির সামনে এগিয়ে এলেন লোকমান্য টিলক এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

সদলে মণ্টেগু ভারতবর্ষে এলেন।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবেশ তখন বেশ উত্তপ্ত বললেই হয়। সে উত্তাপের কারণ, নেতৃবৃন্দের অন্তরীণ আর হোমরুল আন্দোলন, অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসনের দাবী।

এই দুটি বিষয়েই যে দুইজনের কণ্ঠ সেদিন সবচেয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল তাঁরা হলেন টিলক ও চিত্তরঞ্জন। উভয়ের সমগ্র রাজনৈতিক চিন্তা তখন এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছিল ও তাঁদের উভয়ের একাধিক অগ্নিস্রাবী অথচ যুক্তিজালপূর্ণ ভাষণের মধ্যে তা অভিব্যক্ত হচ্ছিল। ইংরেজ রাজপুরুষদের দৃষ্টি তাই তখন এই দুইজনের উপরে, বিশেষ করে চিত্তরঞ্জনের উপরে নিবদ্ধ হতে আরম্ভ করেছে। দাশ কি বলেন, অথবা দাশ কি ভাবেন? এইটাই তখন ভারতে ইংরেজ রাজপুরুষদের কৌতূহল ও আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভারতে পদার্পণ করেই মণ্টেগু লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের সঙ্গে নব-শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন ও বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃস্থানীয়

ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এইভাবে প্রায় ছয়মাস কাল ভারতে অবস্থান করে তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ইংলণ্ড থেকে মণ্টেগুর যাত্রার পূর্বেই ভারত-সরকার য়্যানি বেশান্তকে মুক্তি প্রদান করেছিলেন।

মণ্টেগু পুরো ছয়মাস কিভাবে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে সকল দলের প্রবীণ ও নবীন নেতাদের সঙ্গে দিনের পর দিন আলোচনা করেছিলেন এবং ভারতের জনসাধারণের মনে তাঁর ঘোষণার কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তাও তিনি কেমন যত্নের সঙ্গে নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ মণ্টেগু স্বয়ং লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'দি ইণ্ডিয়ান ডায়েরি' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে। সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক পরিবেশ ও বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের মনোভাবের একটি প্রামাণ্য চিত্র মিলবে এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায়। মণ্টেগু-মিশনে মণ্টেগু একা ছিলেন না, তিনি ভিন্ন আরো দশজন তাঁর এই ঐতিহাসিক মিশনের সঙ্গী ছিলেন। এই দশজনের মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন অন্যতম। কংগ্রেস, হোমরুল লীগ ও মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ভারতসচিবকে স্বাগত জানানো হয়েছিল ভারতের নতুন রাজধানী দিল্লীতে। মানপত্রও দেওয়া হয়; কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রদত্ত মানপত্রটি পাঠ করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ।

মণ্টেগু-মিশন কলকাতায় এলেন ডিসেম্বর মাসে। এখানে মণ্টেগুর সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের পুরো দু'ঘণ্টা আলাপ হয়েছিল। আমন্ত্রিত হয়ে তিনি যাতে সাক্ষাৎ করেন, সেইরকম ব্যবস্থাই আগেভাগে করেছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু। চিত্তরঞ্জনের মুখে মণ্টেগু যা শুনেছিলেন তা তিনি আর কারো কাছ থেকে শোনেন নি। টিলক অবশ্য অনেকটা চিত্তরঞ্জনের সুরে সুর মিলিয়ে বলেছিলেন, তবে তিনিও অতখানি দাবী করতে পারেন নি যতটা পেরেছিলেন চিত্তরঞ্জন। তাই কথিত আছে, মণ্টেগু-মিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য

দিতে উপস্থিত হয়ে তিনি যে-সব কথা বলেছিলেন তাতে ভারতসচিব প্রসন্ন হতে পারেন নি—তাঁর মুখের চেহারাই নাকি পাল্টে গিয়েছিল চিত্তরঞ্জনের দাবীর বহর দেখে। তিনি বলেছিলেন: 'এই শাসন-সংস্কার বিধিমত কার্যে পরিণত হবে না, হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের হাতে সত্যিকার প্রাদেশিক প্রভুত্ব (provincial autonomy) দেওয়া হচ্ছে। এই সময়ে লর্ড রোনাল্ডসের সঙ্গে প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার সম্পর্কে তাঁর বাক্য বিনিময় হয়েছিল। লাটসাহেব তাঁকে রিফর্ম নিয়ে কাজ করবার জন্য বিশেষভাবে বলেছিলেন; কিন্তু চিত্তরঞ্জন তাঁর সঙ্গে এই বিষয়ে একমত হতে পারেন নি এবং পরিষ্কারভাবেই তাঁর মুখের উপর বলেছিলেন, এই শাসন-সংস্কার অচল (This reform is unworkable)। এমন স্পষ্ট ভাষণ তিনি আর কারো কাছে শোনেন নি। 'Mr. Das is an astute politician.'—এই উক্তি রোনাল্ডসের।

অতঃপর মণ্টেগু যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত কি, তখন তার উত্তরে চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন যে, আপাততঃ একমাত্র সৈন্যবাহিনী ও রেলপথ ভিন্ন ভারত-শাসনের আর সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের হাতে দিতে হবে। চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে তাঁর অভিমত মণ্টেগু স্বয়ং এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন: 'I had a talk with C. R. Das, an extremist, but a most sensible fellow. "His demand is complete responsibility at once for local Government. Das argued very strongly. I argued with him. I implored him. I saw him privately and he added: The half way house is no good; there is no intermediate stage possible between responsible Government and complete responsibility. He attracted me

enormously.'* মণ্টেগুর এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে চিত্তরঞ্জন সেদিন তাঁর কাছে একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ ব্যক্তি বলেই বিবেচিত হয়েছিলেন। 'He attracted me enormously'.—মণ্টেগুর এই কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও দেশবন্ধুর রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভার পরিচায়ক। দেশের আসন্ন রাজনৈতিক পরিবর্তনের সময়ে এমনি একজন নেতারই সেদিন প্রয়োজন ছিল। এই সময় থেকেই দেশের সুস্পষ্ট অভিমত সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যেতে আরম্ভ করে এবং তিনি একজন দুর্বলচিত্ত নেতা বলে গণ্য হন। ফলে একদা যিনি ছিলেন জাতির মুকুটবিহীন সম্রাট এবং যিনি এতকাল নেতৃত্বের রাজদণ্ড পরিচালনা করে এসেছেন অপ্রতিহত শক্তিতে, তাঁকেই আজ জাতির হৃদয়ের সিংহাসন থেকে স্থানচ্যুত হতে হলো, আর সেই সঙ্গে সমগ্র দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও আনুগত্য লাভ করলেন টিলক ও চিত্তরঞ্জন। সেদিন এই দুইজন নেতাই মণ্টেগু-ঘোষণার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দাবী নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এতকাল যিনি ছিলেন ভারতীয় রাজনীতির একজন দর্শক মাত্র এবং যিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে সরে ছিলেন, জনসাধারণের সঙ্গে যাঁর সংযোগ অল্পই ছিল, এখন থেকে সেই চিত্তরঞ্জন দেশনেতা হিসাবে দেশবাসীর চিত্তে স্থান লাভ করলেন। 'সবরমতীর সাধু' তখনো পর্যন্ত তাঁর আশ্রম ত্যাগ করে ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন নি।

চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক প্রতিভার বৈশিষ্ট্য তাঁর 'বাংলার কথা' ভাষণের পর থেকে একাধিক বক্তৃতার মধ্যে সুস্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছিল। তাঁর এই সময়কার (১৯১৭—১৮) বক্তৃতাবলী (যা তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয় উপলক্ষে দিয়েছিলেন) গভীর ভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করলে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই যে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পূর্ণভাবেই নতুন কালের উপযোগী

* *An Indian Diary* : Montagu.

ছিল। আগেই বলেছি, মণ্টেগু-ঘোষণার পর থেকেই তাঁর সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে প্রধান সুর ছিল স্বায়ত্তশাসন। একটা পরাধীন জাতির পক্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বা Right of self-determination যে তাঁর জীবনে একটা কত বড়ো বাস্তব সত্য তা তাঁর বন্ধু অরবিন্দ এই শতকের দ্বিতীয় দশকে তাঁর *War and Self-determination* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন। চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক মতাদর্শের গঠনে বিপিনচন্দ্রের পরেই অরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্তার প্রভাব অনেকখানি পরিলক্ষিত হয়। জাতীয় জাগরণের প্রথম ঊষায় যখন রাজশক্তি নানাভাবে আমাদের কণ্ঠরোধ করেছিল, আমাদের ক্রমোন্নতির পথে বাধা দিয়েছিল, তখন জাতির রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাকে প্রথম সুবলয়িত রূপ প্রদান করেন অরবিন্দ। চিত্তরঞ্জন তখন রাজনীতিক্ষেত্রে একজন নীরব দর্শক হিসাবে তাঁর বন্ধুর নিকট-সান্নিধ্যেই থাকতেন, তাই তাঁর পক্ষে অরবিন্দের রাজনৈতিক ভাবধারা উপলব্ধি করা বা আয়ত্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল।

স্বায়ত্তশাসনের ধুয়াটা তো স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই দেশের নেতাদের রচনা ও বক্তৃতার মধ্যে শোনা গিয়েছিল। তারপর একটি যুগ অতিবাহিত হয়ে গেল। দশটি বছরের (১৯০৮-১৯১৭) সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন নীরবতার মধ্যে জাতির রাষ্ট্রীয় চেতনা যেন শূন্যে মিলিয়ে গেল, সে বিস্মৃত হলো তার লক্ষ্য। সেই অবস্থায় মণ্টেগুর ঘোষণার মাধ্যমে ব্রিটিশ-শাসকগোষ্ঠী যখন ভারতবাসীকে ধীরে-সুস্থে ধাপে ধাপে স্বায়ত্তশাসনের দায়িত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন তখন আবার সেই পুরাতন ধুয়াটা নতুন করে জাতির অন্তরে জাগাল অনুরণন। কিন্তু সেই ধুয়াটাকে আমাদের রাষ্ট্রীয় চেতনায় একটি ধ্রুপদী সঙ্গীতে পরিণত করবার জন্য এমন একজন নেতার প্রয়োজন ছিল যিনি দেশকে পেয়েছিলেন বিলাতী রাজনীতির মধ্য দিয়ে নয়, অথবা কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনমূলক চিন্তাধারার ভিতর দিয়ে নয়—পেয়েছিলেন বঙ্কিমের ধ্যানের মধ্যে, অরবিন্দের নতুন

চেতনার মধ্যে। কমলাকান্তের ছদ্মবেশে যিনি একদা বাংলা তথা ভারতে জাতীয়তাবাদের উদ্বোধন করেছিলেন সেই ঋষি বঙ্কিমের ভাবধারার প্রথম উত্তরসাধক অরবিন্দ, দ্বিতীয় চিত্তরঞ্জন।

সম্ভবতঃ এই কারণে দাবীর ভিত্তিতেই এঁদের রাষ্ট্রীয় চেতনা বিকাশ লাভ করেছিল। রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জনের সমমর্মিতা বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। ১৯১৭ সালের বাংলায় (এবং ভারতবর্ষে) স্বায়ত্তশাসনের দাবীটাই ছিল জাতির নিকট প্রধান আলোচ্য বিষয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এটাই ছিল সেদিনকার মৌল প্রশ্ন; এরই সমাধানের উপর অন্যান্য প্রশ্নের সমাধান নির্ভর করছিল—নির্ভর করছিল আমাদের জাতীয় চেতনার একটা পূর্ণ পরিণতি। আমাদের প্রথম পর্যায়ের (১৯০৫-১৯১০) জাতীয় সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা বুঝলাম যে, যতদিন না আমরা স্বায়ত্তশাসন লাভ করতে পারছি, দেশের শাসনভার আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে নিতে পারছি, ততদিন জাতিগঠন কাজ অসম্ভব। তাইতো চিত্তরঞ্জনের কণ্ঠে আমরা শুনলাম:

'আমাদের কিছুই নাই—অর্থ নাই, অস্ত্র নাই, শিক্ষা পর্যন্ত নাই। এ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে স্বায়ত্তশাসনের একান্ত প্রয়োজন। শুধু কয়েকজন শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে উহা আবদ্ধ থাকিবে না। দেশের আপামর জনসাধারণ, প্রজা ও কৃষক যাহাতে স্বায়ত্তশাসনের সুধাময় আস্বাদ পায়, আমাদের কার্যই তাহাই। সমগ্র দেশবাসী যাহাতে স্বাধীনতা-সুখ ভোগ করিতে পারে তাহাই আমাদের কামনা। আমি চাই সমষ্টির কল্যাণ, সমগ্র দেশবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা। আমার কি হইবে, তাহা আমি জানিতে চাহি না, বর্তমান বাঙালীর কি হইবে, তাহাও জানিবার প্রয়োজন নাই, আজিকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহাও ভাবিবার প্রয়োজন নাই। আমি শুধু চাই, আমার জাতির কি হইবে। আমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত আমি শুধু এই কামনাই করিতেছি।'

এই যে লোকতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, সেদিনের রাজনীতিতে এইটারই

* ১৯১৮, জুন মাসে চট্টগ্রামে প্রদত্ত বক্তৃতা।

প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে mass awakening বা গণ-জাগরণের প্রথম শঙ্খধ্বনি চিত্তরঞ্জনই করেছিলেন, গান্ধী নন। তারপর মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে যে স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছিল তার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে সেদিন একমাত্র চিত্তরঞ্জনই বলতে পেরেছিলেন: 'নামে স্বায়ত্তশাসন, অথচ কার্যত কিছুই নহে, এমন স্বায়ত্তশাসন আমরা চাহি না।....যদিও মিঃ মণ্টেগু আমাদিগকে বলেন, তোমরা অত এখন পাইবে না, যৎকিঞ্চিৎ—এই এক বিন্দু এখন লও।—এ অবস্থায় কি করিব? আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশের লোকের এ সাহস আছে যে, তাহারা বলিতে পারিবে—আমরা উহার কিছুই চাহি না। তোমার দান ফিরাইয়া লও। যদি ব্যুরোক্রেসীর দাসত্বই করিতে হয়, যদি প্রতি পদেই বাধা-বিঘ্ন ঘটাইতে চাও, যদি ব্যুরোক্রেসীর ইচ্ছামাত্রেই আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে, তবে ঐরূপ সংস্কারে আমাদের প্রয়োজন নাই। তোমার জিনিস তুমিই ইংলণ্ডে ফিরাইয়া লইয়া যাও।'

দেশকে এইভাবেই বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন চিত্তরঞ্জন। দেশের পরিবর্তিত পটভূমিকায় সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে তখন তা আদৌ সম্ভব ছিল না, কারণ তাঁর মানস-পরিমণ্ডল গঠিত ছিল সম্পূর্ণ বিলাতী ধাঁচের রাজনীতি দ্বারা—দেশ বা দেশের জনসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণচিন্তার স্থান সেখানে খুবই সীমিত ও সংকীর্ণ ছিল, বললেই হয়। দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌল পার্থক্যের ফলেই বাংলাদেশে সেদিন সুরেন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধুর নেতৃত্ব মিলিতভাবে সার্থক হতে পারে নি এবং এটাই ছিল ইতিহাসের পরিহাস—প্রবল পরিহাস। দেশবাসী তাই নতুন যুগে চিত্তরঞ্জনকেই নেতৃত্বের আসনে স্থাপন করে জাতীয় সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ে পদক্ষেপ করবার জন্য এইবার প্রস্তুত হলো। অতঃপর আমরা দেশবন্ধুর গৌরবদীপ্ত রাজনৈতিক জীবনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করব

॥ চৌদ্দ ॥

দেশব্যাপী এক দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের দ্বাত্রিংশ অধিবেশন বসল কলকাতায়। এর ঠিক দশ বছর আগে, ১৯০৬ সালে, কংগ্রেসের দ্বাবিংশ অধিবেশন বসেছিল এই মহানগরীতে। একদিকে হোমরুলের আন্দোলন, অন্যদিকে নেতৃবৃন্দের অন্তরীণাদেশের বিরোধী আন্দোলন আর তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল মণ্টেগুর ঘোষণা ও তাঁর ভারতে আগমন। এইসব কারণে কংগ্রেসের এই অধিবেশন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আসন্ন শাসন-সংস্কারের পটভূমিকায় এই অধিবেশনে কাকে সভাপতি করা যায়, এটা ছিল একটা প্রধান প্রশ্ন। য়্যানি বেশান্তকে গভর্ণমেণ্ট মণ্টেগু-ঘোষণার অব্যবহিত কাল পরেই অক্টোবরের প্রথম দিকে মুক্তি দিয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদীদল তাঁকেই সভানেত্রী করতে চাইলেন—মডারেটরা কিন্তু সম্মত হলেন না; তাঁরা মামুদাবাদের রাজাকে সভাপতি করতে চাইলেন। তাঁরা বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ সেনকে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান্ করতে চাইলেন, অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী দলের ইচ্ছা এবারকার অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান্ হবেন রবীন্দ্রনাথ। শেষে দুই দলে মিটমাট হয়ে ঠিক হয় যে, বৈকুণ্ঠবাবু অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান্ হবেন আর বেশান্ত হবেন অধিবেশনের সভানেত্রী। এই দলাদলির মধ্যে চিত্তরঞ্জন ছিলেন না, তবে তিনি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে একটি বক্তৃতা করেছিলেন বলে জানা যায়। আর স্বায়ত্ত-শাসন সম্পর্কিত মূল প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। কংগ্রেসে সেই তাঁর শেষ বক্তৃতা—এর পর তাঁকে কংগ্রেসের মঞ্চে আর দেখা যায় নি; দেখা গিয়েছিল মডারেট কন্‌ভেন্‌সনের অন্যতম

প্রধানরূপে আর নতুন রিফর্ম প্রবর্তিত হওয়ার পর বাংলা গভর্ণমেণ্টের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরূপে।

১৯০৬-এর কলকাতা কংগ্রেসে টিলক প্রমুখ নেতারা যেমন চিত্তরঞ্জনের রসা রোডের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, এবারও তেমনি দেখা গেল যে, অন্তরীণাবদ্ধ আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের জননী, মহম্মদ আলি জিন্না প্রমুখ অনেকেই চিত্তরঞ্জনের সাদর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। এবারকার অধিবেশন গুরুত্বপূর্ণ ছিল এইজন্য যে, সুরাট কংগ্রেসের (১৯০৭) পর এই দীর্ঘকালের মধ্যে নরম ও চরমপন্থী আর কখনো মিলিত হন নি। এবারকার কলকাতা কংগ্রেসে তাই সেই মিলনের চেষ্টা হয় ও উভয় দল একত্রে এই অধিবেশনে যোগ দেন। কিন্তু ইতিহাসের পরিহাস বাদ সাধল; প্রত্যাশিত মিলন তো হলোই না, বরং দেখা গেল যে, কংগ্রেসের উপর মডারেটদের এতকালের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য তাঁদের শিথিল মুষ্টি থেকে খুলে গেল এবং টিলক ও চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে সংযত ও শক্তিশালী জাতীয়দলের হাতে কংগ্রেসের নেতৃত্ব চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় একটি পুরাতন অধ্যায়ের—আবেদন-নিবেদনের অধ্যায় —পরিসমাপ্তি ঘটল।

কিন্তু এই পালা-বদল হলো কেন? এবং যা ঘটল তার প্রকৃতিটা কি ছিল? এর উত্তরে বলা যায় যে, 'The Indian politics became an exceedingly complex and absorbing business, and Nationalist Indian opinion for the first time became claimant and demonstrative.' এই বলিষ্ঠ রাজনীতির মধ্যেই চিত্তরঞ্জনের প্রবেশ ঘটেছিল ১৯১৭ সালে। রাজনৈতিক মতাদর্শের দুটি বিপরীত ধারা তখন একত্র মিলিত হয়ে জাতীয় ভাবোন্মাদনার একটি উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করার পথে এগিয়ে চলেছে। দুইটি ধারার এই মিলনবিন্দু থেকেই ভারত তার স্বরাজের দাবী রচনা করতে থাকে। এই দুইটি ধারার

একটির উৎস ছিল জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অনুকূলে বিশ্বের যুদ্ধোত্তর পরিবেশ আর অপর ধারাটির উৎস ছিল শাসনব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদূরিত করে ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগ মোচনের জন্য শাসকগোষ্ঠীর উৎকণ্ঠা। ইতিহাসের গতিপথে সেদিন এই দুইটি ধারার মিলনের ফলেই কংগ্রেসের পালা-বদল ও নতুন নেতৃত্বের অভ্যুদয় শুধু সম্ভবপর নয়, অনেকখানি ত্বরান্বিতও হয়েছিল। চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক জীবনের এই প্রেক্ষাপটটি আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার।

কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ১৯১৭ সালের অধিবেশনে পাঁচ হাজার প্রতিনিধি ও সমসংখ্যক দর্শকের সমাগমে বেশ উৎসাহ ও আবেগদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশনে 'ভারতের প্রার্থনা' শীর্ষক একটি কবিতা পাঠ করেছিলেন। সভানেত্রীর ভাষণে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া সম্পর্কে একটি সঠিক সময় নির্ধারণ করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল—হয় ১৯২৩ অথবা খুব বিলম্ব হলে ১৯২৮ সালের মধ্যেই এটা দেওয়ার কথা বলা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে এই 'Time Limit'-এর দাবীটা কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে এই প্রথম করা হয়।

চিত্তরঞ্জন এই অধিবেশনে ঐ একই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তাঁর সেই বক্তৃতার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো। তিনি বলেছিলেন :

'একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এখন সময় এসেছে। এসময় আর অপেক্ষা করলে চলবে না। প্রভুত্বপ্রয়াসী আমলাতন্ত্রের হাতে যে ক্ষমতা ন্যস্ত আছে, এখন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে ভারতবাসীর অর্থাৎ ভারতের জনসাধারণের হাতে তা অর্পণ করতে হবে। এদেশে দীর্ঘকাল ধরে আমরা আমলাতন্ত্রের প্রভুত্ব ও প্রাধান্যের পরাকাষ্ঠা দেখেছি— আমরা আর তা দেখতে চাই না। দেড়শো বছরের কুশাসনে আমরা জর্জরিত হয়েছি। আর একদিনও কালবিলম্বের প্রয়োজন নেই। সকল বিষয়ে আমরা দায়িত্বপূর্ণ

শাসন-ক্ষমতা চাই। এটা আমাদের পেতেই হবে এবং যতক্ষণ দেশের জনসাধারণের হাতে দেশের শাসনভার দেওয়া না হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা কোনমতেই নিরস্ত হব না, সন্তুষ্ট হব না।'

তাঁর এই বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট ভাষণের প্রত্যেকটি কথার মধ্যেই কংগ্রেসের পালা-বদলের সুরটা শোনা গিয়েছিল। তখন থেকেই সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ মডারেটরা বুঝতে পারলেন যে, কংগ্রেসে তাঁদের অপ্রতিহত নেতৃত্বের দিন ফুরিয়ে এল। বিশেষ করে সুরেন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের এই ভাষণে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তিনি তাই এই সময়ে জাতীয়তাবাদীদলের সভ্যদের নিখিল ভারত কমিটিতে যাতে স্থান না হয় সেজন্য চিত্তরঞ্জনের বিরোধিতা করেছিলেন। এ ছিল প্রবীণ ও নবীনের সংঘর্ষ—এ সংঘর্ষ অপ্রত্যাশিত ছিল না, ছিল অবশ্যম্ভাবী। তারপর সুরেন্দ্রনাথ কৌশলে জাতীয়দলকে ভারত-সভা থেকে বিতাড়ন করলেন। চিত্তরঞ্জন কিন্তু রাষ্ট্রগুরুর এই আচরণে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হলেও শ্রদ্ধা হারালেন না। তাঁর সঙ্গে তিনি দেখা করে মিটমাটের শেষ চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নি। তারপর 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথ যখন চিত্তরঞ্জনকে প্রকাশ্যে আক্রমণ করলেন তখন তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। সেদিন সুরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলেছিলেন: 'দাশ নেতা হতে চাচ্ছেন। কিন্তু নেতার উপযুক্ত তিনি কি কাজ করেছেন?' সুখের বিষয়, রাষ্ট্রগুরু তাঁর জীবিতকালেই এই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলেন দেশবন্ধুর গৌরবদীপ্ত নেতৃত্বের মধ্যে। সেই উত্তর তাঁকে ও তাঁর সহগামীদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে:

'এসেছে আদেশ—
বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মতো হলো শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা-কেনা
আর চলিবে না।'

মোটকথা, উনিশ-শো সতেরো সালের ক্রান্তিলগ্নে আমরা পুরাতন কংগ্রেসের মৃত্যু ও নতুন কংগ্রেসের জন্ম প্রত্যক্ষ করলাম।

১৯১৮, ২২শে এপ্রিল।

সিমলা শৈলশিখরে বসে বড়লাট ও ভারতসচিব উভয়ে বহু প্রত্যাশিত মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে তাঁদের স্বাক্ষর প্রদান করলেন। বিরাট রিপোর্ট, বিপুল পরিশ্রমের ফল। ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এই রিপোর্টের গুরুত্ব ও মূল্য অনেক। যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে গান্ধী-চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে যে মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়, তা ছিল এই রিপোর্টেরই ফলশ্রুতি। তাই এখানে আমরা মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। মন্টেগুর 'ইণ্ডিয়ান ডায়েরী' গ্রন্থ থেকে এখন জানা গেছে যে, এই রিপোর্টে স্বাক্ষর প্রদান করতে চেমস্‌ফোর্ড ঈষৎ দোদুল্যমানচিত্ত ছিলেন, কারণ রিপোর্টে উল্লিখিত অনেক বিষয়েই ভারতসচিবের সঙ্গে তাঁর মতান্তর ঘটেছিল। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই রচিত হয় ১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইন এবং ১৯২১ থেকে এই নতুন আইন কার্যকর হয়। স্বাক্ষরিত হওয়ার দু'মাস পরে (৮ই জুলাই) রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়।

কুপল্যাণ্ড এই রিপোর্ট সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এইভাবে: 'The Montagu-Chelmsford report is the first comprehensive study that has yet been made of the whole problem of the Indian Government. It takes rank at once as a permanent contribution to the science of politics.'* কথাটি সত্য, কারণ ভারত-শাসনের সমস্যাটিকে এর আগে এমন সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে দেখবার ও বুঝবার চেষ্টা শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে আর কখনো করা হয় নি। রিপোর্টটির প্রকৃত মূল্য এইখানেই। প্রকাশিত রিপোর্টের প্রধান দুইটি ভাগের একটিতে উপাদান-উপকরণ ও অপরটিতে প্রস্তাবাবলী আলোচিত হয়েছে। ভারত-শাসন পদ্ধতি ও আইনসভার ক্রমিক

* *The Indian Politics :* Coupland

বিবর্তন ও তার সাম্প্রতিক উৎকর্ষের পটভূমিকাটি তাঁদের সামনে রেখেই এদেশে দায়িত্বপূর্ণ শাসন প্রবর্তনের অন্তরায়গুলির কথা রিপোর্টের রচয়িতাদ্বয় বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করেন। এই নিরীক্ষার ভিত্তিতেই তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে: 'No further development is possible on the old lines. The logic of events demand further advance and for making that advance a new line has to be chalked out.'* মন্টেগুর ঘোষণায় এই নতুন দৃষ্টিকোণের উল্লেখ করা হয়েছিল এইভাবে: 'Cautious advance towards the progressive realisation of responsible Government.' দায়িত্বপূর্ণ শাসনের পথে সতর্কভাবে অগ্রসর হওয়ার প্রশ্নটা দেখা দিয়েছিল প্রধানতঃ দুটি কারণে; প্রথম—ভারতীয় জনসাধারণের দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা; দ্বিতীয়—দেশের শিক্ষিত শ্রেণী এবং জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও গণতান্ত্রিক বোধের অভাব। এইসব অন্তরায় সত্ত্বেও শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের আশু প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে উক্ত রিপোর্টের দ্বিতীয় ভাগের মুখবন্ধে বলা হলো: 'Unless we are right, in going forward now the whole of our past policy in India had been a mistake. We believe, however that no other policy was either right or possible, and therefore we must now face its logical consequences. Indians must be enabled, in so far as they attain responsibility, to determine for themselves what they want done.'*

মোটকথা, প্রস্তাবে বলা হলো যে ভারতবাসীর হাতে দেশ শাসনের অধিকার ন্যস্ত হবে, ব্রিটিশ-সরকার নীতিগতভাবে এটা স্বীকার করেন, তবে দায়িত্বপূর্ণ শাসনের পথে ভারতবাসীকে এগিয়ে

* *M. C. Report.*

নিয়ে যাওয়ার জন্য সতর্কতার প্রয়োজন আছে এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই রিপোর্টে উল্লিখিত প্রস্তাবাবলী ভারতীয় সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে উপস্থাপিত হলো না—লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবেই উপস্থাপিত করা হয়। বলা হলো, মাঝে মাঝে তদন্ত কমিশন বসিয়ে পরবর্তী স্তরগুলি নির্ধারণ করা হবে। প্রশ্ন হলো, প্রথম পদক্ষেপটা অর্থাৎ প্রতিশ্রুত দায়িত্বপূর্ণ শাসনের প্রথম পর্যায় কিভাবে প্রবর্তিত হবে? এর উত্তরে রিপোর্টে বলা হলো প্রদেশগুলির হাতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ন্যস্ত হবে এবং কতকগুলি হস্তান্তরিত বিষয় নির্ধারিত ও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে। দেশে শান্তি, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সমস্ত প্রয়ো ·নীয় ক্ষমতা কেন্দ্রে অর্থাৎ ভারত-সরকারের হাতে থাকবে। ভারতীয় আইনসভা দ্বিকক্ষ হবে—কাউন্সিল্ অব্ ষ্টেট ও ব্যবস্থা-পরিষদ। প্রদেশ-শাসনে আমলাতন্ত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা হবে; তার এক ভাগে থাকবেন গভর্ণর ও তাঁর এগ্‌জিকিউটিভ কাউন্সিল্ আর অন্যদিকে গভর্ণরও কাউন্সিলের নিধারিত সদস্যদের মধ্যে নিযুক্ত মন্ত্রিগণ। অর্থাৎ প্রদেশগুলিতে প্রবর্তিত হবে Diarchy বা দ্বৈতশাসন প্রথা।

এই প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ কি বলেন তা জানবার জন্য সেদিন সকলেই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য, ব্যতীত অন্য কোন শাসনব্যবস্থাই আমাদের মনঃপূত হতে পারে না—এই কথা যিনি এতকাল বলে এসেছেন আজ কিন্তু তাঁর কণ্ঠে অন্য সুর শোনা গেল। দিল্লী বৈঠক থেকে ফিরে এসে সুরেন্দ্রনাথ এক নতুন সুর ধরলেন—'আমরা যতটুকু পাই ততটুকুই গ্রহণ করিব এবং কার্য আরম্ভ করিব।' অথচ দেখা যায় যে, সেই একই সময়ে য়্যানি বেশান্ত বলছেন: 'The scheme is unworthy to be offered by England or to be accepted by India'. আর টিলক বলছেন: 'Montagu scheme is wholly un-

acceptable. It makes us believe that one morsel of Representative Government is more than sufficient to satisfy our hunger for Self-Government.' মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ যখন প্রায় একমত তখন সুরেন্দ্রনাথের 'যতটুকু পাই ততটুকুই গ্রহণ করিব'—এই অভিমত চিত্তরঞ্জনের কাছে বিসদৃশ বোধ না হয়ে পারে নি। চট্টগ্রামে বিশ্বম্ভর থিয়েটার হলে প্রদত্ত এই সময়ের এক বক্তৃতায় তিনি রাষ্ট্রগুরুর এই মত-পরিবর্তনকে 'উল্টো ডিগবাজী' খাওয়া বলে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর এই বক্তৃতার ফলেই সুরেন্দ্র-নাথের নেতৃত্বের সৌধ লোকচক্ষে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল।

চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন: 'No leader is anything. The strength belongs to the nation whose representative I am, whose representative everyone of us may become···Take your stand on that and we will worship you as a leader but fall short of that ideal once by a hair's breath, your claim is no longer to be recognised.' এই বক্তৃতাতেই চিত্তরঞ্জন সুরেন্দ্রনাথের ঐ উক্তিকে—'যতটুকু পাই ততটুকু গ্রহণ করিব'—Contempt of public opinion বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু যে কারণে তাঁর চট্টগ্রামের এই বক্তৃতা স্মরণীয় হয়ে আছে, তা হলো এর উপসংহার ভাগ। বক্তৃতার শেষে তিনি বলেছিলেন:

'আমি সেই সময়ের অপেক্ষা করিতেছি যখন আমরা আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব। আমি সেই সময়ে নশ্বর দেহে বাঁচিয়া থাকি আর না থাকি, আমার সন্তান-সন্ততি জীবিত থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু আমি দেখিতেছি অদূর ভবিষ্যতে ভগবৎ-প্রসাদে আমরা এমন শক্তি লাভ করিব যে এক মহিমান্বিত জাতিরূপে আমরা সকল ঐশ্বর্যে ভূষিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখীন হইতে সক্ষম হইব। এই আমার ব্রত, আর আমি বিশ্বাস করি, ভগবান এই ব্রতের উদ্‌যাপনে এখন আমাকে নিয়োগ করিয়াছেন। যদি

এই সংগ্রামে মৃত্যুকেও আমার আলিঙ্গন করিতে হয় তাহাতেই বা কি আসে যায়? এই দেহ পঞ্চভূতে মিলিয়া যাইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু আবার আসিব, আবার সমস্ত শক্তি দেশের কার্যে নিয়োগ করিব, যে পর্যন্ত সিদ্ধিলাভ না হয়, আবার এইভাবেই দেহপাত করিব।'

ভবিষ্যতের দেশনেতা দেশবন্ধুর এইখানেই সূত্রপাত। এখন থেকেই আমরা দেখতে পাব যে চিত্তরঞ্জন নেতারূপে সুরেন্দ্রনাথের আসন গ্রহণ করলেন। 'We won't accept unless it recognises our natural right'.'—প্রস্তাবিত নতুন শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে এই ছিল তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত। টিলক, বেশান্ত ও চিত্তরঞ্জন একই সুরে কথা বললেন।

অতঃপর পার্লামেন্টের তিনটি পৃথক কমিটিতে এই রিপোর্ট আলোচিত হয় এবং ১৯১৯ সালের গ্রীষ্মকালে পার্লামেন্টে ভারত-শাসন আইনের একটি নতুন বিল উত্থাপিত হয়। পার্লামেন্টের উভয় সভাতেই সেই বিল গৃহীত হয় এবং ১৯১৯-এর শেষভাগে এই বিল সম্রাটের অনুমোদন লাভ করে ও উহা আইনে পরিণত হয়ে 'ভারত-শাসন আইন, ১৯১৯' এই নামে আখ্যাত হয়।

মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার এক মাস পরেই এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য কংগ্রেসের এক বিশেষ অধি-বেশনের প্রয়োজন হয়। ঠিক হয় যে বোম্বাইতে এই অধিবেশন বসবে। কংগ্রেসের নিয়মাবলীতে বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করার অধিকার যদিও ছিল, কিন্তু মডারেটদের আমলে কখনো এর কোন আবশ্যকতা দেখা দেয় নি। কংগ্রেসের ইতিহাসে এই প্রথম বিশেষ অধিবেশন হতে চলেছে। কাকে এই অধিবেশনের সভাপতি করা যায়? চিত্তরঞ্জনের ইচ্ছা ছিল টিলক সভাপতি হন। তখনো পর্যন্ত দেশসেবার জন্য লোকমান্যকে এই সম্মান দেওয়া

---

* *Lokamanya Tilak* : Pradhan & Bhagat

হয় নি, এটা চিত্তরঞ্জন গভীর ভাবেই অনুভব করতেন। তাই এইবার যখন তিনি টিলকের নাম প্রস্তাব করলেন তখন কেউ আর আপত্তি করলেন না। কিন্তু টিলক নিজেই সম্মত হলেন না। 'Doors should be kept open for the seceders.'—এই যুক্তি দেখিয়ে টিলক সভাপতিত্বের পদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

এই বিশেষ অধিবেশনের উদ্যোক্তা ছিলেন চিত্তরঞ্জন ; গান্ধীকে বলে তিনি এই অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন ও এজন্য দশ হাজার টাকা কংগ্রেস তহবিলে প্রদান করেছিলেন। টিলক যখন রাজী হলেন না, তখন তিনি সৈয়দ হাসান ইমামের নাম প্রস্তাব করেন ও সে প্রস্তাব সকলেই অনুমোদন করেন। ২৯শে আগষ্ট বোম্বাইতে কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশন হয় ও সেপ্টেম্বরের প্রথম তারিখ পর্যন্ত এর কাজ চলে। মডারেটরা এই কংগ্রেস বর্জন করেন। তাঁরা তখন সুরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশন' নাম দিয়ে একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করেছেন। ফেডারেশন ছিলেন শাসন-সংস্কার গ্রহণের পক্ষে। বস্তুতঃ এই সময় থেকেই ভারতীয় রাজনীতিতে ও ভারতের জাতীয় জীবনে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হিসাবে চিত্তরঞ্জন স্বীকৃতি লাভ করেন। প্রাদেশিক কংগ্রেসের দায়িত্বও এই সময়ে তাঁর উপর এসে গিয়েছিল এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটিতেও তাঁরই সমর্থকগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন। হোমরুল আন্দোলনের সময় থেকেই যে চিত্তরঞ্জনের উপরে সর্বভারতের দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে থাকে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টই প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল এবং এই সম্পর্কে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তাতে বলা হলো : 'While the Congress recognises that the proposals constitute an advance, it holds that the proposals as a whole are

disappointing and unsatisfactory.' কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব সমর্থন করে পণ্ডিত মালব্য একটি সুযুক্তিপূর্ণ ও যথার্থ statesmanlike বক্তৃতা করেন। টিলক এই প্রস্তাব সমর্থন করে তাঁর বক্তৃতায় বলেন: 'We asked for eight annas of Self-Government. The report gives us one anna of responsible Government and says that it is better than the eight annas of Self-Government.'*

যাই হোক, কংগ্রেসের পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে সাব্যস্ত হলো। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে যখন বলা হলো প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার গ্রহণ করা ভারতের পক্ষে অপমানজনক, তখন সুরেন্দ্রনাথের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ঘোষিত হলো—'ইহা সদাশয় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের একটি বড় রকমের দান। আমরা ইহা গ্রহণ করতে প্রস্তুত।' কংগ্রেস ও ফেডারেশন উভয়েরই অধিবেশন বোম্বাইতে হয়েছিল।

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট যে সময়ে প্রকাশিত হয়, প্রায় ঠিক সেই সময়ে (১৯১৮, ১৯শে জুলাই প্রকাশিত হয় রৌলট কমিটির রিপোর্ট। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলা ও মহারাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে একটা ব্যাপক তদন্তের কথা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৯১৪ সাল থেকেই চিন্তা করছিলেন। কিন্তু য়ুরোপে এই বছরে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার ফলে এই চিন্তা সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে ভারত-সাম্রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আপদকালীন ব্যবস্থা হিসাবে ভারত-রক্ষা আইন (Defence of India Act) নামে একটা জরুরী অস্থায়ী আইন প্রবর্তিত হয় ও সেই আইনের বলে বহু লোককে বিনাবিচারে আটক রাখা হয়। যুদ্ধের পর সেই আইনের মেয়া

* *Lokamanya Tilak* : Pradhan & Bhagat

শেষ হওয়ার কথা। যুদ্ধ যখন শেষ হলো তখন ভারতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য লণ্ডন হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার সিডনি রৌলটকে চেয়ারম্যান্ করে ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি কমিটি গঠিত হয়। স্যার সিডনি ভিন্ন এই কমিটিতে আরো চারজন ছিলেন, যথা—বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি বেসিল স্কট, মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি কে. শাস্ত্রী, স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র ও স্যার লোভেট ফ্রেজার।

এই কমিটিও ছয়মাস পরিশ্রম করে একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহাই 'রৌলট রিপোর্ট' নামে পরিচিত। রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালের ১৯শে জুলাই তারিখে। এর মাত্র দশদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট। এই দুখানি রিপোর্ট পাশাপাশি রেখে ভারতবাসী বুঝতে পারল যে, 'The contrast between the Montagu-Chelmsford proposals and the Rowlatt Bills was the contrast between the shadow and the reality.'* ভারতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমনের জন্য রৌলট রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, জুরি ছাড়াই রাজনৈতিক মামলার বিচার করা চলবে এবং সন্দেহক্রমে যে-কোন ব্যক্তিকে বিনাবিচারে ও অনির্দিষ্টকালের জন্য অন্তরীণাবদ্ধ করার পূর্ণ ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারকে দেওয়া হবে। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ভারত-সরকার ভারতীয় রাষ্ট্র পরিষদে দুটি বিল উপস্থাপিত করেন।

এই রৌলট কমিটির রিপোর্টকে উপলক্ষ করেই ভারতের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে মহাত্মা গান্ধীর আর্বিভাব ঘটেছিল। গান্ধী তাঁর আত্মজীবনীতে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'আমি যখন সংবাদপত্রে রৌলট কমিটির রিপোর্ট পাঠ করলাম, তখন এর সুপারিশগুলি আমাকে রীতিমতো চমকিত করে দিল।' শুধু

* *The Empire of the Nabobs :* Hutchinson

চমকিত হওয়া নয়; তাঁর বিবেচনায় রিপোর্টে যে-সব প্রস্তাব করা হয়েছে, আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন কোন মানুষই তা মেনে নিতে পারে না। গান্ধী তখন থাকতেন সবরমতী আশ্রমে। তাঁর দুজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ বিষয়ে এখনি কিছু করা সম্ভব কিনা। এর কিছু পরে তিনি আমেদাবাদে এসে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে বললেন, 'Something must be done.' এর উত্তরে বল্লভভাই তাঁকে বললেন, কিন্তু এই অবস্থায় আমরা কি করতে পারি?

তখন গান্ধী প্যাটেলকে যে কথাগুলো বলেছিলেন তারই মধ্যে ভারতের দ্বিতীয় পর্যায়ের আসন্ন মুক্তিসংগ্রামের ইঙ্গিতটা যেন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। গান্ধী বলেছিলেন: 'If even a handful of men could be found to sign the pledge of resistance, and proposed measure is passed into law in defiance of it, we ought to offer Satyagraha at once.'* তারপর তাঁর আগ্রহেই একটি ছোটখাটো কন্‌ফারেন্স হয়, খুব বেশি হলে কুড়িজন তাতে উপস্থিত ছিলেন এবং এই সভাতেই সত্যাগ্রহের প্রতিজ্ঞাপত্রের খসড়া রচিত হয়। পরবর্তী কাহিনী সুপরিচিত।

চিত্তরঞ্জন কি করলেন? বোম্বাইতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে তিনি এই রিপোর্ট সম্বন্ধেও আলোচনা করেন। সে আলোচনা ছিল পাণ্ডিত্যপূর্ণ। পাণ্ডিত্যপূর্ণ এইজন্য বলছি যে, উপস্থিত ডেলিগেটদের মধ্যে বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁর চেয়ে ওয়াকিবহাল আর কেউ ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন: 'This Report is calculated to arm the Government with the same emergency powers for suppressing political activities as it had enjoyed during the war period. The whole Report comes to me as a rude

* *My Experiments with Truth*: Gandhi

shock.' বক্তৃতার শেষে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে তিনি একটি প্রস্তাবও উপস্থিত করেন। ঐ প্রস্তাবে বলা হয় যে, 'কংগ্রেস এই কমিটির ও কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টের তীব্র নিন্দা করছে। এই কমিটির নির্দেশ অনুসারে কাজ হলে দেশের জনমতের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হবে, দেশের প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হবে।' বোম্বাইয়ের এই বিশেষ কংগ্রেসে গান্ধীও উপস্থিত ছিলেন এবং চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাবটি সমর্থন করে তিনি যা বলেছিলেন তা কংগ্রেসের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। বলেছিলেন: 'This Report is unjust, subversive of all the principles liberty and justice and destructive of the elementary rights of the individual.' বিক্ষুব্ধ ভারত যেন গান্ধীর মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ ঘোষণা করল। সে ঘোষণায় সরকার চমকিত হলেন।

রৌলট বিল যাতে আইনে পরিণত না হয় সেজন্য গান্ধী তাঁর রোগশয্যা থেকে বড়লাট চেমস্‌ফোর্ডকে অনুরোধ করেন। সে অনুরোধ অগ্রাহ্য হয়। গান্ধী এই বিলকে 'Black Bill' বলে অভিহিত করেছিলেন। শুধু তাই নয়। যিনি এতকাল সকল বিষয়ে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে এসেছেন, এবং তাঁর চেয়ে ইংরেজের বড় বন্ধু এদেশে তখন আর কেউ ছিলেন না, সেই গান্ধী এই বিলের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করে দিলেন। তিনি পূর্বাহ্নেই সরকারকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যদি ভারতের জনমত অগ্রাহ্য করে রৌলট বিল আইনে পরিণত হয়, তাহলে তিনি জনসাধারণকে এর বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা সত্যাগ্রহ করতে উপদেশ দেবেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ সরকারের ভারত-বিরোধী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই সত্যাগ্রহ ছিল তাঁর হাতে পাশুপত অস্ত্র। সেই সত্যাগ্রহের পরীক্ষা এবার তিনি ভারতের মাটিতে করতে উদ্যত হলেন।

বোম্বাই কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থিত করেছিলেন। প্রস্তাবটি ছিল নতুন শাসন-সংস্কার অনুযায়ী গঠিত ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচনে ভোট প্রদানের ব্যবস্থা, নির্বাচনকেন্দ্র নিরূপণ ও ব্যবস্থাপক সভার গঠন নির্ধারণ—এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে এবং প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে, এই তিনটি বিষয় যেন কোনো কমিটিতে স্থির না হয়ে সরাসরি পার্লামেণ্ট কর্তৃক নিরূপিত হয়। কিংবা যদি সেই কার্যের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়, তবে সেই কমিটির দুজন বেসরকারী সদস্যের মধ্যে একজন কংগ্রেস ও একজন লীগ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, চিত্তরঞ্জন কমিটিতে কংগ্রেস ও লীগের তুল্যাধিকার দিতে চেয়েছিলেন। উত্তরকালে তিনি যে হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট করে কারো কারো বিরাগভাজন হয়েছিলেন, এই বোম্বাই অধিবেশনেই তিনি তার সূচনা দেখালেন। ভারতে হিন্দু ও মুসলমান—এই দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য দেশবন্ধু যে আন্তরিকতা ও আগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন, তা স্মরণ করেই তাঁর মৃত্যুর পরে মৌলানা মহম্মদ আলি তাঁর 'কমরেড' পত্রিকায় লিখেছিলেন: 'দাশ মুসলমানদিগের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছেন কোন ভদ্র মুসলমান তাহা ভুলিতে পারেন না।'

বিক্ষুব্ধ জনমত অগ্রাহ্য করে রৌলট আইন পাস হলো ১৯১৯ সালের ২১শে মার্চ তারিখে দমনমূলক এই আইন পাস হওয়া থেকেই ভারতবাসী পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পারল কি ধরনের স্বায়ত্তশাসন তারা পেতে চলেছে। এই প্রসঙ্গে মিষ্টার হাচিনসন্ যথার্থই বলেছেন: 'The Rowlatt Act only precipitated a revolt which was inevitable after the blow struck at nationalist hopes by the Montagu-Chelmsford Reforms".* ভারতের আকাশে সেদিন যে ঝড়ের মেঘ দেখা

* *The Empire of the Nabobs* : Hutchinson

দিয়েছিল তাকে গাঢ় থেকে গাঢ়তর করে প্রত্যক্ষভাবে রৌলট আইন আর পরোক্ষভাবে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার।

১৯১৮, ডিসেম্বর।

দিল্লীতে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন বসল। সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। নতুন শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বোম্বাইতে গৃহীত প্রস্তাব এই পূর্ণ অধিবেশনে সমর্থিত হয় এবং বলা হয় যে, ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের প্রদেশগুলিতে যেন অবিলম্বে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এইটাই ছিল মূল প্রস্তাব। বাংলার বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার বোমকেশ চক্রবর্তী এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন ও বল্লভভাই প্যাটেল তা সমর্থন করেন। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে য়্যানি বেশান্ত, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, বি. এন. শর্মা ও কয়েকজন মডারেট নেতা যোগদান করেছিলেন ও তাঁরা কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শাস্ত্রী বললেন, মূল প্রস্তাব থেকে 'disappointing and unsatisfactory' বিশ্লেষণ দুটি বাদ দিলে ভাল হয়। এ ছাড়া, স্বায়ত্তশাসন দেওয়া সম্পর্কে কোনো সময় নির্ধারণের পক্ষে তিনি ভিন্ন মত ব্যক্ত করেন। এই সময় নির্ধারণের প্রস্তাবটা কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে য়্যানি বেশান্ত প্রথম উত্থাপন করেছিলেন ও বোম্বাইয়ের বিশেষ অধিবেশনে সেটি সমর্থিত হয়। তাই দিল্লী অধিবেশনে তিনি বললেন যে, জাতীয়তাবাদী ও মডারেট—উভয় দলের সম্মতিক্রমেই সময় নির্ধারণের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল, সুতরাং এ প্রস্তাব থেকে আমরা পিছু হটতে পারি না। 'Let us advance steadily but cautiously.'—বলেছিলেন বেশান্ত।

এই অধিবেশনে চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতা ছিল অপূর্ব যুক্তিজালপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন: 'ভারতবর্ষ আমলাতন্ত্র বা ব্যুরোক্রেসি দ্বারা শাসিত, কাজেই স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হলে এদের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হবে। এমন অবস্থায় দেশের যারা প্রকৃত শাসক সেই সিভিল সার্ভিসের

গোষ্ঠী তাদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনে কিছুতেই সম্মত হবে না। সুতরাং এই বিষয়ে আমাদের দাবীর সঙ্গে সঠিক সময় নির্ধারণের কথাটাও উল্লেখ করা দরকার।" তারপর শাস্ত্রী মূল প্রস্তাব থেকে যে বিশ্লেষণ দুটি বর্জন করার জন্য বলেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন যখন সেই বিপুল সমাবেশের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ধীর গম্ভীরকণ্ঠে বললেন: "I take objection to Shri Sastri's move to delete the words 'disappointing and unsatisfactory'. I ask you to put your hands on your hearts and answer the question for yourselves whether you are satisfied or disappointed." তখন কংগ্রেস সভামণ্ডপে তুমুল করতালিধ্বনি সহকারে সকলে একবাক্যে বলে উঠেছিল—'না, না, আমরা কেউই সন্তুষ্ট নই, আমরা নিরাশ হয়েছি।'

শাস্ত্রী প্রাদেশিক অটোনমি সম্পর্কে একটি সংশোধনী প্রস্তাবও উত্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: 'The Congress should not press for provincial autonomy as the country is committed to the Curtis scheme'.* এর উত্তরে চিত্তরঞ্জন বলেন, ভারতবর্ষে কেউই ঐ স্কীম গ্রহণ করে নি। বেশান্ত এর প্রতিবাদ করে বলেন, মডারেট ও ন্যাশনালিষ্ট দলের মধ্যে আপোষের ফলেই এই ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃত হয়েছিল। দাশ বলেন, 'কিন্তু এখন

---

* মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড শাসন-সংস্কারের প্রস্তাবাবলীর মধ্যে 'ডায়ার্কি' বা দ্বৈতশাসন বলে যে বিষয়টি উল্লিখিত আছে, তার প্রকৃত রচয়িতা ছিলেন Lionel Curtis; তিনি মণ্টেগু-মিশনের সময়ে একজন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক হিসাবে ভারতবর্ষে আসেন ও কংগ্রেস-লীগ নেতাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনা করেন। তিনি মণ্টেগু-মিশনের সামনেও নিমন্ত্রিত হয়ে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন। এই সাক্ষ্য প্রদানকালে তিনি ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে এদেশের উপযোগী যে ধরনের শাসনব্যবস্থার উল্লেখ করেন তা মণ্টেগুর খুব পছন্দ হয়। পরবর্তীকালে স্যার উইলিয়াম মেয়ার কার্টিস-উদ্ভাবিত ব্যবস্থাকে 'diarchy' নামে অভিহিত করেন। মডারেট ও জাতীয়তাবাদী দল উভয়েই প্রথমে লায়নেল কার্টিসের পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিলেন।

তো মডারেটরা কংগ্রেস্ ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন, কাজেই এখন ঐ চুক্তির কোন মূল্য থাকতে পারে না। আমি নিজে তখন ঐ চুক্তি মেনে নিয়েছিলাম এই আশায় যে, দল হিসাবে মডারেটরা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। কাজেই এই চুক্তি মানার কোন প্রশ্নই এখন ওঠে না'। শেষ পর্যন্ত চিত্তরঞ্জনের সুনিপুণ যুক্তিজালের সামনে কোন সংশোধনী প্রস্তাব টিকতে পারে নি। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে বাংলাদেশ থেকে যে প্রতিনিধিদল গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। দিল্লী কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জনের এই বিজয়-গৌরবের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: 'The whole discussion was about the Reforms. Deshbandhu was our leader. We were to oppose the Reforms. On the other side were ranged many distinguished personages. Mr. Das rose and by his wonderful eloquence he tore into shreds the arguments of his opponents. The victory was his.

দ্বিতীয় দিনের প্রকাশ্য অধিবেশনের একটি দৃশ্য। রাত বারোটা বেজে গিয়েছে। দিল্লীর দুরন্ত শীত। চিত্তরঞ্জন বক্তৃতা করতে উঠলেন। ঘুমের জড়তা পরিহার করে সকলেই উদ্গ্রীব ও উৎকর্ণ হলেন। বক্তৃতা নয়—অগ্নিস্রোত। অপূর্ব বাগ্মিতার সঙ্গে তিনি বিপক্ষের অর্থাৎ সংস্কার সমর্থনকারীদের যুক্তিজাল ছিন্ন করে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেন। ত্রিবাঙ্কুরের বৃদ্ধ দেওয়ান মাধবরাও সেই বক্তৃতা শুনে পরে একজন শ্রোতাকে বলেছিলেন: 'How beautifully Das fired up! I never saw anything like it.' এই বাগ্মিতা-শক্তিই তাঁকে সেদিন সর্বভারতীয় নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছিল।

নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, অমৃতসর কংগ্রেস

প্রকৃতপক্ষে গান্ধী কংগ্রেস। ঠিক তেমনি বলা যায় যে, দিল্লী কংগ্রেসে প্রকৃতপক্ষে চিত্তরঞ্জনের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়েছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নতুন শাসন-সংস্কার নিয়ে আলোচনা আসন্ন, সেজন্য একটি জয়েন্ট পার্লামেণ্টারি কমিটি গঠিত হয়েছে। ঐ কমিটিতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সাক্ষ্য প্রদান করতে কাকে পাঠানো যায়? দিল্লী কংগ্রেসের অধিবেশনের শেষের দিনে যখন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়, তখন নানা জনে নানা রকমের মত প্রকাশ করেন। কেউ বলেন, মালব্যকে পাঠালেই ভাল হয়। কারো মতে এ কাজের জন্য শ্রীনিবাস শাস্ত্রীই উপযুক্ত ব্যক্তি। বেশান্তের নামটাও এই প্রসঙ্গে উঠেছিল। সকলের মত প্রকাশ করা যখন শেষ হলো তখন চিত্তরঞ্জন উঠলেন। তিনি বললেন:

'লণ্ডনে জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারি কমিটির সামনে সাক্ষ্য প্রদান বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য আমাদের উচিত এমন একজনকে সেখানে পাঠানো যিনি স্বাধীনতালাভের জন্য, পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভের জন্য কোনোরকম আপোষের কথা কখনো চিন্তা করেন না। তেমন লোক আমাদের মধ্যে একজনই আছেন—তিনি আপনাদের সামনেই উপস্থিত আছেন। আমি লোকমান্য টিলকের কথাই বলছি। এ কাজের জন্য তিনিই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারি কমিটিতে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব তাঁর চেয়ে যোগ্যতার সঙ্গে আর কেউ করতে পারবেন কিনা সন্দেহ।'

সভামণ্ডপে উঠল তুমুল হর্ষধ্বনি ও করতালি।

এই কংগ্রেসে তাঁর সর্বশেষ বক্তব্য ছিল যে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, অন্ততঃ পনের বছরের মধ্যে, ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে—ব্রিটিশ-সরকার এই মর্মে অবিলম্বে ঘোষণা করুক। তাঁর এই প্রস্তাবও কোনপ্রকার সংশোধন ছাড়াই গৃহীত হয়েছিল।

দিল্লী কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জনের বিজয় নিশান উড়ল।

এতদিনে কংগ্রেসে এলো একটি প্রচণ্ড পরিবর্তনের লগ্ন।

একটি সমাপ্তির প্রান্তে আর একটি সভারম্ভের সময় উপস্থিত হলো। অতঃপর আমরা দেখতে পাব যে, এই পরিবর্তন ও এই আরম্ভের ভেতর দিয়ে চিত্তরঞ্জন কেমন করে ধাপে ধাপে অগ্রসর হলেন তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্যসাধনের পথে।

॥ পনেরো ॥

১৯১৯। মার্চ মাস।

ভারতের রাজনৈতিক আকাশে মেঘের পরে মেঘ জমছে।

আসন্ন হয়ে এলো একটা প্রচণ্ড কালবৈশাখীর ঝড়।

এর পটভূমিকায় ছিল ঘটনা পরম্পরার সংঘাত দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত পরাধীনতার গ্লানি ও অসহায় বেদনা। সারা দেশ তখন মণ্ট-ফোর্ড পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনায় মুখর। নেতাদের অধিকাংশই সন্দিহান ও বিক্ষুব্ধ। তারপরেই প্রকাশিত হলো রৌলট কমিটির তদন্ত-প্রতিবেদন। একে কেন্দ্র করে ধূমায়িত হতে থাকে দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও অসন্তোষের আগুন। সারা দেশেই যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আভাস পেলেন কর্তৃপক্ষ। তাঁদের উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের সীমা নেই। সরকার রৌলট বিল বিধিবদ্ধ করতে উদ্যত হলেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিল উত্থাপন করলেন (৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯) স্যার উইলিয়াম ভিন্‌সেণ্ট। ভারতীয় সদস্যগণ একযোগে জানালেন এর প্রতিবাদ।

রৌলট তদন্ত কমিটির উদ্দেশ্য ছিল: 'To investigate and report on the nature and extent of the criminal conspiracies connected with the revolutionary movement in India.' আর রৌলট কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল এই: 'The conclusion which we have arrived at being that all the conspiracies which we have investigated were directed towards one and same objective, the overthrow by force of British rule in India.' আসলে এই তদন্তের লক্ষ্য ছিল বাংলার দশ বৎসর কালব্যাপী (১৯০৬—১৯১৬) সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। রিপোর্টের সিদ্ধান্তের উপসংহারে তাই

বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছিল: 'Speaking of Bengal in particular, we are of opinion that the revolutionary outrages with which the Bengalee youths are concerned are all the outcome of a widespread but essentially single movement of perverted religion and equally perverted patriotism.'*

গান্ধী রৌলট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেছিলেন সত্য, কিন্তু বাঙালী তরুণের দেশপ্রেম সম্পর্কে এই যে অশ্রদ্ধেয় ইঙ্গিত ('perverted patriotism')-এর কোন প্রতিবাদ তিনি করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। দেশবন্ধুও করেন নি। এখানে উল্লেখ্য যে, লর্ড রোনাল্ডশে স্বয়ং বাংলার বিপ্লববাদের উৎপত্তি ও কারণ বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন, যা উচ্চপদস্থ আর কোন ইংরেজ রাজপুরুষ করেন নি।

ঠিক এই সময়ে সবরমতীর নিভৃত আশ্রম থেকে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন ভারতের নতুন নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। প্রথমে তাঁর কণ্ঠে প্রতিবাদ শোনা গেল: 'রৌলট আইন ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও মানুষের জন্মগত স্বাভাবিক স্বাধীনতার পরিপন্থী।' প্রতিবাদের পর এলো তাঁর ঘোষণা—একটি চমকপ্রদ ঘোষণা (২৪শে ফেব্রুয়ারি): 'যদি এই বিল প্রত্যাহৃত না হয় তাহলে এর প্রতিবাদে শুরু হবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন বা সত্যাগ্রহ।' মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিল পাস হয়ে গেল। একটি মারাত্মক আইনের নাগপাশে নিষ্পেষিত হয় অসহায় ভারতবাসীর কণ্ঠ। ঝড় উঠতে আর বিলম্ব হলো না। সমগ্র দেশে একটা বিস্ফোরণ ঘটতে আর দেরি হলো না। শাসকের সদিচ্ছার স্বরূপ দেখে ভারতবাসী হয় বিক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট। এক হাত দিয়ে যা দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি

* *The Rowlatt Report*

দেওয়া হয়েছিল 'মন্ট-ফোর্ড' রিপোর্টে, অন্য হাত দিয়ে তা ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থার জন্য রচিত হয় রৌলট আইন। এই প্রসঙ্গে হাচিনসন্ ঠিকই মন্তব্য করেছেন :

'To Indians it seemed clear that the contrast between the Montagu-Chelmsford proposals and the Rowlatt Bills was the contrast between the shadow and the reality. Such repressives measures showed quite clearly the exact amount of Self-Government India was to obtain........The Rowlatt Acts only precipitated a revolt which was inevitable after the blow struck at nationalist hopes by the Montagu-Chelmsford Reforms *

রৌলট আইনটা যে মন্দ, এ অভিযোগ শুধু ভারতবাসীর ছিল না, উদারনৈতিক ভাবাপন্ন বহু ইংরেজও এই অভিমত পোষণ করতেন এবং তাঁরাও এটাকে একটা প্রকাণ্ড ভুল ('A colossal blunder') বলে মনে করেছিলেন। গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। দেশ তখন সংগ্রামের জন্য অধৈর্য হয়ে উঠেছে, গান্ধী সংগ্রামের ডাক দিয়ে পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে সূচিত হয় এক নতুন অধ্যায়। তখন গোখেলের মৃত্যুতে (১৯১৫) সর্বভারতীয় নেতার সিংহাসন একপ্রকার শূন্য ছিল বললেই হয়। ইতিহাস-বিধাতা বুঝি কটিবাস-পরিহিত এক অর্ধনগ্ন ফকিরকে সেই শূন্য সিংহাসনের উপযুক্ত বিবেচনা করলেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই গান্ধীর করায়ত্ত হয়।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য গান্ধী যে প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করেছিলেন এবং যে প্রতিজ্ঞাপত্রে সত্যাগ্রহীকে স্বাক্ষর করতে হতো,

* *The Empire of the Nabobs* : Hutchinson.

সেটি পাঠ করে চিত্তরঞ্জন সর্বপ্রথম গান্ধীর প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন। কথিত আছে, এই সময়ে তাঁর এক সহকর্মীকে তিনি বলেছিলেন :

'যাঁর কাছে সত্য ও অহিংসা শুধুমাত্র একটি নীতি হিসাবে বিবেচ্য নয়, পরন্তু ইহা বিশ্বাসের বিষয় বলে স্বীকৃত হয়েছে, তিনি নিশ্চয়ই একজন সত্যিকার বিপ্লবী। যিনি পাশবশক্তির বিরুদ্ধে শুধুমাত্র তাঁর নৈতিক বল নিয়ে দাঁড়াতে পারেন তাঁকে আমি একজন বিপ্লবী বলেই মনে করি। সত্যাগ্রহের যে অভিনব প্রতিজ্ঞাপত্রটি তিনি রচনা করে প্রচার করেছেন সেটিকে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলিল বলেই মনে করি। তিনি সর্বতোভাবেই আমাদের মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব করার যোগ্য মানুষ।'

এই ছিল সেদিন গান্ধী সম্পর্কে চিত্তরঞ্জনের প্রথম উক্তি।

গান্ধী যখন সত্যাগ্রহের জন্য আবেদন জানালেন, সে আবেদন চিত্তরঞ্জনের হৃদয়তন্ত্রীতে এক নতুন মূর্ছনা জাগিয়ে তুলল। তিনি সে আহ্বানে সাড়া দিলেন। কাজ করবার, আন্দোলন করবার একটা পথ পেলেন তিনি। গান্ধীর মতো তিনিও ভারতের জনমত উপেক্ষা করে রৌলট বিল পাস হওয়ার দরুণ মর্মাহত হয়েছিলেন। তাঁর ভাবপ্রবণ চিত্ত গান্ধীর সত্যাগ্রহ বাণীর মধ্যে যেন আশার আলোক দেখতে পেয়েছিল। ৬ই এপ্রিল, রবিবার। আর কলকাতায় মনুমেণ্টের পাদদেশে এক সভার আয়োজন হয়েছে। বিরাট জনসমাবেশ। সেদিন উপবাসী চিত্তরঞ্জন সেই সভায় যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা শুনে অনেকের মনে হয়েছিল যে তিনি গান্ধীর ভাবধারায় পরিস্নাত হয়েছেন। তাঁর সেই বক্তৃতার কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম :

'আজ মহাত্মা করমচাঁদ গান্ধীর দিন। আজ বাঙালীর হৃদয়বেদনা প্রকাশের দিন। আনন্দের দিনে আমরা আত্মহারা হয়ে যাই, কিন্তু দুঃখের দিনে ভগবানের বাণী শুনতে পাই। সত্যাগ্রহ প্রেমের ফল। যদি কেউ স্বদেশীকে ভালবাস, স্বজাতিকে ভালবাস তবে মুক্তকণ্ঠে বলতে পারবে— নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য। এই আন্দোলন প্রেমের আন্দোলন, ধর্মের

আন্দোলন। এ ইংরাজী রাজনীতি-প্রসূত নয়। গান্ধীজি বলেছেন, সত্যাগ্রহী একজন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারী। সে জানে আইন সমাজের কল্যাণের জন্য। কিন্তু সে এও জানে যে, কখনো কখনো এমন আইন রচিত হতে পারে যা ন্যায়সঙ্গত নয় এবং যা মান্য করা অসম্মানজনক। তেমন আইনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শান্তভাবে দাঁড়ান কর্তব্য। রৌলট আইন তেমনি একটি আইন।'

তাঁর এই বক্তৃতায় ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীর অভ্যুদয়ের প্রথম শঙ্খধ্বনি শোনা গিয়েছিল। চম্পারণ সত্যাগ্রহের সময়ে চিত্তরঞ্জন গান্ধীর প্রতি অথবা তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের প্রতি এতখানি আকৃষ্ট হয় নি, এখন যেমন তিনি হলেন। অবশ্য এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনও ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল, তথাপি ভারতের আগামী দিনের দুই মহান্ নেতাকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্য সেদিন বোধ হয় এর প্রয়োজন ছিল। তবে নাগপুর কংগ্রেস অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ কাউকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারেন নি। রৌলট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করার আরো গূঢ় কারণ ছিল। শাসকের সদিচ্ছার উপর গান্ধী সেদিন বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। তিনি যে যুদ্ধের সময়ে বিনাশর্তে ইংরেজের যুদ্ধপ্রয়াসকে সমর্থন করেছিলেন কিন্তু তার পুরস্কার কি এই দমনমূলক আইন? তাঁর এই স্বপ্নভঙ্গের ফলেই গান্ধী সমগ্র দেশে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করার কথা ঘোষণা করেন।

৬ই এপ্রিল, রবিবার।

সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হলো।

সারা ভারতবর্ষ গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিল। সর্বত্রই আন্দোলন উপবাস, প্রার্থনা, হরতাল ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের রূপ নিয়েছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন কংগ্রেসের সংগঠন বলতে বিশেষ কিছু ছিল না, তথাপি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলন আশ্চর্যভাবেই জাতির প্রাণে একটা প্রবল

উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। নির্দিষ্ট দিনে সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং সর্বত্র এক অভূতপূর্ব হরতাল প্রতিপালিত হয়। সুদূর গ্রামেও কৃষক তার হলচালনা থেকে বিরত ছিল। সংবাদপত্রে সে-সব বিবরণ পাঠ করে বড়লাট যারপরনাই বিস্মিত হলেন। রাজধানী দিল্লীতেই সত্যাগ্রহের সফলতা চূড়ান্তভাবে দেখা গিয়েছিল, যদিও এখানে কিছু গোলমাল হয়েছিল যার ফলে পুলিশকে গুলিচালনা করতে হয়।

হঠাৎ ঘটনাস্রোত অন্যদিকে মোড় নিল।

দিল্লীতে শোভাযাত্রাকারী জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয় এবং বহুলোক হতাহত হয়। কলকাতা, অমৃতসর, বোম্বাই ও আমেদাবাদেও বিক্ষুব্ধ শোভাযাত্রাকারীদের ওপর গুলি চলে। গান্ধী স্বভাবতঃই বিব্রতবোধ করলেন। পাঞ্জাব ও দিল্লীর অবস্থা শান্ত ও নিয়ন্ত্রিত করবার উদ্দেশ্যে তিনি বোম্বাই থেকে দিল্লীর পথে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি আটক হন এবং তাঁকে একরকম জোর করেই বোম্বাইয়ে ফিরিয়ে আনা হয় (৯ই এপ্রিল)। সারা দেশে রাষ্ট্র হলো গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সে সংবাদ যেন বিস্ফোরণের কাজ করল—দেশবাসী ক্রোধে ফেটে পড়ল। আন্দোলন তখন সম্পূর্ণভাবে জনতার হাতে চলে গেল। পুলিশের দমননীতি তাদের উত্তেজনায় ইন্ধন যোগাল।

আন্দোলন চূড়ান্ত আকার ধারণ করল পাঞ্জাবে। ১০ই এপ্রিল সকালে অমৃতসরে পাঞ্জাবের দু'জন জনপ্রিয় নেতাকে—ডাঃ কিচলু ও ডাঃ সত্যপাল—গ্রেপ্তার করে কোন এক অজ্ঞাত স্থানে অন্তরীণ করা হয়। মুহূর্তে সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ে সারা শহরে। বিক্ষুব্ধ জনতা ম্যাজিস্ট্রেটের আবাসস্থল ঘেরাও করে নেতাদের মুক্তি দাবী করল। গুলিবর্ষণের ভেতর দিয়ে তারা পেল তার জবাব। ফলে জনতা আরো ক্রুদ্ধ, আরো অসংযত হয়ে ওঠে। অমৃতসর, কাসুর ও গুজরানওয়ালায় পুলিশের সঙ্গে জনতার বাধে তুমুল সংঘর্ষ। স্যার

মাইকেল ও' ডায়ার তখন পাঞ্জাবের গভর্ণর। তিনি কঠোরহস্তে এই আন্দোলন দমনে বদ্ধপরিকর হন। সরকারের দমননীতি তার সমস্ত নৃশংসতা নিয়ে এবার আত্মপ্রকাশ করতে উদ্যত হয়। ১০ই এপ্রিল সমগ্র পাঞ্জাবে ঘোষিত হলো সামরিক আইন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার সমস্ত সংবাদ প্রেরণ ও প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়—নেমে আসে কৃষ্ণ যবনিকা পঞ্চনদের বুকে। ভারতবর্ষের মানচিত্রে তখন কিছুদিনের জন্য পাঞ্জাবের কোন অস্তিত্ব ছিল না বললেই হয়।

দিল্লী, বোম্বাই ও পাঞ্জাবের এই বিস্ফোরক অবস্থায় গান্ধী গভীরভাবে চিন্তা করলেন, এখন কি করা যায়? 'হিংসাত্মক কার্যের ফলে এখন যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তাতে আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই সত্যাগ্রহ করা উচিত'—এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হলেন। কিন্তু আন্দোলন তখন জনতার হাতে। এর পরের ঘটনা জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। বৈশাখের নববর্ষের দিন (১৩ই এপ্রিল) যে পৈশাচিক বর্বরতা জেনারেল ও' ডায়ারের নেতৃত্বে সেদিন অমৃতসরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, পৌনে দুশো বছরের ইংরেজ শাসনকালে এদেশে তেমন বেদনাদায়ক ঘটনা বুঝি আর কখনো ঘটে নি। সে ইতিহাস সুপরিচিত এবং এখানে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, জালিয়ানওয়ালাবাগ ভারতে ইংরেজ রাজত্বের কলঙ্ক হয়ে আছে।

আরম্ভ হওয়ার পর পাঁচ দিনের মধ্যেই আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেল। গান্ধী বুঝলেন (অবশ্য রবীন্দ্রনাথের চিঠি পাওয়ার পর) 'লোকের মনকে অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত না করে, এভাবে অহিংস প্রতিরোধের আন্দোলন নিষ্ফল—পদে পদে অনর্থের ও সমস্যার সৃষ্টি হবে।' এখানে উল্লেখ্য যে, পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডে মর্মাহত হয়ে তার প্রতিবাদ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ সেদিন শাসকের দেওয়া মানের মুকুট—'নাইট' উপাধি ছুঁড়ে ফেলে যে সাহস দেখিয়েছিলেন, আমাদের মুক্তি

সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তেমন সাহস খুব কম নেতাই দেখাতে পেরেছেন। সেদিনের সেই ঘোর দুর্যোগের অন্ধকারে দেশবাসীর সমস্ত অপমান ও লাঞ্ছনার কালিমা সবটুকুই কবি যেন একাই দু'হাতে মেখেছেন। এই একটিমাত্র প্রতিবাদের মাধ্যমে সমগ্র জাতি যেন বিশ্বের দরবারে বিচার ও প্রতিকার চেয়েছে। শুধু কি তাই? কবির এই একটিমাত্র নির্ভীক আচরণের ফলে সমগ্র জাতি যেন তার হৃত আত্মসম্মান ফিরে পেয়েছিল—পেয়েছিল সেই সাহস আর বিশ্বাস সেদিন যার প্রয়োজন ছিল।

আর অন্যদিকে পাঞ্জাবের এই বিয়োগান্ত ঘটনায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতার মনে কি রকম ভাবের সঞ্চার হয়েছিল? গান্ধীর প্রধান জীবনীকার টেণ্ডুলকর এই সময়কার যে-সব বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে দেখা যায় যে, গান্ধী এইসব ঘটনায় ইংরেজ-সরকারের অত্যাচার অপেক্ষা দেশের জনসাধারণের হিংসাত্মক ও বিশৃঙ্খল কার্যকলাপের জন্যই যেন বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। আন্দোলন তো প্রত্যাহৃত হলোই, পরন্তু সেই সঙ্গে আত্মসমালোচনা ও ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করে তিনি ইংরেজের কোন দোষ দেখতে পেলেন না—বরং এই অরাজকতা দমনে সত্যাগ্রহীকে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্য উপদেশ দিলেন। প্রকারান্তরে তাঁর স্বদেশবাসীই সেদিন তিরস্কৃত হয়েছিল গান্ধীর কাছে। তাঁর এই বিসদৃশ আচরণ বিচার্য। বিচার্য আরো একটি কারণে। গান্ধীর আত্মসমালোচনার সুযোগ নিয়ে চেমস্‌ফোর্ডের গভর্ণমেণ্ট কিভাবে দেশবাসীর সংগ্রামের আগ্রহ ও তাদের নৈতিক মনোবলকে ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন, সে-সব ইতিহাস সুপরিচিত। তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে একটি 'হিমালয় সদৃশ ভুল'—এই বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করার পরে সেই দারুণ দুর্দিনে দেশবাসী তাদের নেতার হাতে এইভাবে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার লাভ করার ফল এই দাঁড়াল যে, তারা আপাততঃ অনেকখানি ম্রিয়মাণ ও হতাশ হয়ে গেল।

পাঞ্জাবের মর্মন্তুদ ঘটনায় গান্ধী যে বিন্দুমাত্র বিচলিতবোধ করেন নি তার প্রমাণ তাঁর নিজের মুখের সেই কথা—'এই অবস্থায় আমি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে বিব্রত করতে চাই না।' এই কথা তিনি বলেছিলেন এণ্ড্রুজ সাহেবকে যখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে গান্ধীর কাছে পাঠিয়েছিলেন সরকারী আদেশ অমান্য করে অমৃতসর যাওয়ার প্রস্তাব করে। মোটকথা পাঞ্জাবের দুঃখের তাপ যখন কবির বুকের পাঁজর গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, তখন সেই পৈশাচিক দলননীতির সম্মুখে আন্দোলনের নেতা আত্মসমর্পণ করে নিরস্ত হলেন এবং প্রচণ্ড উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন।

আসল কথা, আন্দোলন যখন ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে একটা সংঘবদ্ধ বিপ্লবের রূপ নিতে উদ্যত হলো, গান্ধী তখন রীতিমতো শঙ্কিত হলেন। একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের মতে: 'Gandhi took alarm at the situation which was developing. Accordingly he called off the movement at the moment it was beginning to reach its height.'* আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার মাত্র কয়েকদিন পরে তা বন্ধ করে দেওয়ার কারণ হিসাবে গান্ধী অবশ্য একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন যে, সত্যাগ্রহীর পক্ষে সরকারকে বিব্রত করা কখনই উচিত নয়। কিন্তু তাঁর নিজের রচিত সত্যাগ্রহের শপথ-বাক্য আর এই বিবৃতি পরস্পর-বিরুদ্ধ বললেই হয়।

চিত্তরঞ্জন কিন্তু এইভাবে আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন না। মৈমনসিংহে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীতে (মে, ১৯১৯) তিনি সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব আনেন ও বিষয়-নির্বাচনী কমিটি দ্বারা তিনি সেটি পাস করিয়ে নেন। এই সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করেছিলেন চট্টগ্রামের বর্ষীয়ান জননায়ক যাত্রামোহন সেনগুপ্ত। প্রকাশ্য অধিবেশনে তাঁর সত্যাগ্রহ প্রস্তাব

* *India Today :* Palme Dutt.

গৃহীত হয় নি। কথিত আছে, এই সময়ে চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন, এরকম রেজোলিউসন তো গত ত্রিশ বছর ধরে পাস হয়ে আসছে, এতে কিছু হবে না। একটা কিছু করতে হবে। সত্যাগ্রহ আন্দোলন সেই একটা কিছু করার সুযোগ নিয়ে এলো বটে, কিন্তু সেটা যে এমনভাবে এত শীঘ্র বন্ধ হয়ে যাবে, এটা তাঁর ধারণার বাইরে ছিল। সত্যাগ্রহ করে চিত্তরঞ্জন জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিন্তু দুই-একজন ভিন্ন আর কেউ তাঁকে সমর্থন করেন নি। মৈমনসিংহ থেকে কলকাতায় ফিরে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে যোগদান করবার জন্য বোম্বাই যাত্রা করেন।

ভারত-সরকার তখন পাঞ্জাবের ঘটনাবলী তদন্ত করবার জন্য 'হাণ্টার কমিশন' নামে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেছেন। কংগ্রেস থেকে ঐ কমিশন বর্জিত হয় এবং গান্ধীকে সভাপতি করে একটি পৃথক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন, ডক্টর জয়াকর ও আব্বাস তায়েবজী—এই কয়জন ছিলেন কংগ্রেস তদন্ত কমিটির সভ্য। চিত্তরঞ্জন তদন্ত-কার্যে মন ঢেলে দিলেন এবং নিজের আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে দীর্ঘকাল তিনি এই কার্যব্যাপদেশে লাহোরে অবস্থান করেছিলেন। গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন —এই দু'জন নেতা এই প্রথম পরস্পরের সান্নিধ্যে আসেন। তদন্ত কার্যে চিত্তরঞ্জন যেভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা দেখে গান্ধী ও কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ মুগ্ধ হন। এই তদন্ত-কার্য চলেছিল সাড়ে তিনমাস কাল। এই সময়ে চিত্তরঞ্জন নিজের পকেট থেকে খরচ করেছিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। তাঁর এই সময়কার দৈনন্দিন জীবনের ধরন-ধারণ দেখে গান্ধী বলেছেন যে, 'দেশবন্ধু থাকতেন রাজার হালে।' বস্তুতঃ, কংগ্রেস তদন্ত কমিটির সমগ্র ব্যয়ভারটা সেদিন একা চিত্তরঞ্জনই বহন করেছিলেন।

চিত্তরঞ্জন তাঁর সমস্ত প্রতিভা ও শ্রম নিয়োগ করেছিলেন গুরুত্ব-

পূর্ণ এই তদন্ত-কার্যে। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত যাবতীয় সাক্ষ্য-প্রমাণের বিশ্লেষণে তিনি যেমন অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, তেমন অপূর্ব যুক্তিজালের সঙ্গে সামরিক আইনের প্রয়োগ যে অন্যায় হয়েছিল তাও উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এই তদন্ত-কার্যে তিনি সকল বিষয়ে গান্ধীর সঙ্গে একমত হতে না পারলেও মেজরিটির সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন। কংগ্রেস তদন্ত কমিটির রিপোর্টটি খুবই মূল্যবান। চেমস্‌ফোর্ডের পদত্যাগ, জেনারেল ডায়ারের পদচ্যুতি ও বিচার, রৌলট আইন প্রত্যাহার ও সামরিক আইনে প্রদত্ত জরিমানা প্রত্যর্পণ —রিপোর্টে বিশেষভাবে এই কয়টি বিষয় দাবী করা হয়। বলা বাহুল্য, ভারত-সরকার এই রিপোর্ট অগ্রাহ্য করেন এবং পক্ষান্তরে হাণ্টার কমিশনের রিপোর্ট যথাক্রমে ভারত-সরকার ও বিলাতে ভারতসচিব কর্তৃক গৃহীত হয়।

॥ ষোলো ॥

দেশব্যাপী এক বিক্ষুব্ধ ও অশান্তিময় পরিবেশেই ১৯১৯-এর ২৪শে ডিসেম্বর সম্রাটের সম্মতিক্রমে প্রবর্তিত হলো নতুন ভারত-শাসন আইন (the Government of India Act, 1919) এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষ শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এক নতুন পদক্ষেপ করল। ভারতসচিব মণ্টেগু ভারতবাসীর উদ্দেশে এই মর্মে এক আবেদন জানালেন যে, তাঁরা যেন এই নতুন শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি আরো আশ্বাস দিলেন যে, উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তিপ্রদান করা হবে।

এই পটভূমিকাতেই অমৃতসর কংগ্রেস।

নতুন ভারত-শাসন আইন প্রবর্তিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই নিরস্ত্র ভারতবাসীর রক্তে রঞ্জিত, ডায়ারী হত্যাকাণ্ডের সেই মর্মন্তুদ স্মৃতিবিমণ্ডিত অমৃতসরেই কংগ্রেসের ৩৪তম অধিবেশনের আয়োজন হয়। গুরুত্বপূর্ণ এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য প্রথমে টিলকের নাম প্রস্তাবিত হয়, কিন্তু তিনি সম্মত হন না। তখন মতিলাল নেহরুকে অমৃতসর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন করা হয় আর অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত হন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। কারো প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করেও আমরা বলতে পারি যে, কংগ্রেসের নেতা হিসাবে আমরা অনেককেই পেয়েছি, কিন্তু টিলকের মতো বা মদনমোহন মালব্যের মতো বোধ হয় আর কাউকে পাই নি। এঁদের উভয়ের নেতৃত্বের মধ্যে যে নিটোল সম্পূর্ণতা (wholeness) পরিলক্ষিত হয়, তা আর কারো মধ্যে দেখা যায় নি। জাতির দুর্ভাগ্য, সেই লোকমান্য টিলক (কংগ্রেসের সঙ্গে যিনি ১৮৮৯ সাল থেকে যুক্ত ছিলেন) কংগ্রেসের সভাপতির

পদে কখনো নির্বাচিত হন নি। এজন্য দেশবন্ধুর মনে একটা বিশেষ ক্ষোভ ছিল বলে জানা যায়। 'ওরা লোকমান্যকে কখনো একবার প্রেসিডেন্ট করল না, এটা কংগ্রেসের পক্ষে অগৌরবের কথা' —এই কথা তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের কাছে প্রায়ই বলতেন।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে যেমন, এর শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসেও তেমনি কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনের গুরুত্ব অনেক দিক দিয়েই ছিল। তাই শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এক যুগসন্ধিক্ষণে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনটির প্রতি ভারতবাসীর যেমন শাসকবর্গেরও তেমনি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে নতুন ভারত-শাসন অধীন সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে, সেজন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তথা ভারতসচিবের উদ্বেগ বড় কম ছিল না। অধিবেশনের কিছু পূর্বেই রাজকীয় ঘোষণায় মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার যথারীতি অনুমোদন করা হয় ও কারারুদ্ধ নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শাসকবর্গ এবার তখন থেকেই যেন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, কংগ্রেসের নেতৃত্ব এবার গান্ধীর হাতে আসবে। মডারেটরা যদিও নতুন রিফর্ম গ্রহণের অনুকূলেই মত প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁরা নতুন রিফর্ম পরীক্ষা করতেও সম্মত ছিলেন তথাপি তাঁরা তো সংখ্যালঘিষ্ঠ, তাছাড়া জনসাধারণের উপর তাদের প্রভাব বলতে তখন বিশেষ কিছু ছিল না। এমন অবস্থায় কংগ্রেস তথা গান্ধীর উপরেই শাসকগোষ্ঠীকে ভরসা করতে হলো।

কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় সকলেই এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, যথা—টিলক, বিপিনচন্দ্র, মালব্য, গান্ধী, চিত্তরঞ্জন এবং সদ্যকারামুক্ত আলি ভ্রাতৃদ্বয়, ডাঃ কিচলু, সত্যপাল, লালা হরকিষণলাল, পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। গুরুত্বপূর্ণ এই অধিবেশনে মডারেট নেতাদের উপস্থিত বাঞ্ছনীয় মনে করলেন মতিলাল নেহরু এবং নির্বাচিত সভাপতি হিসাবে তিনি তাঁদের উদ্দেশে আহ্বান

জানালেন এই মর্মস্পর্শী ভাষায়: 'The lacerated heart of the Punjab calls to you to come back.' মডারেটরা কিন্তু এই আবেদনে সাড়া দিলেন না, কারণ তাঁরা ইতিপূর্বেই নতুন শাসন-সংস্কার নিয়ে কাজ করবেন সিদ্ধান্ত করেছেন। নতুন রিফর্ম আইন গৃহীত হবে কিনা—এইটাই ছিল অমৃতসর কংগ্রেসের সামনে প্রধান প্রশ্ন। গান্ধীর বিবেচনায় রিফর্ম গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল এবং তিনি এই বিষয়ে তাঁর অভিমত প্রকাশ করে লিখলেন: 'I welcome the Royal proclamation announcing the assent to the Government of India Act, 1919. The Reforms Act coupled with the proclamation is an earnest of the intention of the British people to do justice to India and it ought to remove suspicion on that score. Our duty therefore is not to subject the Reforms to carping criticism but to settle down quietly to work so as to make them a success.'*

চিত্তরঞ্জন এর বিরোধিতা করে বিষয়-নির্বাচনী সভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। সেই প্রস্তাবে বলা হলো: 'The Reforms are inadequate, unsatisfactory and disappointing.' এবং আরো বলা হলো যে, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসারে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা ভারতে প্রবর্তন করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যেন অবিলম্বে ব্যবস্থা করেন। টিলক ও বিপিনচন্দ্র এই প্রস্তাব সমর্থন করেন ও বিষয়-নির্বাচনী সভায় উহা গৃহীত হয়। অমৃতসর কংগ্রেসে যে মূল প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়েছিল সেটি রচনা করেন চিত্তরঞ্জন স্বয়ং। তিনটি অনুচ্ছেদ-সম্বলিত সেই প্রস্তাবটি এই:

'1. That the Congress reiterates its declaration

---

* *Young India*: Dec. 31, 1919

of last year that India is fit for full Responsible Government and repudiates all assumptions and assertions to the contrary. 2. That this Congress adheres to the Resolution passed at the Delhi Congress regarding Constitutional Reforms and is of opinion that the Reforms Act is inadequate, unsatisfactory and disappointing. 3. That this Congress further urges that Parliament should take early steps to establish full Responsible Government in India in accordance with the principle of Self-Government.'

এই অপূর্ব মুসাবিদাটির ছত্রে ছত্রে যেন আভাসিত হয়েছে চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্ব-প্রতিভা। বোঝা গেল, এইবার তিনি দুর্দমনীয় তেজে কংগ্রেসে প্রবেশ করলেন এবং স্বীয় মতবাদ নিয়ে কংগ্রেস-মণ্ডপে সুদৃঢ় পর্বতের মত দাঁড়ালেন। তাঁর উপস্থিতি এবারে লোকে যেমন করে অনুভব করল এমন বুঝি আগে কখনো করে নি। পাঞ্জাবের নৃশংস ঘটনাবলী, রৌলট আইন, গ্রহণের অনুপযুক্ত নতুন শাসন-সংস্কার—এই তিনটি বিষয়ই তাঁর ভাবপ্রবণ চিত্তে যে তুমুল আলোড়ন জাগিয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। স্বাদেশিকতা তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছিল। বুঝলেন এবার ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যপট পরিবর্তিত হওয়ার দিন সমাগত। ইতিহাসের দিগন্তে যেন তারই ইঙ্গিত। আকাশে-বাতাসে ও জনচিত্তে একটা নতুন উন্মাদনা পুঞ্জীভূত। এবার ঝড় উঠবেই—নতুনের কেতন উড়বেই। একে বাধা দেওয়া যাবে না কিছুতেই। এইবার তিনি মনে মনে সংকল্প করলেন—সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। তাঁর অমৃতসর কংগ্রেসে যোগদান ও এর মূল প্রস্তাব রচনায় এবং উত্থাপনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ থেকেই বুঝা গিয়েছিল যে, ভবিষ্যতে

দেশের কাজে সম্পূর্ণভাবে যে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, এ ছিল তারই শুভযাত্রা।

প্রস্তাবের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। চিত্তরঞ্জনের মূল প্রস্তাবটির উপরে গান্ধী একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাতে 'নৈরাশ্য-জনক' শব্দটি বর্জন করে বলা হলো: 'This Congress begs loyally to respond to the sentiments in the Royal Proclamation and trust that both the authorities and the people will co-operate so to work the Reforms as to assure the early establishment of full Responsible Government.' গান্ধীর সংশোধনী প্রস্তাবে ভারতসচিব মণ্টেগুর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কথাও ছিল। টিলকের অভিমত অবশ্য ছিল এই দুয়ের মাঝামাঝি। মূল প্রস্তাবে বর্ণিত শাসন-সংস্কার সম্পূর্ণ বর্জন করার পক্ষে তিনি যেমন ছিলেন না, তেমনি গান্ধীর সম্পূর্ণ সহযোগিতার স্বপক্ষেও তিনি ছিলেন না। তাঁর কথা ছিল: 'responsive co-operation' এবং হোমরুল লীগের পক্ষ থেকে বড়লাট ও ভারতসচিবের মারফত তারযোগে সেই কথা-ই তিনি ইংলণ্ডে সম্রাটকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ সহকারে পূর্বাহ্লেই জানিয়ে দিয়েছিলেন।

টিলকের এই তারবার্তার সংবাদ যখন সংবাদপত্রের বিবরণে জানা গেল তখন জাতীয়তাবাদী দলে দেখা দিল তুমুল চাঞ্চল্য। কংগ্রেসের অধিবেশনের ঠিক একদিন আগে চিত্তরঞ্জন কলকাতা থেকে সদলে অমৃতসরে এসে পৌঁছলেন। এসেই তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, 'লোকমান্য যখন সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছেন, আমি তাঁকে বাধা দিতে বাধ্য।' স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তখন সকলকে অনুরোধ করলেন যে, তাঁরা যেন অধৈর্যভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেন এবং এই বিষয়ে লোকমান্যের অভিমত তাঁর মুখে শুনে তবেই যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মধ্যপন্থী টিলক

উভয় সংকটে পড়লেন, সংস্কার-বিরোধী ও সংস্কার-সমর্থক—এই দুই দলের কাছেই তাঁকে তাঁর 'responsive co-operation'-এর ফরমুলাটি বুঝিয়ে দিতে হলো। টিলকের বক্তব্য শেষ হলে গান্ধী উঠলেন ও তিনি তাঁর বক্তব্য রাখলেন এইভাবে: 'গ্রহণ বা বর্জন যেটাই আমরা করি না কেন, সে কথাটা সত্য করে, স্পষ্ট করে দেশের লোককে বলা উচিত। কিন্তু গ্রহণ ও বর্জনের প্রশ্নে আমি শুধ্ এইটুকু নিবেদন করব যে, ভারতীয় সংস্কৃতি আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, যেখানে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত সেখানে বিশ্বাস করা কর্তব্য।'

টিলকের পারস্পরিক সহযোগিতা চিত্তরঞ্জন একেবারে অপছন্দ করেন নি। কারণ এই প্রসঙ্গে অমৃতসর কংগ্রেসেই এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন: 'Co-operation when necessary to advance our cause, but obstruction when that is necessary to advance our cause.' তিনি স্বয়ং এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

তর্কবিতর্কের পর বিষয়-নির্বাচনী সভার সামনে প্রশ্ন দাঁড়াল: মূল প্রস্তাবটির বয়ান তাহলে কি রকম হবে? বেশান্ত, টিলক ও গান্ধী—তিনজনে তিন রকম বয়ান রাখলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঙ্গে যাতে জাতির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়, সেইভাবে প্রস্তাবের বয়ান হওয়া উচিত—এই ছিল অধিকাংশের অভিমত। এই নিরিখে বিচার করে দেখা গেল যে, শেষ পর্যন্ত টিলকের বয়ানটিই গ্রহণযোগ্য, কারণ 'Tilak's resolution was a unique combination of grace with dignity, mellowed by a reasonable expression of gratitude.'*

চিত্তরঞ্জন কিন্তু গান্ধীর সংশোধনী প্রস্তাবে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হলেন (তাঁর নিজের কথা: 'It was a sort of climb down.') ও এর প্রবল

* *Life of B. G. Tilak* : D. V. Athalye

বিরোধিতা করেন। তাঁর বিবেচনায় কংগ্রেসের পক্ষে এই শাসন-সংস্কার সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে তার পরিবর্তে একটা নতুন ভারত-শাসন আইন দাবী করাই উচিত ও সঙ্গত। টিলক চিত্তরঞ্জনের এই মত সমর্থন করেছিলেন বলে জানা যায়। গান্ধীকে সমর্থন করলেন মদনমোহন মালব্য ও মহম্মদ আলি জিন্না। পুরো দু'দিন ধরে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হলো। শেষ পর্যন্ত নেতৃবর্গ একটা আপোষে এলেন। মূল প্রস্তাবের অন্তর্গত 'inadequate, unsatisfactory and disappointing'—এই বিশেষণ তিনটি বজায় রেখে বলা হলো যে, যতদিন পর্যন্ত পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত না হচ্ছে কংগ্রেস যতদূর সম্ভব পরিপূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার গঠনের আশায় ততদিন এই শাসন-সংস্কার মেনে নিয়ে সেইমত কাজ করবে এবং এজন্য এই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মাননীয় ই. এস. মণ্টেগুকে রিফর্মস্ সংক্রান্ত তাঁর পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হচ্ছে।'

এই প্রসঙ্গে গান্ধী তাঁর আত্মজীবনীতে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন অনুসন্ধিৎসু পাঠক তা পাঠ করে দেখতে পারবেন। তবে নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে, অমৃতসর কংগ্রেসে গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন উভয়েই জয়লাভ করেছিলেন। এই অধিবেশনেই টিলককে শেষবারের মতো দেখা গেল এবং বিষয়-নির্বাচনী সভায় মূল প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে গান্ধী যখন সত্যের দোহাই দিচ্ছিলেন, এবং বার বার বলছিলেন যে ভারতের রাজনীতি সত্যভিত্তিক হওয়া দরকার, তখন লোকমান্য টিলক গান্ধীর দিকে তাকিয়ে এই মন্তব্যটি করেছিলেন: 'My friend! truth has no place in politics.'* ভারতবর্ষের সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি যারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন অথবা আলোচনা করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, গান্ধী

* *Lokmanya Tilak* : Pradhan and Bhagat

ও টিলক উভয়ের উক্তিই ঠিক। রাজনীতিতে সময় বিশেষে সত্যের প্রয়োজন হয়, আবার সময় বিশেষে হয় না—কৌটিল্যের এই উক্তিটি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

এই সময়ে খিলাফতের প্রশ্নটি গান্ধীকে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন করে তোলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তুরস্ক মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে এবং জার্মান ও অষ্ট্রিয়ার পক্ষ নিয়ে সংগ্রাম করেছিল। ভারতের মুসলমানগণ যুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিকে সমর্থন করেছিল এই আশ্বাসে যে, যুদ্ধান্তে তুরস্কের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। কিন্তু এই আশ্বাস অনুযায়ী কাজ করা তো হয়ই নি বরং যুদ্ধশেষে দেখা গেল যে, মিত্রশক্তি তুরস্ককে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করতে উদ্যত হয়েছেন; এমন কি রাজধানী কনস্তান্তিনোপলকে এশিয়া মহাদেশে স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব হয়। মুসলমানদের বহু পবিত্র স্থান খ্রীষ্টানদের অধিকারে চলে যায়। এইসব ঘটনার ফলেই ভারতের মুসলমানগণ সেদিন বিশেষভাবে উত্তেজিত হয়। তাদের এই উত্তেজনারই ফলশ্রুতি হলো ভারতে খিলাফৎ আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন আলি ভ্রাতৃদ্বয়—সৌকত আলি ও মহম্মদ আলি, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, হাকিম আজমল খাঁ এবং আরো অনেকে। ১৯২০, ৩০শে মে নিখিল ভারত খিলাফৎ সম্মেলনে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করা হবে—এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধী খিলাফৎ সমর্থন করলেন এবং তুরস্কের প্রতি যাতে ন্যায় বিচার হয় সেজন্য বড়লাটকে এক পত্র লিখলেন। গান্ধীর আবেদন সরাসরি অগ্রাহ্য হলো। ফলে আগুনে আবার নতুন করে ঘৃতাহুতি পড়ল। তখন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়। এই সাব-কমিটি পাঞ্জাবের অনাচার ও তুরস্কের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য স্কুল-কলেজ ও আদালত বর্জন করার সুপারিশ

করেন। এই সাব-কমিটির সুপারিশের মধ্যে আইনসভা বর্জনের কোন উল্লেখ ছিল না, গান্ধী কিন্তু কংগ্রেসের কার্যসূচীর মধ্যে আদালত বর্জন করার সিদ্ধান্তটিও সন্নিবেশিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ঠিক হয় যে, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আলোচনার জন্য ১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসবে।

এই বিশেষ অধিবেশনের কিছু আগেই (১লা আগষ্ট) বোম্বাইতে টিলকের মৃত্যু ১৯২০ সালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কংগ্রেসের একটি স্তম্ভ যেন ভেঙে পড়ল। মৃত্যুশয্যায় লোকমান্যের কণ্ঠে উচ্চারিত শেষ কথা ছিল এই: 'India will not prosper unless she gets Swaraj.' অর্থাৎ, 'স্বরাজ লাভ না হলে ভারতের উন্নতি নেই।' মহারাষ্ট্র-কেশরী লোকমান্য টিলকের রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভে তাঁরই কণ্ঠে ভারতবাসী প্রথম শুনেছিল 'Swaraj is my birthright'—'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার।' আজো, মৃত্যুর সময়ে তিনি সেই একই কথা বলে বিদায় নিলেন। টিলকের এই অন্তিম ইচ্ছাকে সফল করে তুলবার সংকল্প গ্রহণ করেন চিত্তরঞ্জন। গান্ধী ও মতিলাল টিলকের শবানুগমন করেছিলেন এবং শবদেহ বহনকারীদের মধ্যে ছিলেন গান্ধী, সৌকত আলি, ডাঃ কিচলু এবং আরো অনেক নেতা। লক্ষ নেতার সমাবেশে উদ্বেলিত চৌপাটির মহাশ্মশানে টিলকের মরদেহ ভস্মীভূত হয়।

টিলকের মৃত্যুতে গান্ধী তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখলেন:

'Lokamanya Bal Gangadhar Tilak is no more. It is difficult to believe of him as dead. He was so much part of the people. No man of our times had the hold on the masses that Mr. Tilak had. The devotion that he commanded from thousands of his countrymen was extra-ordinary. He was

unquestionably the ideal of his people. A giant among men has fallen. The voice of the lion is hushed···He knew no religion but love of his country.'

এই বীর যোদ্ধার মৃত্যুতে সেদিন ভারতের রাজনীতিতে সত্যিই এক বিরাট শূন্যতা নেমে এসেছিল। সে শূন্যতা আজ পর্যন্ত পূর্ণ হয় নি।

১৯২০, ৪ঠা সেপ্টেম্বর।

কলকাতার রাজনৈতিক হাওয়া খুব উত্তপ্ত।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন।

সভাপতি—পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায়। দীর্ঘকাল দেশে অনুপস্থিত থাকার পর, তিনি তখন সবেমাত্র আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান—বাংলা কংগ্রেসের কর্ণধার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। পঁয়তাল্লিশ বছর নেতৃত্ব করে সুরেন্দ্রনাথ তখন কংগ্রেস থেকে সরে গেছেন। তিনি তখন মডারেট। বাংলার নেতা তখন ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। তিনি পুরোভাগে আর তাঁর পিছনে বিপিনচন্দ্র পাল ও চিত্তরঞ্জন দাশ। এই কংগ্রেসে সব প্রদেশের প্রতিনিধিবর্গ এসেছিলেন। তাঁদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের উপর। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে প্রতিনিধি বা 'ডেলিগেট' হওয়ার জন্য ফি ধার্য ছিল মাত্র দশ টাকা—ফি দিলেই প্রতিনিধি হওয়া যেত। কংগ্রেসে গান্ধী-যুগের আরম্ভ যেমন এখান থেকেই, তেমনি কংগ্রেসের অধিবেশনের রূপান্তরও পরিলক্ষিত হয় এই সময় থেকেই।

রাজনৈতিক হাওয়া উত্তপ্ত হওয়ার কারণ অসহযোগ প্রস্তাব। ভারতের উদীয়মান নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এসেছেন

অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব নিয়ে। বিপিনচন্দ্র, ব্যোমকেশ, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতা ও লাজপৎ রায়—এঁরা সবাই ছিলেন এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। এঁরা চাইতেন যে কোন উপায়ে ইংরেজ বিতাড়ন, তাতে হিংসা-অহিংসার কথা উঠবে কেন ? বাংলার নেতাদের মধ্যে একমাত্র শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ছিলেন দলছাড়া। তিনি গান্ধীর অসহযোগের মধ্যে একটা নতুন ধারার রাজনীতির আভাস পেয়েছিলেন। সেদিনের বাংলায় তিনিই ছিলেন প্রথম অসহযোগী নেতা এবং এই অসহযোগের বাণী প্রচারের জন্য সেদিন তিনিই অগ্রণী হয়েছিলেন। কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশনের পরেই শ্যামসুন্দর প্রতিষ্ঠা করলেন 'দি সার্ভেণ্ট' নামে একখানি নতুন ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা এবং তিনিই ছিলেন এর সম্পাদক। এই পত্রিকা সম্পাদনে শ্যামসুন্দরের সাংবাদিক প্রাতভার যেমন একটা পরিণতি দেখা গিয়েছিল, তেমনি দেখা গিয়েছিল তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা। তিনি বুঝেছিলেন যে, দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় অসহযোগ ভিন্ন আন্দোলনের আর কোন পথ নেই। এই কংগ্রেসের আরো একটি বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল। 'গান্ধীজী কি জয়'—এই ধ্বনিটা এই কংগ্রেসেই প্রথম শোনা গিয়েছিল অবাঙালী প্রতিনিধিদের মুখে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড স্মরণে রেখেও অমৃতসর কংগ্রেসে গান্ধী ইংরেজের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতার প্রস্তাব আনেন আর চিত্তরঞ্জন সেখানে রেখেছিলেন সম্পূর্ণ অসহযোগিতার প্রস্তাব। অর্থাৎ একজন চাইলেন ইংরেজ-সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে, আর অন্যজন গুরুত্ব আরোপ করতে চাইলেন অসহযোগিতার উপর। কিন্তু সেদিন কেই বা জানত যে, এর মাত্র অল্পকাল পরেই স্বয়ং গান্ধীই অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণে অগ্রসর হবেন আর তাকে সফল করবার জন্য ওঁার সমস্ত শক্তি নিয়ে গান্ধীর পাশে দাঁড়াবেন চিত্তরঞ্জন। অমৃতসর কংগ্রেসে শেষ পর্যন্ত সেটা ঘটেছিল

তাঁকে চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধে, গান্ধীর ঠিক জয়লাভ বলা চলে না ; বরং এই কথা বললেই প্রকৃত সত্য বলা হয় যে, লোকমান্যের মধ্যস্থতায় গান্ধীর মুখরক্ষা ব্যবস্থায় চিত্তরঞ্জন সম্মত হয়েছিলেন। এখানে নেপথ্য ইতিহাসের একটি কথা বলব। অমৃতসর কংগ্রেসেই গান্ধী অসহযোগের কথাটা প্রথম তোলেন অবশ্য কোন প্রস্তাব আকারে নয়, ঘরোয়া বৈঠকে। চিত্তরঞ্জন আপত্তি করেন। বলেন, 'এত তাড়াতাড়ি কেন?' এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, চিত্তরঞ্জন অসহযোগের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গান্ধীর সঙ্গে একমত ছিলেন বটে, কিন্তু পথ নির্দেশ ও সময় সম্পর্কে তাঁর ভিন্ন মত ছিল। অমৃতসর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর রসা রোডের বাড়ির বৈঠকখানায় এই বিষয়ে তখন দিনরাত যে পরামর্শ-সভা চলত তাতে তাঁর যে-সব অনুগামী ও সহকর্মী যোগদান করতেন তাঁদের কারো কারো মুখে শুনেছি যে, এই সময়ে চিত্তরঞ্জন বলতেন : 'I accept non-co-operation as a political creed but I differ with the Mahatma as to the means of achieving it.' সেই means বা উপায়টা যে কি হওয়া উচিত, সেটা ঠিক হয় নাগপুর কংগ্রেসে। এখানে উল্লেখ্য যে, গান্ধী অসহযোগের কথা সুস্পষ্টভাবে প্রথম ঘোষণা করেন এলাহাবাদে নিখিল ভারত খিলাফৎ সমিতির এক সভায় (১৯২০) এবং তারপর বিহার প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স ও গুজরাট প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে ইহা আলোচিত হয়।*

কথিত আছে, কলকাতার বিশেষ কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন গান্ধীকে বলেছিলেন, 'পাঁচ বছর পরে আন্দোলন আরম্ভ করুন, এই সময়টা দেশকে প্রস্তুত করুন, এর মধ্যে ওরা যদি কিছু না করে তখন আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব।' তবে গান্ধী একটা জিনিস ঠিক বুঝেছিলেন যে, বাংলা যদি অসহযোগ গ্রহণ না করে তাহলে ভারতে অসহযোগ চলবে না এবং তিনি আরো বুঝেছিলেন, চিত্তরঞ্জন যদি কর্মক্ষেত্রে

* *Autobiography* : **Rajendra Prasad**

অবতীর্ণ না হন, তবে বাংলায় কোন ফলোদয় হবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আসন্ন এই বিরাট আন্দোলন সেদিন একটিমাত্র মানুষের হ্যাঁ কি না-র উপর নির্ভর করছিল। তিনি চিত্তরঞ্জন দাশ। অসহযোগ সম্পর্কে তাঁর নিজের ও সমাগত প্রতিনিধিগণের মতের আদান-প্রদানের ফলে এই সিদ্ধান্তই স্থির হয় যে, চিত্তরঞ্জন গান্ধীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন এবং এই সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই কংগ্রেসে উপস্থাপিত করবেন। এ বিষয়ে তিনিই সেইদিন ছিলেন বাংলার প্রধান মুখপাত্র এবং সকলের মনে এই ধারণা জন্মাল যে তাঁরই মতের উপর অসহযোগ গৃহীত হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করছিল।

এখানে একটি প্রশ্ন আছে। গান্ধী-প্রস্তাবিত অসহযোগকে নীতি হিসাবে স্বীকার করে নিয়েও কেন সেদিন চিত্তরঞ্জন এর বিরোধিতা করতে চেয়েছিলেন? গান্ধী চেয়েছিলেন দেশের লোক যেন অকুণ্ঠিতভাবে অর্থাৎ—'without any reservation'—এটা গ্রহণ করে। চিত্তরঞ্জনের প্রধান আপত্তি ছিল এইখানেই। তাঁর স্বভাবই এই ছিল যে, যা তিনি প্রাণের সঙ্গে না বুঝতেন, তা কোন-দিনই মানতেন না। এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি চিরকাল ছিলেন অটল, অচল। তাই দেখা যায় যে, ১৯১৭ সালে গান্ধীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর থেকে তাঁকে তিনি সম্বোধন করতেন 'মিস্টার গান্ধী' বলে, 'মহাত্মা' বলতেন না, যদিও সারা দেশ তখন ঐ নামের জয়ধ্বনি দিতে আরম্ভ করেছে। গতানুগতিক মানুষ হলে তিনি হয়ত তাই-ই করতেন। কিন্তু তাঁর প্রাণের মধ্যে তিনি যতদিন না গান্ধীকে মহাত্মারূপে অনুভব করেছেন ততদিন তাঁর মুখ দিয়ে ঐ শব্দগুলি উচ্চারিত হয় নি। কলকাতায় কংগ্রেসের এবারকার বিশেষ অধিবেশনেও অসহযোগ-সম্পর্কিত মূল প্রস্তাবটির বিরোধিতার সময় তিনি যখন 'মিস্টার গান্ধী' কথাটি উচ্চারণ করেন, তখন জনতা গর্জন করে বলেছিল—'say Mahatma'—'বলুন মহাত্মা গান্ধী'। তাদের সেই গর্জনকে ছাপিয়ে চিত্তরঞ্জন উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন: 'Why

Mahatma? Unless I realise the man as such, I am not going to utter the word Mahatma like a bird taught.' আসল কথা, তাঁর প্রাণ বোধ হয় তখনো গান্ধীকে ঠিক মহাত্মারূপে উপলব্ধি করতে পারে নি। অসহযোগিতার পন্থা নির্দেশ সম্বন্ধে গান্ধীর মত তিনি যদি সঙ্গত মনে করতেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই সে পন্থা গ্রহণ করতে দ্বিধা করতেন না। তাঁর দ্বিধার আরো একটি কারণ ছিল। দেশ এখনো এজন্য তৈরি নয়—এই ছিল তাঁর ধারণা, আর সেই কারণেই তিনি গান্ধীকে আরো কিছুকাল, অন্ততঃ পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে বলেছিলেন।

কেবলমাত্র নেতিবাচক বা negative ভিত্তির উপর অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তন করা চিত্তরঞ্জন তখনো পর্যন্ত সমীচীন মনে করেন নি। ছাত্ররা সরকারী স্কুল-কলেজ ছাড়ুক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা হোক; তেমনি ইংরেজের আদালত বর্জনে তাঁর আপত্তি ছিল না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশে সালিসী-আদালত প্রতিষ্ঠা মত ছিল। কেবলমাত্র ধ্বংসের পথে যেতে তাঁর সম্মতি ছিল না—ধ্বংসের সঙ্গে তিনি গঠনের আবশ্যকতা প্রথম থেকেই মনে-প্রাণে বুঝেছিলেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত অনেক তর্কবিতর্কের পর গান্ধী জাতীয় বিদ্যালয় ও সালিসী-আদালত প্রতিষ্ঠায় সম্মতি দিয়েছিলেন। তবে এ কথা সত্য যে, চিত্তরঞ্জন গোড়া থেকেই কাউন্সিল বর্জনের বিপক্ষে ছিলেন, এ বিষয়ে তাঁর মত অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল। 'I want to make the Councils an instrument for the attainment of Swaraj and to use the weapon which is in the hollow of your hands to bring about full complete Swaraj.'—চিত্তরঞ্জনের এই কথা থেকেই বুঝা যায় যে, সরকারকে প্রতিবাদে বিব্রত করা ও দ্বৈত-শাসনব্যবস্থা অচল করে তোলা—মুখ্যত এই দুটি কার্যসাধনের জন্যই তিনি কাউন্সিল প্রবেশের স্বপক্ষে ছিলেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশনে গান্ধী-বিশেষ প্রস্তাবিত ও খিলাফতের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সমর্থিত অসহযোগ প্রস্তাব তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও পাস হয়ে যায়। বিরোধীদলের মধ্যে বাংলার কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের অনেকেই—বিপিনচন্দ্র, ব্যোমকেশ, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি ছিলেন এবং তাছাড়া মতিলাল নেহরু, মহম্মদ আলি জিন্না, এন. সি. কেলকার প্রভৃতি অন্য প্রদেশের অনেক নেতাও বিরোধী-শিবিরভুক্ত ছিলেন। এমন কি, লালা লাজপৎ রায়ও তাঁর সভাপতির অভিভাষণে এই প্রস্তাব সমর্থন করতে পারেন নি। তথাপি, একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, 'গান্ধীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং খিলাফতী দলবলের দাপটে প্রস্তাবটি পাস হইয়া গেল।'* কাউন্সিল বয়কট কার্যসূচীও সাময়িকভাবে এই অধিবেশনে গৃহীত হয় এবং ঠিক হয় যে, এই দুইটি বিষয়েই কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। আরো ঠিক হলো যে, চারমাস পরেই নাগপুরে নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হবে।

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করব। একমাত্র পৃথ্বীশচন্দ্র রায় ব্যতীত দেশবন্ধুর আর কোন জীবনীকার এটির উল্লেখ করেন নি। কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন যখন দেখলেন যে, অসহযোগ ও কাউন্সিল বয়কট সম্পর্কে গান্ধীরই মোটামুটি জয়লাভ হলো, তখন তিনি কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বতন্ত্র দল গঠনের কথা চিন্তা করতে থাকেন এবং অধিবেশন অন্তে তাঁর রসা রোডের বাড়িতে এই বিষয়ে একটা গোপন বৈঠকও বসেছিল বলে জানা যায়। তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গুরু বিপিনচন্দ্রকেই প্রস্তাবিত নতুন দলের নেতা পর্যন্ত ঠিক করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাংলার তৎকালীন সর্বজন-শ্রদ্ধেয় ও বর্ষীয়ান জননায়ক অশ্বিনীকুমার দত্তের সুপরামর্শক্রমেই এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। অশ্বিনীবাবু বরিশালের প্রতিনিধি হিসাবে

* অসহযোগ আন্দোলনের স্মৃতি : দেবপ্রসাদ ঘোষ (শারদীয়া যত্রিকা, ১৩৭৫)।

এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। চিত্তরঞ্জনের জীবনীকার পৃথ্বীশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'It is believed that on the acceptance of the non-co-operation resolution by the Congress, Chittaranjan and some of his Bengali friends were thinking of seceding from that body. But the wise and patriotic intervention of Aswini Kumar Dutta prevented them from committing this political *hari kari** এই গ্রন্থের লেখকও ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয়ের জামাতা, ব্যারিস্টার বসন্তকুমার লাহিড়ীর মুখে শুনেছেন যে, ব্যোমকেশবাবুই চিত্তরঞ্জনের কাছে এই প্রস্তাবটা প্রথম তুলেছিলেন। চিত্তরঞ্জনের ভাবপ্রবণ চিত্ত সাময়িক পরাজয়ের ফলে গান্ধীর প্রতি অনেকখানি বিরূপ হয়ে উঠেছিল। সম্ভবতঃ এটা অনুমান করেই ব্যোমকেশবাবু তখন একটা নতুন দল গঠনের আইডিয়া তাঁর মাথায় দিয়েছিলেন এবং তিনি সেটা গ্রহণও করেছিলেন। অশ্বিনীবাবু এর মাঝখানে এসে না দাঁড়ালে শেষ পর্যন্ত কি যে ঘটত তা বলা যায় না।

* *Life and Times of C. R. Das* : Ray

॥ সতেরো ॥

ভারতের আকাশে-বাতাসে তখন শুধু একটি কথা—অসহযোগ।

সে কথা তখন প্রত্যেকটি ভারতবাসীর মুখে মুখে।

অমৃতসর কংগ্রেসের পর থেকেই যেন ধুয়াটা আরম্ভ হলো।

জাতির প্রাণে এই ধুয়া ধরিয়ে দিয়েছিলেন গান্ধী। টিলক বলেছিলেন, স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার। গান্ধী বললেন, অসহযোগ আমার কর্তব্য। কিন্তু আসলে এর জন্মদাতা ছিল রৌলট আইন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'The Rowlatt Act was the parent of the non-co-operation movement.'* একথা সত্য যে সমকালীন ভারতে গান্ধীর চেয়ে ইংরেজ-সরকারের বড় বন্ধু আর কেউ ছিলেন না। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতই তাঁকে করে তুলেছিল একজন উগ্র অসহযোগী। এর সাক্ষ্য দিয়েছেন সুভাষচন্দ্র। তিনিও লিখেছেন: The Punjab atrocities and their sequel made a rebel of the once loyal Mr. Gandhi.'† অমৃতসর কংগ্রেসও যাঁকে দেখা গেল নতুন শাসন-সংস্কার সম্পর্কে সহযোগিতার হস্ত প্রসারণ করতে এবং যিনি কংগ্রেসকে এই বিষয়ে তাঁর স্বমতে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁকেই ১৯২০ সালে দেখা গেল ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে একজন বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করতে এবং তাঁরই কণ্ঠে এই সময়ে ভারতবাসী শুনতে পেল ভারতের শাসক শাসক নয়, শয়তান। এই অত্যাচারী (গান্ধীর নিজের কথায়—'Satanic') শাসকের বিরুদ্ধেই তিনি এইবার অসহযোগ ঘোষণা করতে উদ্যত হলেন। ভারতের জাতীয় সংগ্রামে এখন থেকে একটি নতুন ধারার প্রবর্তন হলো বলা চলে। নাগপুর কংগ্রেসের পর থেকেই

* *A Nation in Making* : Banerjee

† *The Indian Struggle* : Bose

অসহযোগ হয়ে দাঁড়াল ভারতীয় রাজনীতির একটি নতুন ব্যঞ্জনা, একটা নবদিগন্ত।

সুরেন্দ্রনাথ বা সুভাষচন্দ্র যাই বলুন না কেন, ভারতের রাজনৈতিক চিন্তা ও জাতীয় সংগ্রামের গতি-প্রকৃতি যাঁরা গভীরভাবে লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা বলবেন যে, ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই যুদ্ধোত্তর ভারতে অসহযোগ দেখা দিয়েছিল। অবশ্য সমকালীন ঘটনাবলীর সংঘাত এর প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ কারণ হিসাবে গণ্য হতে পারে। ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই ভারতের জাতীয় আন্দোলনে চারটি বিশিষ্ট ধারা লক্ষ্য করবেন, যথা—রামমোহনের সংস্কার যুগ; সুরেন্দ্রনাথের সহযোগিতা ও আবেদনের যুগ; টিলকের প্রতিবাদের যুগ এবং গান্ধীর অসহযোগ যুগ। প্রথম দুইটি সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে অন্যত্র বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। টিলকের যুগে প্রধান নেতা তিনজন—লোকমান্য টিলক, লাজপৎ রায় ও বিপিনচন্দ্র পাল। সেদিন ভারতের রাজনীতির প্রখ্যাতত্রয়ী লাল-বাল-পাল, এই নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের যুগের ধারা থেকে এই তৃতীয় যুগের ধারার কয়েকটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এক নতুন দলের উদ্ভব হতে থাকে। এঁরা আবেদন-নিবেদন, বিলাতে প্রতিনিধি প্রেরণ ও বিধিগত অন্দোলনে আস্থাবান ছিলেন না। টিলক ছিলেন এই দলের প্রথম ও প্রধান প্রবক্তা। ভারতবাসীকে স্বাধীনতা বা স্বরাজ অর্জন করতে হলে, ভারতের জনসাধারণকে স্বরাজের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, এই ছিল টিলকের বক্তব্য। কিন্তু তখনো এই দলের সংখ্যা ছিল খুব কম এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই এঁরা কংগ্রেসে কোনরূপ প্রতিষ্ঠা বা প্রভাব স্থাপন করতে পারেন নি। ১৯০৬ সনে কলকাতা কংগ্রেসে লোকমান্যকে সভাপতি-পদে নির্বাচন করবার জন্য যথাশক্তি প্রয়োগ করেও তাঁরা যে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তার কারণটা তো এইখানেই।

তারপর যুদ্ধোত্তরকালে (১৯১৭) ভারতের পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় কংগ্রেসের নরমপন্থীদের প্রভাব বিলুপ্ত হয়। ১৯১৯ সাল থেকে একমাত্র পণ্ডিত মালব্য ব্যতীত আর কোন নরমপন্থী নেতা জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন নি। নরমপন্থী হলেও তিনি কংগ্রেসে টিলক প্রমুখ চরমপন্থীদের আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন; এমন কি অসহযোগী গান্ধীর পাশে দাঁড়িয়েও তাঁর কাজ করতে অসুবিধা হয় নি। বেশান্ত অবশ্য অসহযোগ মন্ত্র প্রচারিত হওয়ার আগেই কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করেন। যুদ্ধোত্তর যুগে দেশবাসীর স্বাধীনতা স্পৃহা ও প্রবল রাজনৈতিক চেতনা দেখা দেয়, একথা আগেই বলেছি। রৌলট তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই সারা দেশে যে প্রতিবাদ দেখা দিয়েছিল তারই ফলে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অসন্তোষের বহ্নি ধূমাইত হতে থাকে। তারপর জালিয়ানওয়ালা-বাগের নৃশংস ঘটনা তাতে ইন্ধনের কাজ করল—ধূমায়িত বহ্নি এবার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার রূপ নিল। জাতির মানসিক অবস্থা তখন দ্রুত পরিবর্তনের পথে। তার উপর খিলাফতের প্রশ্নে ভারতের মুসলমান সমাজ যেন অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দেশ এসে দাঁড়াল যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মুখে। দেশবাসী সংগ্রামের জন্য অধীর। এমন সময় সেই সংগ্রামের ডাক দিলেন গান্ধী রৌলট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ ঘোষণা করে। কটিবাস-পরিহিত কৃশতনু একটি মানুষ এসে দাঁড়ালেন পুরোভাগে। জাতীয় আন্দোলনের এক সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায় সূচিত হলো তখন থেকেই। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে এক পত্রে 'A great leader of men' বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধী অসহযোগের যে প্রস্তাবটা উত্থাপন করেছিলেন তার মূল কথা ছিল 'progressive non-violent non-co-operation' অর্থাৎ স্তরে স্তরে বা ধীরে-সুস্থে অহিংস

সংগ্রাম দ্বারা স্বরাজ অর্জন। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় 'স্বরাজ' বলতে তিনি কি বোঝেন বা কি বোঝাতে চান, তখন তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন: 'It means a state such that we can maintain our separate existence without the presence of the English. If it is to be a partnership, it must be a partnership at will.' পরবর্তীকালে তিনি অবশ্য স্বরাজের আরো অনেক সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। যাই হোক, সেদিন যুদ্ধোত্তরকালে এরই ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতবাসীর নব পর্যায়ের সংগ্রামের প্রথম অধ্যায় সূচিত হয়েছিল। তুরস্কের খলিফের হিতসাধন আর ভারতবাসীর স্বরাজ অর্জন—অসহযোগের এই ছিল প্রধান লক্ষ্য।

কলকাতা কংগ্রেসের একমাস পরেই অক্টোবরে নতুন আইন অনুসারে কাউন্সিল নির্বাচন হয়ে গেল। বাংলায় জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে এই নির্বাচনে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হলো না, ফলে মডারেটরাই নির্বাচনে জয়ী হলেন। চিত্তরঞ্জনের মতে এইটাই ছিল কাউন্সিল-বর্জন নীতির ক্ষতিকর ফলের একটা দৃষ্টান্ত। এই সময় 'জনসভার' এক বৈঠকে তিনি এই কথা বলেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ভারতসভার পাল্টা প্রতিষ্ঠান হিসাবে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট যেদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় (৮ই জুলাই ১৯১৮), সেইদিনই এই 'জনসভা' স্থাপিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন ব্যোমকেশ চক্রবর্তী আর চিত্তরঞ্জন ছিলেন এর সহঃ সভাপতি। মুখ্যত তাঁরই উদ্যোগে একটা 'ফোরাম' হিসাবেই 'জনসভা' গঠিত হয়েছিল। এই জনসভার মঞ্চ থেকেই তিনি বার বার ঘোষণা করেছিলেন—এই শাসন-সংস্কার আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আর নাগপুরে পূর্ণ অধিবেশনের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র চার মাসের। সেই চার মাসের মধ্যে চিত্তরঞ্জন অনুভব করলেন যে, অসহযোগের প্রাথমিক ব্যবস্থা

আদৌ ফলপ্রসূ হলো না। নভেম্বর মাসে দেখা গেল যে, একজন উকিলও প্র্যাকটিস্ পরিত্যাগ করেন নি আর ছাত্রদের পক্ষ থেকেও আশানুযায়ী সাড়া পাওয়া গেল না। এমন কি আলিগড় কলেজকে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য মৌলানা মহম্মদ আলির প্রচেষ্টাও সফল হলো না। বেনারস হিন্দু কলেজকে ঐভাবে রূপান্তর করার প্রয়াসও সার্থক হলো না। কলকাতায় গান্ধী যে জাতীয় বিদ্যালয়টির উদ্বোধন করেছিলেন, সেটিতেও আশানুযায়ী ছাত্র সমাগম হলো না এবং শেষ পর্যন্ত সেটির দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

নিতান্ত নৈরাশ্যজনক এই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সেই সময় (৩০শে নভেম্বর, ১৯২০) চিত্তরঞ্জন সংবাদপত্রে অসহযোগ সম্পর্কে যে বিবৃতিটি দিয়েছিলেন সেটি ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং তারই মধ্যে এই ইঙ্গিতটা খুবই স্পষ্ট ছিল যে, তাঁর মন তখন অসহযোগের দিকে অনেকখানি আকৃষ্ট হতে আরম্ভ করেছে। সেই বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন: 'Non-co-operation is our only chance. A complete programme of non-co-operation with renunciation of titles and honorary offices at one end and refusal to pay taxes at the other should be at once adopted and worked out within the shortest possible time.' এখানে তিনি একটা পূর্ণাঙ্গ কার্যসূচী ও স্বল্পতম সময়ের মধ্যে তাকে রূপায়িত করা—এই দুটি বিষয়ের উপরেই বিশেষ জোর দিতে চেয়েছিলেন।

এই পটভূমিকায় নাগপুরে কংগ্রেসের ৩৫তম অধিবেশন বসল ডিসেম্বর মাসে। সভাপতি—মাদ্রাজের বর্ষীয়ান জননেতা মিঃ বিজয়রাঘব চারিয়ার। এই অধিবেশনে সমাগত প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল চৌদ্দ হাজার। এই অধিবেশনে ইংলণ্ডের শ্রমিকদলের দুইজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন

পার্লামেন্টের সদস্য। তাঁরা একটা প্রস্তাব এনেছিলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সংগ্রামে ইংলণ্ডের শ্রমিক-সম্প্রদায় সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে। তাই তাঁরা মিলিতভাবে একটি বাস্তব কর্মসূচী প্রণয়নে কংগ্রেসের মতামত জেনে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে চাইলেন। কিন্তু মহম্মদ আলির বিরোধিতার ফলে তাঁদের এই ইচ্ছা ফলপ্রসূ হতে পারে নি। গান্ধী অবশ্য এ বিষয়ে নীরব ছিলেন। কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাসে এই ঘটনাটির কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

যাই হোক, কংগ্রেসের এই নাগপুর অধিবেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাই সারা ভারতের দৃষ্টি তখন এর উপর নিবদ্ধ হয়েছিল। কংগ্রেসে গান্ধী-যুগের আরম্ভ প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই, কারণ এই অধিবেশনেই অসহযোগ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন—উভয়ের মধ্যে এইবার নেতৃত্বের একটা সংঘর্ষ হবে, এমন আশংকা সেদিন অনেকের মনেই জেগেছিল। কলকাতা অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে টিকবে, না বানচাল হবে—এই ছিল সকলের জল্পনা-কল্পনার বিষয়। চিত্তরঞ্জন বিরোধিতা করবেন, এটাই সবাই জানতেন আর সেজন্য তিনি নিজের খরচে পাঁচশো ডেলিগেট নিয়ে এসেছিলেন নাগপুরে। বিপিনচন্দ্র, ব্যোমকেশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দও তাঁর সঙ্গী ছিলেন। বাংলার যুগান্তর ও অনুশীলন এই উভয় দলের বিপ্লবীদের অনেকেই নাগপুর কংগ্রেসে ডেলিগেট হিসাবে যোগদান করতে এসেছিলেন চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিগত অনুরোধে। সেই প্রসঙ্গে পুলিন দাস লিখেছেন :

'সি. আর. দাশ আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, তিনি সদলবলে নাগপুর কংগ্রেসে যাইয়া গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাবের ঘোরতর প্রতিবাদ করিবেন, সেই হেতু আমাকে পাঁচশত স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সঙ্গে নাগপুর যাইতে হইবে। আমি এক কথায়ই সম্মত হইলাম। অনুশীলন সমিতির

সভ্য ব্যতীতও বহু যুবক আমাদের সঙ্গে চলিল। অপর দিকে যুগান্তর দলের কয়েকজন যুবক সি. আর. দাশের বিরোধিতা করিবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইয়া নাগপুরে গিয়াছিল।'*

বিষয়-নির্বাচনী সভার সভ্য নির্বাচন বিষয়ে নাগপুরে এই দুই দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে বচসা ও হাতাহাতি হয়েছিল সেই অপ্রীতিকর ইতিহাসের উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। মোটকথা চিত্তরঞ্জনের বিরোধী ও সমর্থক উভয় দলের কাণ্ডকারখানা সেদিন নাগপুর কংগ্রেসে বাংলার মর্যাদাকে ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছিল বললেই হয়।

নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ প্রস্তাব যে গৃহীত হবে, এটা পূর্বাহ্নেই অনুমান করতে পেরেছিলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। তাই দেখা যায় যে, অধিবেশনের ঠিক প্রাক্কালে তাঁর 'সার্ভেন্ট' পত্রিকায় 'The Green Signal' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন :

We are not political astrologers, nor do we like to indulge ourselves in idle speculation. But if we and permitted to make any assessment of the present situation in the country and if we are able to read the writings on the wall, then we can almost predict a resurgence of mind and spirit following the deliber-ations of the Nagpur session of the Indian National Congress. We think India is now ready for the programme of non-co-operation which is a positive concept, not cowardice or supine passivity, but a dynamic force of the spirit.' ব্যারিস্টার বি. কে. লাহিড়ীর (ইনি নাগপুর কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন) মুখে শুনেছি, 'সার্ভেন্ট'

* আত্মচরিত : পুলিন দাস

পত্রিকার এই সংখ্যাটির কয়েক হাজার কপি নাগপুরে কংগ্রেস শিবিরে শিবিরে প্রচারিত হয়েছিল এবং চিত্তরঞ্জন স্বয়ং এই লেখাটি পাঠ করে যারপরনাই মুগ্ধ হন। বাংলা দেশে অসহযোগ প্রচারে শ্যামসুন্দর ও তাঁর 'সার্ভেন্ট' পত্রিকার কৃতিত্ব সত্যিই অবিস্মরণীয়। কিন্তু কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাসে অথবা নেহরু ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের আত্মচরিতে এর কোন উল্লেখ নেই। গান্ধী অবশ্য তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় অসহযোগের বাণী প্রচারে শ্যামসুন্দরের প্রয়াসের কথা মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করেছেন। 'Among the nationalist leaders of Bengal Shyamsunder perhaps in the true non-co-operation'—এই কথা গান্ধীর।

নাগপুর কংগ্রেসে বাংলা দেশের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দেশবন্ধুর মত-পরিবর্তন সম্পর্কে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। সে-সব বিবরণ কিন্তু পরস্পর-বিরুদ্ধ, একটির সঙ্গে অপরটির মিল নেই। যেমন একজন লিখেছেন:

'কিন্তু সকলকে বিস্ময় বিমূঢ় করিয়া গান্ধীর সহিত এক নৈশ সাক্ষাৎকারের পরেই চিত্তরঞ্জন স্বয়ং বিরোধী চমূর সেনাপতি হইয়াও গান্ধীর দলে গিয়া ভিড়িলেন; এবং প্রতিনিধি ক্যাম্পে আসিয়া জানাইলেন যে, তিনি গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব সমর্থন করিবেন; ফলে, বিরোধীদল একেবারে demoralised হইয়া মুষড়িয়া পড়িলেন। অসহযোগ প্রস্তাব পাস হইয়া গেল।'*

আবার দেশবন্ধুর এক অনুরাগী ও ঘনিষ্ঠ সহকর্মী লিখেছেন:

চিত্তরঞ্জন ব্যোমকেশের দক্ষিণ হস্ত। স্থির হলো ডিসেম্বরে নাগপুরে গিয়ে গান্ধীকে হারাবেন। হারাতে গেলে ডেলিগেট চাই; 'বাংলা থেকে হাজার-খানিক ডেলিগেট গিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জনের পয়সায়। বিষয়-নির্বাচনী সভার অধিবেশন শুরু হলো। গান্ধী তাঁর অহিংস অসহযোগ প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করে বক্তৃতা করলেন। পুরো এক ঘণ্টা বক্তৃতা করে গান্ধী তাঁর বক্তব্যকে সকলের সামনে রাখলেন। তারপর শুরু হয় যুক্তি-তর্ক, কথা কাটাকাটি—এইভাবে আরো দু'ঘণ্টা চলে যায়। অবশেষে চিত্তরঞ্জন,

* অসহযোগ আন্দোলনের স্মৃতি: দেবপ্রসাদ ঘোষ।

লাজপৎ ও মতিলাল গান্ধীর যুক্তি মেনে নিলেন। ব্যোমকেশ, বিপিনচন্দ্র ও কেলকার কিন্তু সায় দিলেন না।'*

পুলিন দাস লিখেছেন :

'সি. আর. দাশ সদলবলে নাগপুর যাওয়ার কালে গান্ধী সি. আর. দাশের সঙ্গে একটি আপোস মীমাংসা করিয়া তাঁহার অসহযোগ নীতির কতকগুলি কঠোরতা শিথিল করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু আলোচনা সভায় সৌকত আলি, মহম্মদ আলির প্রভাব উপলব্ধি করিয়া এবং অধিকাংশ সদস্যেরই অসহযোগ নীতির প্রতি আসক্তি বুঝিতে পারিয়া অবশেষে গান্ধী পরিষ্কার ভাবেই বললেন যে, বিশেষভাবে চিন্তার পর তিনি স্থির করিয়াছেন অসহযোগ নীতির পূর্বনির্দিষ্ট কোন কঠোরতাই শিথিল করা যাইবে না। যাহা হউক, নাগপুর কংগ্রেসেও অসহযোগ নীতিই সমর্থিত হইল। গান্ধীজীর জয় হইল বটে, তথাপি সি.আর. দাশ, মতিলাল নেহরু, মদনমোহন মালব্য এবং মারাঠী নেতাগণের বিরোধিতাও তিনি একেবারে উপেক্ষণীয় মনে করিতে পারিলেন না। তাই কংগ্রেস শেষ হইলে গান্ধী বিশেষভাবে সি. আর. দাশকে অসহযোগের বিরোধিতা হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করেন এবং সি. আর. দাশ বিরোধিতা করিবেন না বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু পরিপূর্ণরূপে উহা মানিয়া লইতে পারিলেন না।'†

দেশবন্ধুর প্রধান জীবনীকার লিখেছেন : 'While in the Congress in Calcutta in September, 1920, Chittaranjan Das opposed Mr. Gandhi's idea of the initiation of the non-co-operation movement, three months after, at Nagpur he entered into a secret pact with Mr. Gandhi (known as the Das-Gandhi pact) by which each promised the other freedom of propaganda in his own sphere, for the future. As soon as this pact

* দেশবন্ধুর সঙ্গে পাঁচ বছর : সাতকড়িপতি রায় ('প্রণব' ১৩৭১-৭২)।

† আত্মচরিত : পুলিন দাস।

was entered into, Chittaranjan became a complete convert to the non-co-operation idea.*

তিনি 'গান্ধীর দলে গিয়া ভিড়িলেন'—এই উক্তিটি ঠিক নয়। মূল প্রস্তাব উথাপিত হওয়ার আগে বাংলার বিপ্লবীদের উদ্দেশে গান্ধী একটি চমৎকার বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি হিংসাত্মক কার্যকলাপের ফলে স্বাধীনতা যে আসবে না, তাই-ই বিশেষ যুক্তিসহকারে বলেন। নাগপুর কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন এমন একজন বিশিষ্ট বিপ্লবী কর্মীর মুখে শুনেছি যে, গান্ধীর এই বক্তৃতার ফলে বিপ্লবীরা এক বছরের জন্য হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে বিরত থেকে অহিংসার পথে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে সম্মত হন। তারপর গান্ধী ও চিত্তরঞ্জনের মধ্যে চুক্তি হয় এইভাবে: দেশবন্ধুর দিক থেকে গান্ধীর অহিংস-নীতির প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য ('Implicit obedience') প্রদর্শন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়; আর গান্ধীর দিক থেকে বলা হয় যে, এক বছরের মধ্যে তাঁর নির্দেশিত পথে স্বরাজ লাভ না হলে তিনি চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্ব মেনে নেবেন। ('I will accept the leadership of Mr. Das,')—এই কথাই নাগপুরে বলেছিলেন গান্ধী।

পূর্বে যিনি ছিলেন অসহযোগের বিরোধী সেই চিত্তরঞ্জনকে তাঁর স্বমতে নিয়ে আসা নিঃসন্দেহে গান্ধীর পক্ষে সেদিন তাঁর ব্যক্তিগত জয়লাভ বলা চলে। পৃথ্বীশচন্দ্র যে 'গান্ধী-দাশ' গোপন চুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, সেই সূত্র অবলম্বন করে দেশবন্ধুর মত-পরিবর্তনের বিষয়টি এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। গান্ধী অবশ্য তাঁর আত্মজীবনীতে 'নাগপুর' শীর্ষক অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নি; তিনি শুধু লিখেছেন: 'Some amendments were made at the instance of the Desbandhu, after which the non-co-operation

* *Life and Times of C. R. Das* : Ray

resolution was passed unanimously.'* অতঃপর চিত্তরঞ্জন স্বয়ং এই প্রস্তাবটি প্রকাশ্য অধিবেশনে উত্থাপন করেছিলেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বিপিনচন্দ্র পাল একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আর বিরোধিতা করেছিলেন জিন্না। কংগ্রেসে তাঁর সেই শেষ বক্তৃতা। এর পর তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। যাই হোক, নাগপুর কংগ্রেসে দেখা গেল যে, চিত্তরঞ্জন অসহযোগিতা গ্রহণ করলেন। কেন? এইবার তিনি গ্রহণ করলেন, আর আগেই বা করেন নি কেন? এই নিয়ে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল বলে জানা যায়। কথিত আছে, যে রাত্রে গান্ধীর শিবিরে পরামর্শ-বৈঠকে সব ঠিক হয়ে যায়, তারপরে বিপিনচন্দ্র চিত্তরঞ্জনকে সকালে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্তভাবে বলেন, 'চিত্ত, আমাদের না জানিয়ে কে তোমায় এতে মত দিতে বলল?' এর উত্তরে চিত্তরঞ্জন বলেন, 'কে আর বলবে, এ ছাড়া আর কোন পথ নেই বলে আমি নিজেই করেছি। এতে কি আমার স্বাধীনতা থাকতে নেই? দেশের কাজ করব, এজন্য কি কারো মতের অপেক্ষায় থাকতে হবে?' গুরু ও শিষ্যের মধ্যে বিচ্ছেদের সূচনাটা সেদিন এইভাবেই হয়েছিল।

তবে কি চিত্তরঞ্জন অসহযোগিতার উপযোগিতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন? তা মনে হয় না। উত্তরকালে তিনি আইনসভায় প্রবেশ করেছিলেন ও অপরকে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছিলেন, অথচ তিনি মনে-প্রাণে একজন অসহযোগী ছিলেন। এর মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? আসল কথা, দেশের সামনে তিনি তখন এর চেয়ে ভাল আর কোন কার্যসূচী দেখতে পান নি। তিনি মনে করলেন, এর ফলে দেশের সর্বসাধারণের মনে যদি রাজনৈতিক চেতনা জাগে, তবে দেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে তার মূল্য কম হবে না। যদি একজন মানুষের প্রভাবে দেশের নিদ্রিত জনশক্তি

* *My Experiments with Truth* : Gandhi

উদ্বুদ্ধ হয়, তবে সেটা দেশের ভবিষ্যতের পক্ষেই মঙ্গলপ্রদ হবে। এইসব বিবেচনা করেই চিত্তরঞ্জন তর্ক বা বিরোধের মনোভাব পরিত্যাগ করে গান্ধীর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার পথ সুগম করে দেওয়াই সমীচীন মনে করেছিলেন।

প্রকাশ্য অধিবেশনের পূর্ব রাত্রে গান্ধীর সঙ্গে তাঁর যে গোপন চুক্তি হয়েছিল বলে পৃথ্বীশচন্দ্র রায় তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন সেটার প্রকৃত ইতিহাস এই। এখন জানা গেছে যে, নাগপুরে গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করার জন্য একমাত্র চিত্তরঞ্জনের সাহায্য ও সমর্থন ভিক্ষা করেন, কারণ তাঁর মনে এই ধারণা হয়েছিল যে, চিত্তরঞ্জনের সাহায্য ও সমর্থন ব্যতীত তাঁর একার চেষ্টায় দেশের বর্তমান অবস্থায় কিছুই করার ছিল না। রৌলট আইনের প্রতিবাদে একক সত্যাগ্রহ আন্দোলন করতে গিয়ে গান্ধী সেটা বুঝেছিলেন। কলকাতায় চিত্তরঞ্জনের বিরোধিতায় গান্ধী স্বভাবতঃই একটু শঙ্কিত না হয়ে পারেন নি। তাই নাগপুরে তিনি সর্বাগ্রে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা করে তাঁর পথ সুগম করার চিন্তা করলেন। নাগপুরে তিনি যখন চিত্তরঞ্জনকে বললেন, 'Mr. Das, give me same chance, at least give me one year's time to work out the idea of non-co-operation.' তখন তার উত্তরে চিত্তরঞ্জন গান্ধীকে বলেছিলেন, 'Well, I am willing to support you at the open session provided you allow me to draft and move the main resolution on non-co-operation and also provided you agree to omit the clause on the boycott of Councils.' গান্ধীকে রাজী হতে হয়। চিত্তরঞ্জন অবশ্য অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করার আগে প্রস্তুতির জন্য পাঁচ বছর অপেক্ষা করার প্রশ্নটা এবারও তুলেছিলেন। তখন গান্ধী তাঁকে বোঝালেন যে, আন্দোলন আরম্ভ করার পক্ষে এই-ই সুবর্ণ সুযোগ, কারণ পাঞ্জাবের অনাচার

আর খিলাফতের প্রশ্ন—এই দুটির প্রতিকারের জন্য গভর্ণমেণ্টের মনোভাব আমাদের যে সুযোগ এনে দিয়েছে, তিনি তারই সদ্ব্যবহার করতে চান। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দাশ-গান্ধী আলোচনায় মৌলানা মহম্মদ আলির অনেকখানি ভূমিকা ছিল। শুধু পাঞ্জাব ও খিলাফতের প্রশ্নে অসহযোগ করতে চিত্তরঞ্জন সম্মত ছিলেন না। তিনি বলেন, এ দুটো কারণ গৌণ, স্বরাজই মুখ্য কারণ হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত। স্বরাজের দাবিতেই অসহযোগ করা হবে। গান্ধী তাঁর এই যুক্তিও মেনে নিয়েছিলেন।

এর পরেই প্রস্তাবের মুসাবিদা করলেন চিত্তরঞ্জন এবং গান্ধীর বিবেচনায় সেটি কলকাতা কংগ্রেসে উত্থাপিত প্রস্তাব অপেক্ষা অধিকতর বাস্তবসম্মত ও কার্যকর বলে মনে হলো। কংগ্রেসের এই দুটি অধিবেশনে উত্থাপিত প্রস্তাবগুলি তুলনা করলে দেখা যাবে যে—১। অসহযোগিতা ও অন্যান্য বিষয়ে চিত্তরঞ্জন গান্ধীর সম্পূর্ণ মতাবলম্বী ছিলেন ; ২। কিন্তু কাউন্সিলে প্রবেশ করে গঠনমূলক নীতি অবলম্বন সম্পর্কে স্বীয় মত আদৌ বর্জন করেন নি ; ৩। নাগপুরের প্রস্তাবে কাউন্সিল বর্জনের কথা ছিল না এবং মডারেটরা যাতে পরবর্তী নির্বাচনে কাউন্সিলে প্রবেশ করতে না পারে তার চেষ্টা করতে হবে ; ৪। স্বরাজলাভ সম্বন্ধে কলকাতার প্রস্তাবে কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল না, শুধু পাঞ্জাব ও খিলাফতের কথাই ছিল, অন্যদিকে নাগপুরের প্রস্তাবে বলা হলো যে, বর্তমান গভর্ণমেণ্ট আমাদের বিশ্বাস হারিয়েছে এবং স্বরাজলাভে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ; ৫। কলকাতার প্রস্তাবে অসহযোগের কোন বিশিষ্ট রূপ ছিল না—ছিল না কোন বিশেষ ত্যাগের কথা। কলকাতায় আদালত, স্কুল-কলেজ বর্জন করা সম্পর্কে বলা হয়, 'The Congress earnestly desires gradual withdrawal' আর নাগপুরে বলা হয়: 'Effective steps should be taken'. এইভাবে দেখা যায় যে নাগপুর প্রস্তাব ছিল অধিকতর প্র্যাক্‌টিক্যাল্। কোন প্রতিবাদের

আশঙ্কা না রেখেই এখানে বলা যেতে পারে যে নিজের সমগ্র ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেই চিত্তরঞ্জন গান্ধীকে সমর্থন করেছিলেন—জয়-পরাজয় বা মত-পরিবর্তনের বিতর্ক বা প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তবে একথা ঠিক যে, নাগপুর কংগ্রেসের পর থেকেই চিত্তরঞ্জনের 'জীবনের গতিধারা ভোগের উপত্যকা হইতে একেবারে নিরবচ্ছিন্ন ত্যাগের পথে প্রবাহিত হয়।' আসল কথা, গান্ধীর আত্মোৎসর্গটা তাঁর মর্মকে স্পর্শ করেছিল। এই ক্ষেত্রে আরো চমকপ্রদ ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে তিনি সংকল্প করেন। বস্তুতঃ রৌলট আইনের প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধী যে কথা বলেন তাই-ই চিত্তরঞ্জনের মনকে প্রথম স্পর্শ করে এবং আমাদের মনে হয়, তখন থেকেই তিনি এই আত্মশুদ্ধি প্রণোদিত সত্যোজ্জ্বল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ প্রস্তাবের সমর্থনে দেশবন্ধু যে বিখ্যাত বক্তৃতাটি করেছিলেন তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো। তিনি বলেছিলেন: 'I call upon you in the name of all that is holy to carry this resolution with no single dissentient vote. Declare to the world that you realise your God-given right to be free —rights exist but they have got to be realised.' এ যেন টিলক-অরবিন্দের যুক্তির প্রতিধ্বনি। তাঁর আবেগপ্রবণ চিত্ত যখন অসহযোগিতার সারবত্তা অনুভব করল সেই মুহূর্ত থেকে তিনি তার অনুকূলে নিজের সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা নিয়োগ করে দেশবাসীকে এই পথ ও মত গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। এই ছিল তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের রীতি।

'আমরা একবছরের মধ্যেই স্বরাজ লাভ করব'—গান্ধীর এই দৃপ্ত ঘোষণার পর নাগপুর কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অধিবেশন সমাপ্ত হয়। গান্ধীর এই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক

আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘমালায় যুগপৎ যে বিদ্যুৎ ও বজ্রের চমক পরিলক্ষিত হয়েছিল, তারই ভিতর দিয়ে মুক্তিসংগ্রামের পথে শুরু হয় ভারতের নতুন পদক্ষেপ। নতুন পদক্ষেপ বলছি এইজন্য যে, নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তারিত কর্মসূচী ছাড়াও আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, যার ফলে এতদিনকার মডারেট-অধ্যুষিত জাতীয় মহাসভা ভিতরে ও বাইরে একটি নতুন রূপ ধারণ করে। আগেই বলেছি, এই অধিবেশনেই কংগ্রেসের নতুন গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়। কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে এর প্রথম অনুচ্ছেদেই বলা হয়: 'The object of the Indian National Congress is the attainment of Swaraj by the people of India by all legitimate and peaceful means.' শুধু তাই নয়। যে প্রতিষ্ঠানটি এতকাল ছিল শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবীদের একটি বিতর্কসভা, তাই এখন হয়ে দাঁড়াল একটি সুগঠিত সংগ্রামী রাজনৈতিক দল যার শিকড় গণচিত্ত পর্যন্ত প্রসারিত হলো। কংগ্রেসের অধিবেশনে হ্যাট-কোট-নেকটাই-প্যাণ্ট পরিহিত প্রতিনিধিদের বদলে খদ্দর-পরিহিত মানুষদের দেখা গেল। এই রূপান্তরের সেদিন প্রয়োজন ছিল এবং কংগ্রেস এই যে নব-কলেবর ধারণ করল, উদ্বুদ্ধ হলো একটা নতুন চেতনায়, তার সকল কৃতিত্বই ছিল কটিবাস-পরিহিত ঐ কৃশতনু মানুষটির; যিনি নিজেকে দরিদ্র ভারতবাসী, বুভুক্ষু ভারতবাসী, কৃষক ও মজুর ভারতবাসীর সগোত্র জ্ঞান করতেন। গান্ধীকে দেশবন্ধু যে গোড়া থেকেই একজন বড় রকমের বিপ্লবী বলতেন, সেটা তিনি শুধু শুধু বলতেন না। রাজনৈতিক অভীষ্টসিদ্ধির জন্য মত ও পথ নিয়ে উভয়ের মধ্যে যত মতবিরোধ থাকুক না কেন, গান্ধীর মধ্যে তিনি একজন যথার্থ যুগোপযোগী নেতাকেই দেখতে পেয়েছিলেন বলেই না তাঁর প্রতি চিত্তরঞ্জন অমনভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নাগপুর কংগ্রেসের ইহাই ফলশ্রুতি।

॥ আঠারো ॥

নাগপুর থেকে ফিরলেন এক নতুন চিত্তরঞ্জন।

অসহযোগী চিত্তরঞ্জন।

আরম্ভ হলো তাঁর রাজনৈতিক জীবনে একটা সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়।

এতকাল ধরে যে কথা বলে এসেছেন—'সর্বস্ব ত্যাগ করো, নইলে এ খেলায় দরকার নেই'—এইবার তিনি নিজে তার প্রমাণ দিলেন। 'আপনি আচরি ধর্ম, প্রভু অন্যকে শিখায়'—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের এই শিক্ষাটা তাঁর মনে গাঁথা ছিল। এইবার নিজের জীবনে সেটা প্রয়োগ করলেন চিত্তরঞ্জন। দেশমাতৃকার বেদীমূলে সর্বস্ব বিসর্জন করতে কৃতসংকল্প হলেন তিনি—অতুল যশ, অনুপম গৌরব, অপরিমিত সম্পদ আর দীর্ঘদিনের সুখভোগ ও বিলাসব্যসন। নাগপুর থেকে ফিরে এসে কর্তব্য নিধারণ করতে তাঁর বিলম্ব হলো না। নির্দ্বিধায় সযত্ন-লালিত ভোগবিলাস—যে ভোগবিলাস কিংবদন্তীতে দাঁড়িয়েছিল—ত্যাগ করে তিনি সাজলেন সন্ন্যাসী, ত্যাগের গৈরিক পতাকা উড়ল রসা রোডের সেই ভোগ-নিকেতনের শীর্ষে।

সবাই সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল—মানুষটাই যেন বদলে গেলেন রাতারাতি—আমীর থেকে ফকির, ভোগী থেকে ত্যাগী, তার্কিক থেকে প্রেমিক। কোন একজন মানুষের জীবনে এমন পরিবর্তন, ভিতরে-বাইরে এমন আশ্চর্য রূপান্তর, দেশের জন্য এমন সর্বস্ব ত্যাগ করার দৃষ্টান্ত একালের ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে বুঝি আর কেউ দেখাতে পারেন নি। চিত্তরঞ্জনের জীবনের এই পর্যায়ে তাঁর চরিত্রের যে দিকটা সকলকে বিস্মিত ও চকিত করে দিয়েছিল, সেটা হলো তার সেই বিপুল ত্যাগ। সেই ত্যাগের মহিমা আজো অম্লান।

চিত্তরঞ্জন যখন অসহযোগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হন, তখন তাঁর তুঙ্গে বৃহস্পতি—ধনমান ও প্রতিষ্ঠার শিখরে তিনি। বিপুল পশার। পরিত্যাগ করলেন নানাবিধ প্রিয় অভ্যাস—মদ থেকে তামাক। বর্জন করলেন পোশাক-পরিচ্ছদের বিলাসিতা, যে বিলাসিতা তখন কিংবদন্তীকে দাঁড়িয়েছিল। জনশ্রুতি সি. আর. দাশের জামা-কাপড় সব প্যারিস থেকে কেচে আসত। কথিত আছে, তিনি যখন ব্যারিস্টারি পরিত্যাগ করেন তখন পরের বছরের জন্য বারো লাখ টাকার ব্রীফ তাঁর জন্য তৈরী ছিল—সে-সব মামলা তাঁর পরিচিত বন্ধুদের মধ্যে বিলি করে দিলেন। নাগপুর কংগ্রেসের পর ডমরাঁও রাজার ম্যানেজার অশ্রুতপূর্ব পারিশ্রমিকের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জন সে মামলায় আর দাঁড়ান নি। ত্যাগ একেই বলে। চিত্তরঞ্জনের মধ্যে লর্ড রোনাল্ডসে যে একজন ভারতবর্ষের বিধাতা-পুরুষকে (Man of Destiny) আবিষ্কার করেছিলেন, আমাদের মনে হয় তা যতখানি তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের জন্য, ঠিক ততখানি তাঁর এই অতুলনীয় ত্যাগের জন্য।

ভারতের রাজনীতিতে সেদিন প্রয়োজন ছিল এমনি একজন রাজ-ভিখারীর। কোন্ ঘরছাড়া বিবাগীর বাঁশী শুনে সুখ-বিলাস ও ভোগৈশ্বর্যে আকণ্ঠমগ্ন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর সযত্ন রচিত কাঞ্চন-কমল-কানন ত্যাগ করে একেবারে পথের ধূলায় এসে দাঁড়ালেন তার ইতিহাস কোনদিন কেউ জানবে না বা লিখবে না, কিন্তু ১৯২১ সালের নববর্ষে যেটা তাঁর স্বজাতি প্রত্যক্ষ করল, প্রত্যক্ষ করল সারা ভারতবর্ষের নরনারী বিমুগ্ধচিত্তে, সে ইতিহাস বা সে ছবি তো ভুলবার নয়। কবির লেখনীতে সেই ছবি এইভাবে ফুটেছে :

ছিলে ঘুম-ঘোরে রাজার দুলাল,
জানিতে না কে সে পথের কাঙাল
ফেরে পথে পথে ক্ষুধাতুর সাথে ক্ষুধার অন্ন মাগি,
তুমি সুধার দেবতা 'ক্ষুধা ক্ষুধা' ব'লে
কাঁদিয়া উঠিল জাগি'—
ওগো চির-বৈরাগী।

আঙিয়া তোমার নিলে বেদনার গৈরিক-রঙে রেঙে'
মোহ-ঘুমপুরী উঠিল শিহরি' চমকিয়া ঘুম ভেঙে।
জাগিয়া প্রভাতে হেরে পুরবাসী
রাজা দ্বারে দ্বারে ফেরে উপবাসী ;
সোনার অঙ্গ পথের ধূলায় বেদনার দাগে দাগী।
কে গো নারায়ণ নররূপে এলে নিখিল বেদনাভাগী—
ওগো চির-বৈরাগী।*

আমরা অনুমান করতে পারি, দোদুল্যমানচিত্ত হ্যাম্লেটের মনে যেমন প্রশ্ন জেগেছিল—'To be or not to be'—সেইরকম কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা সংশয় দ্বারা চিত্তরঞ্জনের চিত্ত কিছুমাত্র দোদুল্যমান হয় নি যখন তিনি নাগপুর থেকে ফিরে এসে স্বোপার্জিত সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ করে, শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে সর্বস্ব ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন একাগ্র মন নিয়ে দেশের কাজ করবেন বলে। তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়েছে—সেই বয়সে এমন ত্যাগ একমাত্র দৃঢ়চিত্ত একজন দেশপ্রেমিকের পক্ষেই সম্ভব। সেই যে নাগপুরে গান্ধী তাঁকে বলেছিলেন, 'আমি টাকা চাই না, আমি আপনাকে চাই'—চিত্তরঞ্জনের কাছে বুঝি মনে হয়েছিল যে, গান্ধীর কণ্ঠকে আশ্রয় করেই ভারতমাতা তাঁকে ঐ কথা বলেছেন। তিনি ঠিক সেইভাবেই দেশের কাজে নিজেকে সঁপে দিলেন। এই যে মানসিকতা, এটা বিচারের বিষয় নয়, অনুভবের জিনিস। বাঙালী দেশবন্ধুর এই মানসিকতা ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। তারা কি সত্যিই উপলব্ধি করতে পেরেছে, দেশসেবার যজ্ঞানলে চিত্তরঞ্জন কেমন সহজে স্বীয় বিত্তরাশি আহুতি দিয়েছিলেন আর সেইসঙ্গে রাজোচিত সুখৈশ্বর্য জলাঞ্জলি দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন দীনদরিদ্রের বেশ! এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবনীকার যথার্থই মন্তব্য করেছেন: 'He suspended his practice and renounced the habits of smoking and drinking and

* চিত্তনামা: কাজী নজরুল ইসলাম।

free indulgence in modern luxuries, and began to live the life of a political and spiritual ascetic.'*

সেই নেতৃত্বই সার্থক যা ত্যাগে বিশুদ্ধ, আত্মদানে উজ্জ্বল। বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের পিছনে ছিল ত্যাগ-পরিশুদ্ধ এমনি একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। আজ এই সুদূর কালের ব্যবধানে, এ কথা বলার দিন এসেছে যে, গান্ধী-পরিকল্পিত অসহযোগ আন্দোলনের উপর দেশবন্ধু যদি এমনভাবে তাঁর নিজ নামের মুদ্রাঙ্কিত করে না দিতেন, তা'হলে অত অল্প সময়ের মধ্যে এই আন্দোলন অতখানি সফল হতে পারত কিনা সন্দেহ।

ভারতবর্ষ উপনীত হলো ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে।

নতুন প্রভাতের স্বর্ণদ্বার খুলতে আর দেরি নেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ অঙ্ক থেকেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দৃশ্যপট পরিবর্তিত হতে থাকে। এ পরিবর্তন অনিবার্য ছিল, অবশ্যম্ভাবী ছিল। সে সময়ে ভারতময় যেন একটা ভাঙাগড়ার আয়োজন চলছিল। ইতিহাস-বিধাতার নেপথ্য বিধানেই। বিশ্বের যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি তখন একটা জগৎজোড়া আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছিল। ভারতবর্ষ এসে দাঁড়াল একটা পরিবর্তনের মুখে—সকলেই বুঝল যে বাঁধা পথের নির্বিঘ্নতা বর্জন করার দিন আসন্ন হয়ে এলো। দেশের প্রচলিত রাজনীতি তখন একটা নতুন মোড় নেবার জন্য উৎসুক হয়েছে। পুরাতন রাজনৈতিক অভ্যাসের মূলোচ্ছেদ হবার উপক্রম হলো। আকাশে-বাতাসে নতুনের আহ্বান—'আসে নির্দয় নবযৌবন ভাঙনের মহারথে।' ব্যক্তির ও জাতির ইতিহাসে মাঝে মাঝে তেমন আহ্বান নিয়ে নতুন যুগ এসে থাকে, যখন ছক-বাঁধা পথে অগ্রসর হতে মন আর চায় না। নাগপুরে চিত্তরঞ্জন কি সেই আহ্বান শুনেছিলেন?

---

* *Life and Times of C. R. Das* : Ray

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের ক্রান্তিলগ্নেই বোঝা গেল যে, ভারতবাসী একটা বৃহৎ যুগসন্ধিক্ষণে যেন এসে উপনীত হয়েছে। অতীত রাত্রি অবসান প্রায়। নতুন চেতনার মধ্য দিয়ে নবযুগের অরুণোদয়ের আর বিলম্ব নেই। ইতিহাসের মঞ্চে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক আন্দোলনের মঞ্চে এবার নতুন নাটকের আয়োজন। এই নাটকের সূত্রধর, কুশীলব সবই নতুন। এবার নতুন ধরনের যজ্ঞ। সে যজ্ঞের সমিধ নতুন, হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্যু সবই নতুন, মাতৃপূজার জন্য সবাই রচনা করবেন নতুন অর্ঘ্য। সেই পূজারীবৃন্দের মধ্যে প্রধান ছিলেন দু'জন—মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। এই দুই মহান্ নেতার জীবনের এই পর্বের সঙ্গে ভারতের সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস একসূত্রে বিধৃত বললেই হয়।

নাগপুর থেকে ফিরে এসেই চিত্তরঞ্জন প্রবল উৎসাহে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। রসা রোডের বাড়িটা যেন রাতারাতি নতুন রূপ পরিগ্রহ করল—জাতীয় আন্দোলনের একটি পীঠস্থানে পরিণত হয়ে গেল সেই বাড়ি যা ১৯০৬ সাল থেকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আলোচনার একটি কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিগত জীবনেও দেখা দিল আমূল পরিবর্তন। 'সঙ্গে সঙ্গে কি আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গেল চিত্তরঞ্জনের মধ্যে। সেদিন থেকে মদ ছুঁলেন না, নিরামিষ খেতে ধরলেন। এমন কি যাঁর চুরুটের ধোঁয়া নিভত না, সে চুরুটও ছেড়ে দিয়েছিলেন। আগের দিনের ভোগী পরের দিনে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন।' তামাক ছিল তাঁর নিত্য সহচর। এই তামাক সাজার ভার ছিল ভৃত্য মজফ্‌ফারের ওপর। সে ছাড়া আর কেউ তাঁর মনের মতো তামাক সাজতে পারত না। ঘরে তামাক—বাইরে চুরুট। সবই ছাড়লেন। নাগপুর কংগ্রেসে সুরাপান নিবারণ সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল—

চিত্তরঞ্জন চিরদিনের জন্য মদ্যপানও ত্যাগ করলেন।* 'ধীরে ধীরে ছাড়ুন, একেবারে ছাড়লে শরীর যে ভেঙে যাবে।'—শোনা যায় এর উত্তরে তিনি নাকি বলেছিলেন, 'ছাড়লে একেবারে নির্বিচারে ছেড়ে দেওয়াই উচিত।' মদ-চুরুট তো সামান্য জিনিস—চেষ্টা করলে অনেকের পক্ষে তা ত্যাগ করা অসম্ভব নয়। কিন্তু যেটা একবারেই অসম্ভব—প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দেওয়া, মাসিক পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দেওয়া—চিত্তরঞ্জন নির্দ্বিধায় তাও ত্যাগ করলেন। কিন্তু এইখানেই তাঁর ত্যাগের শেষ ছিল না। সেই যে বলেছিলেন, 'সর্বস্ব ত্যাগ করো'—চিত্তরঞ্জন অক্ষরে অক্ষরে তাই করেছিলেন—নিজের বলতে তিনি কিছুই রাখেন নি—স্ত্রী-পুত্র, বসতবাড়ি, ভোগবিলাসের যাবতীয় উপকরণ—সবই তিনি অকুণ্ঠিত-চিত্তে দেশসেবার যজ্ঞে আহুতিস্বরূপ অর্পণ করেছিলেন। তখন থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে যে প্রচণ্ড গতিবেগ লক্ষ্য করা যায় তার উৎস ছিল এই ত্যাগ। এমন ত্যাগের দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল। এবং এইজন্য দেশবন্ধুর চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে তার এই অতুলনীয় ত্যাগের কথাটা আমাদের বার বার মনে হয়েছে ও আমরা বার বার তার উল্লেখ করেছি।

অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীর মধ্যে এইগুলি ছিল, যথা—১। সরকারী খেতাব ও অবৈতনিক চাকরি ত্যাগ করা; ২। সরকারী দরবার প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগদান না করা; ৩। সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজ থেকে ছাত্রদের ছাড়িয়ে আনা; ৪। আদালত বর্জন করা অর্থাৎ আইন-ব্যবসায় থেকে বিরত থাকা ও ৫। ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন বর্জন করা। তবে তিনটি বিষয়ের উপরে বেশি জোর দেওয়া হয়—আদালত, কাউন্সিল ও স্কুল-কলেজ বর্জন এবং এই ত্রিধা বয়কটের ভিত্তিতে সেদিন গান্ধী এই আন্দোলনকে ব্যাপক করে তুলবেন সম্পূর্ণ অহিংস উপায়ে—এই

* দেশবন্ধুর সঙ্গে পাঁচ বছর : সাতকড়িপতি রায়।

ছিল তাঁর মনের আশা। চিত্তরঞ্জনের প্রথম কাজ ছিল ছাত্র-সমাজকে অনুপ্রাণিত করা। কলকাতায় এসেই তিনি এই সম্পর্কে তিনটি সভায় বক্তৃতা করেন। ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসের ১০ ১১ ও ১৩ তারিখে যথাক্রমে বিডন স্কোয়ার, ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও কুমারটুলি পার্কে এই সভা তিনটি হয়েছিল এবং এর প্রত্যেকটিতে তিনিই ছিলেন সভাপতি। কালো কোট গায়ে ও চটিজুতা পায়ে তাঁর সেই মূর্তি হয়ত অনেকের স্মৃতিপটে আজো অম্লান থাকতে পারে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বক্তৃতায় ছাত্রদের উপদেশ দিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'বাংলার তরুণগণ, তোমরাই তো দেশের একমাত্র আশা, তবে এখনো নিশ্চেষ্ট কেন?' তাঁর এই আবেদন ব্যর্থ হলো না। ১৪ই জানুয়ারী শহরের রাজপথে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল। ঐদিন কলকাতার কলেজের ছাত্ররা কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এলো। ঐদিনই মির্জাপুর পার্কে বিকেলবেলায় ছাত্রদের এক জমায়েতে চিত্তরঞ্জন বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বক্তৃতা শেষ হলে ছেলেরা তাঁকে বললো—আমাদের জন্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করুন। তখন তিনি তাদের বললেন, 'তোমাদের এখন অনেক কিছু করতে হবে,—গ্রামে গ্রামে স্বরাজের বার্তা বহন করে নিয়ে যেতে হবে, পল্লীজীবন গঠনের কাজে ব্রতী হতে হবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা লেখাপড়া করতে চাও তাদের জন্য আমি ন্যাশনাল স্কুল করে দেব।' কলকাতার জাগরণের বন্যা দেখতে দেখতে মফঃস্বলেও প্রবাহিত হলো। এইভাবে দেখা গেল যে, অল্পদিনের মধ্যে বাংলাদেশে মোট ত্রিশ হাজার ছাত্র অসহযোগ করেছিল।

১৯২১, ১৮ই জানুয়ারি।

চিত্তরঞ্জন 'দেশবন্ধু' হলেন।

ঐ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় ওরিয়েন্টাল জীবনবীমা কোম্পানীর কলিকাতা শাখার সেক্রেটারী বিপিনবিহারী দাসগুপ্ত

চিত্তরঞ্জনকে 'দেশবন্ধু' আখ্যা প্রদান করে একখানি চিঠি প্রকাশ করেন। এর কিছুদিন পরেই স্বনামধন্য সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নায়ক' পত্রিকায় 'দেশবন্ধু' এই শিরোনামায় একটি সুন্দর সম্পাদকীয় লেখেন। শ্যামসুন্দরের 'সার্ভেণ্ট' পত্রিকাতেও অসহযোগ-মন্ত্র গ্রহণ করার জন্য চিত্তরঞ্জনকে 'দেশবন্ধু' এই নামে অভিনন্দিত করা হয়। শ্যামসুন্দর লিখেছেন: 'His grateful countrymen has bestowed on Chittaranjan the title of Deshbandhu (Friend of his country) and none deserves it rightly as he.' তখন থেকেই বাংলা তথা ভারতের জনসাধারণের কাছে তিনি এই নামেই পরিচিত হয়ে উঠতে থাকেন। আধুনিক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনি এই নামেরই মুদ্রাঙ্কিত করে গিয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথ 'রাষ্ট্রগুরু' হয়েছিলেন। টিলক 'লোকমান্য' হয়েছিলেন আর আজ চিত্তরঞ্জন হলেন 'দেশবন্ধু' এবং গান্ধী হলেন 'মহাত্মা'। আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এই চারিটি ঘটনাই মনে রাখবার মতো। কারণ আমাদের জাতীয় জীবনে রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশে এই চারজন রাষ্ট্রনেতার ত্যাগ ও দেশপ্রেম সমান শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণযোগ্য।

ব্যারিস্টার সি. আর. দাশ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশে পরিণত হলেন। কথিত আছে, এই সময়ে তাঁর বন্ধুস্থানীয় একজন রহস্যচ্ছলে তাঁকে বলেছিলেন, "চিত্ত, 'দেশবন্ধু' কথাটার মানে জানো? অভিধানে চণ্ডালকে দেশবন্ধু বলা হয়েছে। তোমাকে শেষ পর্যন্ত তোমার দেশের লোক একেবারে চাঁড়াল বানিয়ে দিল।" পরিহাস-রসিক চিত্তরঞ্জন হেসেই উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি তো চাঁড়ালই—পরাধীন ভারতে আমরা সবাই চণ্ডাল।' তাঁর বিপুল ত্যাগের জন্যই দেশবাসীর হৃদয়ে তিনি দেশবন্ধুরূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু সকলের কাছে তার এই ত্যাগের দৃষ্টান্ত সহজে স্বীকৃতি লাভ

করে নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি এই সময়ে চিত্তরঞ্জনের ত্যাগ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে অমৃতবাজার পত্রিকায় তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। ১৮ই জানুয়ারী মির্জাপুর পার্কের সভায় দেশবন্ধু তার জবাব দেন। বলেন, 'গত দু'-তিন বছর ধরেই আমি পাগলের মতো দেশচিন্তায় কত বিনিদ্র রজনী যাপন করেছি, প্র্যাকটিস্ না ছাড়লে একাত্মমনে যে দেশসেবা করতে পারব না, তাও ভেবেছি। আমি সর্বস্ব ত্যাগ করেই এখন দেশের কাজে ব্রতী হয়েছি। এতে যদি কারো মনে কোন সন্দেহ জেগে থাকে, সন্দেহ নিরসন করতে প্রস্তুত আছি।'

ক্রমে দেশবন্ধু তাঁর চারদিকে বিপুল কর্মের আবর্ত রচনা করে লক্ষ্য সাধনে অগ্রসর হতে থাকেন। দিন-রাত খালি কাজ আর কাজ —যেমন করেই হোক বাংলার বুকে অসহযোগের বন্যাস্রোত বহিয়ে দিতে হবে। স্বদেশী আন্দোলনের দৃষ্টান্তটা ছিল তাঁর সামনে। আজ জীবন-সায়াহ্নে তিনি বাংলাদেশে সেইরকম একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে কৃতসংকল্প হলেন। তাঁর সেই সংকল্পকে চরিতার্থ করবার জন্য তাঁর জীবনের শেষের চার বছর বিশ্রাম কাকে বলে তা তিনি জানতেন না। টাকাকড়ি ত্যাগ হয়ত অনেকের কাছে তেমন কিছু মনে হয় নি, কিন্তু এমনভাবে দেশের জন্য দধীচির মতো আত্মত্যাগ আর কে দেখাতে পেরেছেন? তিনি সত্যিই জীবনসিন্ধু মন্থন করে অমৃতবারি এনেছিলেন। কিন্তু তার সম্পূর্ণ ইতিহাস নেই। গান্ধীর যেমন মহাদেব দেশাই বা প্যারেলাল ছিলেন, দুঃখের বিষয়, দেশবন্ধুর তেমন একজন সহচর কেউ ছিলেন না। যদি থাকতেন তাহলে তাঁর জীবনের সেই কয় বছরের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া যেত। এর-ওর-তার টুকরো টুকরো স্মৃতিকথায় যা পাওয়া যায় তা সামান্যই।

২৬শে জানুয়ারি, রবিবার, ১৯২১।

মির্জাপুর পার্কে বিরাট জনসভা হলো। সমসাময়িক বিবরণ

থেকে জানা যায় যে, ত্রিশ-চল্লিশ হাজার লোকের সমাবেশ হয়েছিল এই সভায়। মতিলাল নেহরু, গান্ধী, মৌলানা মহম্মদ আলি ও দেশবন্ধু এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে একটি মানুষের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন মাত্র এই অল্পদিনের মধ্যে কি রকম দানা বেঁধেছে গান্ধী তা স্বচক্ষে দেখে গেলেন। কলকাতায় গান্ধীর এইবারকার উপস্থিতির সময়ে একটি ঘটনা বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। দেশবন্ধুর কোন জীবনীকার এটির উল্লেখ করেন নি। আগেই বলেছি, দেশবন্ধুর অনুরোধক্রমে বাংলার যুগান্তর ও অনুশীলন উভয় দলের বহুসংখ্যক বিপ্লবী নাগপুর কংগ্রেসে ডেলিগেট হয়ে গিয়েছিলেন। গান্ধীর অহিংসাবাদে এঁদের বিশ্বাস ছিল না এবং এটা তাঁরা বুঝতেও চান নি। তারপর নাগপুর থেকে চিত্তরঞ্জন যখন অসহযোগী হয়ে ফিরলেন তখন পূর্ণ দাস, পুলিন দাস প্রভৃতি তৎকালীন বিপ্লবী নেতারা তাঁকে বলেন যে, এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করার আগে তাঁরা একবার গান্ধীর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হতে চান এবং দেশবন্ধুকে এই বৈঠকের ব্যবস্থা করার জন্য তাঁরা অনুরোধ করেন।

বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে দেশবন্ধুর ছিল প্রাণের যোগ। আর সে যোগ ছিল সন্ত্রাসবাদের সূচনাকাল থেকেই। অর্থ দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে তিনি এঁদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। এঁদের বাদ দিয়ে যে বাংলায় অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপকভাবে সফলতা লাভ করতে পারবে না, একথা তাঁর জানা ছিল। তাই তাঁর রসা রোডের বাড়িতে এই সময়ে (সেপ্টেম্বর, ১৯২১) গান্ধীর সঙ্গে বিপ্লবীদলের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক বসেছিল। সেই বৈঠকে গান্ধী যা বলেছিলেন তার সারমর্ম এই :

'তোমার বিপ্লবী দল মুষ্টিমেয়, তোমরা জীবন পণ করতে পার, কিন্তু এইভাবে চুরি করে অস্ত্রসংগ্রহ করে ব্রিটিশরাজের বিশাল সৈন্যের কি করতে পারবে? আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশবাহিনীর সঙ্গে অস্ত্রযুদ্ধ—

armed fight—অসম্ভব। কিন্তু যদি অহিংসা পন্থা গ্রহণ কর, তবে অহিংসভাবে বিপ্লবের বাণী গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে পারবে। লুকিয়ে কিছু করতে হবে না। প্রকাশ্যে গ্রামবাসীদের বোঝাও, ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগ কর, এতেই গণজাগরণ হবে। যদি অধিকাংশ ভারতবাসী চায় ইংরেজ চলে যাবে, ইংরেজ চলে যেতে বাধ্য হবে। পশুবল দিয়ে ইংরেজের সঙ্গে না লড়ে, মানসিক বল, আত্মিক বল দিয়ে লড়াই কর।'

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : 'সেদিন আমাদের অনেকের কাছেই মনে হয়েছিল যে, শান্তির এই শ্রুতিমধুর বাণী অথবা অহিংস অসহযোগ নীতি দেশকে ভবিষ্যতে নির্বীর্য করে দেবে।' তারপর গান্ধীর ইচ্ছাক্রমে পুলিন দাসের সঙ্গে তাঁর এই বিষয়ে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়। গান্ধী ইতিপূর্বে পুলিন দাস ও অনুশীলন সমিতি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলেন এবং তিনি যে অহিংস অসহযোগ সমর্থন করেন না, তাও গান্ধী জানতেন। তিনি পুলিন দাসের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে ইচ্ছা করেছিলেন। এই স্মরণীয় সাক্ষাৎকারের বিবরণ পুলিন দাস স্বয়ং এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন :

'ব্যারিস্টার সুবোধ রায় ও ব্যারিস্টার হিমাংশু বসু আমাকে সঙ্গে করিয়া সি. আর. দাশের বাড়িতে যাইয়া গান্ধীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ আলোচনার পর গান্ধী জানাইলেন যে, তিনি রুদ্ধদ্বার কক্ষে আমার সহিত আলোচনা করিবেন, এবং হয় তিনি আমাকে তাঁহার মত গ্রহণ করাইবেন, নতুবা তিনিই আমার মতে দীক্ষিত হইবেন। সেই সময় মতিলাল নেহরুও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন যে, তুমি যখন দাশকেই তোমার স্বমতে আনিতে পারিয়াছ তখন পুলিন দাসকে তো অতি সহজেই স্বমতে আনিয়া ফেলিবে। তখন গান্ধী কিন্তু বলিয়া ফেলিলেন, না হে না, এই ক্ষেত্রে একটু শক্ত পাল্লায়ই পড়িয়াছি।'

'আমাদের গুপ্ত আলোচনা তিনদিন চলিয়াছিল। গান্ধী বলিলেন, তোমরা বৈপ্লবিক পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলে, তাহাও ব্যর্থ হইল, এইবারে অহিংসা অসহযোগ নীতি গ্রহণ কর। তোমরা নিশ্চয়ই স্বাধীনতা লাভ করিবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, অহিংসা অসহযোগ-নীতি গ্রহণ করিলেই যে, স্বাধীনতা পাইব তাহারই বা কি যুক্তি আছে? অধিকন্তু আমাদের বৈপ্লবিক পন্থা ব্যর্থ হইয়াছে একথাও আমি স্বীকার করতে পারি না। আমাদের প্রচেষ্টার প্রভাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে বিচলিত হইয়াছিল—তাহার ফলেই বঙ্গভঙ্গ রদ হইয়াছে, মণ্টেগু-সংস্কার আনিয়াছে। গান্ধী বলিলেন, কিন্তু স্বাধীনতা তো পাও নাই। সুতরাং তোমাদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আমি বলিলাম, ব্যর্থই হইয়াছে, একথা আমি স্বীকার করিতে পারি না।…আমরা বিশ্বাস করি যে পৃথিবীতে কোন কালে কোনও পরাধীন দেশই বিপ্লব ও যুদ্ধ-বিদ্রোহাদি ব্যতীত স্বাধীন হইতে পারে নাই।…তখন গান্ধী আমাকে স্বাধীনতার স্বরূপ বুঝাইলেন; বলিলেন, আত্মার স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। আমি বলিলাম, এইরূপ স্বাধীনতার প্রতি আমরা আকৃষ্ট নই। গান্ধী বারে বারে একই কথা বলিতে থাকেন—অহিংস অসহযোগ আন্দোলন অগ্রসর হইতে থাকিলে উহা দ্বারাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর হইবে। আমার সেই একই উত্তর—আমরা কিন্তু সেইরূপ মনে করি না। এই সুদীর্ঘ আলোচনাকালে গান্ধী কখনো উত্তেজিত, কখনো কুপিত আবার কখনো একটু বিমর্ষ হইয়াছিলেন। শেষের দিন একটু বিরাগভাবেই ভ্রূকুটিসহ বলিয়া উঠিলেন—প্রথমেই যদি স্থির বিশ্বাস না জন্মে তবে যুক্তি চলিতে পারে না। এইখানে আমিও নিরস্ত হইলাম।'*

বাংলার বিপ্লবীরা গান্ধীর অহিংসবাদ গ্রহণ করে নি। পুলিন দাস তাঁর আত্মচরিতে আর একদিনের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সেদিন দেশবন্ধুর বাড়িতে গান্ধী মোপলা-বিদ্রোহের কথা আলোচনা করেছিলেন। তখন সেখানে অনুশীলন সমিতির কয়েকজন সভ্য এবং সৌকত আলি ও কয়েকজন মুসলমান নেতা উপস্থিত ছিলেন। মোপলারা বলপ্রয়োগ ও ভীতিপ্রদর্শন করে সেই সময়ে অনেক হিন্দুদের মুসলমান করেছিল। গান্ধী তারই ভয়াবহ বিবরণ আলোচনা করেছিলেন। পুলিন দাস লিখেছেন:

'গান্ধী অহিংসা নীতির গুণকীর্তনে রত হইলে একজন মুসলমান নেতা বলিয়া উঠিলেন, আমি আমার ধর্মের জন্য প্রয়োজন হইলে অহিংস থাকিতে

* আত্মচরিত: পুলিন দাস

পারিব না। গান্ধী বলিলেন, হাঁ, হাঁ, আমি ত তোমাকে সেই অধিকার পূর্বেই দিয়াছি। তৎক্ষণাৎ একজন হিন্দু যুবক দাঁড়াইয়া বলিল, তবে আমরাও আমাদের ধর্মের জন্য প্রয়োজন হইলে হিংসানীতি অবলম্বন করিতে পারিব। গান্ধী জানাইলেন, না, না, তোমরা পারিবে না। কারণ হিন্দুধর্মে হিংসা সর্বতোভাবেই নিষিদ্ধ, মুসলমান-ধর্মে হিংসার স্থান আছে। তখন যুবকটি বলিল, আমাদের গীতার মধ্যেও ত হিংসার স্থান আছে। গান্ধী প্রবল আপত্তি জানাইলে ও বলিলেন, তোমরা গীতার যা অর্থ কর, আসলে উহার অর্থ ভিন্ন। আমি ভালভাবেই গীতা পড়িয়াছি।'

গান্ধীর এই অদ্ভুত যুক্তি—এক সম্প্রদায়ের হিংসায় অধিকার থাকবে আর অন্য সম্প্রদায়ের থাকবে না—বিপ্লবীরা মেনে নিতে পারে নি। দেশবন্ধু দেখলেন, তিনি যে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করতে চলেছেন, তাতে যদি বাংলার বিপ্লবীদের সহযোগিতা না পান তাহলে আন্দোলন সফল হবে কিনা সন্দেহ। বিপ্লবীদের উপর তার অসীম প্রভাব ছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'যখন দেশবন্ধু আমাদের কাছে অনুরোধ করলেন অসহযোগ আন্দোলনে তাঁকে সহায়তা করতে তখন আমরা রাজী হয়েছিলাম। তিনি আমাদের বলেছিলেন তোমরা আমার পিছনে না দাঁড়ালে আমি কেমন করে এই আন্দোলন চালাব।' আসল কথা, দেশবন্ধু একদিকে যেমন অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন, তেমনি বিপ্লবীদেরও তিনি গোপনে প্রকাশ্যে গভীরভাবে স্নেহ করতেন ও সাহায্য করতেন। বিপ্লবীরা তাঁর ডাকেই ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন হিসাবেই অসহযোগে যুক্ত হয়েছিলেন। এবং আজ একথা বলবার দিন এসেছে যে, সেদিন অসহযোগ আন্দোলনের প্রাক্কালে বাংলার বিপ্লবীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা যদি দেশবন্ধু না পেতেন, তাহলে ঐ আন্দোলন অতখানি সফল হতো কিনা সন্দেহ। দেশবন্ধুর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের ইহা একটি বড় দৃষ্টান্ত বলেই এখানে এই ঘটনাটি উল্লেখ করলাম।

দেশবন্ধুর কোন জীবনীকার বাংলায় অসহযোগ আন্দোলন প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ করেন নি। সেটি দেশবন্ধু-নজরুল সম্পর্কের কথা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্য-জগতের নৈঋত কোণে হঠাৎ দেখা গেল একখণ্ড কালো মেঘ। ধীরে ধীরে সেই মেঘ পরিব্যাপ্ত হয় বাংলার সাহিত্যাকাশে। শোঁ শোঁ শব্দে তার তান উঠল 'বিষের বাঁশীতে', তার রুদ্রঝঙ্কার মন্দ্রিত হয়ে উঠল, 'অগ্নিবীণায়'। রবিকর-দ্যুতিতে উদ্ভাসিত বাংলা কাব্যগগনে উদিত হলেন বিদ্রোহী কবি 'দুঃখু মিঞা।' কণ্ঠে তাঁর নতুন সুর :

রবিশশীতারা প্রভাত সন্ধ্যা তোমার আদেশ বহে
এই দিবারাতি আকাশ-বাতাস নহে এরা কারো নহে—

সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে নজরুলের প্রত্যক্ষ কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না সত্য কিন্তু যেটুকু ছিল ও দেশবন্ধুর সাহচর্যে যার প্রকাশ দেখা গিয়েছিল, তা অস্বীকার বা উপেক্ষার জিনিস নয়। নবযুগের চারণ-কবি নজরুল এবং এই ক্ষেত্রে সেদিন তাঁরই ছিল অগ্রণী ভূমিকা। স্বদেশীযুগে রবীন্দ্রনাথের যে ভূমিকা ছিল, অসহযোগের দিনে বিদ্রোহী কবি নজরুলেরও ঠিক সেই ভূমিকা ছিল। পরাধীনতার অসহ্য যন্ত্রণা, মানুষের মধ্যে মানুষের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যে তাঁর অন্তরের বিদ্রোহী কবি-সত্তাকে সেদিন যেভাবে অস্থির করে তুলেছিল তার পরিচয় বাঙালী পেয়েছিল। দেশবন্ধুর ত্যাগ আমাদের স্তিমিত প্রাণে যে প্রেরণা ও আলোড়ন এনে দিয়েছিল ঠিক তেমনি ধরনের একটা তীব্র অনুভূতি এনেছিলেন নজরুল সেই একই সময়ে তাঁর দেশপ্রেমমূলক গান ও কবিতার মধ্যে।

ইংরেজের শাসনকে শোষণ বলে নজরুলই প্রথম তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠে ধিক্কার জানিয়েছিলেন তাঁর 'বিদ্রোহী' ও 'ফরিয়াদ' কবিতা দুইটিতে। নজরুলের বিদ্রোহী কবিসত্তার পশ্চাৎপটে আছে ভারতের সেদিনকার

মুক্তিসংগ্রাম যার পুরোভাগে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। সেদিন আমরা দেশবন্ধুর পাশে বহু সভা-সমিতিতে নজরুলকে দেখেছি, যদিও গান্ধীর অহিংস অসহযোগ-মন্ত্রে তিনি যে খুব বেশি আস্থা পোষণ করতেন তা নয়। নেতা হিসাবে তিনি মানতেন দেশবন্ধুকেই, আর কাউকে নয়। এবং কেন যে মানতেন তা দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে রচিত তাঁর 'ইন্দ্রপতন' শীর্ষক সুদীর্ঘ কবিতাটির মধ্যে কবি অতি মর্মস্পর্শী ভাষাতেই বলেছেন। বাংলার সমকালীন আর কোন কবির লেখনী থেকে আমরা দেশবন্ধু সম্পর্কে এমন সুন্দর কবিতা পাই নি। দেশবন্ধুও নজরুলকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, বাসন্তী দেবীও। দেশবন্ধুর অনুরোধেই নজরুল তাঁরই মতো সেদিন সারা বাংলাদেশ ঘুরে স্বরচিত গান ও কবিতার মাধ্যমে অসহযোগের বাণী প্রচার করেছিলেন। দেশবন্ধুর সঙ্গে নজরুলের প্রথম যোগাযোগের বিবরণটা এই :

'১৯২১ সালের বিরাট অসহযোগ আন্দোলন তখন চলছিল। তারই জন্য একটি গান লেখার অনুরোধ করা হয়েছিল দেশবন্ধুর তরফ থেকে। তিনি তাঁর 'ভাঙার গান' কবিতাটি লিখেছিলেন ১৯২১ সালের জুলাই মাসে, কুমিল্লা থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পরে। আমার সামনেই দাশ-পরিবারের শ্রীসুকুমার-রঞ্জন দাশ 'বাংলার কথা'র জন্য একটি কবিতা চাইতে এসেছিলেন। শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী ও দেশবন্ধু তাঁকে কবিতার জন্য পাঠিয়েছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তখন জেলে থাকতেন ও সেখান থেকেই নজরুলের কাছে কবিতা চাইবার জন্য বাসন্তী দেবীকে বলেন। এই কবিতা ('কারার ঐ লৌহ কবাট') 'বাংলার কথায়' ছাপা হয়েছিল। এই কবিতার জন্য বাসন্তী দেবীর ছয় মাসের জেল হয়েছিল। অহিংস অসহযোগের যুগে আন্দোলনের নেতা দেশবন্ধুর কাগজে এই কবিতা প্রকাশিত হওয়ার জন্য তৎকালীন অহিংসবাদী কংগ্রেসীরা খুব চটে গিয়েছিলেন। কিন্তু দেশবন্ধু নজরুলকে আশীর্বাদ করেছিলেন।'

'নজরুল অবশ্য প্রায়ই বাসন্তী দেবীর ওখানে খেতে যেতেন ; আর দেশবন্ধু যখনই সময় পেতেন তখনই গান শোনাবার জন্য তাকে আমন্ত্রণ করতেন। দেশবন্ধু জেল থেকে মুক্তি পেয়ে নজরুলকে পূর্বাপেক্ষা আরো গভীর স্নেহ দেখাতে

শুরু করেন। এইজন্যই তাঁর মৃত্যুতে নজরুল স্নেহহারা হয়ে তাঁর ওপর এত ভাল ভাল কবিতা ও গান লিখেছিলেন। নারায়ণ পত্রিকায় তাঁর অনেকগুলি কবিতা ছাপা হয়েছিল; তখন নজরুলের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের সাক্ষাৎ-পরিচয় না থাকলেও, লেখার শক্তির জন্য তখন থেকেই তাঁর ওপর তাঁর নজর পড়েছিল।'*

পরবর্তীকালে গান্ধী যখন আচম্বিতে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন তখন দেশব্যাপী সেই অবসন্নতার দিনে 'ধূমকেতুর' নজরুল বিশেষভাবেই স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ শিরে ধারণ করে 'ধূমকেতুর' আবির্ভাব হয়েছিল জাতিকে নবীন মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়ার জন্য। সেদিন নজরুলকণ্ঠে আমরা শুনেছিলাম:

জাগোরে জোয়ান! ঘুমায়ো না ভুয়া শান্তির বাণী শুনি।
সূতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই বসে বসে কাল গুনি
জাগোরে জোয়ান! বাত ধরে গেল মিথ্যার জাল বুনি।

নজরুলের এই দৃপ্ত আহ্বান সেদিন কলকাতার একজন তরুণ সাড়া দিয়েছিলেন। তিনি গোপীনাথ সাহা। এই গোপীনাথকেই নজরুল বলেছিলেন: 'সমগ্র ইংরেজ-সমাজ আমাদের শত্রু। তাদের ভাসিয়ে দিতে হলে চাই প্রাণবন্যা। তারই আবাদ করছি আমি ধূমকেতুর পৃষ্ঠায়।' ডে—সাহেবের হত্যাকাণ্ড এর পরের ঘটনা। দেশে যখন সমস্ত আন্দোলন একরকম থিতিয়ে এসেছিল, তখন বাংলায় যে-সব তরুণ মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল, তার প্রেরণা এসেছিল ধূমকেতু থেকেই। অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে এমন অনলবর্ষী অভিযান সমকালীন ভারতের আর কোন সাময়িক পত্রিকায় দেখা যায় নি। কথিত আছে, ধূমকেতু চালাবার জন্য হেমন্তকুমার সরকারের হাত দিয়ে দেশবন্ধু নজরুলকে এককালীন কিছু টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকা হাতে নিয়ে নজরুল বলেছিলেন 'ফকিরের দান, মাথায় করে নিলাম।' দেশবন্ধু তখন সত্যিই নিঃস্ব,

---

* নজরুল স্মৃতিকথা: মুজাফ্‌ফর আহ্‌মেদ। এর মধ্যে তথ্যগত কিছু ভুল আছে। দেশবন্ধু ধৃত হন ১৯২১-এর ১০ই ডিসেম্বর; তাঁর কারাদণ্ড হয় ১৯২২-এর ৬ই জানুয়ারী। বাসন্তী দেবীর তখনো কারাদণ্ড হয় নি।

ফকির। সরকারের রোষদৃষ্টি পড়ল নজরুলের উপর। রাজদ্রোহের অপরাধে তিনি ধৃত হলেন (১৯২৩) এবং বিচারে তার একবছর জেল হয়।

হেমন্তকুমার সরকারের মুখে শুনেছি যে, হুগলী জেলে নজরুল যখন অনশন ধর্মঘট করেছিলেন তখন দেশবন্ধু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন। তিনি হেমন্তবাবুকে হুগলী জেলে চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে নজরুলকে অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে বলেন। কিন্তু নজরুল তাঁর সংকল্পে দৃঢ় থাকেন। তখন দেশবন্ধু নজরুল সহ হুগলী জেলের রাজবন্দীদের জন্য প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করে দাবীদাওয়া আদায় করায় পরে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। নজরুল-দেশবন্ধু প্রসঙ্গে কবির বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু, বন্ধুবর প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় এক পত্রে আমাকে জানিয়েছেন, 'নজরুলকে দেশবন্ধু যথেষ্ট ভালবেসেছিলেন। তখন প্রায় তাঁর প্রতিটি সভাতেই নজরুলকে সঙ্গে রাখতেন। বাসন্তী দেবী নজরুলকে নিয়ে খাওয়াতেন, মাতার স্নেহে কবিকে আদর করতেন। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গেও নজরুলের গভীর সখ্যতা ছিল। দেশবন্ধু একদিকে যেমন অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন, তেমনি তিনি বিপ্লববাদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। নজরুল এই জন্যই দেশবন্ধুর মতাদর্শকে ভালবেসে সাধ্যমত গান্ধীর আন্দোলনে যুক্ত থেকে কাজ করেছিলেন।' প্রাণতোষ বাবু অসহযোগ আন্দোলন ও বাংলার বিপ্লবীদের প্রসঙ্গে আমাকে আর একটি পত্রে বলেছেন: ১৯২১ সাল থেকে দেশে যে আন্দোলনের ধারা বইতে থাকে তাতে বিপ্লবীরা সদলে গান্ধী আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন অহিংসা সংগ্রামে কোন বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও। কারণ ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামকে জোরদার করার জন্যও বটে, আর বিপ্লবী দলকে পুষ্ট করার জন্যও বটে।' লেখকও এই মত সমর্থন করেন। দেশবন্ধু ভিন্ন বাংলার বিপ্লবীদের অহিংস সংগ্রামে আকর্ষণ করা সেদিন আর কারো পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না।

॥ উনিশ ॥

বন্যার স্রোতের মতোই দুর্বার বেগে প্রবাহিত হলো অসহযোগ আন্দোলন সারা বাংলা দেশে। সেই স্রোতোধারাকে ভগীরথের মতো পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন দেশবন্ধু। তার আনুপূর্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থের দরকার। নাগপুর থেকে ফিরে এসেই তিনি যৌবনের সতেজ শক্তি নিয়ে এই আন্দোলনে ঝাঁপ দিলেন। ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে গান্ধী কলকাতায় এসে দু'সপ্তাহকাল অবস্থান করেছিলেন। আগেই বলেছি দেশবন্ধু প্রথমে আহ্বান জানিয়েছিলেন কলকাতার ছাত্রদের। তাঁর সে আহ্বান ব্যর্থ হয় নি। তাঁর উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনে মহানগরীর ছাত্রসমাজ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। বাংলা দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম বঙ্গবাসী, রিপন, সিটি ও বিদ্যাসাগর—এই চারটি প্রধান বেসরকারী কলেজের ছাত্ররা কলেজ বর্জন করে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। ১৪ই জানুয়ারি এক বিরাট সভায় দেশবন্ধু ছাত্রদের বললেন: 'একবছর কি দু'বছর তোমরা লেখাপড়া স্থগিত রাখতে পার, কিন্তু স্বরাজ-সংগ্রামে তোমাদের এখানে যোগদান করতে হবে। শুধু কলেজ ছাড়লেই হবে না, গঠনমূলক কাজও করতে হবে তোমাদের। দেশের তরুণরা যদি এইভাবে এগিয়ে আস তাহলে পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে দেশ স্বাধীন হবেই।'

তারপর যখন কতকগুলি ছাত্র জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য তাদের দাবী জানাল, তখন দেশবন্ধু একমাসের মধ্যেই তাদের দাবী পূরণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এইরকম একটা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তিনি অগ্রণী হলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতার কয়েকটি শিক্ষায়তনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই জাতীয় প্রচেষ্টায় কিন্তু কেউই উৎসাহ দেখালেন না, অনেকে

আবার এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহও প্রকাশ করলেন। তখন দেশবন্ধু মনে করলেন যে, ছেলেদের জন্য একটি নতুন জাতীয় বিদ্যালয়ই তিনি খুলবেন। স্কুল খুলতে হলে বাড়ি দরকার। অনেক অনুসন্ধানের পর ১১ নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 'ফোরবেস্ ম্যানসন্' ভাড়া নেওয়া হলো। মাসিক দু'হাজার টাকা ভাড়ায়। এইখানেই ৪ঠা ফেব্রুয়ারি গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন ও জাতীয় মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্বোধন করেন মহাত্মা গান্ধী। সেদিন দেশবন্ধু উপস্থিত থাকতে পারেন নি; তিনি একটু অসুস্থ ছিলেন। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতিলাল নেহরু ও মৌলানা আবুলকালাম আজাদ এই শুভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা সকলেই দেশবন্ধুর এই প্রয়াসের জন্য তাঁকে অভিনন্দিত করেন।

'ফোরবেস্ ম্যানসন্' পাঁচতলা বাড়ি।

এইখানেই অসহযোগের বিরাট কর্মযজ্ঞের সূচনা।

এখানেই নবীন বাংলার এক নতুন নেতৃত্বের অভ্যুদয়।

এইখানেই নবীন ভারতের রাজনীতিতে বিরচিত হয় এক নতুন ইতিহাস। সে ইতিহাসের নায়ক—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। আর সেই ইতিহাসেরই দিগন্তে সেদিন আর একটি বিদ্রোহী তরুণের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁকে দেশবন্ধুর মানসপুত্র বলা যেতে পারে—বলা যেতে পারে তাঁর রাজনৈতিক ভাবধারার প্রধান উত্তরসাধক। তিনি সুভাষচন্দ্র। ফোরবেস্ ম্যানসনে খোলা হলো গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন; তিনরকম পরীক্ষার ব্যবস্থা হলো এখানে—আদ্য, মধ্য ও উপাধি। এই বিদ্যায়তনের প্রথম প্রধান অধ্যক্ষ হলেন অধ্যাপক জে. এল. ব্যানার্জী (জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)। ইনি দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। পূর্বে ইনি সুরেন্দ্রনাথের বেঙ্গলী পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন আর বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপনা করতেন। একজন সুবক্তা হিসাবে ইনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এইভাবে জেলায় জেলায় জাতীয় বিদ্যালয়

খোলা হয়। পাঠ্যপুস্তক সর্বত্র প্রায় একই। কেবল পরীক্ষা-কেন্দ্র হলো কলকাতার এই সর্ববিদ্যায়তন। তারপর শ্যামাদাস কবিরাজকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন বৈদ্যশাস্ত্র পীঠ। সেই সময় মেডিকেল কলেজ ও ক্যাম্বেল থেকেও অনেক ছাত্র অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। তাদের শিক্ষার কি হবে? ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস, বিপিনচন্দ্রের বন্ধু, প্রতিষ্ঠাবান চিকিৎসক অথচ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে ইনি ও বিপিনচন্দ্র স্বদেশসেবার প্রথম দীক্ষা নিয়েছিলেন—এসব কথা জানতেন দেশবন্ধু। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি আলোচনা করলেন এবং তাঁরই কর্তৃত্বাধীনে ঐ ম্যানসনেই ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনষ্টিট্যুট (জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান পরিষদ্) স্থাপিত হয়। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন সুন্দরীমোহন। তাঁর মুখে শুনেছি যে, দেশবন্ধু যখন তাঁর কাছে এই প্রস্তাব নিয়ে আসেন তখন তাঁকে দেশবন্ধু বলেছিলেন—'আপনার যোগ্য বেতন দিতে পারি, এমন সাধ্য কিন্তু আমার নেই, তবে আপনাকেই এটা গড়ে তুলতে হবে।' দেশবন্ধুর কথার উত্তরে সুন্দরীমোহন তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনি অত ত্যাগ করতে পারলেন, আর আমরা কিছু পারব না! আমি আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।' সেইদিন থেকে তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস কিভাবে তাঁর প্রতিভা ও পরিশ্রম দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটিকে একটি প্রথম শ্রেণীর বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজে পরিণত করেন, সে ইতিহাস সুবিদিত। এজন্য তিনিও কম ত্যাগ স্বীকার করেন নি। ত্যাগ যখন সত্যিকার ত্যাগ হয়, তখন তা অনেকের চিত্তকেই যে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, দেশবন্ধুর ত্যাগটাই তার একটা বড় দৃষ্টান্ত। উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শাশ্বত দৃষ্টান্ত।

অসহযোগের মন্ত্র প্রচারের জন্য ফেব্রুয়ারির শেষভাগ থেকে

শুরু করে জুলাই মাস পর্যন্ত দেশবন্ধুকে সমগ্র পূর্ববঙ্গে অশ্রান্তভাবে ভ্রমণ করতে দেখা যায়। ললাটে ত্যাগের বিভূতি আর পরিধানে সামান্য বেশভূষা—চিত্তরঞ্জন ছুটলেন পূর্ববাংলার দিকে। তাঁর আগে আগে চলেছে তাঁর অতুলনীয় ত্যাগের বার্তা। ব্যারিস্টার সি. আর. দাশ—লক্ষ্মীর কমলবনে যিনি বাস করতেন, যাঁর ভোগবিলাস ও ঐশ্বর্য ছিল ইন্দ্রতুল্য—সেই মানুষ এখন দেশের কাজে জনসাধারণের মধ্যে নেমে এসেছেন—এই সংবাদ সেদিন পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্রের কূলে কূলে যে শিহরণ জাগিয়েছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না, তা শুধু হৃদয়-মন দিয়ে অনুভব করতে হবে। পূর্ব-বাংলার শহরে শহরে সেদিন কি উত্তেজনা, কি আগ্রহ জেগেছিল দেশবন্ধুকে দেখবার জন্য, তাঁর কথা শুনবার জন্য, তা আজ এই সুদূরকালের ব্যবধানে, আমরা সহজে অনুমান করতে পারব না। নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, মৈমনসিংহ, টাঙ্গাইল, মৌলবীবাজার, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি স্থান নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এই সময় তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন। এই বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার কারণ ছিলেন শুধু দেশবন্ধু, গান্ধী নন। নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকায় জাতীয় বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয় এই সময়ে। দিকে দিকে জাগরণ, দিকে দিকে চাঞ্চল্য। স্বদেশী আন্দোলনের পর এমন ঘটনা আর কেউ প্রত্যক্ষ করে নি। সত্যিই যেন একটা উচ্ছল ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণপ্রবাহ সেদিন বয়ে গিয়েছিল পূর্ব-বাংলার জেলায় জেলায়।

এই প্রসঙ্গে স্বনামধন্য অধ্যাপক ও প্রখ্যাত অসহযোগী নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন: 'The visit of C. R. Das to Chittagong had far-reaching results with respect to the future destinies of not only my own personal life but of hundreds and thousands of lives in the Divison of Chittagong.…

It was the high-tide of Non-co-operation agitation, when enthusiasm broke all bounds and there was a fever-heat in the Nation's pulse, urging large multitudes into frenzied ecstasy and uttermost abandon in activity that threw all calculation to the winds.'*

দেশবন্ধুর স্থির বিশ্বাস ছিল, বাংলার যুবক-সম্প্রদায়কে ত্যাগের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ও উদ্দীপ্ত করতে পারলে তারা অসাধ্য সাধনে সমর্থ হবে এবং তিনি তাদের দিয়ে বাংলার ঘরে ঘরে অসহযোগের আদর্শ ও বার্তা প্রচার করতে সক্ষম হবেন। তাঁর পূর্ব-বাংলা সফরের এইটাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের কাছে তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন এই সময়ে এবং সাড়াও পেয়েছিলেন উভয়ের কাছ থেকে আশাতীতভাবে। সাড়া পেলেন আইন-ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও। যখন সেখানে পদার্পণ করেন সেখানেই উত্তেজনার সঞ্চার হতে থাকে। মফঃস্বলের ছাত্ররা স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করে চরকা-কাটা, খাদি তৈরি করা ও খাদি প্রচারে আত্মনিয়োগ করতে থাকে। গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় খাদিকেন্দ্র। কুমিল্লার 'অভয় আশ্রম' এই সময়কারই কথা। পূর্ব-বাংলা পরিভ্রমণে বেরিয়ে দেশবন্ধু নিজেই এসব প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

মৈমনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে শহর-প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। তথাপি সেখানে তুমুল উৎসাহের সঙ্গে প্রচারিত হয় অসহযোগিতার বাণী। বিজয়ী সেনাপতির মতো জেলার পর জেলা অতিক্রম করে দেশবন্ধু অবশেষে উপনীত হলেন চট্টগ্রামে। এখানে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন তরুণ যতীন্দ্রমোহন, যিনি উত্তরকালে তাঁর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে :

* *At the Cross-Roads* : Banerji

'চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতার ফলে অন্যান্য জেলায় যে সকল ঘটনা ঘটেছিল, চট্টগ্রামেও তাহাই ঘটিতে লাগিল। সকল স্কুল ও কলেজ হইতে ছাত্রগণ বাহির হইয়া আসিল। হরিশ্চন্দ্র দত্তের প্রাচীন ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউশন, ওরিয়েণ্টাল একাডেমি ও যাত্রামোহন সেন ইনষ্টিটিউট সব একে একে বন্ধ হইয়া গেল। এই সময়ে অপর একটি ঘটনা ঘটে, তাহাতে ছাত্রসমাজে চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয়। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন চট্টগ্রাম গভর্ণমেণ্ট কলেজে সিনিয়ার প্রফেসার ছিলেন। চিত্তরঞ্জনের অসাধারণ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি সরকারী চাকরী পরিত্যাগ করেন। কলেজ পরিত্যাগ করিয়া তিনি চট্টগ্রামে একটি জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন।'*

এইভাবে দেখতে দেখতে সারা দেশ যেন টলমল করতে থাকে। সারা বাংলার আকাশ-বাতাস অসহযোগ মন্ত্রমুখর হয়ে উঠল। দেশে জাগরণের চিহ্ন দেখা দিল যেমনটি দেখা গিয়েছিল পনেরো বছর আগে—স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেশ যেন প্রত্যক্ষ করল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি ছিলেন একজন নীরব দর্শক মাত্র। আজ অসহযোগ আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে তিনিই দাঁড়ালেন নেতারূপে। তুলনা করলে দেখা যাবে যে বাংলার এই দুটি আন্দোলনের ধাঁচ বা pattern একই, তবে যেটুকু পার্থক্য চোখে পড়ে সেটা হলো মাত্রা নিয়ে। পূর্ব-বাংলা ও আসাম সফর থেকে কলকাতায় ফিরেই দেশবন্ধু বরিশাল যাত্রা করেন।

১৯২১, এপ্রিল মাস।

বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন। সভাপতি —বিপিনচন্দ্র পাল; অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্ত। নাগপুরে চিত্তরঞ্জনের মত পরিবর্তনে বিপিনচন্দ্র যদিও তাঁর প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন, কিন্তু প্রকাশ্য অধিবেশনে যখন অসহযোগ প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় তখন বিপিনচন্দ্র তাঁকে সমর্থন করেছিলেন এবং নাগপুর থেকে ফিরে এসে তিনিও কিছুকাল গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে মেতেছিলেন। তাই দেশবন্ধুর

* দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন: সুরেন্দ্রচন্দ্র ধর।

খুব আশা ছিল বরিশালে তিনি সভাপতির কাছে আশার বাণী শুনবেন। কিন্তু এখানে বিপিনচন্দ্রের সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তি দেখা গেল ও গুরু-শিষ্যে বিচ্ছেদটা এইখানেই চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায় যে, 'সভাপতির অভিভাষণে বিপিনচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে শুধু নেতিমূলক অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারাই স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। স্বরাজের চেহারা বা কাঠামো সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক—একটা well thought out scheme গঠন করা দরকার। চিত্তরঞ্জন তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের গুরু, মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের এই অতীব যুক্তিযুক্ত উপদেশের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন; বলিলেন, স্বরাজের আবার স্কীম কি? 'Swaraj is Swaraj—I am not a scheming man.' বিপিনচন্দ্র দমিবার পাত্র নহেন; বরিশালে সভাপতির আসন হইতে তিনিও বজ্রনির্ঘোষে বলিলেন: 'I have never bowed to pontifical authority in religion, and I am not going to do so in politics. The nation wants magic, but I can only give you logic.' ফলে, উভয়ের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ ঘটিল। তদবধি দেশনায়ক বিপিনচন্দ্র কংগ্রেসী দলে অপাঙক্তেয় হইয়া রহিলেন।'* বিপিনচন্দ্র সেদিন আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: 'এই অসহযোগিতার অবশ্যম্ভাবী ফল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষ করা। কিন্তু এ আপোষে পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না।' যদিও বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিলনীতে দেশবন্ধুর জয়লাভ হয়েছিল, তথাপি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের পরবর্তী ইতিহাস এই অভ্রান্ত সাক্ষ্যই বহন করে যে, দূরদর্শী বিপিনচন্দ্র ঠিক কথা বলেছিলেন। এবং গান্ধী যখন আচম্বিতে মাঝপথে আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন, তখন দেশবন্ধুও কম বিস্মিত হন নি। সে কথা

---

* অসহযোগ আন্দোলনের স্মৃতি: দেবপ্রসাদ ঘোষ।

আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। বরিশাল সম্মিলনীতে প্রধান প্রস্তাব ছিল অসহযোগ এবং স্বয়ং দেশবন্ধু সেই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে উকিলদের তিনমাসের জন্য প্র্যাকটিস্ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়।

এপ্রিল মাসে লর্ড চেমস্‌ফোর্ড অবসর নিলেন ও তাঁর স্থলে ভারতের নতুন বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড রীডিং। নতুন বড়লাটের ভারত আগমন উপলক্ষে গান্ধী কোন হরতাল বা ধর্মঘট ঘোষণা করলেন না; পরন্তু, তাঁর প্রতি তিনি শিষ্টাচার ও মহানুভবতাই প্রদর্শন করলেন যেমন তিনি করেছিলেন তিন মাস আগে ডিউক অব বনটের ভারত আগমন উপলক্ষে। (ইনি এসেছিলেন সাম্রাজ্যের নবগঠিত ব্যবস্থা-পরিষদগুলির উদ্বোধন করতে)। গান্ধী এই সময়ে বলেছিলেন: 'ভারতবর্ষে প্রচলিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমার কর্তব্য, কিন্তু সেই শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অশিষ্টতা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন আমার আদৌ অভিপ্রেত নয়।' তাই দেখা গেল যে, মে মাসের প্রথম ভাগেই তিনি সিমলায় উপস্থিত হয়ে নতুন বড়লাটের সঙ্গে কয়েক দফা সাক্ষাৎ করলেন এবং মাত্র কয়েক মাস পূর্বে যে সরকারকে তিনি 'Satanic' বলে অভিহিত করেছিলেন এবং দেশের জনসাধারণকে যার বিষাক্ত ছায়া মাড়াতে নিষেধ করেছিলেন, সেই সরকারের সর্বপ্রধান ব্যক্তির সঙ্গে তিনি এখন সহযোগিতা করতে চাইলেন। গান্ধীর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এমনি পরস্পর-বিরুদ্ধ আচরণের বহু নিদর্শন আছে, যার ফলে আন্দোলন চলবার সময়ে বহুবার কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, গান্ধী-নেতৃত্বের এই ত্রুটি বা দুর্বলতা দেশবন্ধুর দৃষ্টি এড়ায় নি।

অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার তিনমাস পরে

অন্ধ্র প্রদেশের বেজওয়েদায় (এখন বিজয়ওয়াদা) নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসল এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগেই। এটি ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন। আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার জন্য এই অধিবেশনে গান্ধী একটি নতুন কর্মসূচী উপস্থাপিত করেন। এই কর্মসূচীর সার কথা ছিল 'men, money and munitions' এবং এই নতুন প্রোগ্রাম সফল করবার জন্যই এই অধিবেশনে টিলক স্বরাজ ফাণ্ডের সৃষ্টি হয়। লোকবল ও অর্থবল ভিন্ন দেশব্যাপী আন্দোলন পরিচালনা করা অসম্ভব, সেই কথা বুঝেই এ. আই. সি. সি.-র এই অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, লোকমান্য টিলকের স্মৃতিতে 'টিলক স্বরাজ্য ফাণ্ড' নামে একটি তহবিল গঠিত হবে ও সেই তহবিলের জন্য আগামী ৩০শে জুনের মধ্যেই এক কোটি টাকা সংগ্রহ করতে হবে এবং এই অর্থ স্বরাজের কাজে ব্যয় হবে। সেই সঙ্গে আরো সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য কংগ্রেসের এক কোটি প্রাথমিক সদস্য (Primary member) রিক্রুট করতে হবে ও কুড়ি লক্ষ চরকার প্রবর্তন করতে হবে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এই অধিবেশন থেকে ফিরে এসে দেশবন্ধু তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে সমগ্র বাংলাদেশের জেলা কংগ্রেস কমিটির পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করলেন এবং তিনি নিজে দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হলেন। তারপর আরম্ভ হয় পূর্ণোদ্যমে অর্থসংগ্রহের কাজ। দেশবন্ধু তাঁর কর্মীদের ডেকে বললেন, 'দেখো, যেন বাংলার মুখ রক্ষা হয়। টিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডে বাংলার জন্য নির্দিষ্ট অর্থ যেন আমরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তুলতে পারি।' রাস্তায় রাস্তায় বেরুল শোভাযাত্রা অর্থসংগ্রহের জন্য আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রাইমারি সদস্য সংগ্রহের চেষ্টাও চলতে থাকে। কংগ্রেসের এই নতুন কর্মসূচীকে সফল করে তুলবার প্রচেষ্টায় মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দেশবন্ধু আবার দ্বিগুণ উৎসাহে সফরে

বেরুলেন। এইবার তিনি উত্তরবঙ্গের মালদহ, বগুড়া, রাজসাহী, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে গিয়েছিলেন। সর্বত্রই তিনি বক্তৃতা করেন ও টিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডের জন্য অর্থসংগ্রহ করেন। জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতা ডাক্তার চারুচন্দ্র সান্যালের মুখে শুনেছি যে, দেশবন্ধুর উত্তরবঙ্গ সফরের সময় এই জেলার অধিবাসীদের মধ্যে যে রকম উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছিল, এমনটি আর কোথাও দেখা যায় নি। এখানে যে সভায় তিনি বক্তৃতা করেছিলেন তাতে পঁচিশ হাজার জনসমাবেশ হয়েছিল। সভার শেষে যখন দু'জন অন্ধলোক এসে প্রত্যেকে চার আনা করে পয়সা দিল, তখন সেই দৃশ্য দেখে দেশবন্ধু যারপরনাই অভিভূত হন। জলপাই-গুড়িতে মহিলাদের মধ্যেও যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গিয়েছিল এবং স্থানীয় মহিলা সমিতির পক্ষ থেকেও বাসন্তী দেবীকে একটি মানপত্র দেওয়া হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, তাঁর সফরের সময় বাসন্তী দেবীও স্বামীর সঙ্গে ছিলেন।

এই সময়কার একটি ঘটনা চাঁদপুরের কুলী ধর্মঘট।

তখনো দেশবন্ধুর উত্তরবঙ্গ সফর শেষ হয় নি, যখন কুমিল্লার অখিলচন্দ্র দত্তের কাছ থেকে একদিন তিনি একটি তারবার্তা পেলেন। তাতে লেখা ছিল: 'চাঁদপুরে চা-বাগানের কুলিরা ধর্মঘট করেছে, আপনার উপস্থিতি প্রয়োজন।' অখিল দত্তের টেলিগ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই এলো যতীন্দ্রমোহনের টেলিগ্রাম। তাতেও সেই একই আহ্বান। এই সংবাদে বিচলিত হয়ে তাঁর সফরের কর্মসূচী বাতিল করে দিয়ে তিনি ছুটলেন চাঁদপুরের দিকে। শ্রমিক-দরদী দেশবন্ধুর আর এক মূর্তি দেখা গিয়েছিল এই সময়ে। সেদিন তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন লাঞ্ছিত নির্যাতিত ব্যক্তিদের পাশে। সে ইতিহাস বিস্মৃত হবার নয়। হতভাগ্য কুলীদের মর্মন্তুদ কাহিনী ও তাদের উপর চাঁদপুর রেল-প্রাঙ্গণে রাত্রির অন্ধকারে গুর্খা পুলিশের অত্যাচারের সংবাদে দেশবন্ধু অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি

যখন সস্ত্রীক গোয়ালন্দ স্টেশনে এসে পৌঁছলেন তখন আসাম-বেঙ্গল রেল কর্মচারীদের ধর্মঘটের ফলে জাহাজ চলাচল বন্ধ ছিল। রেল-কর্মচারিগণ কুলীদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনের জন্য ধর্মঘট ঘোষণা করেছিল। এই রেল ধর্মঘটের নেতৃত্ব করেন যতীন্দ্রমোহন এবং তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এটি ছিল একটি গৌরবজনক অধ্যায়।

গোয়ালন্দ ঘাটে জাহাজ চলাচল বন্ধ। দেশবন্ধু নৌকাযোগে পদ্মা ও মেঘনা অতিক্রম করে চাঁদপুরে উপস্থিত হলেন। চাঁদপুরের দেশ-বিখ্যাত নেতা হরদয়াল নাগ ও যতীন্দ্রমোহন তার পূর্বেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার মিস্টার কে. সি. দে-ও তখন চাঁদপুরে উপস্থিত ছিলেন। নির্যাতিত, শোকার্ত ও বিপন্ন কুলীদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে দেশবন্ধু অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। তারপর তিনি সেখানে অবস্থান করে সর্বস্বান্ত কুলীদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করলেন ও তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, আসাম, করিমগঞ্জ ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলের চা-বাগানে হাজার হাজার কুলি কাজ করতো। মনুষ্যত্বে বঞ্চিত হয়ে তারা পশুর অপেক্ষাও হেয় জীবনযাপন করত। সে জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী সবিস্তারে বলার এখানে প্রয়োজন নেই। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, যখন তাদের এই অবস্থা, তখন সমগ্র ভারতবর্ষে অসহযোগের প্রবল বন্যা বইতে থাকে। স্থানীয় অসহযোগী কর্মিগণ চা-বাগানের অন্ধকার নিভৃতেও এই মুক্তিমন্ত্র প্রচার করতে আরম্ভ করে। সাড়া পড়ে যায় নিপীড়িত কুলি সমাজে। হঠাৎ একদিন হাজার হাজার কুলি দলবদ্ধ হয়ে তাদের জিনিসপত্র গুছাতে আরম্ভ করল। তারা আর চা-বাগানে কাজ করবে না, স্বদেশে চলে যাবে—দরকার হলে সেখানে ভিক্ষা করে খাবে। ক্রীতদাসেরও অধম ছিল তাদের জীবন, কারণ তারা চা-বাগানে কাজ করতে আসত চুক্তিবদ্ধ হয়ে। তারা দলে দলে

চলে আসে করিমগঞ্জ স্টেশনে। সেখানে তারা রেলের টিকিট পায় না। সেখান থেকে তারা পায়ে হেঁটে চলে আসে চাঁদপুর। সেখানে তারা দিনের পর দিন যখন অবস্থান করছিল তখন একদিন রাত্রে কমিশনার দে সাহেবের আদেশে একদল গুর্খা নিদ্রিত কুলি নরনারীর ওপর অতর্কিতে আপতিত হয়। চলে অবিরত অত্যাচার। 'কি সঙ্গত কারণ থাকতে পারে এদের ওপর এইরকম নৃশংস অত্যাচারের?'—এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন দেশবন্ধু কমিশনারকে। তিনি এর কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি। এই সময়ে তিনি আরো ঘোষণা করেছিলেন: 'চাঁদপুরের এই কুলি ধর্মঘট কেবলমাত্র শ্রমিক-বিবাদ নয়—এটা আমাদের জাতীয় সংগ্রামেরই অংশ।'

চাঁদপুরের এই মর্মন্তুদ ব্যাপারে সেদিন দেশবন্ধুর মতো আরো একজন মহৎপ্রাণ ব্যক্তি এগিয়ে এসেছিলেন কুলিদের পাশে। তিনি দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ড্রুজ। এই ভারতপ্রেমিক ইংরেজকে আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে পাঞ্জাবে ছুটতে জালিয়ানওয়ালাবাগের খবর আনার জন্য। আবার আজ তাঁকে দেখা গেল চাঁদপুরে চা-বাগানের নির্যাতিত কুলিদের পাশে তাদের সাহায্য করতে। চাঁদপুরের ঘটনা সম্পর্কে তাঁর জীবনচরিতে বলা হয়েছে: 'A party of Gurkha soldiers was sent down at night, and the brutality with which the wretched refugees were treated roused a storm of public indignation.'* চাঁদপুরের ঘটনা ঘটে ১৯শে মে রাত্রিবেলায়; দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ সেখানে উপস্থিত হন একুশ তারিখে আর দেশবন্ধু এলেন তার পরের দিন। রিলিফের ব্যাপারে এই মহৎপ্রাণ ইংরেজের কর্মতৎপরতা দেখে তিনি শতমুখে তাঁর প্রশংসা করেন। সরকারী সাহায্যের জন্য অপেক্ষা না করে এণ্ড্রুজই অগ্রণী

* *Charles Frear Andrews* : Chaturvedi & Sykes

হয়ে কুলীদের সাহায্যের জন্য অর্থসংগ্রহ করেন। দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে চাঁদপুরের ব্যাপারটি সম্পর্কে বাঙালী, বিশেষ করে কলকাতার অধিবাসিগণ সেদিন তেমন আগ্রহ বা সহানুভূতি প্রকাশ করে নি, যেমন করা উচিত ছিল। কলকাতারই এক জনসভায় একজন নাকি বলেছিলেন: 'A few thousand coolies in a cholera camp might be sacrificed if India's three hundred and twenty millions could obtain Swaraj.' সে সভায় এণ্ড্রুজ উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি এর প্রতিবাদ করেছিলেন। স্বদেশীযুগের মুক্তিসংগ্রামে আমরা পেয়েছিলাম ভারতপ্রেমিকা নিবেদিতাকে আর গান্ধীযুগের জাতীয় সংগ্রামে আমরা পেয়েছিলাম দীনবন্ধু এণ্ড্রুজকে। এঁদের দু'জনেরই নাম আমাদের জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকা উচিত।

চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম ও মাদারিপুর হয়ে দেশবন্ধু কলকাতায় ফিরলেন ৩০শে জুন। টিলক স্বরাজ্য তহবিলে বাংলাদেশ থেকে যে টাকা তুলে দেওয়ার কথা ছিল (সাড়ে দশ লক্ষ) তার সবটাই ইতিমধ্যে সংগৃহীত হয়ে গেল এবং এই বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব দেখে অন্যান্য প্রদেশের নেতৃবর্গ সেদিন বিস্ময়বোধ না করে পারেন নি। বাংলায় টিলক স্বরাজ্য তহবিল সকল শ্রেণীর বাঙালীর—দরিদ্রতম থেকে বিত্তবানের দানে পূর্ণ হয়েছিল। বাংলা সরকার এইবার দেশবন্ধুকে আঘাত করতে উদ্যত হলেন। নাগপুর কংগ্রেসের পর মাত্র ছয় মাসকাল অতীত হয়েছে এবং এই সময়ের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে সমগ্র দেশের জনসাধারণের মনে একা দেশবন্ধু কি উৎসাহ উদ্দীপনারই না সঞ্চার করেছেন। তখন যতীন্দ্রমোহন তাঁর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ বললেই হয় এবং চট্টলার এই বীর সন্তানও তখন পর পর কয়েকটি ধর্মঘট বিশেষ করে আসাম-

বেঙ্গল রেল ধর্মঘট পরিচালনা করে সরকারের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাই সরকার এই সময়ে তাঁকে ও দেশবন্ধুর আরো কয়েকজন সহকর্মীকে গ্রেপ্তার করলেন। দেশবন্ধুকে হীনবল করার উদ্দেশ্যেই ব্যুরোক্রেসি এইভাবে রক্তচক্ষু প্রদর্শন করেছিল সেদিন। সেনগুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিদের এই আকস্মিক গ্রেপ্তারের ফলে যে ক্ষতি দেশবন্ধু বোধ করলেন, তা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ হয়ে যায় এক তরুণের অবির্ভাবে।

এই তরুণের নাম সুভাষচন্দ্র বসু।

সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় সদ্য উত্তীর্ণ সুভাষচন্দ্র কেমব্রিজ থেকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন দেশবন্ধুকে। এই চিঠির তারিখ ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২১। সুদীর্ঘ সেই পত্রের ছত্রে ছত্রে অনুরণিত হয়েছে দেশমাতৃকার বেদীমূলে আত্মনিবেদনের সুর, দেশসেবার অকপট আকাঙ্ক্ষা। যৌবনোচিত উৎসাহ আর একটি তরুণ হৃদয়ের জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম। সে চিঠি পড়ে দেশবন্ধু মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর ত্যাগের আদর্শ যে আরেকজন তরুণকে এমন দুঃসাধ্য ত্যাগের ব্রতে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে, সেটা চিন্তা করে তাঁর মনে সেদিন কি ভাবতরঙ্গ জেগেছিল, আমরা তা সহজেই অনুমান করিতে পারি। দীপ থেকেই দীপ জ্বলে, প্রাণ থেকেই হয় প্রাণের উজ্জীবন—এই সত্যটা সেদিন বাঙালী নতুন করে অনুভব করল দেশবন্ধু-সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টান্ত থেকে। বাংলার জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এমন ঘটনা আর কখনো ঘটে নি—ভারতবর্ষেও নয়। সুভাষচন্দ্র তাঁর সেই চিঠিতে লিখেছিলেন :

'আপনি আজ বাংলাদেশে স্বদেশ-সেবাযজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক—তাই আপনার নিকট এই পত্র লিখিতেছি। আপনারা ভারতবর্ষে যে আন্দোলনের বন্যা তুলিয়াছেন তাহার তরঙ্গ চিঠি ও খবরের কাগজের ভিতর দিয়া এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখানেও তাই মাতৃভূমির আহ্বান শোনা গিয়াছে। কেমব্রিজে অসহযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা খুব বেশী রকমই চলিতেছে।...

আপনি আমাদের বাংলাদেশে সেবাযজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক—তাই আপনার নিকট আমি আজ উপস্থিত হইয়াছি—আমার যৎসামান্য বিদ্যাবুদ্ধি, শক্তি ও উৎসাহ লইয়া। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার আমার বিশেষ কিছুই নাই—আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীর। আপনাকে এই পত্র লেখার উদ্দেশ্য—শুধু জিজ্ঞাসা করা এই বিপুল সেবাযজ্ঞে কি কাজ দিতে পারেন।···আমার আর কিছু বলিবার নাই। আমি আজ প্রস্তুত, আপনি শুধু কর্মের আদেশ দিন।'*

তারপর ২রা মার্চের আর একখানি পত্রে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুকে জানালেন যে, দেশের কাজে নামতে তিনি বদ্ধপরিকর। তিনিও এই তরুণকে সাদরে স্বদেশসেবার মহাযজ্ঞে বরণ করে নিলেন—তুলে নিলেন তাঁকে তাঁর বুকে। দেশবন্ধুর বিরাট ত্যাগের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের এই মহৎ আত্মত্যাগ মিলিত হয়ে এই দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সেদিন সত্যিই একটি নতুন অধ্যায়ে রচনা করেছিল। তাই তো পরবর্তীকালে বহুবার প্রকাশ্যে দেশবন্ধু গর্বের সঙ্গে বলতেন—'আর কিছু না পারি, দেশের কাজে আমি দিয়েছি সুভাষকে।' এইখানে উল্লেখ্য যে, প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বার সময় যখন ওটেন-সংক্রান্ত ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন তখন তিনি চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর পরামর্শ চেয়েছিলেন। তারপর ভারতে প্রত্যাবর্তন করে দীর্ঘকাল বাদে তিনি যখন দেশবন্ধুর সান্নিধ্যে এলেন তখন সুভাষচন্দ্রের মন বলে উঠল : 'I felt that I had found a leader and I meant to follow him.'†

এই সময়ে দেশবন্ধুর সান্নিধ্যে আরো একজন এসেছিলেন। তিনি কিরণশঙ্কর রায়; তেমনি এসেছিলেন মেদিনীপুর থেকে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও কৃষ্ণনগর থেকে অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকার। এইসব সুযোগ্য কর্মীদের পেয়ে তাঁর উৎসাহের সীমা-পরিসীমা ছিল না। বিভিন্ন বিভাগে প্রাদেশিক কংগ্রেসের কাজ ভাগ করে এক

* পত্রাবলী : সুভাষচন্দ্র বসু।

† *The Indian Struggle* : Bose

একজনের উপর তিনি এক একটা দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন। শাসমল হলেন প্রাদেশিক খিলাফৎ কমিটির সেক্রেটারি; সুভাষচন্দ্র হলেন গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনের অধ্যক্ষ ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রচার-সচিব আর হেমন্তকুমার সরকার হলেন তাঁর একান্ত সচিব। কিরণ-শঙ্করের উপর দেওয়া হয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সংগঠনের দায়িত্ব। এইভাবে একটি সুযোগ্য ও যথার্থ দেশভক্ত কর্মীদল নিয়ে সেদিন বাংলার রাজনীতিতে যে 'টীম' গঠিত হয়েছিল তার তুলনা পরবর্তীকালে আর দেখা যায় নি। দেশবন্ধুর নেতৃত্বের সাফল্যের মূলে এইসব নিষ্ঠাবান তরুণ দেশপ্রেমিকদের প্রয়াস শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়। আন্তরিকতা না থাকলে যে দেশসেবার কাজে যথার্থভাবে আত্মনিয়োগ করা যায় না, দেশবন্ধুর এই যুবক কর্মীবৃন্দ সেই দৃষ্টান্তই স্থাপন করে গিয়েছেন।

দেখতে দেখতে আন্দোলনের পর আট মাস অতিক্রান্ত হলো। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, একমাত্র বাংলা দেশ ভিন্ন অসহযোগ আন্দোলন ভারতের অন্যত্র তেমন আশানুযায়ী সাফল্য লাভ করে নি। স্কুল-কলেজ, আদালত বর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাই ছিল অগ্রণী। আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এমন একজনের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি। দেশবন্ধুর সময়ে ইনি প্রাদেশিক কংগ্রেসের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি লিখেছেন: 'মহাত্মাজীর ও দেশবন্ধুর কথায় বাংলায় যত উকিল, ব্যারিস্টার ও মোক্তার প্রভৃতি স্বাধীনজীবী ব্যক্তি ব্যবসায় ছেড়েছিলেন এত আর অন্য প্রদেশ ছাড়ে নি। যত যুবক ইউনিভারসিটির সংস্রব ছেড়েছিল, এত আর অন্য প্রদেশে ছাড়ে নি—একথা আমি জোর গলায় বলতে পারি।'*

* দেশবন্ধুর সঙ্গে পাঁচ বছর: সাতকড়িপতি রায়।

২৮শে জুলাই থেকে ৩রা আগষ্ট বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল। দেশবন্ধু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে আন্দোলনের নতুন কার্যসূচী হিসাবে বিদেশী বস্ত্রবর্জন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। বলা হলো, বিলেতী কাপড় সংগ্রহ করে প্রকাশ্যে তা অগ্নিদগ্ধ করতে হবে। ব্যবসায়ীরা যেন আর বিদেশী বস্ত্র আমদানি না করেন, তাহলেই এই বিষয়ে ভারত আত্মনির্ভর হতে পারবে। দ্বিতীয় আর একটি প্রস্তাবে (এই প্রস্তাবটি এনেছিলেন দেশবন্ধু) বলা হয় যে, আগামী শীতকালে ইংলণ্ডের যুবরাজ যখন ভারত পরিদর্শনে আসবেন তখন যেন উহা বর্জন করা হয়। আরো একটি প্রস্তাবে কংগ্রেসের জনবল বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক প্রদেশে স্বেচ্ছাসেবক-দল গঠনের কথা বলা হয়। আবার তুমুল উৎসাহে কাজ আরম্ভ হয়। বোম্বাই থেকে ফিরে এসে দেশবন্ধু এই নতুন কর্মসূচীকে সফল করে তোলার কাজে পূর্ণোদ্যমে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে (৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯২১) কলকাতার হরিশ পার্কে মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে বিলেতী কাপড়ের যে বিরাট বহ্ন্যুৎসব হয়েছিল, তার স্মৃতি বোধ হয় অনেকের মনে অম্লান আছে।

আন্দোলন আরো শক্তিশালী, আরো ব্যাপক করে তুলবার জন্য এইবার দেশবন্ধু একখানি নিজস্ব কাগজের অভাব বোধ করলেন। দৈনিক কাগজ বের করবার মতো অর্থসঙ্গতি তখন তাঁর ছিল না, তাই প্রথমে একখানি সাপ্তাহিক বের করবার কথা চিন্তা করলেন। কাগজের কথা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে, অনেকে অনেক রকম নাম প্রস্তাব করলেন। দেশবন্ধুর পছন্দ হয় না সে-সব নাম। হেমন্তকুমার সরকারের মুখে শুনেছি, মহাত্মা গান্ধীর ৫২তম জন্মদিবসে তিনি প্রস্তাবিত পত্রিকাটি বের করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সহকর্মীদের বলেন, 'ছাখো, কাগজের নামের জন্য ভাবছিলাম, কাল রাত্রিবেলায় হঠাৎ আমার

মনে পড়ল চার বছর আগে আমি ভবানীপুরে প্রাদেশিক সম্মিলনীতে যে ভাষণ দিয়েছিলাম তার নাম ছিল 'বাংলার কথা'। এই নামটাই তো বেশ, তোমরা কি বলো?' 'বাংলার কথা'—সকলের মনে সাড়া জাগাল এই নাম এবং সবাই একবাক্যে বললেন যে, এর চেয়ে সুন্দর নাম আর হতে পারে না। প্রথম সংখ্যার চারটি প্রবন্ধের মধ্যে তিনটিই লিখেছিলেন দেশবন্ধু নিজে। প্রথম প্রবন্ধটিতে পত্রিকার উদ্দেশ্য ও নীতির কথা বলা হয়; দ্বিতীয় প্রবন্ধটির নাম ছিল 'স্বরাজ সাধনা' আর তৃতীয়টির নাম ছিল 'বস্ত্রযজ্ঞ'। প্রথম সংখ্যাটিতে দেশবন্ধুর আদেশে রচিত নজরুলের শিকল-ভাঙার কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল।

এই সময়কার একটি ঘটনা—গান্ধী-রীডিং সাক্ষাৎকার। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের উদ্যোগেই এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়েছিল। বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীর যে-সব বিষয় আলোচনা হয় তার মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছিল আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের বক্তৃতা। লর্ড রীডিং গান্ধীকে বলেন যে, তাঁর সরকারের বিবেচনায় এঁদের বক্তৃতা প্রকাশ্যত হিংসামূলক। তিনি কয়েকটি বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃতিও দিলেন এবং বলেন—'These speeches are open incitement to violence and have offended the Government.' ইতিমধ্যে তাঁর করাচী ভাষণের জন্য মৌলানা মহম্মদ আলিকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেখানে খিলাফৎ কন্‌ফারেন্সের সভাপতিরূপে তিনি একটা ভাষণ দিয়েছিলেন। গান্ধীকে স্বীকার করতেই হলো যে, এই ভাষণের অংশবিশেষের মধ্যে হিংসাত্মক কাজে প্ররোচনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। তিনি এজন্য আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে দুঃখ প্রকাশ করে বড়লাটকে একটি চিঠি লিখতে অনুরোধ করেন। এই ঘটনা উপলক্ষেই কংগ্রেসের মধ্যে দুই দল দুই রকম অভিমত প্রকাশ করলেন। একদলের বিবেচনায় আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের কাজ অন্যায় বলে সাব্যস্ত হলো আর অন্যদল গান্ধীর আচরণ সমর্থন করতে

পারলেন না। দেশবন্ধু ও মতিলাল শেষোক্ত দলে ছিলেন এবং কথিত আছে, তাঁরা দু'জনেই গান্ধীর এই কাজের প্রতিবাদ করে তাঁকে পত্র লিখেছিলেন।

ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত-পরিদর্শন, ১৯২১ সালের শেষভাগের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গান্ধী নির্দেশ দিলেন যেহেতু পাঞ্জাবের অত্যাচার ও খিলাফতের অবিচার, এই দুইটির একটিরও কোন প্রতিকার হয় নি, সেইজন্য ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে ভারতের সর্বত্র—বিশেষ করে যুবরাজ যে-সব শহর পরিদর্শন করতে পারেন সেইসব শহরে হরতাল প্রতিপালিত হবে। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে সেদিন কলকাতায় যে হরতাল হয়েছিল, তা' ছিল এক কথায় অভূতপূর্ব। ভারতবর্ষের হরতালের ইতিহাসে এর তুলনা বিরল।

১৯শে নভেম্বর যুবরাজ বোম্বাইতে এলেন। সেদিন থেকেই কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী বেআইনী ঘোষিত হয় এবং পুলিশ শহরের সমস্ত কংগ্রেস ও খিলাফৎ অফিসে তল্লাসী চালায়। ২০শে নভেম্বরের স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানার লাইনে ছাপা হলো: 'All Volunteers' Association illegal.' অসহযোগ দমনে ও প্রস্তাবিত হরতাল যাতে সাফল্যমণ্ডিত না হয় সেজন্য ব্যুরোক্রেসি একটি পুরতান বিধির আশ্রয় গ্রহণ করেন—১৯০৮ সালের সেই সংশোধিত ফৌজদারি আইন। এই আইনের সাহায্যেই অনুশীলন সমিতি বন্ধ করা হয়েছিল।

এখানে একটা কথা বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অসহযোগ আন্দোলনের সূচনায় গান্ধী বলেছিলেন যে, যদি ত্রিবিধ বয়কট পালন করে দেশ সম্পূর্ণভাবে অসহযোগিতা পালন করে তা'হলে এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ এসে যাবে। আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর যখন কয়মাস অতিক্রান্ত হলো, অথচ স্বরাজের কোন সূচনা

দেখা গেল না তখন অনেকের মনে প্রশ্ন উঠল—কৈ, কি হলো? দেশবন্ধুর এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন:

'ব্যবসা ছেড়ে, সংসার ভুলে এই যে তিনি দেশের মধ্যে ছুটাছুটি করলেন, এই যে এক গাদা ছেলে স্কুল-কলেজ ছেড়ে এসে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এর ফল কি হলো—এই কথা দেশবন্ধুর মনে জেগেছিল, অনেকের মনেই জেগেছিল। ঠিক সেই সময়ে সরকারী ঘোষণায় জানা গেল যে, প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভারত পরিদর্শনে আসছেন। এই ঘোষণা কাগজে দেখা মাত্র দেশবন্ধু যেন অকূলে একটা কূল পেলেন। না, এইবার হয়ত সরকারের সঙ্গে সত্যিকার একটা সংঘর্ষ বাধতে পারে। বোম্বাইতে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তিনি প্রস্তাব করেন—রাজপুত্রকে বয়কট করতে হবে এবং সেটাই হবে ইংরেজ সরকারের পক্ষে চরম অপমান। মহাত্মা গান্ধী তখন আপত্তি করে বলেন—ইহা বিদ্বেষ সূচনা করছে। দেশবন্ধু উত্তরে বলেন, কিসের বিদ্বেষ? আমরা চাই স্বরাজ। ইংলণ্ডের রাজপুত্র আসবেন বেড়াতে তা আমাদের কি? আমরা তাঁকে অভ্যর্থনা করতে যাব কেন? প্রস্তাব হলো—কংগ্রেস যুবরাজকে অভ্যর্থনা করবে না ও দেশবাসীকে নিষেধ করবে এরূপ কোন অভ্যর্থনায় যোগ দিতে।'*

দেখা যাচ্ছে, যুবরাজকে বয়কট করার প্রস্তাবটা দেশবন্ধুই উত্থাপন করেছিলেন, গান্ধী নন। তাঁর সর্ব-ভারতীয় নেতৃত্বের এটা ছিল একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তে সারা ভারতে আবার নতুন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বাংলায় এই উপলক্ষে যেদিন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদল বে-আইনী বলে ঘোষিত হয় সেদিন দেশবন্ধু যে উদ্দীপনাময়ী বাণী দিলেন তা আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। তিনি বলেছিলেন: 'I feel the handcuff on my wrists and the weight of iron-chains on my body. It is the agony of bondage. The whole of India is a vast prison. The work of the Congress must be carried

* দেশবন্ধুর সঙ্গে পাঁচ বছর: সাতকড়িপতি রায়।

on what matters is whether I am taken or left. What matters is whether I am dead or alive?' কোন একটা গণ-আন্দোলনকে সার্থকভাবে পরিচালিত করতে হলে জনসাধারণের মনে যে রকম উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগ্রত করা প্রয়োজন তা যিনি পারেন, তিনিই প্রকৃত নেতা। দেশবন্ধু ঠিক এই শ্রেণীর একজন নেতা ছিলেন।

॥ কুড়ি ॥

ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে ১৯২১ সনটিকে সত্যিই একটি বিক্ষোভ ও সংঘাতপূর্ণ বছর বলে অভিহিত করা চলে। বছরের শেষভাগে ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত-আগমন উপলক্ষে সেই সংঘাত উঠল চরমে। কিন্তু এ ছাড়া এই সময়ে মোপলা (মালাবারের মুসলমান কৃষক-সম্প্রদায়) বিদ্রোহের ফলে যে সংঘাতের সৃষ্টি হয় তা হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যকে ব্যাহত করল এবং কংগ্রেসী খিলাফতিদের মধ্যে একটা বিচ্ছেদের ভাবও নিয়ে এল। এই অপ্রীতিকর সংঘর্ষের পটভূমিকায় যুবরাজ আসেন ভারতে নভেম্বর মাসে। সংঘাতের প্রধান কেন্দ্র ছিল দুটি—বোম্বাই ও কলকাতা, যদিও ভারতের প্রায় সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়েছিল। ১৯২১ সনের সংঘর্ষের প্রকৃতি জওহরলাল এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন:

'Nineteen twenty-one was an extra-ordinary year for us. There was a strange mixture of nationalism and politics and religion and mysticism fanaticism. Behind all this was agrarian trouble and, in the big cities, a rising working class movement. Nationalism and a vague but intense country-wide idealisim sought to bring together all these various, and sometimes mutually contradictory, discontents,

and succeeded to a remarkble degree···The end of the year brought matters to a head.'*

কংগ্রেসের বৈঠক শেষে দেশবন্ধু বোম্বাই থেকে কলকাতায় ফিরে এসে দেখলেন যে, এবার সরকার তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। তাঁরা কংগ্রেস স্বেচ্ছাবাহিনী বে-আইনী ঘোষণা করেছেন। তখনো পর্যন্ত খুব বেশি স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যায় নি—পাওয়া গিয়েছিল মাত্র পাঁচ হাজার। দেশবন্ধু ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন : 'এই মহানগরীতে মাত্র পাঁচ হাজার। এখানে এতগুলি স্কুল-কলেজ, তবু মাত্র পাঁচ হাজারের বেশি পাওয়া গেল না। আমি আশা করি ঠিক যেভাবে মানুষের বাঁচা উচিত, কলকাতার ছাত্রবৃন্দ সেই ভাবেই জীবনধারণ করে। শুধু অস্তিত্বের ভার বহন করা মানে বেঁচে থাকা নয়। ('Existing is not living.') তাঁর সেই আবেদন ব্যর্থ হলো না। অল্পদিনের মধ্যেই সারা বাংলায় দু'লক্ষ লোক স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। বাংলার গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠল স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী। সরকার থেকে যখন এই বাহিনী বে-আইনী বলে প্রচারিত হয় ও সমস্ত সভা-সমিতি নিষিদ্ধ হয়, তখন তার প্রত্যুত্তর দিলেন দেশবন্ধু।

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে প্রচারিত হলো—সরকারের এই আদেশ অবৈধ। চলল আগের মতো শহরের মহল্লায় মহল্লায় খদ্দর ফেরি ও পিকেটিং। স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রত্যহই বন্দী হতে লাগলেন। কংগ্রেস কমিটি প্রত্যহই তিনশো-চারশো-পাঁচশো করে স্বেচ্ছাসেবক পাঠাতে লাগল খদ্দর প্রচার করতে; পুলিশও তাদের ধরে ধরে জেলে পুরতে লাগল। শুরু হয় দেশের সর্বত্র অভূতপূর্ব গ্রেপ্তারের পালা, ইংরেজীতে যাকে বলা যেতে পারে 'mass arrest' এবং সেই সঙ্গে পুলিশের লাঠিবাজি। দেশবন্ধুর একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন গ্রেপ্তার হলেন ৬ই ডিসেম্বর এবং তার পরের

* *Autobiography* : Nehru

দিন বড়বাজারে খদ্দর প্রচার করতে গিয়ে বন্দী হলেন তাঁর পত্নী বাসন্তী দেবী, ভগ্নী উর্মিলা দেবী ও অন্যান্য পুরমহিলাবৃন্দ। দেশের কাজে মেয়েদের বন্দী হওয়া বাংলায় এই প্রথম, সম্ভবতঃ ভারতবর্ষেও। ভূপেন বসু প্রভৃতি কয়েকজনের অনুরোধে সরকার মেয়েদের সেইদিন রাত্রেই মুক্তি প্রদান করেন।

দেশবন্ধুর আহ্বানে বাংলার তরুণ সেদিন যেভাবে সাড়া দিয়েছিল তা অভূতপূর্ব। 'বাংলার যুবক একদিন পিস্তল হাতে নিয়ে দলের নেতার আদেশে শত্রুর প্রাণ নিয়েছে, নিজের প্রাণও দিয়েছে—দ্বিধা করে নি। আবার সেই বাংলার যুবকবৃন্দ নেতার আদেশে অহিংস আন্দোলনে মাথা পেতে পুলিশের লাঠি খেয়ে রক্তারক্তি করেছে। একবারও হাত তোলে নি।'

১৯শে নভেম্বর যুবরাজ যখন ভারতবর্ষে পৌঁছলেন তখন সমগ্র দেশ সংঘর্ষ ও উত্তেজনায় যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। যুবরাজের আগমন তাতে ইন্ধন জোগাল। 'The Prince's arrival was the signal for serious riots in Bombay and elsewhere, and his tour was everywhere marked by scenes of disorder.'* এই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের ফলে ত্রিশ হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল—আন্দোলনের পুরোভাগে যে-সব নেতা ছিল তাঁরাও বাদ যান নি। একমাত্র গান্ধী তখনো পর্যন্ত জেলের বাইরে ছিলেন। ১৭ই নভেম্বর বোম্বাইতে যে ভীষণ গোলযোগ হয় তার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল গান্ধীর মনে। তিনি অনশন করে এর প্রায়শ্চিত্ত করলেন এবং প্রকাশ্যে বললেন, এই জাতীয় স্বরাজ আমি চাই না। তারপরেই সরকারের স্বৈরাচারের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্ত তিনি সংগ্রামের একটি নতুন নীতি ঘোষণা করেন—সরকারী আইন

* *The Empire of the Nabobs* : Hutchinson.

অমান্ত করার জন্ত ভারতের সর্বত্র স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠনের নির্দেশ দেন এবং নবপর্যায়ের সংগ্রামের নাম তিনি দিলেন 'আইন অমান্য (Civil Disobedience) আন্দোলন।' নভেম্বরের শেষভাগ থেকেই অসহযোগ আন্দোলনের অনিবার্য পরিণতি হিসাবেই এই 'আইন অমান্য আন্দোলন' আরম্ভ হয়েছিল। নভেম্বর ও ডিসেম্বর এই দু'মাস ভারতবর্ষে এই আইন অমান্য আন্দোলন চরমে উঠেছিল। হাচিনসন্ লিখেছেন: 'This new policy was given the name Civil Disobedience, and was calculated to paralyse the machinery of Government. It was enthusiastically acclaimed and Gandhi was appointed dictator.'*

বাংলাদেশে দেশবন্ধু সেই সময়ে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রথম ডিক্টেটর নিযুক্ত হয়েছিলেন। আর সম্পাদক ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। কলকাতায় যুবরাজের আগমন আসন্ন। ভারতবর্ষে পদার্পণ করে অবধি তাঁর ভাগ্যে প্রত্যাশিত অভ্যর্থনা কোথাও জোটে নি। তাই লর্ড রোনাল্ডসে ভাবলেন যে, যদি কলকাতায় তাঁকে যথারীতি অভ্যর্থনা করতে না পারা যায় তাহলে ভারত-সরকারের মুখ রক্ষা হয় না। তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। তখন স্থার আশুতোষ চৌধুরীর মধ্যস্থতায় ৮ই ডিসেম্বর উভয়ের মধ্যে এই সাক্ষাৎকার ঘটে। জানা যায় যে, বেলা তিনটা থেকে একঘণ্টাকাল এই আলোচনা চলেছিল দু'জনের মধ্যে। যুবরাজের আসন্ন আগমন উপলক্ষে হরতাল বন্ধ করবার জন্য দেশবন্ধুকে তিনি অনুরোধ করেন। কিন্তু মিটমাটের কোন আশা দেখা গেল না। তখন উভয়ে উভয়কে চিনলেন। দেশবন্ধু-রোনাল্ডসে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে সেই সময়ে কোন কোন সংবাদপত্রে ও সরকারী ইস্তাহারে বলা হয়েছিল যে, দেশবন্ধুরসম্মতিক্রমেই গভর্ণর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

* আমেদাবাদ কংগ্রেসের পর গান্ধী ডিক্টেটর হন।

এটা সত্যের অপলাপমাত্র, কারণ অসহযোগী নেতা দেশবন্ধু কখনই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই কাজ করতে পারেন না এবং তিনি তা করেনও নি।

দেশবন্ধু বুঝলেন এবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবেই। তাই তিনি তাঁর সহকর্মীদের উপর দায়িত্ব দিলেন যাতে যুবরাজের আগমন উপলক্ষে বয়কটের বহরটা ঠিকমত হয়। ১০ই ডিসেম্বর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো। সেদিন ছিল শনিবার। বিকেল সাড়ে চারটার সময় পুলিশের ডেপুটি কমিশনার কিড্ সাহেব এলেন রসা রোডে দেশবন্ধুর ভবনে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে। পুরনারীবৃন্দ শাঁখ বাজিয়ে, উলুধ্বনি করে বীরকে বিদায় দিলেন। 'ঐ একই দিনে আর যাঁরা বন্দী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুভাষচন্দ্র, আবুল কালাম আজাদ, বীরেন শাসমল, পদ্মরাজ জৈন, মৌলানা আক্রাম খাঁ, অম্বিকা বাজপেয়ী ও ভোলানাথ বর্ধন।'* গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে দেশবন্ধু শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীকে প্রদেশ কংগ্রেসের দ্বিতীয় ডিক্টেটর ও সাতকড়িপতি রায়কে সম্পাদক নিযুক্ত করে যান। গ্রেপ্তারের সময় দেশবাসীর উদ্দেশে তিনি এই মর্মে বাণী দিলেন: 'ভারতের নর-নারী, এই আমার শেষ বাণী। যদি দুঃখ-ক্লেশ, নির্যাতনে স্বাধীনতা লাভ করতে চাও তো এই সুবর্ণ সুযোগ—জয় আমাদের সুনিশ্চিত।' দেশবন্ধুর গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে সে কি তুমুল উত্তেজনা, সে কি চাঞ্চল্য—ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর থেকে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এক বাংলা দেশ থেকে ষোল হাজার লোক জেলে গিয়েছিল। ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন যে সম্ভব তা তিনি প্রমাণ করলেন। আজ একথা বলবার দিন এসেছে যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এমন কি সমস্ত প্রদেশ একত্র করেও এমন অসহযোগ আন্দোলন আর কোথাও হয় নি যেমন হয়েছিল বাংলাদেশে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে। তিনিই দিয়েছিলেন এই আন্দোলনকে একটা মহিমময় রূপ।

* সম্ভবতঃ সুভাষচন্দ্র ও শাসমল কিছুদিন পরে গ্রেপ্তার হন।

দেশবন্ধুর গ্রেপ্তারের পর লর্ড রীডিং একবার কলকাতায় আসেন। যুবরাজের আগমনে এবারে হরতাল না করার জন্য তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গে একটা মিটমাটের চেষ্টা করেন। এবিষয়ে মধ্যস্থতা করেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। তখন বাংলার জেলগুলি রাজনৈতিক বন্দীতে পূর্ণ বললেই হয়। জেলের মধ্যে আলোচনা-সভা বসল। রীডিং-গান্ধীর সঙ্গেও এবিষয়ে একটা আপোষে আসতে চেয়েছিলেন। আলিপুর জেলে পরামর্শ-সভা বসল। প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ জেলে উপস্থিত হলেন। বড়লাট দেশবন্ধুর সব শর্ত মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বললেন যে, সারা ভারতের আন্দোলনের নেতা যিনি তিনিই এই সন্ধি করতে পারেন। সবরমতীতে তারবার্তা গেল। জবাব এলো: 'Compromise possible and withdrawal of movement agreed if the Ali brothers are released and date and composition of the Round Table Conference announced now'. এই রকম শর্তে রাজী হওয়া রীডিং-এর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। যদি বা তিনি আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তিতে রাজী ছিলেন, কিন্তু গোল-টেবিল বৈঠকের গঠন ও তারিখ নিয়ে কিছু বলা তখন আদৌ সম্ভবপর ছিল না। আপোষ মীমাংসা ভেঙে যায়। কংগ্রেস একটি বহু মূল্যবান দুর্লভ মুহূর্ত হারাল। সে মুহূর্ত আর আসে নি। সেদিন ইচ্ছা করলে দেশবন্ধু নিজেই এই সন্ধি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি। গান্ধীর নেতৃত্ব ক্ষুণ্ণ হয় এমন কাজ তাঁর চিন্তায় স্থান পেত না। নাগপুর প্রদত্ত সেই একান্ত আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি তিনি সেদিন এইভাবেই রক্ষা করেছিলেন। এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব।

৬ই জানুয়ারী দেশবন্ধুর বিচার আরম্ভ হয় চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে। দেশবন্ধুর বিচার, সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। জীবনে যিনি একাধিক স্বদেশী মামলায় অনেক খ্যাতনামা

দেশপ্রেমিকের পক্ষসমর্থনকারী কৌঁসুলিরূপে আদালতে দাঁড়িয়েছেন এবং যাঁর সওয়াল-জবাবে আদালত-কক্ষ কম্পিত হয়ে উঠত, আজ তাঁকেই দেখা গেল আসামীর কাঠগড়ায় এসে প্রশান্তভাবে দাঁড়াতে। দলে দলে উকিল, ব্যারিস্টারগণ এলেন এই মামলার বিচার দেখতে। তিনি যখন আসামীর কাঠগড়ায় এসে উপস্থিত হলেন, তখন উপস্থিত সকলেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। এই মামলায় সরকার পক্ষে উকিল ছিলেন তারকনাথ সাধুখাঁ, ডি. সিলভা প্রভৃতি। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে দেশবন্ধু সেই একই কথা বললেন যা তিনি বলেছিলেন চৌদ্দ বছর আগে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মামলার পক্ষ সমর্থন করবার সময়ঃ 'I do not desire to participate in the proceedings of the Court nor do I want to make any statement because I have got nothing to state before your Lordship.' ১৪ই ফেব্রুয়ারি ম্যাজিস্ট্রেট রায় দিলেন—ছয়মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড।

দেশবন্ধুর মামলা চলবার সময়েই যুবরাজ কলকাতায় এলেন (২৪শে ডিসেম্বর)। সেদিন যে হরতাল হয়েছিল তার কথা বলতে গিয়ে স্টেটস্‌ম্যান্ সংবাদপত্রকে পর্যন্ত 'Remarkably successful' এই কথা ব্যবহার করতে হয়েছিল। যুবরাজের আগমনের দিন 'সমস্ত শহর নীরব, নিস্তব্ধ, সমস্ত পথঘাটে জনমানব-শূন্য শ্মশান—লোক নাই, জন নাই, গাড়ি নাই, ঘোড়া নাই।' সেদিন সত্যিই একদিনের জন্য দেশবন্ধুর ইঙ্গিতে মহানগরীর প্রাণস্পন্দন থেমে গিয়েছিল এবং তা প্রত্যক্ষ করে শত্রু-মিত্র সকলেই যারপরনাই বিস্মিত হয়েছিল। কোন একজন নেতার পক্ষে জনসাধারণের উপর এমন প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করা যে আদৌ সম্ভব তা প্রত্যক্ষ করে শহরের শ্বেতাঙ্গ-সমাজ পর্যন্ত সেদিন বিস্মিত না হয়ে পারে নি। তবে যুবরাজকে বয়কট করার আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রের সাংগঠনিক প্রয়াসও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাঁর

এক সতীর্থের মতে শহরে সেদিন যে সম্পূর্ণ হরতাল হতে পেরেছিল তার মূলে ছিলেন সুভাষচন্দ্র।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে দেশবন্ধুর কারাদণ্ডের সংবাদে যারপরনাই বিচলিত হয়েছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি সেই সময়ে বাসন্তী দেবীকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন। সম্ভবতঃ সমকালীন বাংলাদেশের বরেণ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে একমাত্র তিনিই দেশবন্ধু-জায়াকে চিঠি লিখে সমবেদনা জানিয়েছিলেন। আমরা সেই পত্রখানি এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম। এই চিঠির তারিখ ১৪।১২।২১।

"প্রিয় ভগ্নি, আমার যে প্রবল ভাবাবেগ হইয়াছে, তাহা আমি প্রকাশ করিতে অক্ষম।

আপনার স্বামী যখন সেই ইতিহাস-স্মরণীয় মোকদ্দমায় শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেন, সেইদিন হইতেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অশেষ বদান্যতা, স্বদেশপ্রেম, মহান্ আদর্শবাদ, দীনদরিদ্রের পক্ষ সমর্থনের জন্য তাঁহার অসীম আগ্রহ, সর্বদাই লোকের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। যদিও কোন কোন বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমার মতের পার্থক্য আছে, তবুও চিরদিনই তাঁহার প্রতি আমি আকর্ষণ অনুভব করিয়াছি। তিনি বাংলা দেশ বা তরুণ ভারতের চিত্ত অধিকার করিবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। রাজনীতিতে তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের মতভেদ আছে, তাঁহারাও তাঁহার (চিত্তরঞ্জনের) অপূর্ব স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। শ্রীযুক্ত দাসের এই অগ্নি-পরীক্ষার দিনে, তাঁহার প্রতি স্বতঃই আমাদের চিত্ত ধাবিত হইতেছে। আমি জানি, আমার মত বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত দাশের জীবনের ব্রত সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারিবে না, কেননা লোকসমাজ ও ঘটনার স্রোত হইতে সর্বদাই আমি দূরে বাস করি। চিরজীবন একান্তভাবে বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলে আমার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, মনের প্রসার বোধ হয় সঙ্কুচিত হইয়াছে। কিন্তু প্রিয় ভগ্নি, আমি আপনাকে নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে যখন আমি বিজ্ঞান-চর্চা করি, তখন বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া দেশকেই সেবা করি। আমাদের লক্ষ্য একই, ভগবান জানেন। আমার জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

আপনি আপনার দুঃখ, অপূর্ব সাহস ও আনন্দের সঙ্গে বহন করিতেছেন। বাংলার সম্মুখে নারীত্বের যে উচ্চ আদর্শ আপনি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা

সেই অতীত রাজপুত গৌরবের যুগকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। আমি মনে-প্রাণে আশা করি যে কৃষ্ণমেঘ আমাদের মাতৃভূমির ললাট আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা শীঘ্রই অপসারিত হইবে এবং আপনার স্বামীকে আমরা ফিরিয়া পাইব। ভবদীয়—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

জেলে থাকবার সময়েই দেশবন্ধু আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে থাকার জন্য তাঁর পক্ষে এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার তখন উপায় ছিল না। তিনি তাঁর সভাপতির ভাষণ লিখে উর্মিলা দেবীর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে বাসন্তী দেবীও একটি মর্মস্পর্শী বাণী পাঠিয়েছিলেন বলে জানা যায়। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে দেশবন্ধুর ভাষণটি পাঠ করেন সরোজিনী নাইডু এবং নির্বাচিত সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতি নির্বাচিত হলেন হাকিম আজমল খান। এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। কংগ্রেসের এই আমেদাবাদ অধিবেশন থেকেই টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা উঠে যায় এবং সমাগত প্রতিনিধিদের মেজের উপরে বসবার ব্যবস্থা হয়। নাগপুর কংগ্রেসে বিরচিত নতুন গঠনতন্ত্র অনুসারেই প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় এবং তখন থেকেই জাতীয় মহাসভা একটি সত্যিকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। অনেক দিক দিয়েই এই অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য ছিল। সভাপতি ও চেয়ারম্যান তাঁদের স্ব স্ব ভাষণ যথাক্রমে উর্দু ও হিন্দীতে পাঠ করেন। সর্দার প্যাটেলের ভাষণটি ছিল অতি সংক্ষিপ্ত, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের মতে—'the briefest speech in Congress history.' এবং তাঁর সেই ভাষণে তিনি বিশেষভাবে গুজরাটের কৃষকদের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেন।

সর্দার প্যাটেল তাঁর চেয়ারম্যানের ভাষণে আরো একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করেন—নাগপুর কংগ্রেসে প্রদত্ত গান্ধীর

সেই প্রতিশ্রুতি: 'এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ লাভ হবে।' সেই নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হতে চলেছে অথচ স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেছে। তবে গান্ধীর এই প্রতিশ্রুতির মূলে যে-সব শর্ত ছিল, উৎসাহ-উত্তেজনার মুখে জনসাধারণ সেগুলি উপেক্ষা করেছে, যদিও প্যাটেলের মতে এত তাড়াতাড়ি ঐসব শর্ত পালন করা চলে না। প্যাটেলের আশা ছিল যে, 'কংগ্রেসের এই অধিবেশনে তাঁরা স্বরাজ লাভের উৎসব পালন করবেন, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ, তিনি আমাদের শক্তি পরীক্ষার জন্য আরো দুঃখকষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করার ভিতর দিয়ে আমাদের নিয়ে যেতে চান।' তার এই ভাষণে প্যাটেল আরো বলেছিলেন: 'The repression launched by Government is a sure sign of the approach of Swaraj.' তবে কঠিন সংগ্রামের ভিতর দিয়েই সে স্বরাজ অর্জন করতে হবে, সে কথাও তিনি বলেন এবং দেশবাসীকে সেজন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন।*

আমেদাবাদ কংগ্রেসে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল গান্ধীর প্রস্তাবিত আইন অমান্য আন্দোলন এবং গান্ধীকে এই আন্দোলনের অধিনায়ক বা ডিক্টেটর করা হয়। এই প্রস্তাব অনুসারেই ঠিক হয় যে বারদৌলিতে প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হবে। এবং আন্দোলন আরম্ভ করার আগে ফেব্রুয়ারি মাসে গান্ধী বারদৌলির এক জনসভায় জনসাধারণকে সত্য ও অহিংসার শপথ গ্রহণ করতে বললেন ও দেশের স্বাধীনতার জন্য যে-কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে বললেন। এর পরেই তিনি লর্ড রীডিংকে এক পত্রে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে যখন এইসব সংবাদ এসে পৌঁছল তখন দেশবন্ধু ও তাঁর সহবন্দীরা আশা করলেন যে, এইবার গান্ধী স্বয়ং যখন আন্দোলন পরিচালনা করতে কৃতসংকল্প হয়েছেন তখন নিশ্চয়ই

* *Sardar Patel* : N.D. Parikh

তা ফলপ্রসূ হবে। দেশে বিরাটভাবে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হতে চলেছে, স্বভাবতঃই সকলের মনে এই আশা জাগল যে, ভারতবর্ষ এবার স্বাধীনতার পথে অনেকখানি অগ্রসর হবে। প্রস্তাবিত আন্দোলন আরম্ভ করার আগে গান্ধী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রীতি অনুসারে বড়লাটকে একটি পত্র লিখে জানালেন যে, তিনি নিজে বারদৌলিতে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করবেন, যদি না এক সপ্তাহকালের মধ্যে সরকারের হৃদয়ের পরিবর্তন হয়।

কিন্তু এই নির্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই ঘটনাস্রোত সহসা অন্যদিকে মোড় নিল। উত্তরপ্রদেশে গোরক্ষপুর জেলায় চৌরিচৌরা নামক একটি ক্ষুদ্র শহরে একদল ক্রুদ্ধ কৃষক কংগ্রেস স্বেচ্ছাদল দ্বারা পরিচালিত হয়ে স্থানীয় পুলিশ থানা আক্রমণ করে ও কয়েকজন পুলিশকে হত্যা করে। এই ঘটনা যখন ঘটে গান্ধী তখন বারদৌলিতে এবং সেইখানেই তিনি ওয়ার্কিং কমিটির একটি জরুরী বৈঠক আহ্বান করলেন। চৌরিচৌরার ব্যাপারে মর্মাহত হয়ে এবং হিংসার প্রতি জনসাধারণের আসক্তি দেখে তিনি একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। ইহাই কংগ্রেসের ইতিহাসে 'বারদৌলি প্রস্তাব' নামে অভিহিত। এই প্রস্তাবে বলা হলো: 'গোরক্ষপুরের মর্মান্তিক ঘটনা ইহাই প্রমাণিত করল যে, ব্যাপকভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে অহিংসার প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণ এখনো সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে নি। অতএব এখন এই অবস্থায় কোন প্রকার অহিংস আন্দোলন চলতে পারে না।' এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই গান্ধী অনির্দিষ্ট কালের জন্য সর্বপ্রকার গণ-আন্দোলন—অহিংসা,অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ বা আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন।

বারদৌলিতে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় ১৬ই ফেব্রুয়ারি এবং তার কিছুদিন পরে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে এই প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। বারদৌলিতে গান্ধীর

এই অপ্রত্যাশিত আত্মসমর্থনের তুমুল প্রতিক্রিয়া দেখা দিল কংগ্রেসের কারারুদ্ধ নেতাদের মধ্যে। কারাপ্রাচীরের এদিক থেকে চিঠির পর চিঠি আসতে লাগল লাজপৎ রায়, মতিলাল, দেশবন্ধু প্রভৃতি নেতাদের কাছ থেকে। সে-সব চিঠির বক্তব্য একই: 'This decision is greatly harmful to the country. It will not only demoralise the people but also mean a set back to the prestige of the nation.'* গান্ধীর এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশি বিচলিত বোধ করেন দেশবন্ধু। তিনি জেলে তাঁর সহকর্মীদের বলেন: 'বারদৌলিতে আন্দোলন বন্ধ করার কারণ যাই থাক না কেন, বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবকদলের কাজ বন্ধ করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণই থাকতে পারে না, কারণ এই প্রদেশে এদের কাজের ফলেই সরকারের অচল অবস্থা হয়েছে।' তিনি আরো বলেছিলেন: 'This is the second instance when Mahatmaji has bungled the situation." এই ঘটনার পর জেলের মধ্যে একদিন বারদৌলি প্রস্তাব নিয়ে যখন একটি আলোচনা সভা হয় তখন সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই যে আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলো এটা বাংলা দেশের পক্ষে ভাল হবে কি মন্দ হবে?—তখন তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'গান্ধী ইংরেজের সঙ্গে আপোষ করতেও দিলেন না, আবার আন্দোলন চালাতেও দেবেন না। বাংলাদেশ যতদূর এগিয়ে যাচ্ছিল, এই বারদৌলির সিদ্ধান্তে বাংলার কর্মস্পৃহাকে একেবারে ততখানি নিস্তেজ করে দেওয়া হয়েছে। এইসব কাজ করতে হলে চৌরিচৌরার মতো এক-আধটা ঘটনা যে ঘটবে না তা কেউ আশা করে না। বিশেষতঃ বাংলায় তো আপত্তিজনক কিছু দুর্ঘটনাই হয় নি।' এর পর তিন বছর পর্যন্ত গান্ধীর সঙ্গে অনেক প্রধান প্রধান রাজনীতিমূলক বিষয়ে দেশবন্ধুর প্রবল মতানৈক্য ছিল এবং সম্ভবতঃ সেই কারণে

---

* *Autobiography*: Rajendra Prasad

এই সময়টা অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্তককে রাহুগ্রস্তের মতো সবরমতীর নির্জন আশ্রমে চরকা ও খদ্দর নিয়ে অবস্থান করতে হয়েছিল। গান্ধীর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে 'হিমালয় সদৃশ ভুল' আর এইরকম কাজ ভণ্ডুল করার অজস্র দৃষ্টান্ত মিলবে।

সুভাষচন্দ্র এই সময়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে একত্রে জেলে অবস্থান করছিলেন। দেশবন্ধুর মনে বারদৌলি প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে তিনি তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন : 'Deshbandhu was beside himself with sorrow and anger at the way Mahatma was repeatedly bungling. The Bardoli retreat came as a staggering blow.' জওহরলাল নেহরুও তাঁর আত্মচরিতে অনুরূপ মনোভাবই প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন : 'We were angry when we learnt of this stoppage of our struggle at a time when we seemed to be consolidating our position and advancing on all fronts.' যে আন্দোলনের ফলে এক বছরের মধ্যে ত্রিশ হাজার লোক কারাবরণ করল, সে আন্দোলনকে এইভাবে তার সফলতার মধ্যপথে হঠাৎ বন্ধ করে দিয়ে গান্ধী প্রকৃতপক্ষে সেদিন যাদের নিশ্চিন্ত করতে চেয়েছিলেন তারা হলেন ধনিকগোষ্ঠী, পুঁজিপতি ও শিল্পপতির দল। সাধুতারও একটা সীমা আছে, কিন্তু গান্ধী সম্ভবতঃই এইবার যেন সেই সীমা অতিক্রম করলেন দেখা গেল। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক যখন আমাদের মুক্তি আন্দোলনের এই অধ্যায়ের কথা লিপিবদ্ধ করবেন তখন তিনি নিশ্চয়ই লিখবেন যে : 'Non-co-operation and civil disobedience werediscontinued by the leadership not because the movement was defeated, but because of its alarming success.'* ভারতে ধনিকগোষ্ঠীর বন্ধু গান্ধীর পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক ছিল।

---

* *The Empire of the Nabobs* : Hutchinson

সত্য ও অহিংসার নৈষ্ঠিক পূজারী গান্ধী মাঝপথে আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন বটে, কিন্তু সরকারের হৃদয়ের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। বরং ১০ই মার্চ (১৯২২) তাঁকে গ্রেপ্তার করে তাঁরা যেন ভারতের জাগ্রত মুক্তি-আন্দোলনের মূলে এবারে আঘাত করতে উদ্যত হলেন। বিচারে গান্ধীর ছয় বছরের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। বিগত কয়েক মাসের প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার পরিবর্তে গভীর নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হলো সমগ্র দেশ এবং সেই সঙ্গে জাতির রাজনৈতিক চেতনা অবসাদে আচ্ছন্ন হলো।

অসহযোগ আন্দোলনের এই রকম পরিণতি কেন হলো? কেনই বা এই আন্দোলন মাঝপথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল? এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে এই পর্যায়ের আন্দোলনটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত ভারতে একজন নেতার অধীনে এক কার্যসূচী নিয়ে এতখানি ব্যাপক আন্দোলন এর আগে আর কখনো দেখা যায় নি। কিন্তু এই আন্দোলনের তাৎপর্যটা কী? এই আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন। কংগ্রেসের কলকাতা বা নাগপুর অধিবেশনের সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন বিজ্ঞানসম্মত রাজনীতি ছিল না—ছিল না কোন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাবাদর্শ। ধর্মের ভিত্তিতেই এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয় এই শতাব্দীর শুরু থেকে। সেটা ছিল ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদ বা religious revivalism-এর যুগ। গান্ধীর রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে ধর্মীয় ভাব প্রবল ছিল এবং সম্ভবতঃ এই কারণে তাঁর পরিকল্পিত অসহযোগ আন্দোলন যুগপৎ ধর্মীয় ও জাতীয় উন্মাদনার উপর নির্ভর করে অগ্রসর হতে থাকে। যে

সময়ে এই আন্দোলন ভারতবর্ষে আরম্ভ হয় তখনকার ঔপনিবেশিক দেশগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ মনে রাখলেই বোঝা যাবে যে, তখন সর্বত্রই দেখা দিয়েছে একটা অন্ধ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা। তার মধ্যে যতখানি তীব্রতা ছিল ঠিক ততখানি ছিল না বলিষ্ঠ চিন্তাগত বিপ্লব। অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে সাম্রাজবাদ বিরোধিতা ছিল না—ছিল না চিন্তাগত বিপ্লব অথবা বিজ্ঞানসম্মত রাজনীতি। রাজনীতিতে অহিংস-নীতির পরীক্ষা অভিনব সন্দেহ নেই তবে এর মধ্যে প্রকৃত বিপ্লব কোথায়? গান্ধীর কাছে 'স্বরাজ' ছিল রামরাজ্যের এক অস্পষ্ট অদ্ভুত রহস্যময় পরিকল্পনা মাত্র। এতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না, কারণ গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শন অনেক কিছুর মিশ্রণে (থিওজফি, টলষ্টয়, বেদ ও সার্মন অন দি মাউন্ট) গঠিত ছিল। এ শুধু রহস্যময় নয়, দুর্বোধ্যও বটে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে নেহরু সত্যিই বলছেন, 'এ ছিল জাতীয়তা, রাজনীতি, ধর্ম, অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদ এবং ধর্মান্ধ গোঁড়ামির এক আশ্চর্য মিলন-মিশ্রণ। আমরা কর্মের আনন্দে মাতিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম কিন্তু লক্ষ্য সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না।' এবং ইহা সত্য যে সেই রাজনৈতিক উন্মাদনার দিনে এই বিষয়ে কেউ কিছুমাত্র চিন্তা করেও দেখে নি—না এর তত্ত্বের দিক, না দার্শনিক দিক। তথাপি গান্ধীর মতবাদে অনেকেই প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। হন নি শুধু একজন। তিনি রবীন্দ্রনাথ। সেদিন তিনিই ছিলেন অসহযোগের প্রধান সমালোচক।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল এই আন্দোলনের দুর্বলতা। তাই তিনি কয়েকটি পত্রে গান্ধীকে এ বিষয়ে সাবধান করে বলেছিলেন যে, এই আন্দোলনের ফলে দেশে যে তীব্র স্বাদেশিকতা ও জাতীয় উন্মাদনার প্লাবন এসেছে, এর মধ্যে কোন সার্বজনীন সত্য নেই। সেদিন কবি বলেছিলেন: 'স্বাজাত্যের অহমিকা

থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সর্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে।... সত্যকার স্বাতন্ত্র্যের উপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হবে। যারা নবযুগের সাধক ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে হবে; আর তাদের মনে রাখতে হবে, এই সাধনায় জাতিবিশেষের নয়, নিখিল মানবের মুক্তি।'* এই রকম স্বচ্ছ আন্তর্জাতিক চিন্তা-চেতনা সেদিন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিল কিনা সন্দেহ।

এই প্রসঙ্গে এণ্ড্রুজ সাহেবের নামও উল্লেখযোগ্য। তিনিও গান্ধীকে এই জাতীয় chauvinistic উন্মাদনার নেতৃত্ব করতে দেখে তাঁকে এই সূত্রে সাবধান করে দিয়ে লিখেছিলেন: 'This non-co-operation must, I fear, lead back to the old, bad, selfish nationalism.' এমন কি, তিনি আইন অমান্য আন্দোলন ও বিলাতি বস্ত্র বর্জন দুইয়ের কোনটাই সমর্থন করেন নি। বলেছিলেন, এইসব জিনিস সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতার বিরোধী মোটকথা, কি রবীন্দ্রনাথ কি এণ্ড্রুজ অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেন নি যদিও তাঁরা দু'জনেই ভারতের নবযুগের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীর মতো একজন সর্বত্যাগী নেতার আবির্ভাবকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি ও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। গান্ধীর অসহযোগ নীতির ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াতে পারে সেটা বোধ হয় ভারতবর্ষে সকলের আগে উপলব্ধি করেছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ। এই সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তা অনুধাবনযোগ্য। কংগ্রেসের পূর্ববর্তী নেতাগণ যেখানে বিশ্বাস করতেন 'progressive realisation of Self-government', সেই রকম এর নতুন নেতৃবৃন্দ চমক লাগাবার জন্য নিয়ে এলেন 'raw haste'—যে জিনিসটা সুস্থ রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার বিকাশের পক্ষে প্রবল প্রতিবন্ধকস্বরূপ। সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন:

* কালান্তর: রবীন্দ্রনাথ।

'Non-co-operation had done its work by creating a poorfound sense of mistrust on British promises and pledges among a certain section of our people, despite evidence of earnest effort to redeem them.... The avowed advocates of non-co-operation have achieved nothing on the constructive side....The cult of non-co-operation, which dominated the political horizon, today stands suspended. The fact is an open proclamation of the failure on the part of the leaders of that movement.'*

অসহযোগের পরিণতি যে সহযোগ, এ কথাটাও সুরেন্দ্রনাথ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, যেমন বলেছিলেন বিপিনচন্দ্র। এঁরা এই আন্দোলনের মধ্যে দেখেছিলেন বিদ্বেষের ভাব যা কোন সুস্থ রাজনীতির পরিচায়ক নয়। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে আমরা দেখেছি যে বিদ্বেষপ্রসূত কোন আন্দোলনই জনসাধারণের পক্ষে স্থায়ী কল্যাণপ্রসূ হয় নি। ভাবোম্মাদনার প্রাথমিক ঘোর কেটে যাওয়ার পর আমাদের নেতারাও বোধ হয় সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন যে আইন অমান্য আন্দোলন বা অসহযোগের পথে ভারতের স্বাধীনতা লাভ সুদূরপরাহত।

খিলাফৎ আন্দোলনটাও ঠিক তেমনি একটা ভ্রান্ত জিনিস ছিল। এটাকেও গান্ধীর আর একটি হিমালয় সদৃশ ভুল বলা যেতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মুসলমান জগতের ধর্মগুরু 'খালিফা' বা তুরস্কের সুলতানের প্রতি ইংরেজরা কঠোর আচরণ করেছিল। ফলে, সমস্ত মুসলমান সমাজের মধ্যে আরম্ভ হয় খিলাফৎ আন্দোলন। ভারতে এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন মৌলানা মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি, সে কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে।

* *A Nation in Makiug :* Banerjea

১৯০৯ সালের শাসন-সংস্কারের অজুহাতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করে যে বিভাগের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, গান্ধী সেই বিচ্ছেদটা দূর করার জন্য আলি-ভ্রাতৃদ্বয়ের এই আন্দোলনকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সমর্থন জানালেন। তাঁর আশা ছিল, এর ফলে ভারতের হিন্দু-মুসলমান কাছাকাছি আসবে। গান্ধীর মত একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি কি করে যে এই আন্দোলন সমর্থন করলেন তা সাভারকরের মতে, ভারতের ইতিহাসে আজো বিস্ময়ের বিষয় হয়ে আছে। কাফের ও অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যারা জেহাদ ঘোষণা ভিন্ন অন্য কিছু জানে না, তাদের জন্য এই দরদ ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে যে কি মারাত্মক হয়েছে, সে বেদনাদায়ক ইতিহাসের পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

প্রকৃত সত্য এই যে, রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের মিশ্রণ ঘটিয়ে গান্ধী ভুল করেছিলেন এবং তারই সুযোগ নিয়ে মহম্মদ আলি তাঁকে খিলাফৎ আন্দোলনের মধ্যে টেনে এনেছিলেন। গান্ধী অবশ্য ভেবেছিলেন যে, যদি হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বাস্তবে রূপায়িত হয়, তাহলে ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হবে। তিনি তাই নির্বিচারে দুই বাহু প্রসারিত করে আলি-ভ্রাতৃদ্বয়কে দিলেন আলিঙ্গন আর তারই প্রতিদানে তাঁর প্রিয় মহম্মদ আলির মুখ থেকে তাঁকে অবশেষে শুনতে হলো: 'Mr. Gandhi is working under the influence of communalist Hindu Mahasabha. He is fighting for the supremacy of Hindusthan. He wants to pass over the head of Muslim India.' এইখানেই শেষ নয়। তাঁকে আরো শুনতে হলো: 'I am a Muslim first, a Muslim second and a Muslim last.' এই মহম্মদ আলিই গোল টেবিল বৈঠকে গিয়ে যা বলে এসেছিলেন তারই মধ্যে পাকিস্তানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল এবং ১৯৩০ সালের পর থেকে তাঁর 'কমরেড' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি পাকিস্তানের অনুকূলেই জোর প্রচারকার্য

চালিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন এর প্রকৃত জন্মদাতা। শেষের দিকে গান্ধী ও আলি-ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের এই ছিল প্রধান কারণ।

এর পরেও কি আমরা বলব না যে, খিলাফৎ আন্দোলন সাম্প্রদায়িক বিভেদ দূর করা দূরে থাকুক, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকেই পরিপুষ্ট করে ভারতের জাতীয় সংহতিকে দুর্বল করে দিয়েছে চিরকালের মতো। আজ যখন আমরা ভারত-বিভাগের সর্বনাশা পরিণতির ইতিহাস চিন্তা করি তখন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে পারি না যে, অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলনকে মিলিয়ে-মিশিয়ে গান্ধী ভুলই করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অমৃতসর কংগ্রেসে যখন খিলাফতের প্রশ্ন উঠেছিল, তখন একমাত্র জিন্নাই এই বিষয়ে গান্ধীপ্রমুখ নেতাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে, এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের মুসলিম সমাজে প্রবল ধর্মান্ধতার (religious bigotry) সৃষ্টি হবে এবং ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির পক্ষে সেটা আদৌ হিতকর হবে না। তখন জিন্নার এই সতর্কবাণীতে কেউ কর্ণপাত করেন নি। তারপর মোপলা-বিদ্রোহের ফলে গান্ধীর যখন চমক ভাঙল তখন তিনি হয়ত তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও গান্ধীর খিলাফতী মনোভাবের প্রতি কোনদিন আস্থা বা ভরসা প্রদর্শন করেন নি। খিলাফতের দাবীতে অটোমান-সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রবর্তনের দাবী ইতিহাসের বিচারেও যে অসঙ্গত, সেটা যদি সেদিন গান্ধী বুঝতেন, তাহলে ঘটনাস্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত হতো এবং পরিণামে সেটা ভারতের পক্ষে শুভ হতো।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বন্দীজীবন যাপনের সময় দেশবন্ধু কেবলমাত্র রাজনীতির আলোচনা করে দিনাতিপাত করেন নি। রাজনীতি-সর্বস্ব মানুষ তিনি ছিলেন না। সাহিত্য ও ইতিহাসে তাঁর ছিল প্রবল অনুরাগ; তাই দেখা যায় যে, ১৯১৭ সালে

ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলন থেকে আরম্ভ করে ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মিলন পর্যন্ত তিনি ইংরেজী ও বাংলায় যত বক্তৃতা করেছেন তার প্রত্যেকটি ছিল সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ এবং এই কারণেই জনমনে তাঁর বক্তৃতাগুলি অমন ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করতে পারত। এই বৈশিষ্ট্যে অন্য সব নেতার মধ্যে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। আলিপুর জেলে অবস্থান করবার ফলে তিনি যে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন তার সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁর সহবন্দী সুভাষচন্দ্র। এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের একটি চিঠি থেকে এখানে কিছু উদ্ধৃতি দিলাম। তিনি লিখেছেন :

'কারাগারে দেশবন্ধু অধিকাংশ সময় অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন। ভারতের জাতীয়তা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিবার অভিপ্রায়ে তিনি রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক অনেক নূতন পুস্তক আনিয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়া তিনি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু সময়ের সংকীর্ণতার দরুন তিনি জেলখানায় থাকিতে পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে পুনর্বার কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইল বলিয়া তিনি জীবদ্দশায় তাঁহার আরব্ধ কাজ শেষ করিতে পারেন নাই। সে সময়ে রাজনীতি ও জাতীয়তা সম্পর্কে তাঁহার সহিত আমার অনেক আলোচনা হইয়াছিল। তিনি কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি ধর্মনীতি—জীবনের কোন ক্ষেত্রেই মতের অনুসরণ পছন্দ করিতেন না।'

তুলসীচরণ গোস্বামী ও গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরীর সঙ্গে দেশবন্ধু সম্পর্কে যখনি আলোচনা করেছি, তাঁরা বিশেষভাবেই দেশবন্ধুর সাহিত্যপ্রীতির কথা উল্লেখ করতেন। এঁদের অভিমত এই ছিল যে, যদি রাজনীতি দেশবন্ধুকে গ্রাস না করত তাহলে তিনি একজন উচ্চদরের কবি ও লেখক হতে পারতেন। রাজনীতির বেদীমূলে তাঁর এই ত্যাগটাও বড় কম ছিল না।

দেশব্যাপী উৎসাহ-উদ্দীপনা যেন সহসা স্তিমিত হলো।

আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেল মাঝপথে।

জেলের মধ্যেই বসে তিনি ধীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন—ততঃ কিম্।

কারামুক্তির পর জাতীয় আন্দোলনের জন্য কি কার্যক্রম হওয়া উচিত, দেশব্যাপী অবসন্নতা দূর করে ব্যুরোক্রেসির সঙ্গে কিভাবে মোকাবিলা করতে হবে, এইসব চিন্তায় তাঁর মস্তিষ্ক আলোড়িত হতে থাকে। পথ একটাই আছে—কাউন্সিল-প্রবেশ, কিন্তু সমস্যা হলো কংগ্রেস থেকে এটা পাস করিয়ে নেওয়া যাবে কিনা। সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি এই নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে একদল কাউন্সিল-প্রবেশের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন, অপর দল এর স্বপক্ষে। এই সময়ে (এপ্রিল, ১৯২২) চট্টগ্রামে বাংলার প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন বসল। দেশবন্ধু কারাগারে। বাসন্তী দেবীর প্রতি সম্মান দেখিয়ে বাংলা তাঁকে ঐ সম্মিলনে সভানেত্রীর পদে বরণ করল। এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন যতীন্দ্রমোহন। বাসন্তী দেবীর অভিভাষণে কাউন্সিল-প্রবেশের আভাস ছিল। লোকে তাঁর মধ্যে দেশবন্ধুর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছিল।

১৯২২, ৯ই আগষ্ট।

দেশবন্ধু কারামুক্ত হলেন।

জেল থেকে অসুস্থ শরীরেই তিনি মুক্ত হন। ঠিক হলো, এই উপলক্ষে তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে প্রকাশ্যে সংবর্ধিত করা হবে। এই সংবর্ধনার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নির্মলচন্দ্র চন্দ। দেশবন্ধুর সংবর্ধনা সভায় কে সভাপতিত্ব করবেন? সকলের ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। তখন নির্মলচন্দ্র জোড়াসাঁকোয় গিয়ে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ও প্রস্তাব নিবেদন করলেন। কবি সম্মত হলেন না। বললেন, 'পলিটিক্স ছেড়ে দিয়েছি।' অনেক সাধ্য-সাধনাতেও তিনি দেশবন্ধুর সংবর্ধনা-সভায় সভাপতিত্ব করতে রাজী হলেন না। সকলে ভাবলেন

এটা কি 'নারায়ণ' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিরূপ সমালোচনার প্রতিক্রিয়া? অথবা জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতার জন্য একটি প্রতিবাদ সভা ডাকার জন্য চিত্তরঞ্জনের কাছে কবির সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার প্রতিক্রিয়া? অথবা ডায়ারী বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি যে রাজদত্ত সম্মান ত্যাগ করেছিলেন সেজন্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কংগ্রেসের উপেক্ষার প্রতিক্রিয়া? হয়ত এইসব কারণেই রবীন্দ্রনাথ নির্মলচন্দ্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে থাকবেন। তখন ঠিক হয় যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে এজন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। সকলে মিলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি বললেন, 'রবীন্দ্রনাথ থাকতে আমি কেন সভাপতি হব?' তারপর কবি রাজী হন নি শুনে প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং গিয়ে আবার কবির কাছে দরবার করলেন। কবি তাঁকে বলেছিলেন, 'আমি অসুস্থ, আমি পারব না।' এর পরেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতা ত্যাগ করে শান্তিনিকেতন চলে যান।

উদ্যোক্তারা কিন্তু নিরুৎসাহ হলেন না। তাঁরা আচার্য রায়কে সভাপতি ঠিক করে এই বিষয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। অভিনন্দন-পত্র রচনা করবে কে? তিনজনের উপর এই কাজের ভার দেওয়া হলো—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনজনেই তিনটি মানপত্র রচনা করেছিলেন এবং সেই তিনটির মধ্যে শরৎচন্দ্রের রচিত মানপত্রটিই সকলের পছন্দ হয়—যেমন তার ভাষা, তেমন তার প্রকাশভঙ্গি। সেই অভিনন্দন-পত্র মুদ্রিত করে সমস্ত জেলা কংগ্রেসে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে নির্দিষ্ট তারিখে প্রকাশ্য সভায় ঐটি পাঠ করে দেশবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে। ঠিক এই ধরনের সংবর্ধনার আয়োজন এদেশে আর কখনো হয় নি।

কলকাতার হরিশ পার্কের সভায় সভাপতিত্ব করলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। দেশবন্ধু সভায় এলেন খদ্দরের ধুতি-চাদর পরিহিত

হয়ে, পায়ে চটি। ছয়মাস পরে জেলের বাইরে এসে তিনি তাঁর দেশবাসীর সম্মুখে দাঁড়ালেন। জনতার কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল: দেশবন্ধু কি জয়! এই সভার তারিখ ছিল ২৬শে শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩২৯। দক্ষিণ কলকাতার এই সভার পর দ্বিতীয় সংবর্ধনার সভা হয় মির্জাপুর পার্কে। এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন বিশেষ করে মহানগরীর ছাত্রসমাজ। হরিশ পার্কের সভায় দেশবন্ধুকে যে মানপত্রটি দেওয়া হয়েছিল সেটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো:

শ্রদ্ধাস্পদ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের

শ্রীকরকমলে—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন!

হে বন্ধু, তোমার স্বদেশবাসী আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। মুক্তি-পথযাত্রী যত নর-নারী যে যেখানে যত লাঞ্ছনা, যত দুঃখ, যত নির্যাতন সহ্য করিয়াছে, হে প্রিয়, তোমার মধ্যে আজ আমরা তাহাদের সমস্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া সগৌরবে সবিস্ময়ে নমস্কার করি। সুজলা সুফলা শ্যামলা মা আমাদের অবমানিতা শৃঙ্খলিতা। মাতার শৃঙ্খলভার যত সন্তান তাঁহার স্বেচ্ছায় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে, তুমি তাহাদের অগ্রজ; হে বরেণ্য. তোমার সেই সকল খ্যাত ও অখ্যাত ভ্রাতা ও ভগিনিগণের উদ্দেশে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত সমস্ত দেশের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি গ্রহণ কর।

একদিন দেশের লোক তোমাকে ক্ষুধিত ও পীড়িতের আশ্রয় বলিয়া জানিয়াছিল, সেদিন সে ভুল করে নাই। কিন্তু যে কথা তুমি নিজে চিরদিন গোপন করিয়াছ,—দাতা ও গ্রহীতার সেই নিভৃত করুণ সম্বন্ধ—আজো সে তেমনই গোপন শুধু তোমাদের জন্যই থাক। কিন্তু, আর একদিন এই বাংলাদেশে তোমাকে ভাবুক বলিয়া, কবি বলিয়া, বরণ করিয়াছিল। সেদিনও সে ভুল করে নাই। সেদিন এই বাংলার নিগূঢ় মর্মস্থানটি উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিতে, তাহার একান্ত সঞ্চিত অন্তরবাণীটি নিরন্তর কান পাতিয়া শুনিতে, তাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়া লইতে তোমার একাগ্র সাধনার অবধি ছিল না। তখন হয়ত তোমার সকল কথা বঙ্গের ঘরে ঘরে গিয়া পৌঁছায় নাই, হয়ত কাহারো রুদ্ধদ্বারে ঘা খাইয়া সে ফিরিয়াছে, কিন্তু পথ যেখানে মুক্ত ছিল, সেখানে সে কিছুতেই ব্যর্থ হইতে পায় নাই।

তাহার পরে একদিন মাতার কঠিনতম আদেশ তোমার প্রতি পৌঁছিল। সেদিন দেশের কাছে স্বাধীনতার সত্যকার মূল্য নির্দেশ করিয়া দিতে সর্বস্বপণে তোমাকে পথে বাহির হইতে হইল, সেদিন তুমি দ্বিধা কর নাই।

বীর তুমি, দাতা তুমি, কবি তুমি—তোমার ভয় নাই, তোমার মোহ নাই,—তুমি নির্লোভ, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। রাজা তোমাকে বাঁধিতে পারে না, স্বার্থ তোমাকে ভুলাইতে পারে না, সংসার তোমার কাছে হার মানিয়াছে। বিশ্বের ভাগ্যবিধাতা তাই তোমার কাছেই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বলি গ্রহণ করিলেন; তোমাকেই সর্বলোকচক্ষুর সাক্ষাতে দেশের স্বাধীনতার মূল্য প্রমাণ করিয়া দিতে হইল। যে কথা তুমি বার বার বলিয়াছ— স্বাধীনতার জন্য বুকের জ্বালা কি, তাহা তোমাকেই সকল সংশয়ের অতীত করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইল। বুঝাইতে হইল—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

এই ত তোমার ব্যথা। এই ত তোমার দান।

ছলনা তুমি জান না, মিথ্যা তুমি বল না, নিজের তরে কোথাও কিছু লুকাইতে তুমি পার না,—তাই বাংলা যখন তোমাকে 'বন্ধু' বলিয়া আলিঙ্গন করিল, তখন সে ভুল করিল না, তাহার নিঃসঙ্কোচ নির্ভরতার কোথাও লেশমাত্র দাগ লাগিল না।

আপনার বলিয়া, স্বার্থ বলিয়া কিছু তোমার নাই। সমস্ত স্বদেশ, তাইত আজ তোমার করতলে। তাইত, তোমার ত্যাগ আজ শুধু তোমার নয়, আমাদের। শুধু বাঙালীকে নয়, তোমার প্রায়শ্চিত্ত আজ বিহারী, পাঞ্জাবী, মারহাট্টা, গুজরাটি যে যেখানে আছে, সকলকে নিষ্পাপ করিয়াছে।

তোমার দান আমাদের জাতীয় সম্পত্তি,—এ ঐশ্বর্য বিশ্বের ভাণ্ডারে আজ সমস্ত মানবজাতির জন্য অক্ষয় হইয়া রহিল। এমনি করিয়াই মানবজীবনের দেনা-পাওনার পরিশোধ হয়, এমনি করিয়াই যুগে যুগে মানবাত্মা পশুশক্তিকে অতিক্রম করিয়া চলে।

একদিন নশ্বর দেহ তোমার পঞ্চভূতে মিলাইবে। কিন্তু যতদিন সংসারে অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের, সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের, অধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তির বিরোধ শান্ত হইয়া না আসিবে, ততদিন অবমানিত, উপদ্রুত মানব-জাতি সর্বদেশে, সর্বকালে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমার এই সুকঠোর প্রতিবাদ মাথায় করিয়া বহিবে এবং কোনমতে কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকাটা যে অনুক্ষণ শুধু বাঁচাকেই ধিক্কার দেওয়া, এ সত্য কোনদিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

জীবনতত্ত্বের এই অমোঘবাণী—স্বদেশে-বিদেশে, দিকে দিকে উদ্ভাসিত করিবার গুরুভার বিধাতা স্বহস্তে যাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার কারাবসানের তুচ্ছতাকে উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া আমরা উল্লাস করিতে আসি নাই। হে চিত্তরঞ্জন, তুমি আমাদের ভাই, তুমি আমাদের সুহৃদ, তুমি আমাদের প্রিয়,—অনেকদিন পরে তোমাকে কাছে পাইয়াছি। তোমার সকল গর্বের বড় গর্ব—বাঙালী তুমি, তাইত সমস্ত বাংলার হৃদয় তোমার কাছে আজ বহিয়া আনিয়াছি,—আর আনিয়াছি, বঙ্গজননীর একান্ত মনের আশীর্বাদ, তুমি চিরজীবী হও, তুমি জয়যুক্ত হও।

—তোমার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসিগণ।

মির্জাপুর পার্কের সংবর্ধনা সভার উদ্যোক্তা ছিলেন বাংলার তরুণ ছাত্রসমাজ। একই মানপত্র এখানেও পঠিত হয়। এই সভায় সুভাষচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'অভিনন্দন-পত্রে দেশবন্ধুর গুণগ্রামের উল্লেখ ছিল এবং দেশের জন্য তিনি কিরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহারও বর্ণনা ছিল। তরুণের ভক্তি ও ভালোবাসার পূর্ণ অর্ঘ্য যখন তাঁহার নিকটে নিবেদিত হইল তখন দেশবন্ধুর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি ছিলেন চির-নবীন, চির-তরুণ; তাই তরুণের বাণী তাঁহার মর্মে গিয়া আঘাত করিত। তিনি যখন অভিনন্দন-পত্রের উত্তর দিবার জন্য উঠিলেন, তখন তাঁহার অন্তরে ভাবের জোয়ার ছুটিতেছে। নিজের ত্যাগ ও কষ্টের কথা তুচ্ছ করিয়া তিনি বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের ত্যাগের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু বেশিদূর বলিতে পারিলেন না। উচ্ছ্বসিত ভাবরাশি তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল। তিনি নির্বাক নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; দুই গণ্ড বহিয়া পবিত্র অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। তরুণের রাজা কাঁদিলেন, তরুণেরাও কাঁদিল।'*

এইখানে দেশবন্ধুর যে চিত্র পাই, কোন সুদক্ষ শিল্পী যদি রঙ

* হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে লেখা সুভাষচন্দ্রের চিঠি। এই চিঠির তারিখ ৫ই মার্চ, ১৯২৬।

ও তুলির সাহায্যে তাকে রূপায়িত করেন তাহলে সেটি যে একটি উৎকৃষ্ট চিত্রসৃষ্টি বলে গণ্য হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মানুষটির হৃদয় যে কত বিশাল ছিল, সকলকে আকর্ষণ করবার কি অপরিসীম ক্ষমতা ছিল তাঁর, সুভাষচন্দ্রের এই বর্ণনার মধ্যে আমরা যেন তারই পরিচয় পাই। নেতৃত্বের যে শক্তিতে দেশবন্ধু ছিলেন অপরাজেয়, তার উৎস তো ছিল তাঁর সেই বিশাল হৃদয়।

দেশবন্ধুর বিশ্রাম নেই।

আবার স্তিমিত দেশকে করতে হবে উদ্দীপ্ত।

কারামুক্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশবন্ধু তাই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য অস্থির হলেন। গান্ধীর ছয় বছরের কারাদণ্ডের যেন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না দেশবাসীর মধ্যে। আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতখানি অবসন্নতা জনসাধারণের মনে কেন এলো? এ যেন একটা বিরাট anti-climax এবং দেশবন্ধু এ বিষয়ে যতই চিন্তা করতে থাকেন এর কোন সদুত্তর তিনি খুঁজে পান না। এটা নিশ্চয়ই জাতির একটা নৈতিক অবনতির লক্ষণ। দেশবন্ধুর যেন চিন্তার শেষ নেই। তখনো একটি সাংসারিক দায় ছিল তাঁর। কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীর তখনো বিবাহ দেওয়া বাকী ছিল। এইবার তিনি সেই কাজটা সম্পন্ন করলেন সকলের আগে। ১০ই আগস্ট কল্যাণীর বিবাহ হলো রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের দৌহিত্র ভাস্কর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

এই বিবাহ উপলক্ষে দেশবন্ধু মতিলাল নেহরু প্রমুখ কয়েকজন নেতাকে কলকাতায় তাঁর রসা রোডের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এই নিমন্ত্রণের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু ছিল স্বতন্ত্র। দেশে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত কিনা সেই বিষয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন। কল্যাণীর বিবাহকালে এই তদন্ত সমিতির

অধিবেশন চলছিল পাটনায়। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নেতাদের সঙ্গে মত বিনিময়ের সুযোগ হবে বলেই দেশবন্ধু তদন্ত কমিটির সকল সদস্যকেই তাঁর কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। প্রথমে আলোচনা হয় তদন্ত কমিটির কাজ সম্পর্কে। মতিলাল তাঁকে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেন। কথিত আছে, এই সময়েই মতিলালের সঙ্গে কাউন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক আলোচনা হয়।

কন্যার বিবাহের পর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের বিশেষ পীড়াপীড়িতে কিছুদিন বিশ্রাম লাভের জন্য দেশবন্ধু প্রথমে দার্জিলিঙ যান। এখানে কিছুকাল অবস্থান করে কোন উপকার হলো না দেখে তিনি স্বাস্থ্যলাভের জন্য কাশ্মীর যাবেন ঠিক করলেন। পরে তিনি মত পরিবর্তন করে পাঞ্জাবের স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান মারীতে গমন করেন। সেই বছরে দেরাদুনে উত্তরপ্রদেশ রাষ্ট্রনৈতিক সম্মিলনে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে দেশবন্ধু বক্তৃতা প্রসঙ্গে সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেন: 'I do not want a Swaraj which will satisfy only the middle class. I want Swaraj for the masses not for the classes.' এই সভায় মতিলাল ও সরোজিনী নাইডু উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা উভয়েই দেশবন্ধুকে তাঁর এইরকম বলিষ্ঠ ঘোষণার জন্য অভিনন্দিত করেন।

ইতিমধ্যে আইন অমান্য তদন্ত সমিতির রিপোর্ট প্রকাশিত হলো। রিপোর্টে বলা হলো যে, বিরাটভাবে আইন অমান্য আন্দোলন করার জন্য দেশ এখন প্রস্তুত নয়। আর কাউন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে রিপোর্টে মতদ্বৈধ দেখা গেল। তদন্ত সমিতির চেয়ারম্যান হাকিম আজমল খান, মতিলাল নেহরু ও বিঠলভাই প্যাটেল কাউন্সিল-প্রবেশ সমর্থন করেন আর ডাঃ আনসারি, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি ও কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

দেশবন্ধু তখন অমরাবতীতে অবস্থান করছিলেনযখন তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। মতিলালকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি কাউন্সিল-প্রবেশের বিষয়টি সম্পর্কে প্রকাশ্যে কোন কথা বলবেন না। এখন রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে বললেন : 'Reformed Councils are really a mask which the bureaucracy has put on. I conceive it our clear duty to tear those masks off the face. To end these Councils will be the most effective boycott. It is possible to achieve this if we get a majority. If we stand for elections in the beginning of 1923, the results will show that we have proceeded upon facts and not upon assumptions. I am sure of a majority for men of our views.'

কাউন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে এই ছিল তাঁর প্রথম সুস্পষ্ট অভিমত। তাঁর এই বিবৃতির তারিখ ছিল ৭ই নভেম্বর, ১৯২২। এর ঠিক তিন দিন পরেই দেশবন্ধু ফিরলেন কলকাতায়। হাওড়া স্টেশনে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এটা তাঁর কাছে ছিল নিতান্ত অপ্রত্যাশিত, কেননা কাউন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে তাঁর অভিমত তখনো অর্থাৎ সর্ববাদীসম্মতভাবে গৃহীত হয় নি। ১৮ই ও ১৯শে নভেম্বর তারিখে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতির বৈঠক বসল। সেই বৈঠকে কংগ্রেসীদের সুপারিশ করা হলো এই মর্মে যে তাঁরা যেন স্বরাজ লাভের জন্য এবং পাঞ্জাব ও খিলাফতের প্রশ্নে আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ২০শে নভেম্বর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা বসল। দেশবন্ধু এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। সেই সভায় কাউন্সিল-প্রবেশের স্বপক্ষে যাঁরা বক্তৃতা-করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মতিলাল নেহরু, হাকিম আজমল

খান, বিঠলভাই প্যাটেল, এন. সি. কেলকার, এম. আর. জয়াকর, এইচ. এস. মুঞ্জে, অভয়ঙ্কর, ডাক্তার আলম, শেরওয়ানি, অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ, এস সত্যমূর্তি, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, আম্বালার লালা দুনিচাঁদ, শ্রীমতী লজ্জাবতী দেবী, জে. এম. সেনগুপ্ত, বি. এন. শাসমল; এবং আরো অনেকে, আর বিপক্ষে যাঁরা বক্তৃতা করেছিলেন তাঁদের দলে ছিলেন, রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, সরোজিনী নাইডু, ডাক্তার আনসারি, মৌলভী আব্বাস তায়েবজী, টি. প্রকাশম, লাহোরের লালা দুনিচাঁদ, জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য, গঙ্গাধর দেশপাণ্ডে এবং আরো অনেকে। বিরোধী শিবিরে সবচেয়ে উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন পট্টভি সীতারামাইয়া যিনি বলেছিলেন—'যে কোন অবস্থায় আইনসভায় যোগদান করা কংগ্রেসীদের পক্ষে অসাধুতা। ঐক্য ভালো, কিন্তু সততা আরো ভালো।' এই পটভূমিকাতেই দেশবন্ধু কংগ্রেসের আসন্ন অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন যদিও তখনো পর্যন্ত তাঁর শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি।

আগেই বলেছি, দেশবন্ধু জেলে থাকবার সময়ে চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনে সভানেত্রীর ভাষণে বাসন্তী দেবী বলেছিলেন যে, এখন কংগ্রেসের কার্যক্রমের পরিবর্তন প্রয়োজন এবং অসহযোগিতাকে এখন আইনসভায় নিয়ে যেতে হবে। সকলেই তখন মনে করেছিলেন যে এটা দেশবন্ধুরই অভিমত। তখনো সকল রাজবন্দীর কারামুক্তি ঘটে নি। তাই তখন থেকে জেলের ভিতরে ও বাইরে এই নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে এবং অনেকেই এর বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। এই সময়ে বাংলার রাজনৈতিক আকাশে-বাতাসে শুধু কাউন্সিল-প্রবেশের কথাই শোনা যেত এবং তাঁর কারামুক্তির পরেই দেশবন্ধুকে এই বিষয়ে নানা প্রশ্নের সম্মুখীনও হতে হয়। সেই সব প্রশ্ন ও দেশবন্ধুর উত্তরের সারমর্ম এই ছিল :

প্রশ্ন। আইনসভায় গেলে অসহযোগ আন্দোলন ব্যাহত হবে কিনা ?

উত্তর। না। লোকে আইনসভার ভিতরে ও বাইরে থেকেও অসহযোগী হতে পারে। বরং আইনসভার ভিতর থেকেই সংস্কারকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করা সম্ভব এবং ব্যুরোক্রেসি তখন নিজেকে অসহায় মনে করবে।

প্রশ্ন। আইনসভায় কংগ্রেসের কার্যসূচী কি হবে ?

উত্তর। সরকারকে তার প্রত্যেকটি কাজে বাধা দেওয়া। আমরা এইটাই প্রমাণ করব যে, এই শাসন-সংস্কার দ্বারা দেশের কোন কল্যাণ সাধিত হয় নি। তখন তাদের এই শাসনতন্ত্র হয় বদলাতে হবে, না হয় বাতিল করতে হবে।

প্রশ্ন। এই রিফর্ম যে ভুয়া তাতো ইতিমধ্যেই বোঝা গেছে।

উত্তর। একথা শুধু মুখে বললে কাজ হবে না। এখন তো আইনসভার দোহাই দিয়ে ব্যুরোক্রেসি যা খুশি তাই করছে। কাউন্সিলের ভিতরে গিয়ে আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে, পরিষদের বর্তমান সদস্যগণ জনসাধারণের প্রকৃত নির্বাচিত প্রতিনিধি নন।

প্রশ্ন। কংগ্রেস যদি দেশের সমস্ত আইনসভা দখল করে তাহলে ব্যুরোক্রেসির অত্যাচার বা দমনমূলক নীতি বন্ধ হবে কিনা ?

উত্তর। সে বিষয়ে এখনি কিছু বলা শক্ত। এখন ওরা যা কিছু করছে, আইনসভার দোহাই দিয়ে করছে, তখন তা পারবে না। কেননা তখন সেখানে দুটো দল থাকবে—সরকারী দল আর জনসাধারণের দল।

প্রশ্ন। দেশের যেটুকু লাভ হয়েছে, তা যদি সরকার ফিরিয়ে নেয় ?

উত্তর। প্রকৃতপক্ষে সরকার আমাদের কিছুই দেয় নি—বর্তমান শাসন-সংস্কার কোন ভাল জিনিস ব্যুরোক্রেসিদের কাছ থেকে

আশা করা যায় না। এব দ্বৈতপ্রথার তারা তাদের মন্ত্রীদের বিশ্বাসই করে না।

প্রশ্ন। আইনসভায় নির্বাচিত হলে আপনি কি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবেন?

উত্তর। না। বর্তমান ব্যবস্থায় মন্ত্রী হওয়া মানে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা। যদি সমস্ত বিভাগ আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসে আর যদি প্রাদেশিক অটোনমি দেওয়া হয় তা'হলে আমি সম্মত আছি।

প্রশ্ন। আইনসভায় গেলে স্বরাজলাভ হবে কিনা?

উত্তর। যদি দেশের জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল সমস্ত আইন-সভা দখল করতে পারে এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে সেখানে জনসাধারণের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করতে পারে, তখন ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট আপোষের কথা চিন্তা করতে বাধ্য হবে। এইভাবে আইন অমান্য আন্দোলন ব্যতিরেকেই আমরা আমাদের লক্ষ্যে উপনীত হতে পারব।

প্রশ্ন। আপনি কি আইন অমান্যের পক্ষপাতী নন?

উত্তর। আমার গত দু-এক বছরের কাজ থেকেই বুঝা যাবে যে, এ প্রশ্ন অবান্তর। আমার প্রধান লক্ষ্য জনসাধারণের জন্য স্বরাজ অর্জন আর আইন অমান্য তারই একটা উপায় মাত্র। পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন করার আগে শক্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন এবং সেই শক্তি আমরা লাভ করব সরকারের নির্দিষ্ট কয়েকটি কাজে বাধা প্রদান করে। যদি আইনসভার ভিতরে গিয়ে, জনসাধারণের সমর্থনে প্রাদেশিক অটোনমি আমরা লাভ করতে পারি তা'হলে আমি অন্ততঃ আইন অমান্য আন্দোলনের কথা চিন্তা করব না—যদিও এইটাই আমাদের হাতে শেষ অস্ত্র।

প্রশ্ন। কাউন্সিলের সদস্য হলে আপনি শপথ গ্রহণ করবেন কিনা?

উত্তর। শপথ গ্রহণে দোষ কি? এমন কি যাঁরা অসহযোগিতায় বিশ্বাস করেন তাঁরা তো সরকারী ডাকটিকিট ব্যবহার করছেন এবং সরকারী প্রচেষ্টায় সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধারও ব্যবহার করছেন। আমাদের লক্ষ্য দেশে ব্যুরোক্রেটিক শাসনের অবলুপ্তি সাধন এবং শাসন-ব্যবস্থায় একটি পরিবর্তন নিয়ে আসা। আমরা তো পার্লামেণ্ট অথবা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না; সুতরাং রাজার নামে শপথ গ্রহণে কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

প্রশ্ন। আমরা চরমপন্থীরা আপনার উত্তরে খুশি হতে পারলাম না। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাইরে আপনি পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী কিনা?

উত্তর। আমি স্বাধীনতা চাই, কিন্তু সেই স্বাধীনতার আকার-প্রকার নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আমি স্বরাজ চাই এবং এই স্বরাজের অর্থ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা—চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করবার নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার প্রশ্নটা এখনি বিবেচনা আসে নি। তবে কংগ্রেস যদি এইরকম কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তা'হলে আমি কংগ্রেসকে সমর্থন করব ও সেজন্য সংগ্রাম করব।

অতঃপর আমরা দেখতে পাব যে, দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পটভূমিকায় দেশবন্ধুর রাজনৈতিক প্রতিভা আইন-সভায় প্রবেশের ভিতর দিয়ে কিভাবে দেশকে মুক্তিসংগ্রামের পথে এগিয়ে নিয়ে গেল এবং কেমন করেই বা তিনি সেই রাজনৈতিক অবসন্নতার দিনে দেশবাসীর মনে সঞ্চার করলেন এক নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা। দেখতে পাব তাঁর নেতৃত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। দেখতে পাব স্বরাজ-রথের সারথি হিসাবে ও 'crusader of Council entry'-রূপে দেশবন্ধুর আর এক মূর্তি, ভারতবর্ষের সমকালীন ইতিহাসে যার তুলনা বিরল।

অন্তিম শয়নে দেশবন্ধু

তৃতীয় খণ্ড

১৯২২-১৯২৫

উদ্ভাসন

এনেছিলে সাথে লয়ে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

॥ একুশ ॥

'The change of direction which I advocate and the other practical changes which I have mentioned are not by way of surrendering anything that is already on the plank—but it is simply by way of addition.... There is no royal road to freedom, and dark and difficult will be the path leading to it.'

গয়া কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টের মঞ্চ থেকে এই কথাগুলি বলেছিলেন দেশবন্ধু। সাহিত্য ও ইতিহাসে তাঁর এই অভিভাষণ অতুলনীয়। প্রতিভার সঙ্গে কৌশলের সমাবেশ ভিন্ন রাজনীতি কখনো সার্থকতায় উত্তীর্ণ হয় না। আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে সেই প্রতিভা ও কৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন গয়া কংগ্রেসের সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রাম তখন এক সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। গান্ধী কারাগারে, দেশের মধ্যে আন্দোলন নেই। শাসকের উদ্ধত ভ্রূকুটি প্রতি পদেই তখন শাসিতদের ব্যঙ্গ করছিল। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সেই সময়ে দেশবন্ধুর নেতৃত্বের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

অসহযোগ আন্দোলন, স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন ও ইংলণ্ডের যুবরাজের কলকাতায় আগমন উপলক্ষে পরিপূর্ণ হরতাল—এই তিনটি বিষয়েই সেদিন বাংলা ছিল অগ্রগণ্য। এক বাংলাদেশেই ষোল হাজার অসহযোগী জেলে গিয়েছিল আর সেই অনুপাতে সারা ভারতের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ হাজার। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে মুক্তি আন্দোলনে এই যে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ; এ সম্ভব হয়েছিল শুধু একটি মানুষের অসাধারণ ত্যাগের ফলে আর তাঁর অভূতপূর্ব সাংগঠনিক প্রতিভার জন্য।

বাংলার আন্দোলনের উত্তাপ সেদিন সমগ্র ভারতবর্ষ অনুভব করেছিল আর অনুভব করেছিলেন স্বয়ং লর্ড রীডিং। তাইতো তিনি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মাধ্যমে দেশবন্ধুর সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা করবার জন্য কলকাতায় ছুটে এসেছিলেন, সে কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। কাজেই কংগ্রেসের ৩৭তম অধিবেশনে সভাপতির পদে নির্বাচিত হওয়ার দাবী একমাত্র তাঁরই ছিল এবং সমস্ত প্রদেশ কংগ্রেস সেদিন একবাক্যে তাঁর নির্বাচনের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করে দেশবন্ধুর নেতৃত্বকেই জানিয়েছিল অকুণ্ঠ স্বীকৃতি আর আন্তরিক অভিনন্দন।

কংগ্রেসের ইতিহাসেও এই অধিবেশন অবিস্মরণীয়। আমরা পূর্বেই বলেছি, চিত্তরঞ্জন সর্বপ্রথম কংগ্রেসের দ্বাবিংশ অধিবেশনে যোগদান করেন (১৯০৬) একজন প্রতিনিধি হিসাবে। তারপর থেকে দশ-এগার বছর তিনি কংগ্রেসের বাইরে অবস্থান করেছেন একজন নীরব দর্শক হিসাবে। ১৯১৭ সালে য়্যানি বেশান্তকে সভানেত্রীর পদে নির্বাচন করার ব্যাপারে তিনিই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং একজন উৎসাহী প্রতিনিধি হিসাবে এই কংগ্রেসের আলোচনায় যোগদান করেন। সেই থেকে ১৯২৪ সালে বেলগাঁও কংগ্রেস পর্যন্ত (গান্ধী এই কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন) এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দেশবন্ধুর যোগসূত্র আর কখনো ছিন্ন হয় নি। ১৯২১ সালে কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু এই অধিবেশনের কিছুদিন পূর্ব সংশোধিত ফৌজদারি আইনে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং তখনো পর্যন্ত তাঁর বিচার শেষ হয় নি, সেইজন্য সেই অধিবেশনের আলোচনায় নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ ও সম্মান থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন।

তারপর যে ছয়মাস তিনি আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে সরকারের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, সেই সময়ে সেখানে তাঁর সুপরিসর ঘরটিতে প্রতিদিনই রাজনৈতিক দরবার বসত। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে থেকেই তিনি যাতে সর্বভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে সকল

নেতার সঙ্গে অবাধে আলোচনা করতে পারেন, সরকার অবশ্য সে-সব সুযোগ-সুবিধা তাঁকে দিয়েছিলেন। ভারতের রাজনীতিতে তাঁর প্রাধান্য শুধু যে সরকার পক্ষ থেকেই স্বীকৃতি পেয়েছিল তা নয়, মালব্য প্রমুখ যে-সব নেতৃবৃন্দ তখনো বাইরে ছিলেন তাঁরা পর্যন্ত বাংলার এই নবীন নেতার প্রভাব বিশেষভাবেই অনুভব করতে থাকেন। ওদিকে মহাত্মা গান্ধী তখন যারবেদা জেলে ছয় বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন। এমন অবস্থায় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন যখন আসন্ন হয়ে এলো তখন সর্ববাদীসম্মতিক্রমে দেশবন্ধুকেই গয়া কংগ্রেসের সভাপতির পদে নির্বাচন করা হয়। সুরেন্দ্রনাথের পরে তিনিই দ্বিতীয় বাঙালী যিনি উপর্যুপরি দুইবার এই সম্মান লাভ করেছিলেন এবং তাঁর স্বরাজ-সাধনার উত্তরাধিকারী সুভাষচন্দ্রের ভাগ্যেও এই একই সম্মানলাভ ঘটেছিল। আবার গুরু-শিষ্য উভয়কেই পদত্যাগও করতে হয়েছিল। দেশবন্ধুকে সভাপতির পদে নির্বাচন করার আরো একটা কারণ ছিল। সমগ্র দেশে তখন অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের ধারা মন্দীভূত হয়ে এসেছে; কর্মীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে নৈরাশ্য ও অবসাদ। এমন অবস্থায় কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের দৃষ্টি দেশবন্ধুর উপরেই নিবদ্ধ হয়েছিল। কারণ সকলের মনেই তখন এই ধারণা জন্মেছিল যে, দেশব্যাপী রাজনৈতিক অবসন্নতার দিনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দেশকে আবার কর্মচঞ্চল করে তুলতে হলে তাঁর মতো একজন প্রভাবশালী নেতারই প্রয়োজন।

আগেই বলেছি, জেলে থাকবার সময়েই দেশবন্ধু তাঁর পরবর্তী কর্মপন্থা—কাউন্সিল-প্রবেশ—বিশেষভাবেই চিন্তা করছিলেন ও তাঁর সহবন্দীদের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনাও করতে থাকেন। শ্যামসুন্দরও তখন জেলে এবং তিনি এই কাউন্সিল-প্রবেশের একজন প্রবল বিরোধী ছিলেন। সেই বিরোধের ফলে উভয়ের মধ্যে একটা সাময়িক বিচ্ছেদও ঘটে যায় যেমন ঘটেছিল অসহযোগকে উপলক্ষ করে বিপিন-চন্দ্রের সঙ্গে। তারপর তাঁর কারামুক্তির পর যখন তাঁকে কলকাতায়

ও অন্যত্র সম্বর্ধিত করা হয়, তখন দেশবন্ধু তাঁর প্রত্যেকটি বক্তৃতায় দেশবাসীকে ওই নতুন কর্মপন্থার আভাস পরিষ্কারভাবেই দিয়েছিলেন যদিও গয়া কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণের আগে কাউন্সিল-প্রবেশ নীতি সম্পর্কে তিনি কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য দেশবাসীর সামনে রাখেন নি।

১৯২২, ডিসেম্বর।

স্মরণীয় গয়া কংগ্রেস। বিহারে এই দ্বিতীয়বার জাতীয় মহাসভার বার্ষিক অধিবেশন হতে চলেছে। এবারকার উদ্যোক্তা ছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। তিনিই আমেদাবাদ কংগ্রেস মহাসভার পরবর্তী অধিবেশন বিহারে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য ওয়ার্কিং কমিটিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কংগ্রেসের এই ৩৭তম অধিবেশনের সম্পূর্ণ বিবরণ তিনি তাঁর আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন বিহার কংগ্রেসের প্রধান এবং তিনিই তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্বে তাঁর প্রদেশে এই অধিবেশনের আয়োজন করেন। আমেদাবাদ ধনীর দেশ, বিহার গরীবের দেশ। সুতরাং এখানে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন ডাকা বিশেষ দায়িত্বজনক বিষয় সন্দেহ নেই। কংগ্রেসে গান্ধীর অভ্যুদয়ের পর থেকেই এর বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিনিধি-সংখ্যা পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেতে থাকে, ফলে তখন থেকেই বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে একটি ছোটখাটো শহরই গড়ে তুলতে হতো। অধিবেশনের সবাই আবার খাদি প্রদর্শনীর আয়োজনও করতে হতো, তার ফলে বার্ষিক অধিবেশন ব্যয়বহুল হয়ে উঠতে থাকে। অধিবেশনের সমগ্র ব্যয় প্রধানতঃ সাধারণ লোকের কাছ থেকে চাঁদা তুলেই সংগ্রহ করতে হতো। কারণ দেশের ধনী ব্যক্তিরা অথবা শিল্পপতিরা তখনো পর্যন্ত দরাজ হাতে কংগ্রেসের তহবিলে অর্থ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন নি। কংগ্রেসের এই গয়া অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য রাজেন্দ্রপ্রসাদকে তাঁর নিজের দায়িত্বে একটি স্থানীয় ব্যাঙ্ক থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা কর্জ করতে হয়েছিল।

গয়া থেকে দুই মাইল দূরে একটি গ্রামের ছায়া-সুনিবিড় আম্রকুঞ্জে গড়ে উঠেছিল কংগ্রেসনগর। রাঁচী থেকে গয়াতে এসে দুইশত আদি-বাসী তাদের নিঃস্বার্থ শ্রমদান করে কংগ্রেসনগর নির্মাণে ও এর সুবৃহৎ মণ্ডপ, তোরণ প্রভৃতি নির্মাণে সহায়তা করেছিল। অসহযোগ আন্দো-লনের সময় থেকেই বিহারের আদিবাসীরা কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। গয়া কংগ্রেসে খাদি প্রদর্শনীটি সমাগত সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। এর আগে এমন সুপরিকল্পিত খাদি প্রদর্শনী কংগ্রেসের আর কোন অধিবেশনে দেখা যায় নি। কংগ্রেসের ইতিহাসে গয়া অধিবেশনের বিশেষ গুরুত্ব এই ছিল যে, এইখান থেকেই কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়—একদল আইনসভায় প্রবেশের বিরোধী ছিলেন এবং সেইজন্য এঁদের বলা হলো 'নো-চেঞ্জার' (No-Changer) আর অপর দল যাঁরা এর স্বপক্ষে ছিলেন তাঁদের বলা হলো 'প্রো-চেঞ্জার' (Pro-Changer) এবং কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতৃবর্গও এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যান। গয়া কংগ্রেসেই যে কাউন্সিল-প্রবেশ বিষয়টি উত্থাপিত হবে, এটা সকলেরই জানা ছিল ও সেইজন্য প্রতিনিধি নির্বাচনে এই দুই দলের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা রেষারেষি দেখা গিয়েছিল, যার ফলে জয়াকর, নটরাজন প্রভৃতি তাঁদের স্ব স্ব এলাকা থেকে প্রথমে প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হতে পারেন নি। পরে রাজেন্দ্রপ্রসাদের চেষ্টায় এই দুইজন প্রো-চেঞ্জার নেতা বিহার থেকে প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হতে পেরেছিলেন।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছেন: 'গয়া অধিবেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কাউন্সিল-প্রবেশ বিতর্কের ফলে কংগ্রেস দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রো-চেঞ্জার ও নো-চেঞ্জার দুই দলই গয়াতে আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং সেইজন্য প্রত্যেক গ্রুপই তাঁদের সমর্থকের সংখ্যা ভারি করবার জন্য সেইভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করেছিলেন।.......অনেকে অভিযোগ করেন যে, কাউন্সিল-প্রবেশের বিরোধীরা তাঁদের দল পুষ্ট করার জন্য গান্ধীজির নাম ভাঙিয়ে অন্যায়-

ভাবে ভোট সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। আবার অনেককে এমন কথাও বলতে শোনা গিয়েছিল যে, যেহেতু বিহার হচ্ছে গান্ধীভক্ত ও নো-চেঞ্জারদের ঘাঁটি, সেইজন্য অধিবেশনের নির্বাচিত সভাপতিকে নাকি তাঁর প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করা হয় নি। ইহা সর্বৈব মিথ্যা'।*

গয়া যাওয়ার আগে মির্জাপুর পার্কে ও হরিশ পার্কে সভা করে দেশবন্ধু কাউন্সিল-প্রবেশের প্রস্তাব সম্পর্কে লোকমত গঠন করেন। রসা রোডের বাড়িতে এ. আই. সি. সি.-র একটি সভায় তিনি সভাপতি-রূপে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন—দুই পক্ষেরই বাদানুবাদ হয় এই সভায়। ইহা স্বাভাবিক ছিল। হেমন্তকুমার সরকারের মুখে শুনেছি, যদিও তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে কারো কোন কথা বলার সাহস হতো না, তথাপি এই সময়ে দেশবন্ধুকে কাউন্সিলের প্রস্তাব নিয়ে প্রবল প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, নির্যাতনও সহ্য করতে হয়েছিল। তখন টিলক স্বরাজ তহবিলের অর্থ নিঃশেষিত হয়ে গেছে। স্বদেশী ভাণ্ডারের টাকাও ফুরিয়ে গেছে। কংগ্রেসের ত্রিশ হাজার টাকা বাড়িভাড়া বাকী পড়েছে। সবই তাঁর দায় ও দায়িত্ব। একে অসুস্থ শরীর, তার উপর চারদিকে নিন্দা, তিরস্কার, নির্যাতন। কলকাতার প্রত্যেকটি সংবাদপত্র তাঁর বিরুদ্ধবাদী, তাঁকে গালিগালাজ না দিয়ে কেউ কথা বলত না, বিশেষ করে অমৃতবাজার পত্রিকা। কোন কোন কাগজে ব্যক্তিগত আক্রমণও চলতে থাকে। সেই সঙ্গে অবিরত সভাসমিতিতে তাঁর বিরুদ্ধে চলতে থাকে প্রবল প্রতিবাদ। মোটকথা, গয়া কংগ্রেসের প্রাক্কালে দেখা যায় যে, দেশ-বন্ধুর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারে বাংলাদেশের, বিশেষ করে কলকাতা শহরের রাজনৈতিক আবহাওয়া বেশ ভারি হয়েই উঠেছিল। কেউ তাঁকে বলেন 'দেশশত্রু' আবার কেউ অপবাদ দেয় যে, তিনি নিজেই মন্ত্রিত্বপদ প্রার্থী। সে একদিন গিয়েছে। তথাপি দেশবন্ধু যেন সহস্র ঝঞ্ঝা বজ্রাঘাতে অটল মেরুর ন্যায় ধৈর্যধারণ করে রইলেন। অনুগামী

* *Autobiograpby* : **Rajendra Prasad**

ও সহকর্মীদের আশ্বাস দিয়ে শুধু বলেন, কিছু চিন্তা করো না, মেঘ কেটে যাবে। সেই দুর্দিনে একমাত্র সহায় ছিল এক পয়সা দামের 'বাংলার কথা'। ধার করে তিনি প্রথমে এই কাগজটিই বের করেছিলেন।

গয়া কংগ্রেসে যদিও তিনি যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে গিয়েছিলেন তথাপি ডেলিগেট-নির্বাচন ব্যাপারে দেশবন্ধুকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন যে হতে হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁর প্রধান সহকারী ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক বীরেন শাসমল নো-চেঞ্জার ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের কাছে পরাজিত হন। এমন কি বাসন্তী দেবীও ডেলিগেট নির্বাচিত হতে পারেন নি। গয়া কংগ্রেসে তাঁর প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি উপযুক্ত সংখ্যক সমর্থক পাবেন কিনা এবং যদি না পান তখন কি করবেন, এইসব বিষয় নিয়ে গয়া যাত্রার প্রাক্কালে দেশবন্ধুকে বিশেষ উদ্বিগ্ন হতে হয়েছিল। তিনি জানতেন যে, এর আগে কংগ্রেসে তিন-তিনবার কাউন্সিল-বর্জন প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। গয়া অধিবেশনের ফলাফল শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে সেটা তিনি যে কিছুটা অনুমান করতে না পেরেছিলেন তা নয়। তবে সবটাই নির্ভর করছিল প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্তের উপরে। আবার তিনি এও বুঝেছিলেন যে, অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার পরও 'এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ লাভ' গান্ধীর এই প্রতিশ্রুতির অসারতা প্রতিপন্ন হওয়ায় জনসাধারণের মনে তখন একটা দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। এমন অবস্থায় কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে একটা নতুন কার্যসূচী প্রত্যাশিত ছিল এবং পরিবর্তিত রাজনৈতিক পটভূমিকায় সেই প্রত্যাশিত কার্যসূচী যে কাউন্সিল-প্রবেশ ভিন্ন অন্য কিছু হতে পারে না, এই বিশ্বাসে দেশবন্ধু ছিলেন অবিচল।

কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিল। গান্ধী তখন জেলে। গয়া অধিবেশনের পূর্বে তাঁর সঙ্গে মত-বিনিময়ের সুযোগ বা সময়ও দেশবন্ধু পান নি। কাউন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে গান্ধীর মনোভাব তিনি

অবগত ছিলেন। আমাদের অনুমান হয়, যদি তাঁর সঙ্গে পূর্বাহ্নে আলাপ-আলোচনার সুযোগ মিলতো, তা হলে দেশবন্ধু নিশ্চয়ই এই বিষয়ে গান্ধীকে তাঁর স্বমতে আনতে সক্ষম হতেন, যেমন ঘটেছিল নাগপুরে যখন গান্ধী দেশবন্ধুকে তাঁর স্বমতে নিয়ে আসেন। তাই মনে হয় গয়া কংগ্রেসের পূর্বে যদি এই দুইজন নেতার মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার সুযোগ ঘটত তাহলে অধিবেশনের পর যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল সেটা নাও হতে পারত। আমাদের এরূপ অনুমান করার কারণ এই যে, যে গান্ধী বরাবর কাউন্সিল-প্রবেশের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করে এসেছেন, সেই তিনিই কারামুক্তির পর সমগ্র বিষয়টি অনুধাবন করে স্বরাজ্য দলকে তাঁর সমর্থন জানিয়ে বলেছিলেন : 'I shall cling to the Swarajya Party just as a baby clings to his mother.' এই সব বিষয়ের বিশ্লেষণ করে ইতিহাসের সেই অধ্যায়টি সম্বন্ধে আজ যখন আমরা চিন্তা করি তখন আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই যে, কারারুদ্ধ গান্ধীর অনভিমতেও গয়া কংগ্রেসে তাঁর একক দায়িত্বে কাউন্সিল-প্রবেশ প্রস্তাবটা তুলে দেশবন্ধু কিছুমাত্র অন্যায় করেন নি, বরং তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। মুস্কিল এই যে, আমরা কোন বিষয় ধীরভাবে চিন্তা করি না, অধিকাংশক্ষেত্রে উচ্ছ্বাস বা আবেগদ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকি। ফলে নানা অবাঞ্ছিত ঘটনা ও অপ্রীতিকর উক্তি-প্রত্যুক্তির সৃষ্টি হয়ে থাকে। নইলে গয়া কংগ্রেসেই অনেক নো-চেঞ্জারকে এই রকম অশোভন উক্তি করতে শোনা গিয়েছিল যে, গান্ধীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে দেশবন্ধু তাঁর কাউন্সিল-প্রস্তাব তুলেছিলেন।

১৯২২। ডিসেম্বর মাস।

গয়াতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন।

সভাপতি—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

বাংলার বিখ্যাত অসহযোগী নেতা, আদর্শ-চরিত্র শিক্ষক, বাগ্মী ও সুলেখক অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের গয়া অধি-বেশনকে একটি বৃহৎ ঘটনা ('big event') বলে তাঁর আত্মচরিতে উল্লেখ করেছেন। সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসে ইহা সত্যিই তাই ছিল। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় এই অধিবেশনে একজন প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন : এই অধিবেশনের নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন দেশবন্ধু দাশ। বহুসংখ্যক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের দুইদলের মধ্যে—প্রো-চেঞ্জার অর্থাৎ স্বরাজী—যাঁরা পরিষদীয় কাজে আস্থাবান এবং নো-চেঞ্জার অর্থাৎ যাঁরা অসহযোগিতা ও আইন অমান্য আন্দোলনে বিশ্বাসী—একটা শক্তির পরীক্ষা অনিবার্য ছিল। উভয় দলই তাঁদের স্ব স্ব শক্তি সংগ্রহ করে-ছিলেন এবং নো-চেঞ্জারদের নেতা ছিলেন রাজাগোপালাচারী। ইতিহাসের পরিহাস এই যে, ইনিই পরবর্তীকালে নির্বাচনে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং মাদ্রাজে মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেছিলেন। এই সময়ে বাংলার সমগ্র বিপ্লবীগোষ্ঠী—যুগান্তর ও অনুশীলন দল—দেশবন্ধুর সমর্থক ছিলেন। যেমন করেই হোক ক্ষমতা অধিকার করতে হবে—এই ছিল স্বরাজীদের লক্ষ্য।'*

যদিও তাঁর কারামুক্তির পর দেশবন্ধু কলকাতায় ও অন্যত্র প্রদত্ত একাধিক বক্তৃতায় সংগ্রামকে আইনসভায় নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন, তথাপি এই বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত গয়া কংগ্রেসের পূর্বে অভিব্যক্ত হয় নি। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে সভাপতিরূপে তিনি যে ভাষণ প্রদান করেন সেটিকে অনেকেই উল্লেখযোগ্য বা 'remarkable' বলে স্বীকার করেছেন। সুদীর্ঘ ও সুচিন্তিত এই ভাষণটির প্রথম ও প্রধান বক্তব্য যদিও ছিল কাউন্সিল-প্রবেশ, তথাপি এর ছত্রে ছত্রে দেশবন্ধুর প্রখর রাজনৈতিক বুদ্ধি-বিবেচনা বিচ্ছুরিত হয়েছে। আবেগ অপেক্ষা যুক্তির সমাবেশই

* *At the Cross-Roads* : Banerji

এখানে বেশি। রচনা হিসাবে ইহা একটি উৎকৃষ্ট রচনা। ভাষণের প্রথমেই কারারুদ্ধ গান্ধী সম্পর্কে তিনি যে-সব কথা বলেছিলেন সেগুলি উপস্থিত সকলের চিত্তকে স্পর্শ করেছিল, অভিভূত করেছিল। তাঁর কাছে গান্ধী ছাড়া কংগ্রেসের এই বার্ষিক অধিবেশন যেন শিবহীন যজ্ঞের মতোই প্রতীয়মান হয়েছিল। সেই বিপুল জনসমাবেশের সম্মুখে দাঁড়িয়ে দেশবন্ধু যখন বললেন: 'Mahatma Gandhi is undoubtedly one of the greatest men that the world has ever seen. The world hath need of him.'—তখন তাঁর শান্ত ও সংযত কণ্ঠোচ্চারিত এই কথাগুলি শুনে উপস্থিত সকলেই যারপরনাই অভিভূত হয়েছিলেন। এই ভাষণে গান্ধীর প্রতি তিনি যে অকপট শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন, গান্ধী সম্পর্কে তেমন সুন্দর কথা খুব কম লোকেই আজ পর্যন্ত বলতে পেরেছেন। দুঃখের বিষয়, গান্ধীর প্রতি তাঁর এই উদার ও অকপট মনোভাব সত্বেও, সেদিন এই গয়া কংগ্রেসেই অনেক নো-চেঞ্জারকে বলতে শোনা গিয়েছিল যে, মহাত্মাজীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েই দেশবন্ধু তাঁর কাউন্সিল-প্রবেশ নীতি পাস করিয়ে নিতে ব্যগ্র হয়েছেন। এমন অশোভন সমালোচনা তাঁরাই করতে পারেন যাঁরা দেশবন্ধুর চরিত্রের বিরাটত্ব ও মহত্ত্ব সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ।

"The time is a critical one and it is important to seize upon the real issue'—তাঁর ভাষণের সূচনায় এই কথা বলে, অসহযোগিতার নীতি সম্পর্কে ও নির্বাচন বয়কট করার অসারতা সম্পর্কে দেশবন্ধু বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর দৃষ্টি কেবলমাত্র ভারতবর্ষের সমস্যাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা প্রসারিত ছিল সমগ্র এশিয়ার বৃহত্তর পটভূমিকায়। ভারতের মুক্তি আন্দোলনকে তিনি এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনের সামিল করেই দেখতে চেয়েছিলেন এবং বিশ্বশান্তির জন্য এশিয়ার জনসাধারণকে নিয়ে গঠিত একটি ফেডারেশনের যে বিশেষ প্রয়োজন, সে কথাও তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে উল্লেখ

করেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে ঠিক এই ধরনের কথা—একটি নিখিল এশীয় সংস্থা গঠনের কথা—এর আগে আর কখনো উচ্চারিত হয় নি। তাঁর সমগ্র ভাষণের মধ্যে এই অংশটি খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন :

"Even more important than this is the participation of India in the great Asiatic federation which I see in the course of formation. Such a federation of all Asiatic peoples is the union of the oppressed nationalities of Asia. Is India to remain outside this union? I admit that our freedom must be own by ourselves but such bonds of friendship and love of sympathy and co-operation between India and the rest of Asia, nay between India and all the liberty-loving people of the world, is destined to bring about world peace.'

দেশবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভ্রান্ত নিদর্শন ছিল তাঁর এই এশিয়ান ফেডারেশনের পরিকল্পনা। শুধু তাই নয়। তিনি যে জাতীয়তার ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথের মতোই আন্তর্জাতিকতার স্তরে পৌঁছেছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দেশপ্রেমিক দেশবন্ধু যে কেবলমাত্র parochial ছিলেন না, তাঁর জীবনের এই সত্যটা সেদিন খুব কম লোকেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আমাদের মনে হয় তিনি যদি আর দশটা বছর জীবিত থাকতেন তা হলে যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তা আর স্বপ্ন থাকত না, বাস্তবে পরিণত হতো—তাঁর নেতৃত্বে একটি এশিয়াটিক ফেডারেশন গড়ে উঠতে পারত। দার্জিলিঙ-এ তাঁর শেষের কয়দিন তিনি এই বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন বলে জানা যায়। দেশের সমস্যা যেমন দেশবন্ধুর সমস্ত ভাবনা-চিন্তা ধ্যান-ধারণা—সমস্ত মন জুড়ে ছিল, তেমনি

ছিল সমগ্র এশিয়ার সমস্যা। আমাদের মনে হয়, তাঁর অকালমৃত্যু না ঘটলে দেশবন্ধু-মানস স্বাভাবিক ভাবেই এই ক্রম-পরিণতির দিকে অগ্রসর হতো।

গয়া কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণের মধ্যে অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল কাউন্সিল-প্রবেশ। তাঁর জীবনীকারের মতে: 'In this remarkable address, Chittaranjan first advanced his proposal to depart from Mr. Gandhi's programme on a very crucial issue and boldly made a bid for entry into the Councils.*

গান্ধীর কার্যসূচী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেশবন্ধু যে নতুন নীতি দেশবাসীর সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন সেই বিষয়ে বিতর্কের প্রবল ঝড় উঠেছিল। ঝড়ের আভাস তিনি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি সেই প্রসঙ্গে অপূর্ব যুক্তিজাল সহকারে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা থেকে 'স্বরাজ বছরের' মধ্যে যে-সব বিভিন্ন ঘটনা ও আন্দোলন একের পর এক হয়েছিল তার বহু নিপুণ বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন যে, কেউ কেউ তাঁর নতুন কার্যসূচীর মধ্যে সহযোগিতার আভাস পেয়েছেন। তাঁর মতে, একটা ভ্রমাত্মক ধারণামাত্র। কারণ তাঁর নিজের কথায়: 'Entry into the Council to co-operate with the Government and entry into the Councils to non-co-operate with the Government are two terms and two different propositions. The former is inconsistent with the idea of Non-co-operation, the latter is absolutely consistent with that very idea.'

কংগ্রেসের দুর্ভাগ্য, দেশবন্ধুর এমন সুযুক্তিপূর্ণ কথা অরণ্যে রোদন মাত্র হয়েছিল অথবা, আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, সেগুলি বধির কর্ণে নিপতিত হয়েছিল। ফলে, গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধুর কাউন্সিল-

* *Life and times of C. R. Das : Ray*

প্রবেশ নীতি সমর্থনে প্রতিনিধিদের মধ্যে চব্বিশজনের বেশি সমর্থক পাওয়া যায় নি। আইনসভার ভিতরে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা কি করে সম্ভব, সেটা প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও, প্রতিনিধিগণ বুঝতে পারেন নি, অথবা তাঁরা বুঝতে চান নি। এই ভাষণের আর এক স্থলে স্বরাজের সংজ্ঞা নির্ণয়ে দেশবন্ধু যা বলেছিলেন তার মধ্যেও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার পরিণতি লক্ষ্য করে বিস্মিত হতে হয়। তিনি বলেছিলেন: 'Swaraj is indefinable and is not to be confused with any particular system of government. Swaraj is government by the people and for the people and a parliamentary government is not a government by the people and for the people.'

এই ভাষণের অন্যত্র তিনি বলেছিলেন: 'আমাকে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও গ্রামের সম্পূর্ণ স্বরাজ— এই দুটোর মধ্যে কোন্‌টা চাও, আমি বলব, আমি গ্রামের সুখ ও স্বাধীনতা আগে চাই। আমি চাই না যে, বর্তমান আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বদলে একটা মধ্যবিত্তশ্রেণী ব্যুরোক্রেসি বা স্বদেশী আমলাতন্ত্র গড়ে উঠুক। আমি চাই সকলের সমান অধিকার।' পাঠক লক্ষ্য করবেন যে, সেই ১৯১৭ সালে ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতিরূপে 'বাংলার কথা'য় চিত্তরঞ্জন যে রাজনৈতিক আদর্শের কথা প্রচার করেছিলেন, আজ গয়া কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তিনি সেই একই কথার পুনরুল্লেখ করে বললেন: 'আমি চাই সকলের সমান অধিকার।' ভারতবর্ষে জাতীয় মহাসভার জন্মকাল থেকে সেদিন পর্যন্ত এমন কথা আর কোন নেতার মুখে উচ্চারিত হয় নি।

দুঃখের বিষয়, তাঁর এই চিন্তাগর্ভ অভিভাষণ যথোচিত সমাদর লাভ করে নি। হেমন্তকুমার সরকারের মুখে শুনেছি, কলকাতায় ফিরে এসে তাঁর অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের কাছে দেশবন্ধু দুঃখ করে বলে-

ছিলেন : 'দুঃখ হয় এই ভেবে যে, যাদের সামনে আমার জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট ভাষণটি দিলাম তাদের কেউই তা উপলব্ধি করতে পারল না।' আজো আমরা তা পেরেছি কিনা সন্দেহ।

বিষয়-নির্বাচনী সভায় যখন কাউন্সিল-প্রবেশ প্রস্তাবটি উত্থাপিত হলো (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২২) তখন সেই প্রস্তাবের সমর্থনে প্রদত্ত হয় ৮৯০টি ভোট আর বিরুদ্ধে প্রদত্ত হয় ১৭৪৮টি ভোট। এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন : 'The Subjects Committee rejected the Council entry proposal by a large majority....Heated debate continued in the open session also and it was long-drawn-out....I opposed the amendment vehemently. C. Raja Gopalachari, leader of the No-Changers, advocated our case with remarkable lucidity. S. Srinivasa Iyenger moved a compromise amendment, but it was rejected .. The Gaya Congress adopted a number of resolutions but to us every thing seemed secondary compared to the Council entry resolution which, when put to the vote, was lost, two-thirds of the delegates voting against it.'

এইভাবেই সেদিন গয়াতে কংগ্রেসের একটি সুদীর্ঘতম অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় জানা যায় যে, এই পরাজয়ের মধ্যেও সেই মহাসভায় দেশবন্ধুই ছিলেন একমাত্র জীবন্ত মূর্তি এবং সকলে তাঁর সমাপ্তি ভাষণ শুনে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্তম্ভিত হয়। যুগপৎ জয়ধ্বনি ও নৈরাশ্যের আশঙ্কার মধ্যে তাঁর রুদ্ধ কণ্ঠ যখন দৃপ্তভঙ্গিতে উচ্চারণ করল : 'Although to-day I differ from the majority of the members, I have not given up the hope that a day will come when I shall get the majority on my side.'—তখন কেউ ভাবতেও পারে নি যে,

অনতিকালের মধ্যে তিনি কংগ্রেসকে তাঁর স্বমতে আনতে সক্ষম হবেন। গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধুর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের (অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'virile and aggressive personality.') যে উদ্ভাসন দেখা গিয়েছিল, তার সম্যক ধারণা এই সুদূরকালের ব্যবধানে আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। তবে আমরা মাত্র এইটুকু অনুমান করতে পারি যে জাতির সেই সংকটের দিনে, সেই রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার দিনে, জাতির সেই মহাসভায় বিরোধীদলের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি যে অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন, কংগ্রেসের ইতিহাসে তা বিরল। পরবর্তীকালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে সেই একই দৃশ্য আমরা কি নতুন করে প্রত্যক্ষ করি নি তাঁরই সুযোগ্য রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী সুভাষচন্দ্রের মধ্যে? কিন্তু সে কাহিনী স্বতন্ত্র।

॥ বাইশ ॥

'পরাধীন দেশে সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মুক্তিসংগ্রামে বিদেশীদের অপেক্ষা দেশের লোকদের সঙ্গেই মানুষকে লড়াই করতে হয় বেশি।' দেশবন্ধু সম্পর্কে এই উক্তিটি করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।* দেশবন্ধুর সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এই উক্তির নিষ্ঠুর সত্যতা তাঁরাই জানতেন যাঁরা দেশবন্ধুর জীবনের শেষ তিন-চার বছর তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন ও তাঁর সঙ্গে কাজ করেছিলেন। গয়া কংগ্রেসের পর থেকেই দেখা যায় যে, দেশের লোকদের সঙ্গেই তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল বেশি। এই সংগ্রামের সূচনা গয়া কংগ্রেস থেকেই। এই সংগ্রাম বিদ্রোহীরই নামান্তর ছিল এবং ইতিহাসের কার্য-কারণ সম্বন্ধের ফলেই সেদিন এই জিনিস অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, বলা চলে। আমরা আগেই বলেছি, বারদৌলি প্রস্তাবের (দেশবন্ধুর কথায়, 'Bardoli surrender'), পর থেকেই দেশবন্ধুর মনে অসহযোগ আন্দোলনের সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগতে থাকে। সন্দেহ থেকে নৈরাশ্য। তখন থেকেই তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা চিন্তা করতে থাকেন ও মতিলাল নেহরুর সঙ্গে এই বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করতে থাকেন। তারপর গয়া কংগ্রেসে তিনি তাঁর কর্মপন্থা—কাউন্সিল-প্রবেশ—উপস্থাপিত করেন। গোঁড়া গান্ধী ভক্তদের কাছে দেশবন্ধুর এই আচরণ যেন অসহযোগিতার বিরুদ্ধেই প্রকাশ্য বিদ্রোহ বলে বিবেচিত হলো। ফলে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে বিপুল ভোটাধিক্যে এই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। কংগ্রেসের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে এই জাতীয় ঘটনা এই প্রথম।

* স্মৃতিকথা: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৩২)

গয়া কংগ্রেসে কাউন্সিল-প্রবেশ প্রস্তাব গৃহীত হলো না।

দেশবন্ধু কিন্তু আশা ত্যাগ করলেন না।

'ভিতর থেকে অসহযোগ' ('Non-co-operation from within.')—এই নীতির সার্থকতা যেইমাত্র তিনি অনুভব করলেন, সেইমাত্র তাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলবার সাধনায় তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর স্বভাবই ছিল এইরকম। বিক্রমপুরের জেদটা দাশ-বংশের রক্তে ভালোভাবেই ছিল; তিনি সেই বংশের সন্তান। যা ন্যায় বলে তিনি একবার বুঝতেন, শত বাধা তাঁকে তা থেকে নিবৃত্ত করতে পারত না। তাঁর জীবনের বহু ঘটনায় এর নিদর্শন আছে, তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এমন নিদর্শন আরো বেশি। গয়াতে যখন তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা বললেন, 'Non-co-operation from within is a contradiction in terms' অর্থাৎ ভিতর থেকে অসহযোগ একটা স্ববিরোধী জিনিস, তখন তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন: 'Yes, but what else can we do to do away with the feeling of frustration that has engulfed the country now following the withdrawal of the movement at its height of success.' বিরুদ্ধবাদীরা সেদিন এর জবাব দিতে পারেন নি।

এই মনোভাব নিয়েই তো সেদিন তিনি দাঁড়িয়েছিলেন গান্ধীর বিরুদ্ধে। এর ফলে স্বল্পকালের মধ্যেই অসহযোগীরা দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেলেন—নো-চেঞ্জার ও প্রো-চেঞ্জার। শেষে অবস্থাটা এমন দাঁড়াল যে, অসহযোগি ও মডারেটদের মধ্যে যে-রকম মনোমালিন্য ঘটেছিল, এই দুই দলের মনোমালিন্য যেন তার চেয়েও তিক্ত হয়ে দাঁড়াল। কংগ্রেস ভেঙে যায় যায় অবস্থা। এমন কি, সকলের আশঙ্কা হলো এই দলাদলি যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, অথবা দুই দলের বিরোধ যদি না মেটে, তাহলে বুঝি কংগ্রেসেরই অস্তিত্ব আর থাকবে না, কিংবা পুনরায় তা মডারেটদের দ্বারা কবলিত

হবে। কিন্তু ইতিহাসের অভিপ্রায় তা ছিল না। তাই দেখা গেল, ইতিহাসের প্রয়োজন সিদ্ধ করবার জন্যই যেন দেশবন্ধু একটা নতুন দল গঠন করলেন যাতে মতিলাল প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ যোগদান করেছিলেন। এই স্বতন্ত্র দল গঠনের ফলে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা অনিবার্য ছিল। যারবেদা জেলে বসে গান্ধীকে তাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হয়েছিল। তাই শেষ পর্যন্ত একটা রফার চেষ্টা হয়। ফলে দেশবন্ধুর চেষ্টায় দিল্লী কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ঘটনাস্রোত কিভাবে মোড় নিল, অতঃপর আমরা সেই ইতিহাস আলোচনা করব। ইতিহাসের দৃষ্টিতে সমগ্র বিষয়টা ছিল মূলতঃ দুই নেতৃত্বের সংঘর্ষ।

এই পরাজয়ের পর দেশবন্ধু মনে করলেন যে তাঁর পক্ষে সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকা উচিত হবে না। কেননা, সভাপতি হিসাবে তিনি যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তা যখন প্রত্যাখ্যাত হলো, তখন বুঝতে হবে তিনি মেজরিটির আস্থা হারিয়েছেন। এমন অবস্থায় তাঁর পক্ষে পদত্যাগ করা ভিন্ন আর কোন পথ ছিল না। ওয়ার্কিং কমিটির কাছে তিনি যখন তাঁর পদত্যাগ পত্রখানি পাঠিয়ে দিলেন তখন কমিটি (এই কমিটির অধিকাংশ সভ্যই ছিলেন নো-চেঞ্জার শিবিরের লোক) একটি প্রস্তাবে সভাপতিকে তাঁর পদত্যাগের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেন। দেশবন্ধু সম্মত হলেন না। বললেন: 'As I cannot carry the majority with me, I cannot continue as President and I will try to win over the majority through a new party which I am going to form.' কাজেই এমন অবস্থায় একটা নতুন দলের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে সভাপতির পদে

অধিষ্ঠিত থাকার অর্থ কংগ্রেসের কার্যস্যূচীতে সমস্যার সৃষ্টি করা। কিন্তু ইহা ছিল দেশবন্ধুর অনভিপ্রেত।

যেদিন কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয় সেইদিনই, রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন, প্রো-চেঞ্জারগণ একটি নতুন দল গঠনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই দলের নাম দেওয়া হয় 'স্বরাজ্য দল' এবং ঘোষণা করেন মতিলাল নেহরু। এই ঘোষণা ছিল নিতান্ত অপ্রত্যাশিত। এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন: 'The announcement came as an unexpected blow and cast a shadow on the jubilant faces of the Mahatma's supporters. Most of the outstanding intellectuals were on the side of the Deshbandhu.'* এখানে উল্লেখ্য যে, মতিলাল নেহরুও কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারির পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন। গয়াতে তিনি তখন টিকারির মহারাজার অতিথি হিসাবে রাজবাড়িতে অবস্থান করছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়ে যাওয়ার পর এবং পদত্যাগ করার পরেই দেশবন্ধু এইখানেই তাঁর সঙ্গে মিলিত হন, ইংরেজী নববর্ষের প্রথম দিনে এবং উভয়ের মধ্যে একটি নতুন দল গঠন সম্পর্কে বহুক্ষণ আলোচনা হয়। স্বরাজ্য দলের জন্ম (১৯২৩, ১লা জানুয়ারী) এই রাজবাড়িতেই এবং প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল দেশবন্ধু মতিলালের মিলিত প্রয়াসের ফল। উভয়েই ছিলেন বাস্তববাদী নেতা। তাঁদের বিবেচনায় আদালত, আইনসভা ও শিক্ষায়তন বর্জন সবই ব্যর্থ হয়েছে এবং দেশের পরিবর্তিত অবস্থায় আইন অমান্য আন্দোলন বা সত্যাগ্রহেরও আর কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এমন অবস্থায় একটি নতুন কর্মপন্থা ভিন্ন জনসাধারণকে দেশের কাজে উদ্দীপ্ত করা আর কোন উপায়েই সম্ভবপর নয়।

**The Indian Struggle* : Bose

স্বরাজ্য দল গঠন সম্পর্কে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন : 'During the Gaya session of the Congress, sharp differences of opinion appeared among the Congress leaders. C. R. Das, Motilal Nehru and Hakim Ajmal Khan formed the Swaraj Party and presented the Council entry programme which was opposed by the orthodox followers of Gandhiji. Congress was thus divided between no-changers and pro-changers. I tried to bring about a reconciliation between the two groups and we were able to reach an agreement in the special session of the Congress in September, 1923.'*

কংগ্রেসের মধ্যে কোন বিভেদের সৃষ্টি হয়, এটা অবশ্য কারো বাঞ্ছনীয় মনে হয় নি। তাই আবুল কালাম আজাদ যখন মিটমাটের প্রস্তাব করেন, তখন সকলেই তা মেনে নিলেন। তখন মৌলানা আজাদ দেশবন্ধুকে কিছুকাল অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেন —অন্তত ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত এবং এর মধ্যে যদি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ না হয় তাহলে তিনি দেশবন্ধুকে বলেন যে, তিনি কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করে কাউন্সিল-প্রবেশ কার্যসূচী পাস করিয়ে নেবেন। আজাদ গয়া কংগ্রেসের পরে আলিপুর জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্য হিসাবে মনোনীত হন। তিনি দেশবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন ও তিনিই উদ্যোগী হয়ে দুই দলের মধ্যে একটা মিটমাটের চেষ্টা করেন। দেশবন্ধু আজাদের প্রস্তাবে সম্মত হন, যদিও তখন তাঁকে সভাপতি ও মতিলাল নেহরুকে সাধারণ সম্পাদক করে স্বরাজ্য দলের সূচনা

* *India wins Freedom* : Azad

হয়েছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও আজাদের প্রস্তাবে সম্মত হয়।

১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসের শেষভাগে বোম্বাইতে একটি ক্ষুদ্র কমিটির সহায়তায় স্বরাজ্যদলের নিয়মাবলী রচিত হয়। প্রথমে এর নাম ছিল 'কংগ্রেস-খিলাফত-স্বরাজ্য দল'; ফেব্রুয়ারী মাসে এলাহাবাদের জেনারেল কমিটিতে 'কংগ্রেস খিলাফত' কথা বর্জন করে নাম রাখা হয় 'স্বরাজ্য দল'। ২৭শে ফেব্রুয়ারী দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক বৈঠক বসল। এই বৈঠকে মতিলাল নেহরু ও অন্যান্য স্বরাজীরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে স্বরাজ্যদল ও নো-চেঞ্জারদের মধ্যে আলোচনার পর স্থির হয় যে: ১। স্বরাজ্যদল কাউন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে কোনপ্রকার কার্য করতে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত বিরত থাকবে; ২। উভয় দলই পরস্পরের প্রতি কোন বাধার সৃষ্টি না করে তাঁদের অন্যান্য কার্যসূচী ইতিমধ্যে অবলম্বন করতে পারবে; ৩। কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজের জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সঙ্গে তহবিল সংগ্রহের ব্যাপারে সহযোগিতা করবে।

বস্তুত গয়া কংগ্রেসের পর থেকে তিন-চারমাস কাল দুই দলের মধ্যে মিটমাটের যথেষ্ট চেষ্টা হয় এবং এই ব্যাপারে আজাদ ব্যতীত জওহরলাল নেহরুও বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। এবং শেষে ২৪শে এপ্রিল দিল্লীতে দুই দলের একটি বৈঠক বসে ও উভয় দলের নেতৃবর্গ এই বৈঠকে মিলিত হয়ে একটি সম্মিলিত কার্যসূচী উদ্ভাবনের জন্য সচেষ্ট হন। দেশবন্ধু, মতিলাল, আনসারি, রাজগোপালাচারি, হাকিম আজমল খান ও সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ও একটি সম্মিলিত কার্যসূচী উদ্ভাবনের জন্য তিন-চার দিন ধরে আলোচনা চলে। শেষ পর্যন্ত একটি সম্মিলিত কার্যসূচীও গৃহীত হয়। কিন্তু পাঁচ-ছয় দিন পরে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও শেঠ যমুনালাল বাজাজের বিরোধিতার ফলে এই সন্ধি

ভেঙে যায়। তখন দেশবন্ধু নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘোষণা করতে বাধ্য হন যে, উভয়পক্ষের মধ্যে ঐক্য সাধনের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সামনেই নির্বাচন। তিনি তাই তাঁর দলের সভ্যদের প্রচার-কার্যে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। এইভাবেই সেদিন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একটা নতুন ধরনের বিপ্লব দেখা দিয়েছিল, সুভাষচন্দ্র যাকে 'The Swarajist Revolt' আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর আমরা দেশবন্ধুর নেতৃত্বে পরিচালিত এই বিপ্লবের বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাস অনুসরণ করব।

গয়া কংগ্রেস থেকে কলকাতায় ফিরবার পর দেশবন্ধুকে কি প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সে বিষয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: 'লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই, অতি ছোট যাহারা তাহারাও গালিগালাজ না করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা!'* আর সুভাষ-চন্দ্র লিখেছেন: 'সেদিনকার কথা এখনও আমার মনে স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। আমরা যখন গয়া কংগ্রেসের পর কলকাতায় ফিরি, তখন নানাপ্রকার অসত্যে এবং অর্ধ সত্যে বাংলার সব কাগজ ভরপুর। আমাদের স্বপক্ষে তো কথা বলেই নাই—এমন কি আমাদের বক্তব্যটিও তাদের কাগজে স্থান দিতে চায় নাই। তখন স্বরাজ্য ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ। যখন অর্থের খুব প্রয়োজন তখন অর্থ পাওয়া যায় না। যে বাড়িতে এক সময়ে লোক ধরত না, সেখানে কি বন্ধু, কি শত্রু, কাহারও চরণধূলি আর পড়ে না। কাজেই আমরা কয়েকটি প্রাণী মিলে আসর জমাতুম।'†

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের একজন সাহিত্যিকও আসরে নেমেছিলেন দেশবন্ধুকে আক্রমণ করতে। স্বরাজ্য দলকে ব্যঙ্গ করে ও এর দলপতির আত্মত্যাগকে কটাক্ষ করে প্রমথনাথ বিশী এই সময়ে

* স্মৃতিকথা: শরৎচন্দ্র (মাসিক বসুমতী, ১৩৩২, শ্রাবণ)

† পত্রাবলী: সুভাষচন্দ্র

'দেশের শত্রু' নাম দিয়ে একখানি প্রবন্ধোপন্যাস রচনা করেছিলেন অথবা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এই বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে সেই সময়ে 'প্রবাসী' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল: 'লেখক উপন্যাস লিখিবার ছলে বর্তমান একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান রাজনৈতিক দলের বিবিধ কার্যাবলীর সমালোচনা করিয়াছেন।' দেশবন্ধু আত্মত্যাগের যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন, পরিহাস-রসিক লেখক সেই সম্পর্কে রসিকতার মাধ্যমে যে তীব্র কষাঘাত করেছিলেন, তা প্রবাসী-সম্পাদকের বিবেচনায় সমীচীন মনে হয়েছে। কারণ অবশ্য ছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কোনদিনই দেশবন্ধুর ত্যাগের প্রশংসা করতে পারেন নি, বরং সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। হেমন্তকুমার সরকারের মুখে শুনেছি, যখন তাঁর এক রাজনৈতিক বন্ধু তাঁর কাছে বিষয়টি বলেন তখন দেশবন্ধু হেসে বলেছিলেন, 'বিরুদ্ধ দলের নিন্দা, অপবাদ বা সমালোচনা আমার অঙ্গের ভূষণ। দেশকে ভালবেসে আজ আমি যদি কারো বিবেচনায় দেশের শত্রু হয়ে থাকি, আমি কি তার প্রতিবাদ করব?'

দেশবন্ধু জানতেন, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সহজ নয়। জানতেন, রাজনীতিতে কোন নতুন আদর্শ বা নতুন একটা কর্মপন্থার নির্দেশ দিতে গেলে বহু বাধা-বিঘ্ন ও প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে তাঁকে জনমত গঠন করতে হবে এবং সেই জনমতকে তাঁর অনুকূলে নিয়ে আসতে হবে। বন্ধু শত্রু হবে, শত্রু প্রতিকূলাচরণ করে কাজে প্রবল বাধার সৃষ্টি করবে। তথাপি স্বদেশ-সেবাব্রতের উদ্দেশ্যে তিনি একবার যখন নিজেকে দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করেছেন নিজের সর্বস্ব বিসর্জন করে, তখন তো সব জেনেশুনেই তিনি এই কাজে নেমেছিলেন। তাঁর সাহস ছিল অপরিসীম, ধৈর্য ছিল আরো অপরিসীম। তাই দেখা যায় যে, গয়া কংগ্রেসের পর কলকাতায় ফিরে তিনি কোন কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে স্বরাজ্যদলের সাংগঠনিক কাজে

তাঁর শ্রম ও শক্তি নিয়োগ করতে থাকেন। এইখানেই তাঁর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশে প্রথম যাঁরা স্বরাজ্য দলের সভ্য হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, জে. এম. সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র, কিরণশঙ্কর রায়, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, অনিলবরণ রায়, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সাতকড়িপতি রায়, বসন্তকুমার মজুমদার, হেমপ্রভা মজুমদার, হেমন্তকুমার সরকার, মনোমোহন নিয়োগী, হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ও গোপিকাবিলাস সেনগুপ্ত। শেষোক্ত ব্যক্তি এই সময়ে কিছুকালের জন্য দেশবন্ধুর একান্ত সচিবের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এঁরা সকলেই দেশবন্ধুর মতের ও পথের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন এবং বাংলার স্বরাজ্যদল গঠনে এবং এর ভাবধারার প্রচারে এঁরা সকলেই তাঁকে সহায়তা করেছিলেন। স্বরাজ্য দলের আদর্শ প্রচারের জন্য সেদিন এঁদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষ করে তিনজন—সুভাষচন্দ্র, অনিলবরণ ও হেমন্তকুমার অক্লান্তভাবে লেখনী পরিচালনা করেছিলেন। চার পৃষ্ঠার 'বাংলার কথা' সাপ্তাহিক ছিল এই দলের মুখপত্র; এই পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের উপরে এবং তিনি যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে অনিলবরণ রায় সম্পাদিত 'সারথি' পত্রিকার নামও উল্লেখযোগ্য; স্বরাজ্যদলের আদর্শ প্রচারে 'সারথি' পত্রিকার একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল।

যেহেতু নতুন দলের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের কার্যসূচীতে একটা পরিবর্তন নিয়ে আসার কথা ঘোষিত হয়েছিল, সেইজন্য স্বভাবতঃই দলের নেতারা বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে তাঁদের মতাদর্শ প্রচার করতে থাকেন। এই সময়ে দেশবন্ধু কলকাতায় ও বাংলার কয়েকটি স্থানে একাধিক জনসভায় স্বরাজের আদর্শ ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা করেছিলেন। আর কয়েক মাস পরেই নতুন শাসন-সংস্কার অনুযায়ী নির্বাচন আরম্ভ হবে। এর আগের নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কাউন্সিল বয়কট

করা হয়েছিল, এবারকার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে হবে, সেইজন্য বক্তৃতা ও প্রচারকার্য দ্বারা তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা স্বরাজীরা বোধ করেই কার্যক্ষেত্রে উৎসাহের সঙ্গে অবতীর্ণ হলেন। 'বাংলার কথা' চার পৃষ্ঠার কাগজ, একখানা ইংরেজী কাগজ হলে ভাল হয়। কিন্তু সেরকম একখানা কাগজ করতে হলে অনেক টাকার দরকার। তেমন টাকা এখন কোথায়? নতুন দল, অর্থসঙ্গতি তখনো পর্যন্ত সামান্যই ছিল।

বাংলাদেশে তখন অসহযোগ আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে শ্যামসুন্দরের 'সার্ভেন্ট' খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে—সারা ভারতবর্ষেই এর জনপ্রিয়তা তখন কলকাতার অন্য দৈনিকগুলিকে অনেকখানি নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। গয়া কংগ্রেসের সময় শ্যামসুন্দর জেলে ছিলেন। 'সার্ভেন্টের' সম্পাদনা ও পরিচালনার দায়িত্ব তখন ন্যস্ত ছিল অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে। তিনি যোগ্যতার সঙ্গেই এই দায়িত্ব চালাচ্ছিলেন। তখন বাংলাদেশে প্রধান অসহযোগীদের মধ্যে ছিলেন শ্যামসুন্দর, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ প্রভৃতি। প্রদেশ কংগ্রেসে তখনো এঁদেরই প্রাধান্য। অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন যে, গয়া কংগ্রেসের পরেই দেশবন্ধু একদিন সুভাষচন্দ্র ও কিরণশঙ্করকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন 'সার্ভেন্ট' পত্রিকাটি স্বরাজ্যদলের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। ঠিক হয় যে, প্রধান সম্পাদক নৃপেনবাবুই থাকবেন এবং দেশবন্ধুর নীতির সঙ্গে বিরোধ ঘটলে তিনি স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ লিখতে পারবেন। কিন্তু তিনি এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না। কারণ, তাঁর নিজের কথায়, 'This would be a grave betrayal of the trust reposed in me by Syamsunder, still in jail··· I stuck to my post and edited the *Servant* under very great difficulties.'* প্রকৃতপক্ষে 'সার্ভেন্টের'

* *At the Cross Roads* : Banerji

তখন খুব আর্থিক সঙ্কট চলছিল আর শ্যামসুন্দর তখনো পর্যন্ত জেলে—এই অবস্থার সুযোগটা দেশবন্ধু নেবার চেষ্টা করেছিলেন, মনে হয়। তবে 'সার্ভেন্ট' পত্রিকা নিতে না পারলেও, নৃপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন, প্রদেশ কংগ্রেসে যদিও তখনো পর্যন্ত অসহযোগীদের প্রাধান্য ছিল দেশবন্ধু সেখান থেকে অনেক লোক ভাঙিয়ে এনে তাঁর স্বরাজ্যদল পুষ্ট করেছিলেন এবং অবশেষে প্রদেশ কংগ্রেস তাঁদের সম্পূর্ণ দখলে চলে যায়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্মেলন বসল যশোহরে (১২ই-১৩ই মে, ১৯২৩)। শ্যামসুন্দর তখন কারামুক্ত হয়েছেন। তাঁকেই এই সম্মিলনের সভাপতি করা হলো। এই সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল। স্বদেশসেবায় তাঁরো ত্যাগ বড়ো কম ছিল না। দেশবন্ধু এই সভায় বলেন যে, কাউন্সিল-প্রবেশ প্রস্তাবটি পুনরায় বিবেচনা করার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে প্রেরিত হোক। কিন্তু সভাপতি তাঁর এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। তবে প্রদেশ-কংগ্রেস কমিটি তাঁর মতাদর্শকেই গ্রহণ করে। তারপর তিনি ঝড়ের বেগে স্বরাজের বাণী প্রচারের জন্য দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করে বক্তৃতা করতে থাকেন। এইখানে একটা কথা উল্লেখ্য যে, গয়া কংগ্রেসের পর থেকেই স্বরাজ্যদল ও নো-চেঞ্জারদের মধ্যে যাঁরা বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন তাঁরা সকলেই তাঁদের স্ব-স্ব মতের স্বপক্ষে ভারতের সর্বত্র প্রচারকার্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। গান্ধীভক্তগণের বক্তৃতার সার কথা এই ছিল যে, দেশবন্ধু সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবার উদ্দেশ্যে আইনসভায় যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা সেদিন ছিলেন মাদ্রাজের রাজাগোপালাচারী। এই প্রসঙ্গে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (সেদিন তিনিই একমাত্র নেতা ছিলেন যিনি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে দুই দলের মধ্যে একটা মিটমাটের চেষ্টা করেছিলেন) লিখেছেন: 'I do not think that shri Rajagopalachari

was right in his interpretation. Mr. C. R. Das was not seeking a compromise with the Government but only extending the political struggle to another field.' সেদিন অনেকে এইখানেই দেশবন্ধুকে ভুল বুঝেছিলেন ও অন্যকেও ভুল বুঝিয়েছিলেন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য। গয়া কংগ্রেসের পর থেকে দেশবন্ধু যখন স্বরাজ্যদলের প্রচারকার্যে অবতীর্ণ হন তখন তিনি তাঁর প্রায় বক্তৃতাতেই বলতেন: 'Mahatma Gandhi has bungled and mismanaged the affairs of the Congress.' গান্ধীভক্তগণ তাঁর এই উক্তিটির মধ্যে দেশবন্ধুর গান্ধী-বিরোধী মনোভাব আবিষ্কার করে বলতে থাকেন যে, তিনি মহাত্মার নিন্দা করে বেড়াচ্ছেন। বোম্বাইতে এসে দেশবন্ধু এক বক্তৃতায় এর জবাবে বলেছিলেন: 'আমার চেয়ে গান্ধীভক্ত আর কেউ নেই। আমি তাঁর নিন্দা করছি, এটা ভুল ধারণা। আমি তাঁর কাজের সমালোচনা করেছি এবং সেটা করার অধিকার আমার আছে। কারণ আমি মনে করি কংগ্রেস তথা দেশ গান্ধীর চেয়ে বড়ো।' এর পর বিরুদ্ধবাদীরা নীরব হয়েছিলেন।

মে মাসের শেষভাগে বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক বৈঠক বসল। দেশবন্ধু সর্ববাদীসম্মতিক্রমে কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। এই বৈঠকেই কংগ্রেস ও স্বরাজ্যদলের মধ্যে প্রথম মিলনের সূত্রপাত হয়। পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনের প্রস্তাবে ও জওহরলাল নেহরুর সমর্থনে স্থির হয় যে, স্বরাজ্যদল যে উদ্দেশ্য নিয়ে আইনসভায় যেতে চায় সেইভাবে নির্বাচন-প্রার্থী হলে কংগ্রেস যেন তাঁদের কাজে বাধা প্রদান না করে। যদিও এই সিদ্ধান্তে পরোক্ষভাবে স্বরাজ্যদলেরই জয়লাভ সূচিত হয় তথাপি তাঁরা এই প্রস্তাবে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। না হওয়ার কারণ অবশ্য ছিল। প্রস্তাবে এমন কথা বলা হলো না যে,

কংগ্রেসীরা কংগ্রেসের নামে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। যাই হোক, এইবার দেশবন্ধু সমগ্রদেশে প্রচারকার্যে অবতীর্ণ হলেন ও কংগ্রেসকে তাঁর স্বমতে আনার জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা প্রয়োগ করতে থাকেন।

অতঃপর সারা ভারতবর্ষে তিনি ঝড়ের বেগে পরিভ্রমণ করতে থাকেন। সেই বয়সে ও তাঁর তখনকার স্বাস্থ্যের অবস্থায় এই কাজ খুবই পরিশ্রমসাধ্য ছিল। তথাপি এসব ভ্রূক্ষেপ না করে মনের অপরিমেয় বল নিয়ে বীরবিক্রমে তিনি নানা শহরে স্বরাজ্যদলের মতাদর্শ প্রচার করতে থাকেন। এলাহাবাদে মতিলাল নেহরুর বাড়িতে স্বরাজ্যদলের প্রথম বৈঠকে যখন দলের সংগঠন ও কার্যসূচী রচিত হয় তখনি বলা হয়েছিল (যা এতকাল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঘোষিত হয় নি।) যে: 'The immediate objective of the party was the attainment of Dominion Status.' গান্ধীপন্থীদের বড় ঘাঁটি ছিল মাদ্রাজ। সেই মাদ্রাজে এসে দেশবন্ধু তাদের দুর্গ আক্রমণ করলেন। এইখানে তাঁর সফর সবচেয়ে সফলতা মণ্ডিত হয়েছিল বলে জানা যায় এবং এই সাফল্যের প্রতিক্রিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও দেখা গেল। তাঁর মাদ্রাজ সফরের সঙ্গী ছিলেন আসামের স্বরাজী নেতা তরুণরাম ফুকন। তরুণরাম পরবর্তীকালে লিখেছিলেন: 'স্বরাজ্যদলের প্রচারকার্যের জন্য দক্ষিণ ভারত সফরের সময়ে দেশবন্ধুর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম যে, তাঁর বক্তৃতা শুনবার পর বহুলোক স্বরাজ্যদলের মতাদর্শ গ্রহণ করেছিল এবং গান্ধীপন্থীরা যেন কিছুকালের জন্য ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। দেশবন্ধুই তখন দেশের প্রকৃত নেতা। মাদ্রাজ প্রদেশের বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা করে দেশবন্ধু বিরুদ্ধবাদীদের ও সমালোচকদের নিরস্ত করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, তাঁর মাদ্রাজের বক্তৃতা গান্ধীভক্তদের

ক্ষুণ্ণ করেছিল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর আত্মচরিতে দেশবন্ধুর মাদ্রাজ বক্তৃতাকে 'bitter and acrimonious' বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা অবশ্য এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করি। এই সময়েই তিনি মাদ্রাজ শহরে এক বিরাট সভায় বলেছিলেন :

'Am I a rebel? I would rather rebel against the Congress and any institution in India if I feel that the realisation of the demand of Swaraj makes it necessary. I want Swaraj. I want my liberty. I am prepared to fight. I have not been a coward in my life. I want to fight and if necessary I am prepared to lay down my life.' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সেদিন যে মাদ্রাজে স্বরাজ্যদলের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়েছিল তার মূলে শুধু দেশবন্ধুর বক্তৃতা নয়। সেই সঙ্গে সত্যমূর্তির বক্তৃতা ও আয়েঙ্গারের লেখনীও কম সহায়ক ছিল না। এই দু'জনেই ছিলেন এই প্রদেশে স্বরাজ্যদলের দুইটি বিরাট স্তম্ভ। আয়েঙ্গারের 'স্বদেশমিত্র' পত্রিকা স্বরাজীদের মুখপত্র হয়ে উঠেছিল যেমন হয়ে উঠেছিল মহারাষ্ট্রে কেলকারের 'কেশরী' পত্রিকা।

এই সময়ে মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মিলনীতে যোগদান করে দেশবন্ধু সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে, ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে বড়লাট যখন আপোস করতে চেয়েছিলেন তখন তাতে সম্মত না হওয়া কংগ্রেসের পক্ষে একটা দারুণ ভুল হয়েছিল। তখন থেকেই অবস্থার জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আরো জটিল হয়ে উঠবে যদি কংগ্রেস এই নতুন কর্মসূচী গ্রহণ না করে। এইভাবে তিনি সকলকে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন ও কংগ্রেসীদের কাউন্সিল-প্রবেশ নীতি সমর্থন করতে বলেন। তিনি আরো বলেন যে, আইনসভার ভিতর থেকেই জাতীয় দাবীকে জোরদার করে তুলতে হবে। ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন সম্ভব হবে যদি দেশ তাঁর

পরামর্শ গ্রহণ করে। এই সময়ে তিনি যতগুলি বক্তৃতা করেছিলেন সেগুলি যেমন আবেগে উদ্দীপ্ত ছিল, তেমন ছিল যুক্তিজালপূর্ণ। তিনি যখন সভায় দাঁড়িয়ে বলতেন: 'Not that I love the Congress less but I love the country more.' অথবা, 'Is Council entry against non-co-operation ? No it is only another form of the same activity. Is Council boycott a sacred thing not to be touched? My answer is: there is another thing which is more sacred than the Congress; that is the liberty of the Indian people.'—তখন, সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, উপস্থিত সকলেই দেশবন্ধুর যুক্তির সারবত্তা অনুভব করে স্বরাজ্যদলের প্রতি আকৃষ্ট হতেন। একবার দাক্ষিণাত্যের এক সভায় তিনি যখন দৃপ্তকণ্ঠে বললেন: 'You test me and I shall prove if I cannot come to your standard.'—তখন বিরুদ্ধবাদীদের পর্যন্ত তাঁর প্রতি বিনা দ্বিধায় আনুগত্য প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল।*

গয়া কংগ্রেস থেকে ফিরবার পর স্বরাজ্যদলের সংগঠন দেশবন্ধুর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়। নতুন দলকে গড়ে তুলবার জন্য যখন তিনি স্বর্গ-মর্ত্য তোলপাড় করে স্বীয় অভীষ্ট সাধনে ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন অপ্রত্যাশিতভাবে বাংলাদেশে একটি ঘটনা ঘটল যার উল্লেখ আমাদের মূল কাহিনীর সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে প্রয়োজন। কারণ পরোক্ষভাবে এই ঘটনাটি দেশবন্ধুকে নতুন শাসন-সংস্কারের স্বরূপ উপলব্ধি করতে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। বাংলার পুরুষসিংহ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ আমি ইতিপূর্বে অন্যত্র লিপিবদ্ধ করেছি।† লর্ড লিটন

* *The Indian Struggle* : Bose

† লেখকের শিক্ষাগুরু আশুতোষ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

তখন বাংলার গভর্ণর। লাট লিটন এই সময়ে (এপ্রিল, ১৯২৩) এমন একটি অবিমৃষ্যকারিতার কাজ করে বসলেন যার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন দেশবন্ধু বাংলাদেশে স্বরাজ্যদলকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য।

শিক্ষা-সংক্রান্ত একটি ব্যাপারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিল উত্থাপিত হয়। উক্ত বিলের সংশোধনী খসড়া নিয়ে একদিকে গভর্ণর ও তাঁর শিক্ষামন্ত্রী (তখন স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন) এবং অপরদিকে ভাইস্-চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সঙ্গে গুরুতর মতদ্বৈধ দেখা দেয়। এই নিয়ে সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বাধল একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষ। এরই সুযোগ নিয়ে লাট লিটন যুগপৎ তোষামোদ ও ভীতি প্রদর্শনপূর্বক সরকারের সঙ্গে আশুতোষের সহযোগিতা ক্রয় করতে উদ্যত হলেন। এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন: 'লাট লিটন আশুতোষকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাহা সেই সময়ের শাসকবর্গের মনোভাবের একটা স্পষ্ট প্রকাশমাত্র।...তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, আশুতোষ কর্তৃপক্ষের কথা শুনিয়া কাজ করেন, তাহা হইলে তাঁহার মতো যোগ্য ব্যক্তিকে আসনচ্যুত করা তিনি কিছুতেই উচিত মনে করবেন না।'* এক অসতর্ক মুহূর্তেই যে চিঠিখানি লেখা হয়েছিল, লাট লিটন বোধ করি পরে সেটা বুঝে থাকবেন।

ভাইস্-চ্যান্সেলার হিসাবে আশুতোষের কার্যকাল তখন শেষ হয়ে এসেছে এবং ঐ কাজে তাঁকে শর্তাধীনে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন লর্ড লিটন। সতর্কতা ও শিষ্টাচারের অভাব ছিল লাট সাহেবের চিঠিতে। তাঁর অভিযোগ ছিল, আশুতোষ সরকারকে কোন সাহায্য করা দূরে থাকুক, তিনি প্রতিপদে বাধা দিয়েই এসেছেন। 'আপনি আমাদের বিলের বিরুদ্ধে সমালোচনা

* আশুতোষ-স্মৃতি: দীনেশচন্দ্র সেন।

করেছেন ও কতকগুলি পত্রিকাকে দিয়ে এমন প্রবন্ধ লিখিয়েছেন, যার ফলে আমাদের শাসন সম্বন্ধে দেশের লোকের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হতে পারে।'—এই ছিল সরকারের অভিযোগ। একজন চ্যান্সেলার একজন ভাইস্-চ্যান্সেলারকে পত্র লিখলে তাতে যে শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ থাকা উচিত তার অভাব ছিল এই চিঠিতে। চ্যান্সেলার লিটনের এই চিঠির তারিখ ২৪শে মার্চ, ১৯২৩ এবং এই চিঠি যখন প্রকাশিত হয় তখন শিক্ষিত বাঙালী যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়। ঠিক এই সময়ে স্যার আশুতোষ জজিয়তী থেকে অবসর গ্রহণ করে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি রাজনৈতিক কার্যে নিয়োগ করবেন বলে ঠিক করেছিলেন। স্বাধীনচেতা আশুতোষ পরম ঘৃণাভরে লাটসাহেবের এই প্রস্তাব—শর্তাধীনে অর্থাৎ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে পুনরায় ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত হওয়া—প্রত্যাখ্যান করে যে পত্রখানি লিখেছিলেন তাঁর ছত্রে ছত্রে আত্মসম্মান বোধ ফুটে উঠেছে। উদ্ধত লিটন তাঁর পত্রের সমুচিত জবাব পেয়েছিলেন। সে জবাব শুধু আশুতোষের ছিল না—ছিল আত্মমর্যাদার উদ্বুদ্ধ সমগ্র জাতির।

দেশবন্ধু আশুতোষকে ভাল করেই জানতেন এবং তিনি যখন দেশের কাজে সর্বস্ব ত্যাগ করে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা দেখে, কথিত আছে, আশুতোষ নাকি বলেছিলেন, চিত্তর মতো আমারও ইচ্ছা হয় এইভাবে দেশের কাজে ঝাঁপ দিই। কিন্তু বাঙালীর দুর্ভাগ্য, আশুতোষ সে অবসর পান নি, এই ঘটনার অল্প দিন পরেই পাটনায় তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়। যাই হোক, লিটন-আশুতোষ পত্রাবলী যখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়* তখন বাঙালী বুঝতে পারল সরকার কি শর্তে দেশের লোকদের সহযোগিতা

* লর্ড লিটন ও স্যার আশুতোষের পত্র দু'খানি একমাত্র দেশবন্ধুর 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

পেতে ইচ্ছা করেন; বুঝতে পারল কি অপরিসীম ঔদ্ধত্যের সঙ্গেই না একজন লাট একজন সম্মানিত ভারতীয়কে পত্র লিখতে পারেন। এই ঘটনার ফলেই স্বরাজ্য দলের অনুকূলে প্রবল জনমত সংহত হতে থাকে, কারণ লাট লিটন আশুতোষকে ঐ রকম একখানি পত্র লিখে সমগ্র বাঙালী জাতির আত্মমর্যাদাতেই আঘাত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধুর জীবনীকার লিখেছেন:

'At this time, Sir Ashutosh Mookerjee and Chittaranjan Das were concerting a joint measure of oppositon to paralyse all sinister attempts to rob the University of Calcutta of its academic freedom. Strengthened by the moral support of Sir Ashutosh and by his undertaking that, on his retirement from the Bench, he would come and work with the Swarajya Party, Chittaranjan went about the country with renewed hope and confidence for the propagation of the new gospel and raised a raging agitation on behalf of his new creed. He knew no rest or peace and passed sleepless nights over his campaign, and such was the magic of his personality and his persuasive tongue that within six or seven months time, he had induced a large number of non-co-operating Congressmen to accept his new programme.'*

এই উদ্ধৃতি থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, আশুতোষ তাঁর পাশে দাঁড়াবেন, এই প্রতিশ্রুতি দেশবন্ধুকে তাঁর নবগঠিত দলের সংগঠনে অনেকখানি উৎসাহ জুগিয়েছিল, যার ফলে গয়া

* *Life and Times of C. R. Das* : Ray

কংগ্রেসের পর অত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বহু কংগ্রেসীকে তাঁর কার্যসূচী গ্রহণ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য সেই সঙ্গে তাঁর ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব বাগ্মিতার কথাও তাঁর জীবনীকার উল্লেখ করেছেন। একটি নতুন দলকে কিভাবে গড়ে তুলতে হয় এবং কি কৌশলে সর্বভারতে তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তা দেশবন্ধুর রাজনৈতিক প্রতিভা বিস্ময়করভাবেই সপ্রমাণ করেছে। তাঁর নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই। সমকালীন রাজনীতিতে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব যে কি অসামান্য ছিল, তাঁর স্বরাজ্যদলই তার সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে।

॥ তেইশ ॥

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩।

দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন।

এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন আবুল কালাম আজাদ।

নো-চেঞ্জার ও প্রো-চেঞ্জার—কংগ্রেসের উভয় দলের সম্মতিক্রমেই তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। আজাদ তাঁর সভাপতির ভাষণে বললেন: 'দেশের স্বাধীনতাই আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য। ১৯১৯ সাল থেকে আমরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কার্যসূচী অবলম্বন করেছি এবং তাতে যথেষ্ট ফললাভ হয়েছে। এখন যদি আমাদের মধ্যে কেহ মনে করেন যে, এই সংগ্রামকে আইনসভার ভিতরে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, তাহলে আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল থাকার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। লক্ষ্য যতক্ষণ এক, তখন প্রত্যেক দলেরই নিজ নিজ কার্যসূচী অনুসরণ করার স্বাধীনতা থাকা উচিত।'

এই বিশেষ অধিবেশনের সিদ্ধান্ত যা আশা করা গিয়েছিল তাই-ই হলো। ঠিক হলো যে প্রো-চেঞ্জার ও নো-চেঞ্জার উভয় দলই তাঁদের স্ব স্ব কার্যসূচী স্বাধীনভাবেই অনুসরণ করতে পারবেন; একদল গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করবেন আর অপরদল আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তখন এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়: 'বাধাপ্রদান করবার জন্য আইনসভায় প্রবেশ করলে, কংগ্রেস সেরূপ নির্বাচনে কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করবে না।' কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশনে স্বরাজ্যদলের ডেলিগেটদের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, দেশবন্ধু ইচ্ছা করলে সংখ্যাধিক্যের জোরে কাউন্সিল-প্রবেশ প্রস্তাবটি কংগ্রেস কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারতেন, কিন্তু দলীয় জয়লাভ অপেক্ষা

কংগ্রেসের সংহতি ও ঐক্যের পক্ষপাতি তিনি ছিলেন। দিল্লী কংগ্রেসে কাউন্সিল-প্রবেশের প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন মহম্মদ আলি এবং প্রস্তাবটি সমর্থন করেন ডাক্তার কিচলু, সরোজিনী নাইডু, আব্বাস তায়েবজী ও আরো অনেকে। প্রস্তাবটি উত্থাপন করে মহম্মদ আলি বলেছিলেন, 'যদিও এই বিষয়ে আমি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে পরামর্শ করার কোন সুযোগ পাই নি, তথাপি আমি পুণা জেল থেকে এক অলৌকিক উপায়ে এই বাণী পেয়েছি যে, দেশবন্ধুর এই প্রস্তাবে মহাত্মার সম্মতি আছে।'*

এই অধিবেশনে তাঁর কার্যসূচীর সমর্থনে দেশবন্ধু বলেছিলেন :

'What are these Councils and what are these legislatures? Things of falsehood. Must we not remove them. Mahatma Gandhi intends to wreck the Reforms and I do the same thing by working from within, and the only way to do it is to make Government through Councils impossible.' এই বক্তৃতাতেই তিনি বলেছিলেন যে, ভোটের জোরে তিনি জয়লাভ করতে চান না, কারণ তিনি চান কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য, বিভেদ নয়। তখন তাঁর এই সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার আশ্চর্য ফল হলো। কাউন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো। কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য যখন প্রকাশ্য সভায় কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখন সভামণ্ডপে তুমুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হয় এবং সকলের মুখেই আনন্দ ও উৎসাহের ভাব ফুটে উঠেছিল।*

আনন্দ ও উৎসাহের ভাব, আমরা কল্পনা করতে পারি, দেশবন্ধুর

---

* পরে জানা গিয়েছে, পুণা জেল থেকে পুত্র দেবদাস গান্ধী মারফৎ মহাত্মাজী মহম্মদ আলিকে বলে পাঠান যে, তিনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন এবং তাতে তার সম্মতি আছে।

* *History of the Indian National Congress* : Pattavi Sitaramayia.

মুখেও সেদিন ফুটে উঠেছিল। যে লক্ষ্য সাধনের জন্য তিনি বিগত কয়েক মাস যাবৎ বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন, যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আজ তা সার্থক হলো। রাজধানীতে স্বরাজ্য দলের বিজয় পতাকা উড়ল। এইবার দেশবন্ধু নতুন উৎসাহে স্বরাজ্য দলকে অধিকতর সাফল্যের পথে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁর বিশ্রামের সময় নেই। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আইনসভায় প্রবেশ সম্পর্কে নো-চেঞ্জারদের প্রধান আপত্তি এই ছিল যে, এই কার্যসূচী গ্রহণের ফলে গান্ধীর নেতৃত্বের হানি হবে। পরবর্তী ঘটনাবলী অবশ্য প্রমাণিত করে দিয়েছিল যে, তাঁদের এই ধারণা ভ্রমাত্মক ছিল। কেন্দ্রীয় পরিষদে স্বরাজ্য দলের প্রথম প্রস্তাবেই গান্ধীর কারামুক্তি দাবী করা হয় এবং এই প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মুক্তিলাভ করেন।

নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হলেন দেশবন্ধু।

অবতীর্ণ হলেন পরিপূর্ণ এক যোদ্ধমূর্তিতে।

নভেম্বরই সাধারণ নির্বাচন।

সময় খুব কম। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে তিনি বাংলাদেশে স্বরাজ্যদলের নির্বাচনী-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং কলকাতায় বসেই সমগ্র ভারতে স্বরাজ্যদলের নির্বাচন পরিচালনা করতে থাকেন। এইবার তিনি একখানি দৈনিক ইংরেজী কাগজের প্রয়োজন বিশেষভাবেই বোধ করলেন। এজন্য প্রথমে তিনি ‘সার্ভেণ্ট’ পত্রিকা গ্রহণ করবার কথা চিন্তা করলেন। শ্যামসুন্দর তখন কারামুক্ত হয়েছেন। একদিন দেশবন্ধু নিজেই সার্ভেণ্ট অফিসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁর প্রস্তাব তাঁকে অবগত করান। যদিও ‘সার্ভেণ্ট’ পত্রিকা তখন আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলছিল, তথাপি নো-চেঞ্জার শ্যামসুন্দর দেশবন্ধুর প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। অমৃতবাজার পত্রিকায় তখন বিপিনচন্দ্র মধ্যে মধ্যে সম্পাদকীয় লিখতেন। তাঁর মতবাদ যেমন অসহযোগের

বিরোধী ছিল, তেমনি আইনসভায় গিয়ে সরকার প্রবর্তিত সবকিছুরই বিরোধিতা করতে হবে (অর্থাৎ 'Persistent and consistent obstruction of all Government measures good, bad and indifferent.')—এই নীতিরও সমর্থক ছিলেন না তিনি। তাঁর মতে লোকমান্য টিলকের নীতিই অনুসরণযোগ্য —সে নীতি হলো Responsive co-operation, অর্থাৎ সরকার যদি ভাল কিছু প্রস্তাব করেন তা সমর্থন করতে হবে, যদি মন্দ কিছু করেন তার বিরোধিতা করতে হবে। সুতরাং দেশবন্ধু বুঝলেন যে, এ কাগজ তাঁকে সমর্থন করবে না। তাঁর বন্ধু পৃথ্বীশচন্দ্র রায় তখন সুরেন্দ্রনাথের বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদক; তিনি স্বরাজ্য দলের নীতিকে সমর্থন করবেন, এই আশ্বাস দিলেন। তিনি নিজেই এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'In his effort to capture as many seats as possible in the local Council for his party at the General Election of November that year (1923), Chitta Ranjan was greatly helped by the advocacy of the *Bengalee* which of all newspapers in the province had taken up his cause with a singular enthusiasm.'* যদিও পৃথ্বীশচন্দ্র তাঁর বিরোধীপক্ষের লোক ছিলেন, তথাপি একজন নিরপেক্ষ সাংবাদিক হিসাবে সেদিন তিনি যে ঔদার্য প্রদর্শন করে স্বরাজ্যদলের নির্বাচনী প্রচারকার্যে সহায়তা করেছিলেন, তা দেশবন্ধুকে যারপরনাই মুগ্ধ করেছিল। আবার এই পৃথ্বীশচন্দ্রই দেশবন্ধুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর সম্পর্কে ইংরেজীতে যে জীবনচরিতখানি রচনা করেছিলেন, আজ পর্যন্ত সেটিই দেশবন্ধুর শ্রেষ্ঠ জীবনচরিত বলে স্বীকৃত, অন্তত এই লেখকের মতে।

তথাপি একখানি নিজস্ব পত্রিকার প্রয়োজন বোধ করলেন

* *Life and Times of C. R. Das*: Ray

দেশবন্ধু এবং বহু চেষ্টার পর নির্বাচনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে (২৩শে অক্টোবর, ১৯২৩) যিনি তাঁর নিজস্ব পত্রিকা *Forward* প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেই কিছুকাল এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন এবং সম্পাদক ছিলেন প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী। 'ফরোয়ার্ড পাব্লিশিং কোম্পানী লিমিটেড' নামে একটি যৌথ সংস্থা গঠিত হয়; এবং পরিচালকবর্গের মধ্যে ছিলেন মতিলাল নেহরু, শরৎচন্দ্র বসু, তুলসীচরণ গোস্বামী ও প্রভুদয়াল হিম্মতসিঙ্কা। বাংলা তথা ভারতবর্ষের সাংবাদিকতার ইতিহাসে দেশবন্ধুর 'ফরোয়ার্ড' কাগজ সেদিন নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন করে ও সেইসঙ্গে সরকারী নীতির কঠিন সমালোচনা করে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা আজ পর্যন্ত অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর আহ্বানে কলকাতার অনেক খ্যাতিমান ও কৃতবিদ্য সাংবাদিক তাঁদের আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও এই পত্রিকায় যোগদান করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকার কিশোরীমোহন ঘোষ, মৃণালকান্তি বসুর নাম বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। সুভাষচন্দ্রও এই দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখার ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। যাঁদের অর্থসাহায্যে দেশবন্ধুর এই প্রয়াস সেদিন সার্থক হতে পেরেছিল তাঁদের মধ্যে তিনজনের নাম বিশেষভাবেই স্মর্তব্য। তাঁরা হলেন তুলসীচরণ গোস্বামী, নির্মলচন্দ্র চন্দ ও নাড়াজোলের দেবেন্দ্রলাল খান। সেদিন এঁরা যদি দেশবন্ধুকে সহায়তা না করতেন, তাহলে 'ফরোয়ার্ড' কাগজ তিনি প্রকাশ করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। সত্যের খাতিরে এই প্রসঙ্গে আরো একটি অপ্রীতিকর বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়। শ্যামসুন্দর যখন তাঁর 'সার্ভেন্ট' পত্রিকা দেশবন্ধুর হাতে তুলে দিতে সম্মত হলেন না তখন তিনি তাঁর প্রতি যেন কতকটা আক্রোশ বশতঃ মনোমোহন ভট্টাচার্য প্রমুখ 'সার্ভেন্ট' পত্রিকার অনেক কর্মীকে ভাঙিয়ে নিয়ে যান।

দেশবন্ধুর ফরোয়ার্ড পত্রিকা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন: 'In

the field of journalism, too, the Swarajist made much progress. In Calcutta, the Deshbandhu launched his daily paper *Forward* in October, soon after his victory at Delhi. As some of the organisers of the paper were suddenly put into prison without trial, I was entrusted with the organisation of the paper··· success followed rapidly and in its career the paper was able to keep pace with growing popularity and strength of the party. Within a short time *Forward* came to hold a leading position among the nationalist journals in the country. Its articles were forceful, its news service varied and up-to-date and the paper developed a special skill in the art of discovering and exposing official secrets.'*

এ কথা সত্য যে, সরকারী দপ্তরের গোপন তথ্য আবিষ্কার ও তা প্রকাশ করার রেওয়াজটা 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা থেকেই শুরু হয় এবং এই জাতীয় বহু সরকারী তথ্য প্রকাশ করে পত্রিকাখানি যুগপৎ অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠা ও পাঠক সমাজে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে একদিকে দলের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকে, অন্যদিকে পত্রিকারও চাহিদা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়টি যদিও দেশবন্ধুর স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সেটি রচনা করেছিলেন প্রখ্যাত অধ্যাপক ও সুলেখক আনন্দময় ধাড়া। ইনি পূর্বে 'সার্ভেণ্ট' পত্রিকারও কিছুকাল সম্পাদক ছিলেন। 'ফরোয়ার্ডের' সেই বিখ্যাত সম্পাদকীয়টির নাম ছিল 'No means is too mean'। দেবপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন, "শ্যামসুন্দরের 'সার্ভেণ্ট'

* *The Indian Struggle* : Bose

আর দেশবন্ধুর 'ফরোয়ার্ড'—এই পত্রিকা দুখানি সেদিন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।" তবে দেশের হাওয়া তখন দেশবন্ধুর স্বরাজ্যদলের দিকে, তাই নো-চেঞ্জার দলের মুখপত্র হিসাবে 'সার্ভেন্টের' প্রভাব ও প্রচারসংখ্যা দুই-ই 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে হ্রাস পেতে থাকে।

নির্বাচন আসন্ন।

বাংলায় স্বরাজ্যদলকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর স্থাপন করবার জন্য দেশবন্ধু যাদের সাহায্য একান্ত আবশ্যক মনে করেছিলেন তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন ছিলেন অন্যতম। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর দীর্ঘ দেড় বৎসরকাল তিনি প্র্যাকটিস্ বন্ধ রেখেছিলেন এবং নির্বাচনের কিছুকাল পূর্বে আবার ব্যবসায়ে যোগদান করেছিলেন। এজন্য কংগ্রেসীদের কাছ থেকে অনেক বিদ্রূপ ও নিন্দা শুনতে হয়েছিল তাঁকে। এইসময়ে দেশবন্ধু বলেছিলেন, 'যতীনের মতো কর্মী আর একটি জুটবে কিনা সন্দেহ। তাকে যে আবার প্র্যাকটিস্ করতে হচ্ছে—এটা দেশেরই দুর্ভাগ্য।' সকলের নিন্দা ও বিদ্রূপ নীরবে সহ্য করে যতীন্দ্রমোহন যখন চট্টগ্রামে নিভৃত জীবন যাপন করছিলেন, তখন আবার একদিন আহ্বান এলো দেশবন্ধুর কাছ থেকে। তিনি আবার তাঁকে সহকর্মী হিসাবে পেতে চান। যতীন্দ্রমোহন সে আহ্বানে সাড়া দিলেন। তিনি বঙ্গীয় স্বরাজপার্টির সম্পাদক পদে নিযুক্ত হলেন আর সেই সঙ্গে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে সহকারী সভাপতির পদও লাভ করলেন। এর পরেই শুরু হয় কাউন্সিলের নির্বাচন-সংগ্রাম। এই সংগ্রামে তাঁর প্রধান সহকর্মী ছিলেন যতীন্দ্রমোহন।

এইবার সভ্য মনোনয়নের পালা।

স্বরাজ পার্টির পক্ষ থেকে ৫৭ জন হিন্দু ও মুসলমান আইনসভার সভ্যপদের জন্য মনোনীত হলেন। সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে দেশবন্ধু বলেছিলেন, 'জীবনে কখনো অকৃতকার্য হই নি। এবারও হব না।' আহার নেই, নিদ্রা নেই, কোন কাজেই শৈথিল্য নেই। প্রতিদিন দশ-বারো ঘণ্টা নানা সভায় বক্তৃতা করে তাঁর উদ্দেশ্য ও সাধনা সকলের কাছে বোঝাতেন দেশবন্ধু। শুধু কলকাতায় নয়, বাংলার প্রত্যেক জেলায় গিয়ে স্বরাজ্যদলের প্রার্থীদের অনুকূলে তিনি বক্তৃতা করেছেন। লেখক এইরকম একটি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। সেটি এখানে বিবৃত করি। নদীয়া জেলা থেকে স্বরাজ্যদলের প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন দেশবন্ধুর প্রিয়তম সহকর্মী এবং লেখকের শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু হেমন্তদা—অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকার। তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন কৃষ্ণনগরের উকিল ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী। কৃষ্ণনগরে নির্বাচনী সফর সমাপ্ত করে একদিন অপরাহ্নে দেশবন্ধু গঙ্গা পার হয়ে সদলে এলেন নবদ্বীপে। লেখক তখন নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। আমরা কয়েকজন ছাত্র রানীরঘাটে উপস্থিত ছিলাম। বেলা তখন চারটা হবে। ঘাটে এসে নৌকা থামল। নৌকা থেকে নামলেন দেশবন্ধু, সঙ্গে হেমন্তকুমার ও ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আরেকখানি নৌকা থেকে নামলেন ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী। দেশবন্ধুকে সেই প্রথম দেখলাম। দীর্ঘ উন্নত দেহ, গায়ে একটা খদ্দরের কোট, তাতে সব বোতামও ছিল না। পরনে খদ্দরের মোটা ধুতি, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। মুখে ক্লান্তির ভাব। সভা হবে বড় আখড়ায়। গঙ্গার ঘাট থেকে পায়ে হেঁটে তিনি প্রথমে এলেন মহাপ্রভুর মন্দিরে। ভক্তিভরে সেখানে মহাপ্রভুর বিগ্রহ দর্শন করে প্রণাম করলেন। পূজারী তাঁর হাতে দিলেন মহাপ্রভুর চরণস্পৃষ্ট নির্মাল্য। সবিস্ময়ে দেখলাম দেশবন্ধু সেই নির্মাল্য তাঁর মস্তকে ধারণ করলেন। মহাপ্রভুর পূজা ও ভোগের জন্য হেমন্তকুমারকে পূজারীর হাতে দশটি

টাকা দিতে বললেন। বললেন, 'আজ আমি ফকির, আমার এই সামান্য পূজা মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করবেন।' যে দেখল, যে শুনল সেই-ই মুগ্ধ হলো। মুগ্ধ হলেন নবদ্বীপের বৈষ্ণবসমাজ তাঁর এই ভক্তি বিনম্র মূর্তি দেখে।

মহাপ্রভুর মন্দির থেকে তিনি এলেন বড় আখড়ায়। স্থানটি তখন লোকে লোকারণ্য। শ্রোতারা বসেছেন সতরঞ্জির উপরে। বক্তাদের জন্য টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল। শরৎচন্দ্র বক্তাদের সামনে শ্রোতাদের মধ্যেই বসলেন। লেখক তাঁর পাশেই বসেছিলেন। আরম্ভ হয় সভার কার্য। প্রথমে বক্তৃতা করলেন ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী। তিনি রিফর্মের সমর্থক ও সুরেন্দ্রনাথের শিষ্য। তিনি বলেছিলেন যে, 'যাঁরা বলেন এই শাসন-সংস্কার ভুয়া, এ কিছু নয় এবং মন্ত্রীরা ব্রাউন ব্যুরোক্রাট মাত্র, তাঁরা ঠিক কথা বলেন না। এর ভিতর দিয়েই আমরা দেশের অনেক ভাল কাজ করতে পারি। বাংলায় একটা কথা আছে, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। আমিও বলি, একেবারে কিছু না পাওয়ার চেয়ে যতটা এখন পাওয়া গেছে তাই-ই দেশের পক্ষে ভাল।' তাঁর বক্তৃতা শেষ হলে উঠলেন দেশবন্ধু। খুব সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেছিলেন তিনি। গান্ধী দেশবন্ধুকে যুক্তির অবতার বলে অভিহিত করেছেন। সেদিন তাঁর বক্তৃতার মধ্যে সেই জিনিসটা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। প্রতিপক্ষের উত্তরে দেশবন্ধু বলেছিলেন :

'আমার প্রিয় বন্ধু আপনাদের বলেছেন, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। কথাটা শুনতে ভাল, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, যদি সেই কানা মামা লম্পট হয়, তবুও কি তাকে আপনারা ভাল বলবেন? এই শাসন-সংস্কার আমাদের কিছুই দেয় নি—কাউন্সিলে গিয়ে আমি এর স্বরূপটা উদ্ঘাটন করতে চাই। কংগ্রেস কেন এই নতুন শাসন-সংস্কার প্রত্যাখ্যান করেছে? ঋষি বঙ্কিমের কমলাকান্তের দপ্তরে শিবু তেলির গল্পটা একবার স্মরণ করুন—স্মরণ করুন সেই শীর্ণকায় কুকুরটার কথা। সে করুণ চোখে ও প্রার্থনাপূর্ণ দৃষ্টিতে

তার মনিবের আহারের থালার দিকে তাকিয়ে আছে। মনিব তার পাতের মাছের কাঁটাখানি উত্তমরূপে চুষে তার মুখের সামনে ফেলে দেয়, কিন্তু তাতে কুকুরের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। এই রিফর্মটাও ঠিক তাই—কাঁটা-চোষা মাছ। আমাদের জাতীয় দাবী পূর্ণ হয় এমন কিছু এর মধ্যে নেই। যদি বুঝতাম আছে, তাহলে অমৃতসর কংগ্রেসে আমিই সকলের আগে এটা গ্রহণ করতাম ও আপনাদের গ্রহণ করতে বলতাম।'

বলা বাহুল্য, এই নির্বাচনে নদীয়া জেলা থেকে স্বরাজ্যদল প্রার্থী হেমন্তকুমার সরকারই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করে আইনসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এই সময়ে প্রায় নির্বাচনী সভায় দেশবন্ধু তাঁর বক্তৃতার শেষে এই কথাটি বিশেষ জোর দিয়ে বলতেন: 'The Reforms are mere moonshine. They mean nothing. I want to expose them, and wreck them.' পরবর্তীকালে আইন-সভায় প্রবেশ করে বিরোধীদলের নেতা হিসাবে তিনি তাই-ই করেছিলেন—রিফর্মের অন্তঃসারশূন্যতা উদ্ঘাটন করে দ্বৈতশাসনকে অচল করে দিয়েছিলেন। সে কাহিনী যথাস্থানে বলব।

দেশবন্ধুর শক্তি ও সাহস যে কতদূর ছিল তা বোঝা গিয়েছিল এই নির্বাচনের সময়ে। যখন তিনি নির্বাচন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, 'তখন তাঁর নিজের মানসিক বলই ছিল একমাত্র ভরসা—ব্যাঙ্কে সম্বল মাত্র দুইশত টাকা।' কিন্তু বাধা-বিপত্তিতে দমবার মানুষ ছিলেন না তিনি। গয়া কংগ্রেসেই তিনি বিরোধীদের মুখের উপরে বলে এসেছিলেন—'এক বছরের মধ্যেই আমি সমস্ত দেশকে আমার মতানুবর্তী করে তুলব আর যদিও লোকে মহাত্মা গান্ধীর নামে জয়ধ্বনি করবে, কিন্তু তারা follow করবে সি. আর. দাশকে।' পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, এ তাঁর বৃথা আস্ফালন ছিল না। 'পুরাতন ঋণের উপর নিজের নামে আরো চল্লিশ

হাজার টাকা ঋণ করলেন ভূ-কৈলাশের রাজার কাছ থেকে তাঁর বসতবাড়ি বন্ধক রেখে।' সেই টাকা দিয়ে তিনি স্বরাজ্য-দলের নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সমস্ত দেশ তখন গান্ধীর মন্ত্রে দীক্ষিত—গান্ধীর অঙ্গুলি হেলনে সমস্ত দেশ উঠছে বসছে। সেই গান্ধী স্বয়ং কাউন্সিল-প্রবেশের বিপক্ষে। এই দুই নেতার উপর তখন সারা ভারতের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে বললেই হয়। লোকে দেশবন্ধুকে উপহাস করে, বন্ধুগণ প্রতিনিবৃত্ত হতে উপদেশ দেয়, কিন্তু একা দেশবন্ধু সব্যসাচীর মতো অমিত-বিক্রমে তাঁর স্বরাজ-রথ এগিয়ে নিয়ে চললেন। সমস্ত বাধা-কুঞ্জর যেন তৃণসম ভেসে গিয়েছিল সেদিন।

নির্বাচনকে জয়যুক্ত করবার জন্য 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় বিশেষ বন্ধনীর মধ্যে দেশবন্ধুর স্বাক্ষরে প্রকাশিত এই নির্বাচনী আবেদনটি সেদিন সমস্ত ভোটদাতার মর্মস্পর্শ করেছিল। এটি তাঁরই রচনা ছিল :

MY APPEAL TO THE VOTERS

Limited monarchy is a theory of Law, unlimited power of the people is a political fact. The constitutional cry of 'limited bureaucracy' is a servile imitation of the Law of England. In India freedom is inconsistent with the maintenance of bureaucracy in any shape or form. The system must be ended. That is the practical idea of the Swarajya Party within the Congress. I therefore appeal to you to exercise your franchise rightly.

—C. R. Das

স্বাধীন ভারতে আমরা কিন্তু আজো সেই দেশীয় আমলাতন্ত্রের ভরণপোষণ করে চলেছি। এই নির্বাচনী আবেদনের মধ্যেও দেশবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দেখা যায়।

নির্বাচনের ফলাফলই প্রমাণ করে দিল যে, তিনি কতদূর আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন, তাঁর শক্তি ও প্রভাবের মূল্য কত বেশি।

সাতান্নজন প্রার্থীর মধ্যে চল্লিশজন জয়লাভ করলেন। সর্বত্র স্বরাজ্যদলের জয় বিঘোষিত হয়। এই বিজয়-গৌরব তাঁর ললাটে এঁকে দিল জয়ের নতুন তিলক। বিজয়-গৌরবলাভ করলেন বটে, কিন্তু এই অক্লান্ত সংগ্রামে তাঁর স্বাস্থ্য যে কতখানি ভেঙে গিয়েছিল, সেদিন তার সন্ধান কেউ রাখে নি। তখন কে জানত যে, দেশবন্ধুর দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যাধির মূল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। দু'বছরে নিজ তহবিল থেকে ও ঋণ করে ষাট হাজার টাকা খরচ করে, অর্থ, শক্তি ও স্বাস্থ্যবিনিময়ে মডারেটদের বিতাড়িত করে তিনি জয়লাভ করলেন বটে, কিন্তু তিনি একেবারে কপর্দকশূন্য হলেন। ব্যুরোক্রেসির ভিত্তি শিথিল হলো বটে, কিন্তু তাঁর জীবনীশক্তি আরো নিস্তেজ হয়ে আসতে থাকে।

দেশবন্ধুর নির্বাচনা-যুদ্ধের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের পরাজয়। বারাকপুর কেন্দ্র থেকে তিনি নির্বাচন-প্রার্থী হয়েছিলেন; স্বরাজ্যদলের পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে দেশবন্ধু দাঁড় করালেন যুবক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকৃতপক্ষে সুরেন্দ্রনাথ ও বিধানচন্দ্রের মধ্যে ছিল না, এ ছিল সুরেন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধুর মধ্যে—আমলাতন্ত্র ও কংগ্রেসের মধ্যে। সেদিন বারাকপুর কেন্দ্রের এই নির্বাচনের উপর সমগ্র ভারতের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। এত বড় ও এমন উত্তেজনাপূর্ণ নির্বাচনী সংগ্রাম এদেশে আর কখনো দেখা যায় নি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে যদিও তিনি তাঁর পূর্ব জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন, তথাপি মন্ত্রী হিসাবে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন রচনা করে ও স্বয়ং তা প্রবর্তন করে সুরেন্দ্রনাথ দেশবাসিগণের শ্রদ্ধা অনেকখানি ফিরে পেয়েছিলেন। এইটাই ছিল দেশবাসীকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান, কারণ পৌরসভার যথার্থ স্বরাজের পথ তিনিই এই নতুন আইন প্রবর্তন করে প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন যার ফলভোগ করেছিলেন স্বরাজ্য-দলপতি দেশবন্ধু।

আরো একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য। যে-সব নির্বাচন-প্রার্থী কংগ্রেস ও স্বরাজ্য পার্টির সহায়তা লাভ করে নির্বাচন-যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন তাঁদের সকলেই যে স্বরাজী বা কংগ্রেসী ছিলেন, তা নয়। কাউন্সিলে কংগ্রেসদলের সঙ্গে একযোগে কাজ করবেন, এই শর্তেই স্বরাজ্যদল তথা কংগ্রেসের সহায়তা তাঁরা পেয়েছিলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তখনো পর্যন্ত কোন দলের সঙ্গেই সংযুক্ত ছিলেন না, একজন স্বতন্ত্র-প্রার্থী হিসাবেই তিনি নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয় (Calcutta University Constituency) কেন্দ্র থেকে সবচেয়ে অধিক সংখ্যক প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন—একেবারে পাঁচজন। এই পাঁচজনের নাম ঃ স্যার নীলরতন সরকার, বাগেরহাটের প্রবীণ শিক্ষক প্রসন্নকুমার রায়, রিপন কলেজের তরুণ অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ, রায়বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ আর আলিপুরের খ্যাতনামা ফৌজদারী উকিল বিজয়কৃষ্ণ বসু। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন স্বরাজ্যদলের মনোনীত প্রার্থী। বলা বাহুল্য, এই কেন্দ্রের নির্বাচনে বিজয় বসুই জয়ী হয়েছিলেন। তেমনি স্বরাজ্যদলের প্রার্থী সাতকড়িপতি রায়ের কাছে দেশবন্ধুর নিকটতম আত্মীয় ও বাংলার তদানীন্তন এ্যাডভোকেট-জেনারেল এস. আর. দাশের পরাজয়ও খুব চমকপ্রদ ছিল। গান্ধীর প্রভাবের বিরুদ্ধে এত বড় একটা শক্তিশালী দল গঠন করে দেশবন্ধু যেমন শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তেমনি স্বরাজ্যদলের প্রথম নির্বাচনের সাফল্যের মধ্যে তিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভা ও নেতৃত্বের পরিচয়ও রাখতে পেরেছিলেন। সেই সময় বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর এই সাফল্য লাভকে একটি গৌরবোজ্জ্বল জয়লাভ বা 'Signal Victory' বলে বর্ণনা করা হয়েছিল।

স্বরাজ্যদলের নির্বাচনী কৃতিত্ব সম্পর্কে একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন : 'The Swarajists were elected to a majority of seats in the Central Provinces, formed the single

largest party in Bengal and acquired considerable strength in Bombay and the United Provinces. Their success in Madras, the Punjab, and Bihar and Orissa was less spectacular.'* বিহারে মাত্র দশজন স্বরাজী-প্রার্থী নির্বাচিত হতে পেরেছিলেন। মধ্যপ্রদেশের আইনসভায় স্বরাজ্যদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফল মন্ত্রীসভা গঠন করাই সম্ভব হয় নি। এই নির্বাচনের ফলাফলই যে সেদিন স্বরাজ্য-দলপতি দেশবন্ধুকে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এইবার বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পালা।

লর্ড লিটন মন্ত্রিত্ব গঠনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে দেশবন্ধুকেই আহ্বান করলেন। না করে উপায় ছিল না। অবশ্য মন্ত্রিত্ব গঠন মানে কেবলমাত্র হস্তান্তরিত বিভাগগুলির শাসনভার গ্রহণ, তদতিরিক্ত কিছু নয়—নতুন শাসনসংস্কারে এর বেশি দেওয়ারও ছিল না। এই সময়ে দেশবন্ধু একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন —'Finance-এর উপর কোন control না থাকলে মন্ত্রিত্ব আত্ম-প্রতারণা মাত্র।' লাট লিটনের এই প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখার জন্য দেশবন্ধু কিছুদিন সময় নিলেন। তারপর নিজের দলের সঙ্গে পরামর্শ করে ১০ই ডিসেম্বর, ১৯২৩ তারিখে তিনি গভর্ণরকে একখানি পত্র লিখে জানালেন: 'I regret I cannot undertake the responsibility regarding the Transferred Departments.'

ইহাই প্রত্যাশিত ছিল।

এই প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজ্যদলের ইতিহাসে আরম্ভ

* *The Viceroyalty of Lord Irwin* : S. Gopal

হয় একটি নতুন অধ্যায়। এইবার তিনি সব্যসাচীর মতো সবাহিনী প্রবেশ করলেন আইনসভায় এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বিপক্ষ দলকে পর্যুদস্ত করে, দিনের পর দিন ট্রেজারীবেঞ্চ থেকে উত্থাপিত প্রত্যেকটি বিল—এমন কি, মন্ত্রীদের চৌষট্টি হাজার টাকার বেতনের বিল পর্যন্ত—নাকচ করে যে কাণ্ডকারখানা বাধিয়ে দিলেন, ব্রিটিশ রাজশক্তি সে-সব প্রত্যক্ষ করে হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। মন্ত্রীরা গদিচ্যুত হয়েছেন বার বার, তিনি শাসন-সংস্কারের অসারতা প্রমাণ করে দিয়ে দ্বৈতশাসন অচল করে দিয়েছেন, ইতিহাসের পাঠক-মাত্রেই সে-সব বিষয় অবগত আছেন। বিরোধী দলের নেতা হিসাবে আইনসভায় দেশবন্ধুর বিস্ময়কর সংগ্রামের কথা পরবর্তী অধ্যায়ে কিছু উল্লেখ করব। এখানে প্রসঙ্গতঃ আর একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন।

বাংলাদেশে নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে দেখা গেল যে, নির্বাচিত সভ্যগণের মধ্যে নানারূপ দলগঠন ও মীমাংসার আলোচনা হতে থাকে। এই সময়ে 'ন্যাশনাল পার্টি' নামে একটি দলের সৃষ্টি হয়েছিল। এই দল কংগ্রেস বা স্বরাজ্য পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল না।* অথচ নরমপন্থীদের সঙ্গেও এঁদের সংস্রব ছিল না। এই দলে মাত্র দশ কি এগারো জন সভ্য ছিলেন। দেশবন্ধুর সঙ্গে মীমাংসার ফলে এঁরা কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করতে সম্মত হলেন। এঁদের মধ্যে মিলিত হওয়ার ফলে আইনসভায় কংগ্রেস দলের শক্তি বৃদ্ধি পায়। কাউন্সিলে আরো তিনটি দল ছিল। মডারেট বা নরমপন্থী, মুসলমান দল ও সরকারের মনোনীত দল দেশবন্ধু কখনো ভরসা করেন নি, মডারেট বা মনোনীত সদস্যগণ তাঁর দলের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। তাই তাঁর শেষ ভরসা ছিল মুসলমান দলের উপর। এঁদের হস্তগত করতে পারলে আইনসভায় কংগ্রেস দলের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অপ্রতিহত থাকবে। দেশবন্ধু এইবার সেই চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর সেই প্রয়াসের

পরিণতি হিন্দু-মুসলমান চুক্তি (Hindu-Muslim Pact)। ভারতের রাজনীতিতে এই প্যাক্টের সৃষ্টি বহুবিধ অনর্থের সৃষ্টি করেছে।

আজ এ কথা বলা যেতে পারে যে, যদিও দেশবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনাকাল থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি ভিন্ন ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নয়, তথাপি তাঁর 'বেঙ্গল প্যাক্ট' ইতিহাসের বিচারে আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। ১৯০৯ সালের মিণ্টো-মর্লি শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ার পর যখন পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা হয় তখন থেকেই ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদের বীজটা বপন করা হয়। এই সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেস অনেকদিন থেকেই সচেতন ছিল। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পর কংগ্রেস-লীগ চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী পাঞ্জাবের আইনসভায় কংগ্রেস মুসলমানদিগকে শতকরা ৫১টি আসন দিতে সম্মত হয়। ১৯২৩ সালের কলকাতা মিউনিসিপাল আইনে কয়েক বছরের জন্য মুসলমানদিগের বিশেষ সুযোগ দেবার ব্যবস্থা করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেশবন্ধুর হিন্দু-মুসলমান চুক্তির সৃষ্টি। তাঁর এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ী সম্প্রীতি জাগ্রত করা এবং তার ভিত্তিতে সংযুক্ত দাবী ও সম্মিলিত আন্দোলন দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন।

কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদন করতে গিয়ে তিনি একদিকে যেমন হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হলেন, অন্যদিকে তেমনি মুসলমান সম্প্রদায়েরও পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করতে পারেন নি। তবে এই চুক্তির ফলে তিনি মন্ত্রিত্ব-ধ্বংসে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু-মুসলমান চুক্তি উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক পরিত্যাক্ত হয়।

দেশবন্ধু সম্পাদিত হিন্দু-মুসলমান চুক্তি এই রকম ছিল:

১। ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি নির্বাচন লোকসংখ্যা হিসাবে হবে। কিছুকাল পর্যন্ত পৃথক নির্বাচন চলবে। ২। জিলা বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড ইত্যাদিতে যেখানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে শতকরা ৬০ জন মুসলমান নির্বাচিত হবে। হিন্দুর সংখ্যা বেশি হলে হিন্দুই নির্বাচিত হবে। ৩। বাংলার মুসলমানগণ শতকরা ৫৫টি সরকারী চাকরি পাবে। (এই ৫৫ পরে ৫২তে পরিণত হয়, কারণ দেখা যায় যে বাংলার সমগ্র লোকসংখ্যার মধ্যে হিন্দু শতকরা ৪৮, মুসলমান ৫২।) ৪। আইনের দ্বারা ধর্মসংক্রান্ত কোন বিষয়, (যেমন ঈদের সময় গো কোরবানি) বন্ধ হবে। যে সম্প্রদায়ের ধর্মে হস্তক্ষেপ হওয়ার কথা, তাদের শতকরা অন্তত ৭৫ জন লোক যদি মত দেয়, তবেই হতে পারবে। নামাজ পড়বার সময় মসজিদের সম্মুখে হিন্দুদের কোন শোভা-যাত্রায় বাজনা বাজান বা সঙ্গীত হতে পারবে না।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি দ্বারা এই প্যাক্ট (The Bengal Pact) পাস করিয়ে নিয়ে দেশবন্ধু সেটা কোকনদকংগ্রেসে উপস্থিত করেন। এই চুক্তি সম্পর্কে দেশবন্ধুর এক জীবনীকার লিখেছেন : 'The Pact was conceived in the best of spirits but it became the nucleus of political controvercy. Communal sections among the Hindus Vilified Deshbandhu Das and said that he had surrendered the rights of the Hindus. Even the more moderate opinion among the Hindus held that Deshbandhu Das had gone too far in trying to win the confidence of the Muslims··· The majority of Muslim, however, hailed this pact as a charter of their rights and almost overnight Deshbandhu Das became their unchallenged leader.'*

* *Deshbandhu Chittaranjon Das* : H. N. Das Gupta

এই মন্তব্য যিনি করেছেন তিনি দেশবন্ধুর অন্তরঙ্গস্থানীয়দের মধ্যে একজন ছিলেন। তাই অনুরাগীর দৃষ্টি দিয়ে তিনি যা বলেছেন, ইতিহাসে তার সমর্থন মেলে না। দেশবন্ধু কোনদিনই মুসলিম সমাজের অবিসংবাদী নেতারূপে স্বীকৃত হন নি, যদিও আক্রাম খান প্রমুখ কয়েকজন জাতীয়তাবাদী মুসলিম তাঁর নেতৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। এই বেঙ্গল প্যাক্টের ফলে সেদিন বিতর্কের ঝড় উঠেছিল ঠিকই এবং হিন্দু-সমাজের একশ্রেণীর মধ্যে প্রবল ক্ষোভও দেখা দিয়েছিল, তবে এই চুক্তির ফলে বাংলার হিন্দুর স্বার্থ যে অনেকখানি বিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং মূলত রাজনৈতিক অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তিনি যে এই রকম একটি চুক্তি সম্পাদিত করেছিলেন অথবা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, ইতিহাসেই তার অজস্র সাক্ষ্য বহন করে।

ডিসেম্বর, ১৯২০।

কোকনদে কংগ্রেসের ৩৮তম অধিবেশন বসল। সভাপতি —মৌলানা মহম্মদ আলি। সভাপতি তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে ভারতের রাজনীতিতে মুসলমানদের স্থান ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন। কাউন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে দিল্লী কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত এই অধিবেশনে চূড়ান্তভাবে সমর্থিত হয়। দেশবন্ধু জানতেন যে, হিন্দু-মুসলিম চুক্তি কার্যকর করে তুলতে হলে কংগ্রেসের অর্থাৎ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন। কোকনদ কংগ্রেসে তিনি এই চুক্তি সম্পর্কিত তাঁর প্রস্তাবটি তুলে ব্যর্থকাম হন। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলিম চুক্তির কথা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি চিন্তা করছে—এই কারণ প্রদর্শন করে তাঁর 'বেঙ্গল প্যাক্ট' সরাসরি অগ্রাহ্য করা হয়। 'Bengal Pact should be shelved? Bengal Pact should be deleted'—প্রকাশ্য সভায় যখন তাঁর বিরোধীরা এই রকম আওয়াজ তোলেন তখন

দেশবন্ধু যেন ক্রোধে ফেটে পড়লেন। দৃপ্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেন :

'You may delete the Bengal Pact from the resolution but you cannot delete Bengal from the Indian National Congress. Bengal demands her right of having her suggestions considered by the National Assembly. What right has anybody to say that Bengal has to be deprived of her right? Bengal will not be deleted in this unceremonious fashion. I cannot understand the argument of those who cry 'delete the Bengal Pact'. Is Bengal untouchable? Will you deny Bengal the right of suggestion on such a vital question? If you do, Bengal can take care of itself. You can't refuse Bengal the right to make a suggestion.'

দেশবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে তাঁর বহু বিখ্যাত বক্তৃতার মধ্যে এটি একটি। বক্তৃতা তো নয়, রীতিমতো বিস্ফোরণ। বিদ্রোহী বাংলার এক প্রচণ্ড অভিব্যক্তি। তবে এ কথা ঠিক যে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নে যদিও অল্প-বিস্তর বিতর্কের ঝড় উঠেছিল, কিন্তু মোটের উপর কোকনদ কংগ্রেসের আলাপ-আলোচনা এক সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যার মিটমাটের জন্যই দেশবন্ধু এই হিন্দু-মুসলিম চুক্তি রচনা করেছিলেন এবং তিনি আশা করেছিলেন যে কংগ্রেস তা সমর্থন করবে। তাঁর প্রস্তাবটি কোকনদ কংগ্রেসে এই কারণেই অগ্রাহ্য হয়েছিল যে, এর দ্বারা মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা হয়েছে এবং ইহা জাতীয়তার নীতিকে লঙ্ঘন করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটির মীমাংসার জন্য লাজপৎ

রায় ও ডাঃ আনসারি দু'জনে মিলে আর একটি অনুরূপ চুক্তি রচনা করেছিলেন এবং ঐ চুক্তিটি বিবেচনার জন্য কোকনদ কংগ্রেস থেকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে প্রেরিত হয়।

এখানে একটি প্রশ্ন আছে। এই জাতীয় চুক্তির প্রয়োজন হয়েছিল কেন এবং এর পরিণামই বা কি হয়েছিল? সুভাষচন্দ্র এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'Those Pacts indicated that the better minds among the Congress leaders had begun to realise the possibility of a communal rift and the necessity of making some sort of settlement before the breach widened. But sufficiently speedy or sufficiently drastic action was not taken, with the result that the differences did become more acute and grave and the country had to face a communal storm as soon as the political tension created by the Swaraj Party subsided after the death of Deshbandhu Das.'*

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে এই সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য ও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে স্থায়ী সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য গান্ধী-জওহরলাল-সুভাষচন্দ্র প্রমুখ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ প্রয়াস করেন। কিন্তু তাঁদের এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়। সেই ব্যর্থতার পরিণাম ভারত-বিভাগ।

কোকনদ কংগ্রেসের কাজ শেষ হয়ে গেলে সেখান থেকে দেশবন্ধু লাহোরে এলেন। এখানে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তাঁর বক্তৃতার মধ্যে ভারতের বিভিন্ন শিল্পসংস্থা ও ফ্যাক্টরি আইন সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন। ১৯২৪ সালেও তিনি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন।

* *The Indian Struggle* : Bose

॥ চব্বিশ ॥

দেশবন্ধু আইনসভায় প্রবেশ করলেন।

কংগ্রেসের পরিষদীয় অধ্যায়ের সূচনা এখান থেকেই।

একজন দক্ষ পার্লামেণ্টারিয়ান হিসাবে এবং বিরোধীদলের নেতা হিসাবে আইনসভায় তাঁর আর এক মূর্তি দেখা গেল। সংগ্রামী মূর্তি। নতুন শাসন-সংস্কার যে আসলে ভূয়া, প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসনের বিন্দুবিসর্গও যে এর দ্বারা ভারতবাসীকে দেওয়া হয় নি, সেটা প্রমাণ করবার জন্য সেদিন দেশবন্ধুর মতো একটি প্রতিভার প্রয়োজন ছিল। তিনি চাণক্যের মতো যুগপৎ রাজনীতি ও কূটনীতিতে পারঙ্গম। এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার যে, কোকনদ কংগ্রেসের পর থেকেই ভারতের রাজনীতি স্বরাজ্যদলকে আশ্রয় করে আইনসভায় নতুন পদক্ষেপ করতে থাকে এবং জনসাধারণের মনে তখন এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, কংগ্রেস-তরণীকে জনজীবনের বিশাল প্রবাহস্রোতের ওপর দিয়ে চালিত করবার জন্য এখন একমাত্র কর্ণধার দেশবন্ধু। এই সময় থেকেই বেশ কিছুকাল পর্যন্ত জনসাধারণের মনোযোগ বিশেষভাবেই আকর্ষণ করে তাঁর কার্যকলাপ আইনসভার ভিতরে ও বাইরে সকল রাজনৈতিক দলের শ্রদ্ধার বিষয় হয়ে উঠেছিল। দেশবন্ধুর পার্লামেণ্টারি প্রতিভার এই তো বড় পরিচয়।

এইভাবে প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করে তিনি সব্যসাচীতুল্য বিক্রম সহকারে ব্যুরোক্রেসির বিরুদ্ধে শুরু করেন তাঁর অভিযান। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এমন দৃশ্য এর আগে আর কখনো আমরা প্রত্যক্ষ করি নি। যুক্তিতে অজেয়, তর্কে নিপুণ, বাগ্মিতায় শ্রেষ্ঠ এবং কৌশলে অদ্বিতীয় দেশবন্ধু যেদিন বিরোধীদলের নেতা হিসাবে প্রথম আইনসভায় প্রবেশ

করেন, সেদিন তাঁর আর এক মূর্তি দেখা গিয়েছিল। জনসভার বক্তৃতা আর আইনসভার বক্তৃতা এক জিনিস নয়। এখানে প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করতে হলে, প্রতিটি বিষয়ে তাকে নাকাল করতে হলে সতর্কভাবে অগ্রসর হতে হবে, তথ্যের উপর ভিত্তি করে আর তার যুক্তিকে ধূলিসাৎ করতে হবে, এমনভাবে যাতে প্রতিপদে সে বিব্রত বোধ করে। এই চমকপ্রদ দৃশ্যেরই অবতারণা সেদিন হয়েছিল বাংলার আইনসভায়। ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে মন্ত্রীদের বেতন মঞ্জুর করার প্রস্তাব উঠল—বিরোধীপক্ষের ভোটের তোপের মুখে সে প্রস্তাব কোথায় উড়ে গেল। বাজেটের প্রধান বিষয়গুলি যখন উত্থাপিত হলো, সেগুলিও পাস হলো না। মন্ত্রীদের নিয়োগ ও তাদের বেতন সম্পর্কিত প্রস্তাব একবার ১৯২৪ সালেও আর একবার ১৯২৫ সালে বিপুল ভোটাধিক্যে প্রত্যাখ্যাত হয়।

১৯২৪ সালের জুন মাসে মন্ত্রীদের বেতনের দাবী মজুরি 'মোশন' যখন প্রত্যাখ্যাত হলো তখন গভর্ণর ব্যবস্থা-পরিষদে আর একবার সুযোগ দিলেন মন্ত্রীদের নিয়োগ সম্পর্কিত সরকারী সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনাব জন্য। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবনীকার (যিনি ঐ সময়ে প্রতিদিন আইনসভায় উপস্থিত থেকে বিরোধী দলের নেতার কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন) লিখেছেন: 'Chittaranjan and his friends took the wind out of the sails of the Government and obtained an injunction from the High Court of Calcutta, to restrain the President from putting the proposed official resolution to the Council on the appointed day, with the result that the statutory rules of the Legislature were revised by a special modification from the Government of India to allow of a second application for a vote.'* তারপর

* *Life and Times of C. R. Das* : Ray

পরিষদীয় নিয়মকানুনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পর আইনসভায় আলোচনার জন্য যখন আগষ্ট মাসে এই 'মোশন'টি আবার নিয়ে আসা হয় তখন দেখা গেল যে বিপুল ভোটাধিক্যে তা নাকচ হয়ে যায়। মোটকথা, কোন বিষয়েই তাঁর শর-সন্ধান ব্যর্থ হতো না এবং প্রতিপক্ষকে নাকাল করার জন্য তাঁর তূণে কোনদিনই উপযুক্ত বাণের অভাব হয় নি। এ এক আশ্চর্য প্রতিভা।

মার্চ মাস, ১৯২৫।

ধ্বংস ও গঠন (destruction and construction) সম্পর্কে দেশবন্ধু আইনসভায় তাঁর যে বিখ্যাত বক্তৃতাটি করেছিলেন তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো:

'আমরা কেন ধ্বংস করতে চাই? আমরা কিসের থেকে পরিত্রাণ পেতে চাই? যে শাসনব্যবস্থা দ্বারা আমাদের কোন উপকার হয় না বা হতে পারে না, আমরা সেইটাই ধ্বংস করতে চাই ও তার থেকেই পরিত্রাণ কামনা করি। আমরা এর ধ্বংস সাধন করতে চাই। কারণ আমরা এমন একটি ব্যবস্থা নির্মাণ করতে চাই যা সার্থকভাবে কার্যকর হবে ও যার দ্বারা জনসাধারণের অশেষ হিতসাধন হবে।'

দেশবন্ধু আইনসভায় যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন ইংলণ্ডের শ্রমিক সরকার তার মধ্যে অরাজকতার (anarchy) আভাষ পেয়েছিলেন ও ভারতের স্বরাজ্যদল যে একটি প্রচ্ছন্ন বিপ্লবীদল, এমন কথাও ইংলণ্ডের কোন কোন কাগজে তখন লেখা হয়েছিল। আর আমাদের দেশে যাঁরা স্বরাজ্যদলের বিরোধী ছিলেন তাঁদের অনেকেই (যেমন, স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু; ইনি মডারেটপন্থীদের অন্যতম ছিলেন) আইনসভায় দেশবন্ধুর নীতিকে নিছক নাটকীয়তা বা বাষ্প-চালিত দেশপ্রেম ('patriotism in locomotion') বলে পরিহাস করেছিলেন। তিনি কিন্তু এসব আদৌ ভ্রূক্ষেপ করতেন না। ভাঙনের গদাটি তিনি বেশ সবল হস্তেই ধারণ করেছিলেন।

নতুন সংস্কার প্রবর্তনের পর তখন তিন বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

এই তিন বছরের হিসাব-নিকাশ করে এই বক্তৃতার শেষভাগে তিনি কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছিলেন : 'Can you lay your hands on your breast and say that you can do anything for the masses under this system? It was tried for three long years with Sir Provash Chandra Mitter as one of the Ministers. May I ask in what way the condition of the masses has been improved? Has there been more education? Have they grown into anything? Has the province been better off financially? No. You have not got this power. And not having the power, you know that you can do no good in the present circumstances. It is a shame business altogether.'

তাঁর যুক্তির ধরনই ছিল স্বতন্ত্র। মন্ত্রীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাঁদের তো কিছু করবার নাই, কারণ তহবিলের ওপর তাঁদের কোন এক্তিয়ার নেই—সেটা সংরক্ষিত বিভাগের অধীনে। জাতি গঠনোপযোগী বিভাগের দায়িত্ব তাঁদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে সত্য, কিন্তু তাঁদের টাকা খরচের উপায় নেই। এ শাসন-সংস্কার কি ভূয়া নয়?—এই ছিল দেশবন্ধুর যুক্তির ধারা। ১৯২৫ সালের গোড়ার দিকের আর একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করছি।

দেশবন্ধু তখন খুব অসুস্থ। রোগশয্যা থেকেই স্ট্রেচারবাহিত অবস্থায় তিনি এলেন আইনসভার কক্ষে দ্বৈতশাসন-ব্যবস্থাকে (dyarchy) শেষ আঘাত হানবার জন্য। বন্ধুদের কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে তিনি নির্দিষ্ট সময়ে এসে প্রবেশ করলেন বিধান-কক্ষে। সেদিন এইভাবে তার উপস্থিতি কক্ষ মধ্যে যেন বিদ্যুতের শিহরণ জাগিয়ে দিয়েছিল এবং যাঁরা দোদুল্যমান ছিলেন, সেইসব

সভ্য একযোগে তাঁর দলে এসে যোগদান করলেন। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান যখন ভোটিং-এর ফলাফল ঘোষণা করলেন তখন দেখা গেল সরকার পক্ষে সেবারকার মতো একটা প্রবলতম পরাজয় ঘটেছে যার ফলে সপরিষদ্ লর্ড লিটনকে হস্তান্তরিত বিভাগ-গুলির পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে হয়। এই ঘটনাটির পর থেকে স্বরাজদলপতি দেশবন্ধু যতদিন আইনসভায় ছিলেন ততদিন সরকারকে প্রতিপদে রীতিমত শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন করে তুলেছিলেন। সেদিনের ভারতীয় আমলাতন্ত্রগোষ্ঠী তাঁর সিংহবিক্রম দেখে সত্যিই বেসামাল হয়ে উঠেছিল।

মোটকথা, কাউন্সিলে তিনি সর্বত্রই জয়লাভ করেছিলেন।

সে জয়লাভের সম্পূর্ণ ইতিহাস বলতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করতে হয়। বাজেট অগ্রাহ্য ও মন্ত্রীদের বেতন প্রথম আঘাতেই তিনি নাকচ করেছিলেন। বার বার তিনি মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে তাঁদের অপসারণ করেন। অমাত্যতন্ত্রের পরাজয় সাধন দেশবন্ধুর রাজনৈতিক কৌশলের বিশেষ নিদর্শন রূপেই গণ্য হওয়ার দাবী রাখে। শেষবার যখন লাট লিটন নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করে মন্মথনাথ রায় চৌধুরীকে ও নবাব নবাবালী চৌধুরীকে মনোনীত করেন, স্বরাজ্যদল সে মন্ত্রীসভাও ভেঙে দিতে সমর্থ হয়। কাউন্সিলে এইটাই ছিল তাঁর শেষ কীর্তি। এ ছাড়া, অর্ডিনান্স আইনও তিনি কাউন্সিল থেকে অচল করেন। পরে এই বিষয়ে যথাস্থানে আরো বলা হবে। এইভাবে কাউন্সিলের মধ্য থেকে যুগপৎ সংহার ও সংস্কার, গঠন ও বিনাশ সম্পর্কে তিনি একাধিক ভাষণে তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন। এই সময়ে সরকার পক্ষের হয়ে কলকাতার একটি বিদেশী সংবাদপত্রে স্বরাজ্য দলপতিকে 'The high priest of destruction in Indian politics' বলে অভিহিত করা হয়েছিল সেদিন এর জবাবে আইনসভা থেকে দেশবন্ধু যে তোপ দেগেছিলেন তা ব্যুরোক্রেসিকে

সচকিত করে তুলেছিল। দৃপ্তকণ্ঠেই তিনি বলেছিলেন : 'I ask my critics to point out one single instance where there has been real constructive work without destruction somewhere.' আরো বলেছিলেন : 'What kind of co-operation you can expect between masters and slaves ?'

ভারতের কোন আইনসভায় এইরকম চাণক্যপ্রতিম দৃপ্ত ভাষণ পরে আর কখনো শোনা যায় নি।

কাউন্সিল-প্রবেশের পর স্বরাজ্যদলের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল নতুন মিউনিসিপাল আইনের বিধি অনুসারে (Calcutta Municipal Act, 1923) পৌরসভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ। সেখানেও দলের বিজয়কেতন উড্ডীন্ করলেন তিনি নবগঠিত পৌরসভার প্রথম পৌরপ্রধান (Mayor) হিসাবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আগে কলকাতার পৌরসভায় জনমতের কোনই প্রাধান্য ছিল না। সভাপতি নির্বাচনে সভ্যগণের কোন হাত ছিল না। সরকার সভাপতি মনোনীত করতেন এবং সরকারের মনোনীত সদস্যসংখ্যাই ছিল বেশি। নতুন আইনের দ্বারা সুরেন্দ্রনাথ পৌরসভাকে জনমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। আইন পাস হয় ১৯২৩ সালে এবং প্রথম নির্বাচন এল ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে। তাঁর দলীয় সভ্যদের নিয়ে ও তাঁর মনোনীত প্রার্থীদের নিয়ে দেশবন্ধু পৌরসভা অধিকার করবেন ঠিক করলেন। এটা একটা দুঃসাহসিক কাজ ছিল সন্দেহ নেই, কারণ অন্যান্য প্রদেশের রাজধানীগুলির মতো বাংলার ভূতপূর্ব রাজধানী কলকাতা খুবই সংরক্ষণশীল শহর বলে গণ্য হতো এবং এখানকার নাগরিকবৃন্দ চরমপন্থী কোন মতাদর্শে যে ভিড়ে যাবে, এমন সম্ভাবনা খুব কমই ছিল।

কিন্তু সেই অসম্ভবকে সম্ভব করলেন তিনি।

তাঁর ছিল সুসংহত সংগঠন আর অন্যদিকে শহরের সংরক্ষণশীলদের তেমন কোন শক্তিশালী সংগঠন ছিল না। ফলে নির্বাচনের দিন বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রের ফলাফল দেখে লোকে যারপরনাই বিস্মিত হলো—সমগ্র মহানগরী যেন স্বরাজ্যদলের পতাকার তলে এসে দাঁড়িয়েছে। পৌরসভার প্রথম নির্বাচনে ৭৫টি সদস্যদের মধ্যে ৫৫ জন স্বরাজ্যদল প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং পৌরসভার প্রথম সভায় দেশবন্ধু প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন। তাঁর জীবনে এই দিনটি ছিল সবচেয়ে গৌরবের দিন। ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ পৌরসভাটি যখন এইভাবে তাঁর দলের করায়ত্ত এলো তখন থেকে স্বরাজ্যদলের ও সেই সঙ্গে দলের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতার শক্তি এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যে সময়ে পৌরসভার শাসনকর্তৃত্ব স্বরাজ্যদলের হাতে এসেছিল তখন দলের আথিক অবস্থা খুবই সংকটজনক ছিল। তাই এটা হাতে পেয়ে তাঁরা কিছুকালের জন্য অনেকখানি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের অভিমত উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি লিখেছেন :

'The Swarajist party have captured the majority of the seats in the Corporation and it is felt that they are utilising their predominance for party purposes. Such a policy is natural, there are illustrations of it all over the world but it is not equitable and it is right and justice that prevail in the Government of human affairs···The first crowning blunder of the new regime has been the appointment of Mr. C. R. Das as Mayor. For Mr. Das's ability, tact and judgment I have great respect; and therefore it seems to me all the more inexplicable that he should

have been led to commit this mistake. To the unbiassed spectator it would point to the deleterious effects of intoxication of power. The Mayor is an officer of some responsibility and of great dignity. The office is usually held by venerable citizens who have grown grey in the service of the Corporation. It was never bestowed on a Gladstone, on a Palmerston or a Disraeli, but is the tribute to fame and distinction for civic service. Mr. C. R. Das has not during the whole of his public career been within miles of a municipal office. But all at once, because his party is in power and he is their leader, he is installed in the position of Mayor without a trace of municipal experience.'*

সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে রাষ্ট্রগুরুর এই সুচিন্তিত মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে যথার্থ বলে স্বীকার করতে হয়। ক্ষমতার একরকম মত্ততা থাকে, সেই মত্ততা স্বরাজ্যদল ও দলপতির শুভবুদ্ধিকে যে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করে নি তা নয়। এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত থাকলাম। নতুন পৌরসভার প্রথম প্রধান কর্মকর্তার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। এই নিয়োগ সর্বাংশেই যোগ্য ছিল।

কাউন্সিলে অপ্রতিহত ক্ষমতা, পৌরসভা অধিকৃত, এখন দেশবন্ধুর পূর্বের দিন যেন সম্পূর্ণ সগৌরবে ফিরে এল। আবার সেই ১৯২১-২২ সালের মতো ১৪৮ নম্বর রসা রোডের বাড়িটি সকল শ্রেণীর লোকের কলকোলাহলে ভরে উঠল। রসা রোডের স্বরাজ আশ্রম রাজনৈতিক আলোচনার পীঠস্থানে পরিণত হলো।

* *A Nation in Making* : Banerjea

সেদিনের সেই স্বরাজযজ্ঞের উদ্গাতা, হোতা, ঋত্বিক, একাধারে দেশবন্ধুই ছিলেন। কিন্তু তাঁর ঋণের বোঝা বাড়ল বই কমল না। দলের প্রতিষ্ঠা হলো, কিন্তু স্বরাজ্য দলপতির আহার নিদ্রা স্নান বিশ্রাম সবই এমনই অনিয়মিত হতে লাগল যে, তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমেই সকলের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠতে থাকে।

কাউন্সিল ও পৌরসভায় প্রাধান্য লাভ করে সংগঠনের কাজে যখন তিনি আত্মনিয়োগ করবেন ঠিক করলেন তখন, দেশের ও জাতির দুর্ভাগ্য, দেশবন্ধুর আয়ুসূর্য পশ্চিমে অবনমিত, জীবনীশক্তি নিস্তেজ, যদিও তাঁর মনের বল তেমনি অক্ষুণ্ণ ও অফুরন্ত ছিল। কর্পোরেশনকে কেন্দ্র করে দরিদ্রনারায়ণের সেবার আয়োজন করতে তিনি রচনা করেন একটি সুন্দর পরিকল্পনা, সমস্ত কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন সুভাষচন্দ্রের উপর। দুঃখের বিষয়, পৌরসভায় কত মেয়র এলেন, গেলেন, কিন্তু দেশবন্ধুর সেই পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে আজো রূপায়িত হয় নি।

৯ই জানুয়ারি, ১৯২৪।

লক্ষ্ণৌতে স্বরাজ্যদলের অধিবেশন বসল। সভাপতি—দেশবন্ধু। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে দলের নেতা যে-সব দাবী উত্থাপন করবেন, এই অধিবেশনে সেগুলি ঠিক হয়। দাবীগুলি এইরকম ছিল: ১। সমস্ত রাজনৈতিক ও আটক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে; ২। দমন-মূলক সমস্ত আইন প্রত্যাহার করতে হবে; ৩। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার নীতি নির্ধারণের জন্য একটি ন্যাশনাল কন্‌ভেনশন্ আহ্বান করতে হবে। তখন ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব ছিলেন স্যার ম্যালকম্ হ্যালে। কেন্দ্রীয় পরিষদে বিরোধী দলের নেতা হিসাবে মতিলাল নেহরু যখন এই দাবীগুলি উত্থাপন করেন তখন স্বরাষ্ট্রসচিব বাধা প্রদান করেন এবং বলেন যে, এগুলি ধীরে ধীরে

বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে; বর্তমান অবস্থায় ও নতুন ভারত-শাসন আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এই দাবীগুলি গ্রহণযোগ্য নয়। কেন্দ্রীয় পরিষদের ন্যাশনালিষ্ট ও স্বতন্ত্র সদস্যগণ এই বিষয়ে স্বরাজীদের সমর্থন করেন ও তখন স্বরাজ্যদলের সঙ্গে তাঁদের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

আইনসভায় স্বরাজ্যদলের অধিকার যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন দেশবন্ধু চিন্তা করলেন যে, অতঃপর কাউন্সিল-প্রবেশ কংগ্রেসের প্রধান কার্যসূচী বলে স্বীকৃত হওয়া উচিত। ইতিমধ্যে তাঁর কারাদণ্ডের নির্ধারিত কাল উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই মহাত্মা গান্ধী মুক্তিলাভ করেছেন (৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪) এবং পূর্বের ন্যায় তাঁর নিজস্ব 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদনা আবার আরম্ভ করেন। এই কাগজে গান্ধীর নিজস্ব মত প্রতিফলিত হতো, তাই সকলেই আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলেন যে, কাউন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে তিনি এখন কি প্রকার মত প্রকাশ করবেন। জেল থেকে বেরিয়েই তিনি ঘোষণা করলেন: 'This policy of Council entry is inconsistent with non-co-operation which require a certain mental attitude which cannot be reconciled with membership of the legislatures. Non-co-operation within is a contradiction in terms.'*

বোঝা গেল গান্ধী তাঁর সিদ্ধান্তে অটল আছেন। তখন দেশবন্ধু ও মতিলাল উভয়ে জুহুতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন (১৮ই মে, ১৯২৪) ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে তিনজনের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়। কিন্তু স্বরাজী নেতা দুইজন গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করে খুশী হলেন না, কারণ গান্ধী কাউন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে কংগ্রেসের দিল্লী ও কোকনদ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব সমর্থন করতে

* *Young India.* 12 March, 1924

পারলেন না। এর পরেই গান্ধী একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাতে দেখা গেল যে, দুইটি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে পার্থক্য তা মৌলিক এবং গান্ধীর ধারণা যে আইনসভায় যাওয়ার ফলে অসহযোগিতার আদর্শ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তবে তিনি এইটুকু রাজী হলেন যে, কংগ্রেসীরা স্বরাজীদের কাজে কোন বাধা সৃষ্টি করবে না এবং কংগ্রেসীরা খাদি, বিলাতী বস্ত্র বয়কট প্রভৃতি গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করবেন।

তখন পাল্টা বিবৃতি দিলেন দেশবন্ধু ও মতিলাল।

কাউন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে কি কি কারণে তারা গান্ধার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি উক্ত বিবৃতিতে তাই বলা হয়। তারা বললেন যে, আইনসভায় প্রবেশ অসহযোগিতারই নামান্তর মাত্র, কারণ স্বরাজীরা শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি করবার জন্য সেখানে প্রবেশ করেছেন। জুহুতে এই তিনজন নেতার মধ্যে সেদিন যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহরু লিখেছেন: 'The Juhu talks, so far as the Swarajists were concerned did not succeed in winning Gandhiji, or even in influencing him to any extent. Behind all the friendly talk, and the courteous gestures, the fact remained that there was no compromise. They agreed to differ, and statements to this effect were issued to the press.'*

জুহুতে থাকতেই দেশবন্ধু পাটনায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে (২৫ মে, ১৯২৪) যারপরনাই ব্যথিত হন এবং কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেই পৌরসভার পক্ষ থেকে মেয়র হিসাবে বাংলার এই পুরুষসিংহের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। মে মাসের শেষভাগে প্রাদেশিক সম্মেলন বসল সিরাজগঞ্জে। সভাপতি—মৌলানা আক্রাম খাঁ। এই সম্মিলনীতে

* *Autobiography* : Nehru

দেশবন্ধু রাত্রি একটা পর্যন্ত বক্তৃতা করে হিন্দু-মুসলমান চুক্তি সম্বন্ধে সমস্ত বিরোধী পক্ষের যুক্তিজাল ছিন্ন করতে সমর্থ হন।

সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে আরো একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, এবং সেইটিই ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও বিতর্কমূলক প্রস্তাব। চার মাস আগে কলকাতায় গোপীনাথ সাহা নামে এক বিপ্লবী যুবক পুলিশ-কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে মিঃ ডে নামে একজন শেতাঙ্গ ভদ্রলোকের প্রাণনাশ করে। ঘটনাটি ঘটেছিল প্রকাশ্য দিবালোকে মহানগরীর সবচেয়ে জনাকীর্ণ অঞ্চল চৌরঙ্গীতে। বিচারে গোপীনাথের ফাঁসি হয়, সে আত্মপক্ষ সমর্থন করে নি। আদালতে দাঁড়িয়ে সে শুধু বলেছিল যে, সে কৃতকার্য হতে পারে নি, অন্য কেউ নিশ্চয়ই হবে। সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে দেশবন্ধুর উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাংলার বিপ্লবীরা দাবী করল যে সম্মিলনীতে গোপীনাথ সম্পর্কে একটা প্রস্তাব আনতে হবে। অহিংস অসহযোগী চিত্তরঞ্জনকে এই দাবী মানতে হয়। প্রস্তাবের মুসাবিদা তিনিই করলেন এবং তিনিই সেটা উত্থাপন করলেন। প্রস্তাবে বলা হলো যে, গোপীনাথের পন্থা অন্যায় ও অবৈধ, কিন্তু তার দেশপ্রেম বা আত্মোৎসর্গ কোনটাই উপেক্ষার বিষয় নয় এবং এইজন্য এই সম্মিলন এই বিপ্লবী তরুণের দেশপ্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সিরাগঞ্জের মূল প্রস্তাবটি তখন রূপান্তরিত অথবা বিকৃতভাবে কলকাতার কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এজন্য দেশবন্ধুকে সেদিন অনেক ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে হয়। এমন কি গান্ধী পর্যন্ত সিরাজগঞ্জের ঐ প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখেছেন: 'Gandhiji did not like this resolution because action like this were not in

tune with the Congress policy of non-violence and impeded the freedom movement.'*

সিরাজগঞ্জের প্রাদেশিক সম্মিলনীতে গৃহীত প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে সেই সময় বহু পত্রিকায় নানা বিরুদ্ধ মত প্রকাশিত হয় এবং কেহ কেহ এমন কথাও বলেছিলেন যে, দেশবন্ধু অহিংসবাদী হয়েও হিংসাত্মক বা বিপ্লবাত্মক কাজের সমর্থন করেন। এই সম্পর্কে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব কাগজে লিখেছিলেন :

'শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ সম্প্রতি একটি ইস্তাহার জারি করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি এবং স্বরাজ্যদল রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা ও ভীতি-উৎপাদননীতির সম্পূর্ণ বিরোধী, ঐরূপ উপায়ে কখনো স্বরাজ্য-লাভ হইতে পারে না ইত্যাদি। উত্তম কথা। স্বরাজ্যদল ঐ প্রকার নীতির সমর্থক, ইউরোপীয় সমাজে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে বলিয়া, তিনি বলেন, তিনি তাহা দূর করিবার নিমিত্ত এই ইস্তাহার জারি করা আবশ্যক মনে করিতেছেন। তিনি বলেন, স্বরাজ্যদলের নীতি ও কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের ঐরূপ ধারণার উত্তরে তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়াছেন। তাঁহার মত বুদ্ধিমান লোক কেন আশ্চর্যান্বিত হইয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না। সিরাজগঞ্জে গোপীনাথ সাহা বিষয়ক প্রস্তাব ধার্য হওয়া, তাহার পর তাহা যে ঠিক হইয়াছিল তাহা কাগজপত্রে ও সভাসমিতিতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা, কংগ্রেস কমিটিতে পর্যন্ত চিত্তরঞ্জনবাবুর জিদ বজায় রাখিবার চেষ্টা, ফরওয়ার্ড কাগজে সকলের ভাল করিয়া নজরে পড়ে, এরূপ ভাল জায়গায় ও বড় অক্ষরে ব্র্যাণ্ট সাহেবের বহি হইতে মদনলাল ধিংড়ার প্রশংসাত্মক বাক্য উদ্ধার, ইত্যাদি কার্য হইতে ইউরোপীয়েরা যদি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকে তাহা বাক্যের দ্বারা এবং কার্যেরও দ্বারা অনুমোদনের চেষ্টা নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু ঐরূপ বিশ্বাসের উত্তরে আশ্চর্যান্বিত হওয়া স্বাভাবিক মনে হইতেছে না। চিত্তরঞ্জনবাবুর ইস্তাহার বেঙ্গল অর্ডিনান্স আইনে পরিণত হইবার এবং আইনটার প্রপূরক আর একটা আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর তিনি জারি না করিয়া বহুপূর্বে করিলে ভাল হইত এবং তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধিও সহজে হইত।'†

* *Autobiography* : Rajendra Prasad.

† প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩২

আমাদের বক্তব্য এই যে, সিরাজগঞ্জের প্রস্তাবে বাংলার বিপ্লবীদের দেশপ্রেমের প্রতি দেশবন্ধুর সহানভূতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পেলেও তাঁর রাজনৈতিক সমীচীনতা বা দূরদর্শিতা আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। এটা তাঁর ভুলই হয়েছিল। এই প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত না হলে, তাঁকে আপোস-রফার কথা চিন্তা করতে হতো না, অথবা সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি গ্রেপ্তার হতেন কিনা সন্দেহ।

গান্ধী এই ঘটনায় এতদূর বিচলিত হয়েছিলেন যে, আমেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় (২৭শে জুন, ১৯২৪) এই ডে-হত্যা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। তখন দেশবন্ধু একটি সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে আসেন ও সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে গৃহীত গোপীনাথ সাহা সম্পর্কিত মূল প্রস্তাবটি তিনি তার মধ্যে সন্নিবেশিত করে দেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখেছেন যে গান্ধীর প্রস্তাবটি নামমাত্র মেজরিটি ভোটে গৃহীত হতে পেরেছিল। এই সময়ে শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত সংবাদপত্রে দেশবন্ধুকে ভীষণভাবে আক্রমণ করা হয় ও সরকার যাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করেন সেই রকম ইঙ্গিত পর্যন্ত করা হয়। কিন্তু চতুর সরকার দেশবন্ধুকে গ্রেপ্তার না করে কিছুকালের মধ্যেই তাঁকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করলেন তাঁর দক্ষিণহস্তস্বরূপ সুভাষচন্দ্রকে ও অন্যান্যকে অতর্কিতে গ্রেপ্তার করে। সে কাহিনী পরে বলছি।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এই বৈঠকে পরিবর্তন-বিরোধীরা (No-changer) কোমর বেঁধে স্বরাজ্যদলকে পরাজিত করতে সমবেত হয়েছিলেন। এই বৈঠক স্মরণীয় হয়ে আছে গান্ধীর সঙ্গে দেশবন্ধুর বিরোধ ও পুনর্মিলনের জন্য।

সিরাজগঞ্জ সম্মিলনীর :পরে দেশবন্ধু তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে (১৯২৪) আত্মনিয়োগ করেন। লেখক এই সত্যাগ্রহে নবদ্বীপ

থেকে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগদান করে কিছুকালের জন্য হুগলী জেলে কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। তারকেশ্বরের মোহান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তিনি কুক্রিয়াশক্ত ও অনাচারী। তাঁর হাত থেকে তারকেশ্বর তীর্থের গ্লানি বিদূরিত করাই ছিল এই সত্যাগ্রহের প্রধান উদ্দেশ্য। এই আন্দোলনেও দেশবন্ধুর আহ্বানে দলে দলে সত্যাগ্রহী জেল ভর্তি করেছিল—চিত্তরঞ্জনও জেলে গিয়েছিলেন এই উপলক্ষে দ্বিতীয়বার। দেশবন্ধুর অনুরোধে শ্যামসুন্দর তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আরো একজন এই সত্যাগ্রহে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন—তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। দেশবন্ধু তাঁকেই এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রচার-সচিব নিযুক্ত করেছিলেন। এই সময়ে নজরুল-রচিত 'মোহ-অন্তের গান' প্রত্যেক সত্যাগ্রহীকে প্রেরণা জুগিয়েছিল। আন্দোলনের ফলে মোহান্ত স্বেচ্ছায় গদী পরিত্যাগ করে একটা আপোস করতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার বিরোধিতার ফলে মিটমাটের শর্তাদি কোনরূপ ফলপ্রসূ হয় নি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে শ্রীরামপুরে লর্ড লিটন তারকেশ্বর সত্যাগ্রহকে একটা বিরাট রাজনৈতিক ধাপ্পা (A colossal hoax) বলে কটাক্ষ করেছিলেন। এর উত্তরে ভবানীপুরের এক সভায় দেশবন্ধু বলেছিলেন: 'The whole of the British Empire is a colossus hoax—a big fraud in history.' লাট লিটন যে সমুচিত জবাব পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শাণিত তরবারির মতো দেশবন্ধু রসনার এই রসে নির্ভীক উত্তর প্রতিপদেই ব্রিটিশ-সিংহকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল সেদিন।

তারকেশ্বর তীর্থকে সর্বপ্রকার অত্যাচার ও অনাচার থেকে মুক্ত করার জন্য দেশবন্ধু প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন—এ কথা তিনি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন। দেশের একদল পত্র-পত্রিকা তাঁর এই কাজটাকে পরিহাস করতে দ্বিধা করে নি। তারপর

আন্দোলনের ফলে মোহান্ত সতীশ গিরির দক্ষিণ হস্ত প্রভাত গিরিকে মোহান্ত করে তাঁর সঙ্গে একটা রফা করেন দেশবন্ধু। কিন্তু পরে একদল স্বার্থান্বেষীর ষড়যন্ত্রে হাইকোর্টে এই রফা বে-আইনী বলে নির্ধারিত হয়। তখন সমস্ত আন্দোলনটা যে একটা বিরাট ধাপ্পা, এমন কঠিন মন্তব্যও কোন কোন কাগজে প্রকাশিত হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নাগপুর কংগ্রেসের পর থেকে তাঁর প্রত্যেকটি রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও উক্তি সম্পর্কে কলকাতার প্রায় প্রত্যেকটি পত্র-পত্রিকা বিরুদ্ধ সমালোচনায় মুখর ছিল। বিশিষ্ট সাংবাদিক হেমচন্দ্র নাগ মহাশয়ের (ইনি স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে জাতীয়তাবাদী বহু পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন; দেশবন্ধুর 'ফরওয়ার্ড' কাগজের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন।) কাছে শুনেছি যে, যেহেতু সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশবন্ধু দেশের কাজে নেমেছিলেন এবং কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের অর্থে ও সামর্থ্যে আন্দোলনের পর আন্দোলন পরিচালনা করেছেন, সেইজন্য কলকাতার প্রায় দৈনিক পত্র প্রবলভাবে তাঁর বিরোধিতা করত। পত্র-পত্রিকার নিন্দা-গ্লানি ও কঠিন সমালোচনা তাঁর শিরে যত বর্ষিত হয়েছিল এমন আর কোন নেতার ক্ষেত্রে (একমাত্র ব্যতিক্রম—সুরেন্দ্রনাথ) আর দেখা যায় নি। নিন্দার শরশয্যাই ছিল এঁদের বিধিলিপি।

বাংলায় দ্বৈতশাসন অচল করে, তারকেশ্বরের মোহান্তের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ চালিয়ে ও কলকাতার পৌরসভা দখল করে স্বরাজ্যদলের প্রভাব ও শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। দেশের জনসাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি তাই তখন নিবদ্ধ ছিল এই দল ও এর নেতার কার্যকলাপের উপর। বলতে গেলে সমস্ত বাংলা তখন দেশবন্ধুর করতলগত। নেতৃত্বের এমন মহিমান্বিত উদ্ভাসন, এমন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ বাংলাদেশে আর কখনো দেখা যায় নি। ঠিক সেই সময়ে,

১৯২৪ সালের গোড়ায়, ফরিদপুর জেলায় মাদারিপুর সাব-ডিভিসনের অন্তর্গত চরমানিয়ার নামক একটি স্থান থেকে পুলিশী অত্যাচারের ভয়াবহ সংবাদ এলো। কয়েকজন স্থানীয় পুলিশ কর্মচারী মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে এবং এর জন্য পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার ফলে স্থানীয় স্বরাজ্যদলের একজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয় ও তার বিরুদ্ধে মামলা আনা হয়। ঐ বছরের নভেম্বর মাসে ঢাকার পুলিশ দরবারে লর্ড লিটন এই ঘটনায় পুলিশকে সমর্থন করে বলেন যে, চর মানিয়ারের সমস্ত ঘটনাই মিথ্যা ও পুলিশকে অপবাদ দেওয়ার জন্যই মেয়েরা তাদের শ্লীলতাহানির কাল্পনিক অভিযোগ উত্থাপন করেছে।

এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে ব্যুরোক্রেসিকে আক্রমণ করার একটা সুযোগ পেলেন দেশবন্ধু। সুযোগ পেলেন স্বরাজ্যদলের পক্ষ থেকে দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলন করবার। লর্ড লিটনের কুৎসিত ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে টাউন হলে একটা বিরাট প্রতিবাদ-সভা হলো। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক এই সভায় সমবেত হয়েছিল। হলের মধ্যে অত লোকের স্থান সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব নয়। ফলে সিঁড়িতে, ময়দানে ছোটোখাটো ছয়টি প্রতিবাদ-সভা হয়। এই প্রতিবাদ-সভার ফলে লর্ড লিটনকে ক্ষমা চাইতে ও কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল। স্বরাজ্যদলের এইটাই ছিল শ্রেষ্ঠ জয়লাভ। দলপতিরও।

॥ পঁচিশ ॥

গোপীনাথ সাহার ঘটনা দেশবন্ধুকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

ভাবিয়ে তুলেছিল বাংলা-সরকারকে।

অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াসে একটা সাময়িক বিরতি এসেছিল। নাগপুর কংগ্রেসের পর যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপ্লবী প্রধানগণ সকলেই দেশবন্ধুর অনুরোধে এই আন্দোলনে যোগদান করেন, এ কথা আগেই বলেছি। কিন্তু আন্দোলন যখন স্তিমিত হলো, গান্ধীর ছয় বছর কারাদণ্ড হলো, তখন বাংলার বিপ্লবীরা আবার তাদের পুরাতন কর্মপন্থা অবলম্বন করার কথা চিন্তা করতে থাকেন। পুলিশ-কমিশনার স্যার চার্লস্ টেগার্ট ছিলেন বিপ্লবীদের পয়লা নম্বরের শত্রু—প্রতিশোধের লক্ষ্য। অনেকবার চেষ্টা করেও টেগার্টকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। কথিত আছে, বালেশ্বর সংগ্রামে নিহত হওয়ার পূর্বে বিপ্লবীনায়ক যতীন মুখার্জী তার সহকর্মীদের উদ্দেশে এই মর্মে একটি নির্দেশ রেখে যান যে, টেগার্টকে যেন গুলি করে মারা হয়। বিপ্লবীরা নেতার সে নির্দেশ বিস্মৃত হয় নি। অবশেষে ১৯২৪ সালে বিপ্লবীরা যখন নব-পর্যায়ে তাদের বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াস শুরু করে তখন সর্বপ্রথম টেগার্টকে মারবার জন্য গোপীনাথ সাহা নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এই ঘটনার পর থেকে দেশবন্ধু বুঝলেন যে, বাংলায় বিপ্লব আন্দোলন স্তিমিত হয় নি, আবার মাথা চাড়া দেওয়ার চেষ্টা করছে। বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ছিল দীর্ঘকালের যোগ। তাই এই সময়ে প্রকাশ্য সভায় দুই-একটি বক্তৃতায় তিনি জনসাধারণের কাছে সে কথা স্বীকার করলেন এবং বললেন যে, বিপ্লবীদের কার্যকলাপ তাঁর অগোচরে নেই। আরো বললেন যে, এজন্য দায়ী আমলাতান্ত্রিক

স্বৈরাচার। গান্ধীর সঙ্গে এই বিষয়ে তাঁর পার্থক্য ছিল এই যে, বিপ্লবীদের মত বা পথের সমর্থন করতে না পারলেও, তাদের দেশপ্রেমকে তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অকুণ্ঠিতচিত্তে, আর তাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে দিয়েছেন স্বীকৃতি। দীর্ঘকাল যাবৎ অর্থাৎ সেই ১৯০৭ সাল থেকে তিনি এদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে আসছেন। তাই বাংলায় বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াসের আন্তরিকতা সম্বন্ধে তাঁর মনে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এদের অনেককেই তিনি গোপনে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন। বাংলার বিপ্লবীরা তাই দেশবন্ধুকে যারপরনাই শ্রদ্ধা করত, বিশ্বাস করত। কবি মিথ্যা বলেন নি :

আজ দিকে দিকে বিপ্লব-অহিদল খুঁজে ফেরে ডেরা,
তুমি ছিলে এই নাগশিশুদের ফণী-মনসার বেড়া।
তুমি দেখেছিলে ফাঁসির গোপীতে বাঁশীর গোপীমোহন
রক্ত-যমুনাকূলে রচে গেলে প্রেমের বৃন্দাবন।
তোমার ভগ্ন চাকায় জড়ায়ে চালায়েছে এরা রথ,
আপন মাথার মাণিক জ্বালায়ে দেখায়েছে রাতে পথ ;
আজ পথহারা আশ্রয়হীন তাহারা যে মরে ঘুরে,
গুহামুখে বসি ডাকিছে সাপুড়ে মারণ-মন্ত্র সুরে।*

১৬ই আগষ্ট কলকাতায় নিখিল ভারত স্বরাজ্যদলের কন্‌ফারেন্স হলো। দলের সমস্ত বিশিষ্ট নেতৃবর্গ এই সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। তখন দেশে স্বরাজ্যদলের কার্যকলাপ নিয়ে তুমুল সমালোচনা আরম্ভ হয়েছে। তাই এই সম্মিলনীতে বিরুদ্ধ-বাদীদের সমালোচনার উত্তরে দেশবন্ধু বলেছিলেন : 'I appeal to you ; stand fast by the principle which the Swarajists have put forward before the country. We will act, but give us breathing time. Do not overwhelm us with criticisms and questions. I

* চিত্তনামা : নজরুল

have thought and thought about it for the last twenty years of my life and now I have devoted the rest of my life to the cause of my country. Believe in me and I tell you, God willing, I shall not die before I have accomplished my object.'

এই আর্তি, এই আকুলতা আর এই আন্তরিকতাই ছিল দেশবন্ধুর নেতৃত্বের প্রেক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

এই সময়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবেশ খুবই উত্তপ্ত ছিল। আমেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকের পর গান্ধী দেশের পরিস্থিতি নতুন করে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। দিল্লী, সাহাজাহানপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, জামালপুর ও নাগপুর প্রভৃতি স্থানে যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধল তা গান্ধীকে যুগপৎ বিস্মিত ও ব্যথিত করল। দাঙ্গা মারাত্মকভাবে দেখা দিল মালাবারে মোপলা জেলায় যেখান থেকে চার হাজার লোক প্রাণভয়ে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলতে আসতে বাধ্য হয়েছিল। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণগুলি তদন্ত করবার জন্য গান্ধী ও সৌকত আলিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। তদন্তের ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটল। একজন বললেন এই দাঙ্গাহাঙ্গামার সকল দায়িত্ব হিন্দুদের আর অপরজন ঠিক এর বিপরীত অভিমত প্রকাশ করলেন। সৌকত আলি ১৯১৯ সাল থেকে গান্ধীর অনুরাগী ও সহকর্মী ছিলেন, কিন্তু আজ যখন গান্ধী তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারলেন না, তখন তিনিই প্রকাশ্যে গান্ধী-নেতৃত্বের নিন্দা করতে আরম্ভ করলেন।

এই পরিবেশেই গান্ধী ব্যথিত চিত্তে একুশ দিন অনশন করবার সংকল্প ঘোষণা করেন। এর ফলেই দিল্লীতে ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি বৈঠক বসে, কয়েকজন ইংরেজও এই বৈঠকে যোগদান করেন। এই বৈঠকই 'ঐক্য সম্মিলন' (Unity Conference)

নামে পরিচিত। এই বৈঠকের আলোচনায় দেশবন্ধু প্রধান স্থান গ্রহণ করেছিলেন। এই বৈঠকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত নতুন পর্যায়ে হিন্দু-মুসলিম চুক্তির নামান্তর মাত্র ছিল। এই বৈঠক শেষ হয়ে যাওয়ার পর দেশবন্ধু বায়ু-পরিবর্তনের জন্য দিল্লী থেকেই সিমলা চলে যান। তখন তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা অনেকের কাছেই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৯২৪, ২৫শে অক্টোবর।

বাংলা-সরকার অর্ডিন্যান্স আইন জারী করে পৌরসভার প্রধান কর্মকর্তা সুভাষচন্দ্রকে অতর্কিতে গ্রেপ্তার করলেন।

গোপীনাথ সাহার ঘটনার পর বাংলায় সন্ত্রাসবাদের পুনরাবির্ভাব দেখে সরকার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বড়লাটের অনুমতি নিয়ে সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করলেন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য। আসলে সরকার চেয়েছিলেন দেশবন্ধুর প্রাধান্যকে খর্ব করতে। পূর্বোল্লিখিত সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে গৃহীত গোপীনাথ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি সেই সুযোগ এনে দিল। প্রথম দফায় অর্ডিন্যান্সের বেড়াজালে আটক হল প্রায় আশিজন তরুণ; যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন স্বরাজ্যদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এঁদের বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ ব্যতীত এবং বিনা বিচারেই এঁদের অন্তরীণাবদ্ধ করা হয়। সরকারের সন্দেহ এঁরা বৈপ্লবিক কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।* এই ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন ছিলেন দেশবন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং এই তিনজনই ছিলেন তাঁর স্বরাজ্যদলের প্রধান সহকর্মী। সেই তিনজনের মধ্যেই সুভাষচন্দ্র ছিলেন অন্যতম।

* ১৯২৫ সালের শেষভাগে অর্ডিন্যান্স আইনে ধৃত ও আটক বন্দীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় দুইশতে।

সিমলা শৈলশিখরে বসে দেশবন্ধু যখন এই সংবাদ পেলেন তখন তিনি বুঝলেন যে, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দেশে তাঁর এবং স্বরাজ্য-দলের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের প্রতিই এই আঘাত হানা হয়েছে। তিনি আইনসভায় দ্বৈতশাসন অচল করে দিয়েছেন, এজন্য তাঁর উপর সরকারের কম আক্রোশ ছিল না। তিনি তাঁর কর্তব্য স্থির করলেন—এই স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে তিনি অবিলম্বে শুরু করলেন প্রচণ্ড সংগ্রাম এবং সরকারের নিষ্ঠুর সন্দেহ থেকে তাঁর সহকর্মীদের রক্ষা করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। অবিলম্বে তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেন :

কলকাতায় ফিরেই প্রথমে তিনি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তারপরে পৌরসভার একটি জরুরী সভায় এর প্রধান কর্মকর্তার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করে মেয়রের চেয়ার থেকে তিনি যে দৃপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন তা যেন কালের প্রাস্তর অতিক্রম করে আজো আমাদের কানে প্রতিধ্বনিত হয়। সেদিন তিনি বলেছিলেন :

'অত্যাচারই অত্যাচারের সৃষ্টি করে। ১৯০৭ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের এই অত্যাচার চলেছে—আইনের অত্যাচার চলে আসছে। এইসব অত্যাচারের ফলেই এই দেশে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে, তার পুনরুক্তি আমি আবার করছি। আমি আগেও বলেছি এবং এখন আবার বলছি এইদেশে বিপ্লববাদমূলক অপরাধ আছে অর্থাৎ বিপ্লববাদীর দল আছে। ১৯১৭ সালে আমি এই কথা বলেছিলাম। দেশে বিপ্লববাদীর দল আছে বলে আমি যে স্বীকারোক্তি করেছিলাম আমার সেই উক্তি উদ্ধৃত করতে সরকার কখনো ক্লান্ত হন নি। তারপরেও আমি বার বার সেই স্বীকারোক্তি করেছি। আজো আমি তা স্বীকার করছি এবং যা আমি সত্য বলে মনে বিশ্বাস করি তা স্বীকার করতে আমি কখনো প্রতিনিবৃত্ত হব না। কিন্তু এর প্রতিকারের আমি যে যুক্তি দিয়েছিলাম, সরকার কি কখনো সেই বিষয়ের বিবেচনা করেছেন? তাঁরা কি কখনো এই বিষয়ে মন দিয়েছেন? পীড়ন-নীতির ফল ভাল হয় তার প্রমাণ পৃথিবীর ইতিহাসেই রয়েছে। সেই প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও

আমরা কি পীড়ন-নীতি ব্যতীত আর কিছু বিষয়ের বিবেচনা করতে অসমর্থ? তাঁরা কি পীড়ন ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করতে পারেন না? আমি তাঁদের আবার বলছি দমননীতির বহর যতই হোক না কেন এই বিপ্লববাদমূলক আন্দোলনকে কখনো রোধ করতে পারবে না। পৃথিবীর বুক থেকে সরকার একটা জাতিকে ধ্বংস করতে পারে না। যারা স্বাধীনতালাভের প্রয়াসী তাদের রোধ করে রাখতে পারে না।'

'আজ এইখানে দাঁড়িয়ে আমি এই দাবী করছি যে, আমার স্বাধীনতার জন্য যদি আমার জীবনপাত করাও দরকার হয়, আমি তা করতেও প্রস্তুত আছি। বিপ্লববাদমূলক আন্দোলনে যদি আমার বিশ্বাস থাকত, যদি আমি বিশ্বাস করতাম যে এই আন্দোলন সফল হবে, তাহলে আমি এই আন্দোলনে যোগ দিতাম। ইহা সফল হবে বলে যদি আমার মনে বিশ্বাস হয়, তাহলে আগামী কালই ইহাতে আমার যোগ দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, বিপ্লববাদমূলক আন্দোলনে সাফল্য আসবে না এবং সেইজন্যই আমি ইহাতে যোগ দিই নি।......এ দেশের প্রত্যেক সৎব্যক্তিই ইহা বলতে বাধ্য যে —আমার দেশকে ভালবাসি, আমি আমার স্বাধীনতাকে ভালবাসি, আমার নিজের ব্যাপারের ব্যবস্থা করবার, আমার নিজের দেশকে শাসন করবার জন্মগত অধিকার আমার আছে। যদি তা অপরাধ হয়, তবে সেই অপরাধের অভিযোগে আমি অপরাধী। যদি তা অপরাধ হয়, তবে সেই কর্তব্য পরিহার করার চেয়ে আমি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতেও ইচ্ছুক। কারণ আমি মনে করি বর্তমান সময়ে প্রত্যেক ভারতবাসীরই তা একমাত্র কর্তব্য।'

'মোট কথা আমি ইহাই বলতে চাই যে, সুভাষ আমার চেয়ে অধিকতর বিপ্লবী নয়। ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করে নি কেন? আমি জানতে চাই কেন? যদি দেশকে ভালবাসা অপরাধ হয়, তাহলে আমি একজন অপরাধী। সুভাষ যদি অপরাধী হয়, তাহলে আমিও একজন অপরাধী। কেবলমাত্র এই পৌরসভার প্রধান কর্মকর্তা নয়, এর মেয়রও সমানভাবে অপরাধী। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করবার জন্যই অর্ডিন্যান্সের এই খড়্গ উত্তোলিত হয়েছে। তিন আইনে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা আমলাতন্ত্রের পক্ষে নিছক পাশবিক শক্তির পরিচয়।'

এই অগ্নিক্ষরা বক্তৃতাটি পাঠ করলে মনে হবে, যে বক্তার

হৃদয়-বীণার তারে শুধু একটি সুরই বাজত—স্বাধীনতা। সেই আলিপুর বোমার মামলায় বন্ধু অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনের সময় থেকে দেশবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু যেন হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতার জন্য অকুণ্ঠ দাবী। ভারতের আর কোন নেতার কণ্ঠে এই দাবী এমন বলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত হয় নি যেমন হয়েছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দাশের কণ্ঠে। তেমনি সরকারের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে নির্ভীকভাবে তাদের স্বৈরাচারী আইনের—যে আইনকে তিনি 'Lawless Law' আখ্যা দিয়েছিলেন—কঠোর সমালোচনা করতে সেদিন ভারতবর্ষে দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না। দেশবন্ধু ভিন্ন সেদিন আর কে ছিলেন যিনি এই কথা বলতে পারতেন: 'To be taken and kept in custody for an indefinite period of time, without being told what evidence there is and without being brought to justice according to the law of the land, is a denial of the primary right of humanity. This is 'Lawless Law, Laws such as these were enacted in England in the days of the Stuart tyranny.' সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন সম্পর্কে দেশবন্ধুর সুস্পষ্ট অভিমত তাঁর এই বক্তৃতাটির মধ্যেই পাওয়া যায়।

কলকাতায় ফিরে দেশবন্ধু ব্যুরোক্রেসির এই নতুন আক্রমণের কথা জানিয়ে তারবার্তা পাঠালেন গান্ধী, মতিলাল, সরোজিনী নাইডু ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কাছে। সমস্ত বিশিষ্ট নেতা চলে এলেন কলকাতায় এবং ভারতের সর্বত্র সরকারের এই দমনমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ উঠল। বাংলাদেশেই অবশ্য এর প্রতিক্রিয়া প্রচণ্ডরূপ ধারণ করেছিল—বাঙালী গর্জে উঠল এর বিরুদ্ধে। এই সরকারী দমননীতির প্রতিবাদ জানাবার জন্য ৩১শে অক্টোবর ১৯২৪, কলকাতায় দেড়লক্ষ লোকের সমাবেশে এক বিরাট সভা হলো। মহানগরীতে সেই সময়ে এমন মহতী সভা আর হয় নি।

গান্ধী, মতিলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই কলকাতায় এসে দেশবন্ধুর সঙ্গে মিলিত হলেন। এইবার বাংলাদেশে এসে গান্ধী উপলব্ধি করলেন যে, প্রথমে আইনসভা ও পৌরসভার স্বরাজ্যদলের সাফল্যের জন্যই সরকার এইরকম দমননীতির আশ্রয় নিয়েছেন। দলের শ্রেষ্ঠ কর্মীদের বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করে সরকার যেন স্বরাজ্যদলের কার্যসূচী ব্যাহত করে দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন।

এইবার দেশের নেতারা বুঝলেন যে, বর্তমানের অগ্নিগর্ভ পরিবেশে তাঁদের মতদ্বৈধ ঘুচিয়ে, সংগ্রামের জন্য সর্ববাদীসম্মত একটি কার্যসূচী রচনা করা আশু প্রয়োজন। তখন গান্ধী, মতিলাল ও দেশবন্ধু তিনজন মিলে একটি যুগ্ম বিবৃতি প্রচার করলেন। তাতে বাংলা ও কেন্দ্রে স্বরাজ্যদলের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে সুস্পষ্ট-ভাবে বলা হলো যে, এখন থেকে স্বরাজ্যদলের অনুসৃত কার্যসূচীই হবে কংগ্রেসের প্রধান কার্যসূচী। এতদিন বাদে গান্ধী তাঁর মতের পরিবর্তন করলেন—বর্জন করলেন আইনসভা, বয়কটের নীতি এবং কাউন্সিল-প্রবেশকে কংগ্রেসের একমাত্র রাজনৈতিক কার্যসূচী বলে স্বীকার করলেন। ২৩শে নভেম্বর বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে নেতৃত্রয়ের প্রচারিত যুগ্ম বিবৃতি সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত হলো। এতদিনে দেশবন্ধু সমস্ত ভারতবর্ষকে তাঁর স্বমতে নিয়ে আসতে সমর্থ হলেন। এইবার যেন তাঁরই চূড়ান্ত জয় বিঘোষিত হলো।

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। গান্ধী কেন আইন-সভায় প্রবেশের বিরোধী ছিলেন? কারণ তিনি পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন না। ইংলণ্ডে ছাত্রাবস্থায় আইন অধ্যয়নের সময় তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাজে আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। তাঁর 'হিন্দ্ স্বরাজ' গ্রন্থে তিনি বেশ কঠিন ভাষায়

এই সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন দেখা যায়।* পরবর্তীকালে তাঁর কারামুক্তির পর দেশবন্ধু ও মতিলালের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর তিনি যখন আইনসভায় প্রবেশের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করলেন তখন পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের উপযোগিতা সম্পর্কে তাঁর মনে আর কোন দ্বিধা বা সংশয় ছিল না। তাই এই ঘটনার বহুকাল বাদে তিনি অকপটে লিখেছিলেন : 'The labours of Deshbandhu and Matilal Nehru had opened my eyes that the parliamentary programme had a place in the national activity for independence.'† তার আগে তিনি লিখেছিলেন : 'Legislatures should be entered not to offer co-operation but to demand co-operation.' এবং তিনি গান্ধী সেবাসংঘের সদস্যদের বিধানসভায় এই মনোভাব নিয়ে প্রবেশ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, গান্ধীর চেয়ে দেশবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা বেশি ছিল। পরিষদীয় কাজে কংগ্রেসকে যে ভবিষ্যতে যোগদান করতে হবে এবং কংগ্রেসের যে একটি পরিষদীয় বিভাগ (Parliamentary wing) প্রয়োজন হবে, এই চিন্তা করেই তো দেশবন্ধু সেদিন কাউন্সিল-প্রবেশ নীতি অবলম্বন করেছিলেন।

৪ঠা নভেম্বর বৈকালে দেশবন্ধুর ভবনে নেতৃবৃন্দের যে বৈঠক হয়, তাতে স্থির হয় যে, ১। অসহযোগ আন্দোলন আপাততঃ স্থগিত থাকবে ; ২। খদ্দর পরিধান ও বিদেশী বস্ত্র বর্জন কংগ্রেসের মুখ্য কার্যসূচীরূপে পরিগণিত হবে ; ৩। প্রতি মাসে ২০০০ গজ চরকার সুতো দিয়ে (নিজের কাটা অথবা অপরের কাটা) কংগ্রেসের সভ্য হতে হবে এবং ৪। স্বরাজ্যদলের কার্য কংগ্রেসের অন্তর্গত কার্য বলে পরিগণিত হবে, কিন্তু এই কার্য পরিচালন ও অর্থসংগ্রহের জন্য

* *Mahatma Gandhi :* Tendulkar

† *Harijan*, 28.7.46, *Harijan*, 1.5.37.

স্বরাজ্য দলই দায়ী হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, স্বরাজ্যদলের সঙ্গে এইভাবে আপোষ করার জন্য কংগ্রেসের দক্ষিণ-পন্থী নেতারা অর্থাৎ নো-চেঞ্জারগণ গান্ধীর প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন এবং তাঁদের অনেকেই তাঁর এই কাজের বিরোধিতা করেছিলেন। গান্ধী কিন্তু স্বরাজ্য-দলকেই আঁকড়ে ধরে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।*

অতঃপর দেশবন্ধুকে আমরা দেখতে পাই গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে। 'বাংলার কথায়' বাংলার অবহেলিত গ্রামগুলির পুনরুজ্জীবন ও সংগঠনের যে চিন্তা ও পরিকল্পনা ছিল, আজ আট বছর পরে, দেশবন্ধুর কণ্ঠে ঠিক সেই জিনিস শোনা গেল। এই সময়ে তিনি যে আবেদনটি প্রচার করেছিলেন সেটি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। সেই বিবৃতিতে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহটি কলকাতায় ও হাওড়ায় 'স্বরাজ্য-সপ্তাহ' হিসাবে প্রতিপালিত হওয়ার কথা ছিল। এই সময়ের মধ্যে দেশের সর্বত্র সভা-সমিতি হবে, সেই সভায় জনসাধারণকে দেশের বর্তমান অবস্থা বুঝিয়ে দিতে হবে, দমনমূলক আইনের প্রতিবাদ করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবকেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করবে। এই বিবৃতির শেষভাগে এই কথাটি ছিল: 'I appeal to you to work in the villages where, as I have always believed, lies our salvation.' এই কথার মধ্যে আমরা কি পল্লী-দরদী দেশবন্ধুকে দেখতে পাই না?

দেশবন্ধু বরাবর পল্লীসংগঠনের কাজের উপর বিশেষ জোর দিতেন। ১৯১৭-তে ভবানীপুরের বক্তৃতায় পল্লীবাংলার কথা বিশেষভাবেই উল্লিখিত ছিল। তিনি মনে করতেন যদি পল্লীসংগঠন না হয়, দরিদ্র কৃষকের ও ছুতোর, কামারের যদি বারোমাসই দুঃখকষ্টে কাটে, গ্রাম যদি ম্যালেরিয়ায় উচ্ছন্ন হয়, যদি গ্রামীণ সমাজের সংহতি,—একতা, স্নেহ, প্রেম—শিথিল হয়ে যায় তবে কাকে নিয়ে কাজ করবেন, কোথায় বা কাজ করবেন?

* *Autobiography :* Nehru ও Prasad

এই দুঃসাধ্য সাধনের জন্য তিনি তিন লক্ষ টাকা চেয়েছিলেন। ১লা ডিসেম্বর থেকে সাত দিনের জন্য 'স্বরাজ্য-সপ্তাহ' নাম দিয়ে এই কাজে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু সেদিন তিনি এই মহাব্রত সাধনের জন্য উপযুক্ত কর্মীর অভাব বোধ করলেন। সুভাষ কাছে নেই, সত্যেন, অনিলবরণ নির্বাসিত, শাসমল অনুপস্থিত, সাতকড়ি অসুস্থ। অন্যান্য কর্মীরাও বড় কেউ কাছে আসে নি। একমাত্র প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় তাঁর এই কাজে সহায়ক ছিলেন। গোটা ডিসেম্বরটাই তিনি টাকা তোলার কাজে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন—অলিতে-গলিতে সভা করে, দোকানে দোকানে ও বাড়ি বাড়ি ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে মাত্র লাখখানিক টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। এই একমাসের পরিশ্রমে তাঁর শরীর একেবারেই ভেঙে যায়। এই অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে এই সময়ে একদিন সকালে কলকাতার এক প্রখ্যাত ধনীর বাড়িতে গিয়েছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্রের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এজন্য দুইঘণ্টাকাল তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল, অথচ তিনি বিন্দুমাত্র ধৈর্যচ্যুত হন নি।*

এই স্বরাজ্য-সপ্তাহে হাওড়ায় একস্থানে দেশবন্ধু বলেছিলেন :

'আজ জীবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমি স্থির বুঝেছি পল্লীসমাজই ভারতের জীবন, পল্লীসংগঠনেই ভারতের মুক্তি। আজ আমি কপর্দকহীন, আমার টাকা থাকলে বা আমি যদি প্র্যাকটিস্ করতাম তাহলে সামান্য টাকার জন্য আপনাদের দ্বারস্থ হতাম না।...আপনারা যদি সকলে মিলে এই ভার বহন না করেন আমি একা কি করতে পারি? ব্যবসা না ছাড়লে আমিই সমস্ত অর্থ দিতে পারতাম, কিন্তু আজ আমি দরিদ্র, অক্ষম, কপর্দকহীন। আমি তো নিজের জন্য ভিক্ষাঝুলি নিয়ে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইনি। আমি চাই ভারতের মুক্তির জন্য আমাদের প্রদেয় শুল্ক।

আজ এই সুদূরকালের ব্যবধানে, আমরা যখন এই কথাগুলি স্মরণ করি, তখন বুঝতে পারি, কি বেদনা ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়ে

* মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ, ১৩৩২

সেদিন তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছিল। আজ তাই মনে হয়, সেদিন দেশবন্ধু যখন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে তাঁর স্বজাতির সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখন আমরা সে-ই ভিখারীকে ঠিকমতো ভিক্ষা দিতে পারি নি, তাঁকে সম্মান প্রদর্শন তো দূরের কথা। কবি তাই সখেদে বলেছেন :

'দেহি ভবতি ভিকষাম্ বলি দাঁড়ালে রাজ-ভিখারী
খুলিল না দ্বার, পেলে না ভিক্ষা, দ্বারে দ্বারে ভয় দ্বারী।
বলিলে, 'দেবে না ? লহ তবে দান—
ভিক্ষাপূর্ণ আমার এ প্রাণ'
দিল না ভিক্ষা, নিল নাক দান ; ফিরিয়া চলিলে যোগী !
যে জীবন কেহ লইল না তাহা মৃত্যু লইল মাগি।*

এই সময়ে স্বরাজ্যদল কিছুটা ছত্রভঙ্গ ও ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছিল। প্রধান কর্মীগণ সবাই তখন কারান্তরালে, বাইরে কাজের লোক তেমন ছিল না, অর্থের অভাব তো ছিলই। কথিত আছে, দেশবন্ধু তাঁর সহকর্মীদের প্রায়ই বলতেন, 'কাজ তো আমার একার নয়।' হায়, চির-বিদ্রোহি ! স্বাধীনতা-যজ্ঞে অমনভাবে সর্বস্ব অর্পণ করেও তোমার পক্ষে স্বজাতির অন্তরে সেই চেতনা জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয় নি যার ফলে দলে দলে লোক এসে তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করবে। কাজ তোমার একারই ছিল—এই সত্যটা বোধ করি তোমার স্বদেশবাসী তোমাকে অকালে হারিয়ে বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরেছিল—ভিতরের আগুন আর বাইরের কর্মভার তোমার অকাল-মৃত্যুর কারণ ছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ তাঁর প্রিয় সহকর্মিবৃন্দ যখন আচম্বিতে অর্ডিন্যান্স আইনে গ্রেপ্তার হন তখন দেশবন্ধুর স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল ছিল না এবং স্বাস্থ্যলাভের জন্যই তিনি তখন সিমলায় গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যবিধাতা বুঝি তাঁর ভাগ্যে বিশ্রাম সুখ লেখেন নি ; তাই সম্পূর্ণ অবকাশ যাপনের পূর্বেই

চিত্তনামা : নজরুল

তাঁকে কলকাতায় ফিরতে হয়। আর ফিরে এসেই তিন সপ্তাহকাল ধরে স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্য একলক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে আহার-নিদ্রা-বিশ্রাম ভুলে তাঁকে যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয় তার ফলে তিনি গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই অসুস্থ শরীর নিয়েই তিনি বেলগাঁও কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। সেই তাঁর শেষ-বারের মতো জাতীয় মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান।

১৯২৪, ডিসেম্বর।

বেলগাঁওতে কংগ্রেসের ৩৯তম অধিবেশন।

সভাপতি—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

অমৃতসর কংগ্রেস থেকে যে মানুষটিকে ভারতবাসী কংগ্রেসের কাণ্ডারী হিসাবে পেয়েছিল, যিনি কংগ্রেসের প্রকৃত অধিনায়ক, সেই গান্ধী যে কখনো কংগ্রেসের বাষিক অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হবেন, এটা অনেকেরই চিন্তার বাইরে ছিল জওহরলাল তাই লিখেছেন: 'In December 1924 the Congress session was held at Belgaun, and Gandhiji was President. For him to become the Congress President was something in the nature of anticlimex, for he had long been the permanent super-president.'* এই কংগ্রেসেও দেশবন্ধুর জয়লাভ হয়। গান্ধী ও তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ পুনর্মিলন ঘটল এই সময়ে। দেশবন্ধু জানতেন গান্ধীর কারামুক্তির পর ইহা প্রত্যাশিত ছিল।

বেলগাঁও কংগ্রেসে শেষবারের মতো দেশবন্ধু বলেন: 'The bureaucracy expected a feast of quarrels al Belgaun but Mahatma has disappointed it. I fully believe in constructive programme···Council work is not the permanent point of activity with the Swarajists.'

**An Autobiography*: Nehru

কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই আইনসভা দখল করা কংগ্রেসের সর্বপ্রধান রাজনৈতিক কার্যসূচী বলে গৃহীত হয়। এইভাবে দেখা যায় যে, ১৯২৪ সালটি যখন শেষ হয় তখন দেশের রাজনীতিতে স্বরাজ্যদলের অক্ষুণ্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর তখন স্বরাজ্যদল এবং কংগ্রেস এক ও অভিন্ন হয়ে উঠেছে। আর সেই স্বরাজ্যদলের দলপতি হিসাবে দেশবন্ধু অপ্রতিহত প্রভাবের সঙ্গে তাঁর নেতৃত্বের রাজদণ্ড পরিচালনা করতে থাকেন।

১৯২৪ সাল শেষ হয়ে আরম্ভ হয় ১৯২৫।

দেশবন্ধুর জীবনের সর্বশেষ বৎসর।

বেলগাঁও থেকে জ্বর নিয়ে ফিরলেন তিনি। চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করে বলেন বিলিয়াম কলিক। সেই অবস্থায় বিছানা থেকে ওঠা নিষেধ। কিন্তু আইনসভায় বেঙ্গল অর্ডিনান্স সম্পর্কিত বিল (Ordinance Bill) সরকার পক্ষ থেকে উত্থাপিত হওয়ার আয়োজন চলছিল। ১৯২৪ সালে গভর্ণর-জেনারেল যে অর্ডিনান্স জারি করেছিলেন, তা বাংলা-সরকারের হাতে কাউকে বিনা কারণে গ্রেপ্তার ও বিনাবিচারে কারারুদ্ধ রাখার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়েছিল। তখন থেকেই এই প্রদেশে প্রকৃতপক্ষে অর্ডিনান্সের শাসন চলছিল। ১৯২৫-এর এপ্রিল মাসে তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কথা। তাই সরকার পক্ষ থেকে ঐ ক্ষমতা বজায় রাখার জন্যে নেপথ্যে উদ্যোগ আয়োজন চলছিল—তাঁরা আইনসভায় আলোচনার জন্য অর্ডিনান্স বিল নামে একটি বিলের খসড়া প্রস্তুত করেন। এই বিলের মধ্যে রৌলট বিলের প্রধান প্রধান ধারাগুলি সন্নিবিষ্ট হয়। স্বরাজ্যপার্টির ক্ষমতা খেপ করা ও বিপ্লববাদ দমন—এই দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই বিল রচিত হয়। আইনসভায় যাতে এই বিলটি পাস হয় সেজন্য সরকার তাদের সমস্ত ক্ষমতা নিয়োগ করলেন। স্বরাজীরা কাউন্সিলে ওন মাইনরিটি বললেই হয়, এমন অবস্থায় সরকারের

আশা ছিল যে, বিলটি আইনসভায় উত্থাপিত হলে সহজে ও বিনা বাধায় পাস করিয়ে নেওয়া অসম্ভব হবে না।

রোগশয্যায় শুয়ে দেশবন্ধু যখন এই সংবাদ পেলেন, তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ৭ই জানুয়ারি সকালে তাঁর রোগশয্যা থেকেই তিনি ঘোষণা করলেন : 'The Black Bill is coming up for discussion. I must attend at any cost and oppose it.' সর্বনাশ, শরীরের এই অবস্থায় তিনি কাউন্সিলে যাবেন কি করে! সবাই উদ্বিগ্ন হয়, নিষেধ করে। তিনি বলেন, 'তোমরা বুঝতে পারছ না ওরা আমাকে মারবার জন্যই অর্ডিনান্স জারি করেছিল আর সেই একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে ওরা এই বিল নিয়ে আসছে। আমার ছেলেরা সব বিনা বিচারে আটক রয়েছে, তাদের আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যেমন করে পারি জেল থেকে তাদের বের করে নিয়ে আসব। আমাকে তোমরা নিষেধ করো না।'

নেতা একেই বলে। বস্তুত সুভাষচন্দ্র প্রমুখ তরুণদের গ্রেপ্তারের পর থেকে দেশবন্ধু এতদূর বিচলিত হয়েছিলেন যে ভাষায় তা প্রকাশ করবার নয়, তা শুধু আমাদের অনুভূতিসাপেক্ষ। পাটনা থেকে সুভাষচন্দ্রকে তিনি যে সর্বশেষ চিঠিখানি লিখেছিলেন সেটি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। সুভাষচন্দ্রের কাছে এই পত্রখানি দেশবন্ধুর অমূল্য শেষ স্মৃতিচিহ্নরূপে পরিগণিত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, 'তাঁহার সহকর্মী ও অনুচরদের গ্রেপ্তারের পর তিনি যেরূপ যন্ত্রণায় কালক্ষেপ করিতেছিলেন তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন সেই পত্রে ছিল। সে যন্ত্রণা যে কত তীব্র তা শুধু তিনি বুঝিতে পারেন যিনি দেশবন্ধুর প্রাণের পরিচয় পাইয়াছেন।' ঘুরে ফিরে সেই প্রাণের কথাটা আসে। তাঁর বাইরের সম্পদ তো লোকচক্ষুর গোচরে ছিল, কিন্তু এই যে তাঁর অন্তরের সম্পদ—সহানুভূতি ও সহৃদয়তায় অভিসিঞ্চিত একটি প্রাণ—এর সন্ধান সেদিন ক'জন রাখত?

স্বরাজ্য পার্টি দেখল, লর্ড লিটন এই বিল পাস করাতে কৃতসংকল্প। এই বিল মঞ্জুর হলে এরই বলে সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা আরো বৃদ্ধি পাবে। রৌলট বিলের মূল ধারাগুলো এতে গৃহীত হওয়াতে এই বিল গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে রৌলট বিল আবার গৃহীত হবে। এই আশঙ্কা করে স্বরাজ্যদলের নেতৃবৃন্দ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কাউন্সিলে তাঁদের সভ্যসংখ্যা তখন অল্প, তার সাহায্যে এই বিল অগ্রাহ্য করার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু দেশবন্ধু নিশ্চিন্ত ছিলেন না। চিকিৎসকগণের নিষেধ অগ্রাহ্য করে তিনি পাটনা থেকে কলকাতায় চলে আসেন এবং তাঁর সংকল্প ঘোষণা করেন।

কাউন্সিলে তখন সভ্যদের মধ্যে কোন্ পক্ষে জয়লাভের সম্ভাবনা আছে তার আলোচনা চলছিল, এমন সময় একটি স্ট্রেচারে শায়িত অবস্থায় দেশবন্ধুকে কাউন্সিল-কক্ষে নিয়ে আসা হয়। তাঁর সঙ্গে আছেন দু'জন ডাক্তার—বিধানচন্দ্র ও জে. এন. দাসগুপ্ত। দু'জনেই আইনসভার সদস্য। মুহূর্তমধ্যে বিদ্যুৎগতিতে সে সংবাদ সর্বত্র প্রচারিত হলো। সভ্যগণ দলে দলে রোগজীর্ণ দেশবন্ধুকে দেখতে এলেন; রোগ-কাতর হলেও তিনি সকলের সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। 'এ অবস্থায় আপনার কাউন্সিলে আসা উচিত হয় নি।' এমন কথা বললেন কেউ কেউ। দেশবন্ধু বললেন, 'ভিখারীর সে ঔচিত্য অনৌচিত্যের বোধ থাকলে ভিক্ষা তো জুটে না।' সর্বত্যাগী বিরাট পুরুষ আজ বাংলার যুবকদের জন্য ভোট-ভিক্ষা করতে রোগশীর্ণ দেহে কাউন্সিলে উপস্থিত হয়েছেন। কারণ তিনি জানতেন, এই বিল পাস হলে হাজার হাজার ছেলেদের বিনাবিচারে অন্তরীণ ও বন্দী করা হবে। তাঁর মুখে এই কথা শুনে, কারো সাধ্য হলো না যে ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। বিদ্যুৎগতিতে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হলো। তাঁর সুস্থাবস্থায় যারা তাঁর স্বপক্ষে ভোট দেন নি, আজ স্ট্রেচারে বাহিত দেশবন্ধুকে দেখে ও তাঁর মুখে এই কথা শুনে তাঁদের প্রাণও গলে গেল। যাঁরা দ্বিধা

করছিলেন, তাঁদের কোন দ্বিধাই আর রইল না। যাঁরা স্বরাজ্যদল-ভুক্ত না হয়েও এর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, তাঁদের সহানুভূতি দৃঢ়তর হলো। পৃথিবীর কোন দেশের কোন আইন-সভায় এমন দৃশ্য দেখা যায়নি আজ পর্যন্ত।

যথাসময়ে ট্রেজারি-বেঞ্চ থেকে অর্ডিনান্স বিল উপস্থাপিত করা হলো। শুরু হয় ব্ল্যাক বিলের আলোচনা। সরকার পক্ষ প্রমাদ গণলেন। অন্যদিকে বৃদ্ধি পায় স্বরাজ্যদলের চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা। ভোটগণনা শেষ হলে দেখা গেল বহু ভোটের বলে ব্ল্যাক বিল অগ্রাহ্য হয়েছে। অবিরাম হর্ষধ্বনির মধ্যে জয়দৃপ্ত দেশবন্ধু অনেকাংশে সুস্থ হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। কাউন্সিলে বিলটি পরিত্যক্ত হলো বটে কিন্তু তিনদিন যেতে না যেতেই লর্ড লিটন তাঁর অতিরিক্ত ক্ষমতা-বলে তা মঞ্জুর (certify) করে দিলেন। লোকে দেখল নতুন শাসনতন্ত্রের আমলেও লোকমত কেমন করে অগ্রাহ্য হয়। অতঃপর ২৭শে জানুয়ারি চিকিৎসকগণের সনির্বন্ধ অনুরোধে বিশ্রামলাভের জন্য দেশবন্ধু পাটনা গমন করেন।

মার্চ মাসে আবার আইনসভার কাজ আরম্ভ হলে তাঁকে আবার কলকাতায় ফিরতে হয়। প্রদেশের মন্ত্রী নিয়োগের বিষয়টা আবার নতুন করে আলোচনা হবে, আইনসভায় তিনি উপস্থিত না থাকলে গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি যোগ্যতার সঙ্গে কে আলোচনা করবে? আইনসভার এই বৈঠকেই তিনি তাঁর সর্বশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই বক্তৃতার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো:

'We want a living constitution, a free constitution, a constitution in which honourable men can work with honourable friends, and we say that the whole field is at present covered with a sham constitution. The effect of killing Dyarchy with enable us to build the beautiful mansion to which I have

referred. It is not very difficult to understand that if you feel that a Government must mean a government by the people, for the people and for the good of the people, the Ministers under the present system will serve no purpose.'

তাঁর এই যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার পর তৃতীয়বারের মতো মন্ত্রিদের বেতন অগ্রাহ্য হয় (২৩শে মার্চ, ১৯২৫) এবং দেশবন্ধু বাংলাদেশে দ্বৈতশাসনের সমাধি রচনা করেন। তাঁর জীবিতকালে এর পুনরুজ্জীবন আর সম্ভব হয় নি। এই সময়ে তাঁর সম্পর্কে 'স্টেটস্‌ম্যান্‌ পত্রিকায় এই মন্তব্যটি করা হয়েছিল: 'Mr C. R. Das is India's evil genious, servant of chaos, whose spiritual home is Moscow the general headquarters of the forces of hate.' তথাপি ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে এই কথা লেখা থাকবে যে, বাংলাদেশে দ্বৈতশাসন অচল করে দিয়ে দেশবন্ধু তাঁর পার্লামেণ্টারি প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। এই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

বাংলাদেশের অচল অবস্থা দূর করবার জন্য এবার সচেতন হলেন বাংলা-সরকার। কলকাতার শেতাঙ্গ সমাজের সনির্বন্ধ অনুরোধে এই সময়ে দেশবন্ধু-লিটন সাক্ষাৎকার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দেশবন্ধু নিজেও এই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের কথা গভীরভাবেই চিন্তা করছিলেন। কারণ তাঁর মনে এই ধারণাটা তখন বদ্ধমূল ছিল যে, অহিংসায় বরং সম্ভব; কিন্তু হিংসাত্মক পথে স্বরাজ পাওয়া যাবে না। যখন লর্ড লিটনের সঙ্গে দেশবন্ধুর সাক্ষাৎ হয় তখন সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়, তিনি যেন প্রকাশ্যে হিংসাত্মক কার্যের নিন্দা করে এই কথা বলেন যে রাজনৈতিক লক্ষ্য সাধনের ইহা প্রকৃষ্ট পন্থা নয়।

২৯শে মার্চ, ১৯২৫।

দেশবন্ধু এই বিবৃতি প্রচার করলেন :

'আমি আগেও বলেছি আবার এখনো বলছি যে, আমি রাজনৈতিক গুপ্ত-হত্যা—যে কোন প্রকারের হিংসাত্মক কাজের বিরোধী। আমি মনে করি ইহা আমাদের ধর্মীয় শিক্ষারও বিরোধী। আমি সুনিশ্চিতভাবেই অনুভব করি যে, যদি হিংসাত্মক কার্য আমাদের রাজনৈতিক জীবনের গভীরে প্রবেশ করে, তাহলে স্বরাজের পথ চিরদিনের মতো রুদ্ধ হয়ে যাবে। কাজেই এখন আমরা দেশে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে আমি এর অবসান কামনা করি।

আমি আগেও বলেছি, আবার এখনো বলছি যে, আমি সকল রকম সরকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং হিংসাত্মক কার্যের মতো আমি এই জাতীয় অত্যাচারকেও ঘৃণা করি। অত্যাচার দ্বারা রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা কখনো বন্ধ হয় না। এবং অত্যাচারের ফলে ইহার পরমায়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া বিচিত্র নয়, অস্বাভাবিক নয়। আমরা স্বরাজলাভের জন্য দৃঢ়সংকল্প এবং সাম্রাজ্যের মধ্যে সম্মানজনক অংশীদারত্বে ও সমতার ভিত্তিতেই আমরা ভারতের স্বাধীনতা চাই। হয়ত এই সংগ্রাম সুদীর্ঘ হবে, কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করার জন্য দৃঢ়সংকল্প।

বাংলার তরুণদের আমি বলি—স্বরাজলাভের জন্য তোমরা সংগ্রাম কর, কিন্তু পরিষ্কারভাবে সংগ্রাম কর। তোমাদের অভীষ্টের উপরে যেন কলঙ্ক আরোপিত না হয়। কঠিন ও অবিশ্রান্ত সংগ্রামের পথে আমি তোমাদের আহ্বান করছি। স্বরাজলাভ করতে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে এগিয়ে চলো।

আর ইংরেজদের আমি বলি, তোমরা আমাদের ভুল বুঝো না। তোমরা তোমাদের মনের বৃথা সন্দেহ দূর করো। সরকারের অত্যাচারকে তোমরা সমর্থন করো না—তা যদি করো তবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের রাজনৈতিক জীবনে হিংসাত্মক পদ্ধতি অনিবার্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।'

এই বিবৃতির ছত্রে ছত্রে আমরা দেশবন্ধুর মধ্যে একজন প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রনেতাকে পাই যাঁর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা ছিল অতুলনীয়। লর্ড বার্কেনহেড তখন ভারতসচিব। সংবাদপত্রে দেশবন্ধুর এই বিবৃতি পাঠ করে তিনি অবিলম্বে সাড়া দিলেন। তখন বিলাতের

পার্লামেন্টে (হাউস অব লর্ডস-এ) বেঙ্গল অর্ডিনান্স সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। তিনি মুক্তকণ্ঠেই বললেন যে, তিনি তাঁর মন থেকে সমস্ত সন্দেহ দূর করতে প্রস্তুত আছেন। দেশবন্ধুর আবেদন অনুযায়ী অগ্রসর হওয়ার জন্য তিনি ভারতবাসীর উদ্দেশে একটি আবেদন জানালেন এবং সর্বপ্রকার হিংসাত্মক ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অবসান ঘটিয়ে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অনুরোধ করলেন।

দেশবন্ধু ও লর্ড বার্কেনহেডের এই দুইটি বিবৃতির ফলে ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়। ৩রা এপ্রিল পাটনায় এক বক্তৃতায় দেশবন্ধু বললেন :

'লর্ড বার্কেনহেড খোলা মন নিয়েই কথা বলেছেন। তিনি যে তাঁর মন থেকে সমস্ত সন্দেহ দূর করতে সম্মত হয়েছেন, এজন্য আমি খুব আনন্দ বোধ করছি। ভারতসচিবের এই বিবৃতিটি গুরুত্বপূর্ণ। আমি ১৯২২ সালে আমার গয়ার ভাষণে আমার কথা খোলাখুলি ভাবেই জানিয়েছি। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। বেঙ্গল অর্ডিনান্স কর্তৃপক্ষের হাতে অবাধ ক্ষমতা তুলে দিয়েছে যার ফলে আইন-আদালতের কাজ সংকুচিত হয়ে গিয়েছে। কি কি কারণের জন্য ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে, লর্ড বার্কেনহেডকে আমি অনুরোধ করছি, তিনি যেন এই বিষয়ে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করেন। আমি দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা একমাত্র অহিংসার পথেই সম্ভব। বিপ্লবীদের হিংসাত্মক কাজের আমি যেমন নিন্দা করি, তেমনি আমি সরকারের স্বৈরাচারেরও নিন্দা করি—ইহাও একপ্রকার হিংসাত্মক কাজ। আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন একটি জাতি কোন্ কোন্ শর্তে সহযোগিতা করতে পারে, তা আমি বলেছি। এখন সবটাই নির্ভর করছে সরকার ও ইংরাজদের সুবিবেচনার উপর।'

ইংলণ্ডের সংরক্ষণশীল দলের মুখপত্র 'দি টাইমস্' ও 'দি ডেলি হেরাল্ড' পত্রিকায় দেশবন্ধুর এই ঘোষণা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়

এবং হাউস অব কমন্স-এ সহকারী ভারতসচিব বলেন যে, হিংসাত্মক কার্যসম্পর্কে তাঁর গভর্ণমেন্ট দেশবন্ধু দাশের এই বিবৃতিকে স্বাগত জানাচ্ছে। এই পটভূমিকাতেই ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, স্বরাজ্যদল কি কি সম্মানজনক শর্তে সহযোগিতা করতে পারে তা জানবার পর ভারতসচিব দেশবন্ধুকে বিপ্লবদমনে সরকারকে সাহায্য করবার জন্য আহ্বান করেন। দেশবন্ধু তৎকালীন অবস্থায় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে আদৌ আগ্রহ প্রকাশ করেন নি—এই মর্মে তখনকার কোন কোন কাগজে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এমন কি, তাঁর এই আপোস প্রচেষ্টাকে লঘু করে দেখা হয়েছিল ও আকাশকুসুম বলে পরিহাস পর্যন্ত করা হয়েছিল। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত পরাধীন দেশের কোন ব্যক্তি বা দল সমানে সমানে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে একটি সাময়িক পত্রিকায় এই মন্তব্যটি করা হয়েছিল: 'ইস্পাতের শিকল সোনার গিল্টি থাকিলেও উহা শিকল, গলার হার নহে। গভর্ণমেণ্ট কাহাকেও সহযোগিতা করতে ডাকিল, এই সহযোগিতার প্রকৃত অর্থ অনুবর্তিতা, যদিও তাহার উপর সহযোগিতার রং মাখান থাকিতে পারে।'* কিন্তু আমরা অনুমান করতে পারি, অনুবর্তিতাকে গিল্টি করে বা রং ফলিয়ে সহযোগিতার চেহারা দিলেও তা যে কখনো সম্মানজনক হতে পারে না, এটা দেশবন্ধু নিশ্চয়ই বুঝতেন।

দেশবন্ধু আরো বুঝতেন যে, 'The goal of the political evolution of India as an equal partner in the common wealth and not as a trustic dependent.' কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে এই কথা প্রথম বলা হয় ১৯০৪ সালের বোম্বাই অধিবেশনে। স্যার হেনরি কটন ছিলেন এই অধিবেশনের

* প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩২

সভাপতি। এর প্রতিধ্বনি শোনা গেল ১৯০৫-এ কাশী কংগ্রেসে গোখেলের কণ্ঠে এবং ১৯০৬-এ কলিকাতা কংগ্রেসে নৌরজির কণ্ঠে। তারপর ১৯২৫ সালে দেখা গেল যে, দেশবন্ধু যেন সেই আদর্শটাকেই দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করলেন। দেশবন্ধুর রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা গভীরভাবে অনুসরণ করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, শেষের দিকে তিনি যেন ক্রমশঃই বুঝতে পারছিলেন যে, 'A nation does not lose its independence by an allience with another country.' এর অনেক কাল পরে দেশবিভাগের পর আমরা দেখতে পেলাম যে, ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে উত্থাপিতপূর্ণ স্বরাজের ধারণা বা concept বজায় রেখেও স্বাধীন ভারতের পক্ষে কমনওয়েলথের সভ্য হতে বাধে নি। কাজেই সাম্রাজ্যের মধ্যে সমান অংশীদারত্বের দাবীতে সহযোগিতার হস্ত প্রসারণ করে দেশবন্ধু সেদিন যথার্থ রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। এইক্ষেত্রে তিনি ভারতের রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করেই তাঁর লক্ষ্যসাধনে অগ্রসর হয়েছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর ফরিদপুরের ভাষণের মধ্যেই এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল।

॥ ছাব্বিশ ॥

২রা মে, ১৯২৫।

ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন।

সভাপতি—দেশবন্ধু, উদ্বোধক—মহাত্মা গান্ধী।

দেশবন্ধু বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হতে আর বিলম্ব নেই। তাই এই সম্মিলনীতে উদ্বোধকরূপে যোগদান করার জন্য তিনি বিশেষভাবে গান্ধীকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। ১লা মে গান্ধী কলকাতায় এসে পৌছলেন। দেশবন্ধু তাঁর বাসভবন দেশের কাজে দান করেছেন এবং অসুস্থ শরীর নিয়েই তিনি ফরিদপুর গেছেন—মির্জাপুর পার্কের এক জনসভায় অশ্রুভারাক্রান্ত চিত্তে গান্ধী যখন এই কথা ব্যক্ত করে বলেন : 'That house a beautiful mansion no longer belongs to Dashbandhu. He has placed it in the hands of the trustees in order to divest himself of the least vestige of wealth that he possessed in the world....I cannot conceive of such stupendous sacrifice of everything one may call one's own.'—তখন উপস্থিত সকলের চক্ষুই সজল হয়ে উঠেছিল। দেশমাতৃকার চরণে এমন করে সর্বস্ব অর্পণ, পৃথিবীতে আর কে করতে পেরেছে? আর সেই অতুলনীয় ত্যাগের কথা নিজমুখে বলে গেলেন মহাত্মা গান্ধী। দেশবন্ধুর মহত্ব কোথায়, সেটা আজ তিনি অনুভব করলেন তাঁর হৃদয়-মন দিয়ে।

বাসন্তী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে দেশবন্ধু ১লা মে ফরিদপুরে এসে পৌছলেন। গান্ধী এসে পৌছলেন তার পরের দিন সকালবেলায়। ফরিদপুরবাসী উভয় নেতাকেই জানালো উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন। তাঁর মুদ্রিত ভাষণ পাঠ করার আগে দেশবন্ধু মহাত্মা গান্ধীকে এই

বলে সম্বোধন করলেন: 'Mahatmaji, it is my proud privilege to welcome you as President of the Bengal Provincial Congress. I have been your follower from the beginning of the non-co-operation movement and I am still your follower and co-worker···We want your inspiration and guidance'. যখন তিনি সভায় দাঁড়িয়ে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে এই কথাগুলি বলেন এবং গান্ধীর দীর্ঘায়ু কামনা করে সর্বশেষে তিনি যখন এই কথাগুলি উচ্চারণ করেন, 'স্বরাজ অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত ভগবান আমাদের চালক হয়ে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করুন'—তখন সভায় উপস্থিত সকলে দেশবন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল যে, রোগবিবর্ণ সেই মুখে ফুটে উঠেছে এক প্রশান্ত জ্যোতি আর আশার আলো। এ বিস্ফোরণ নয়—উদ্ভাসন। স্বদেশ-সেবাব্রতে সমর্পিত একটি চিত্তের মহিমান্বিত উদ্ভাসন।

সুভাষচন্দ্র লিখেছেন:

'বেঙ্গল অর্ডিনান্স বিল যখন লাটসাহেবের বিশেষ ক্ষমতা-বলে বিধিবদ্ধ হয়, তখন ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অনুষ্ঠান হয় এবং দেশের সংকটজনক পরিস্থিতি বিবেচনা করে, উক্ত সম্মিলনীতে দেশবন্ধুকেই সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। চিকিৎসকগণের নিষেধ সত্ত্বেও অসুস্থ শরীর নিয়েই তিনি ফরিদপুর গিয়ে সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করতে দৃঢ়সংকল্প হন। তখন কেউ বুঝতে পারে নি কেন তিনি ফরিদপুর যেতে এত ব্যগ্র হয়েছিলেন। কারণ যদিও সংবাদপত্রে প্রদত্ত তাঁর বিবৃতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, তথাপি সরকারের উপরোধে প্রকাশ্যে তিনি তাঁর দাবীগুলি জানাতে চাইলেন। অধিকন্তু, সরকারকে তিনি এইটাই বলতে চেয়েছিলেন যে, কংগ্রেসের অধিকাংশ লোকের নিকট তাঁর মত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ায়, সরকার যদি কোনরকম আপোসে সম্মত হন তাহলে কংগ্রেসকে দিয়ে রাজী করান তাঁর পক্ষে অসম্ভব হবে না। তখন সরকার বাংলার প্রাদেশিক সম্মিলনীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, কারণ বাংলাই ছিল তখন ভারতের মধ্যে প্রধান ঝটিকাকেন্দ্র এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে

র‍্যাডিক্যাল বলে গণ্য ছিলেন তাঁরা এই প্রদেশেরই অধিবাসী ছিলেন। তাই এখানে কোন একটি প্রস্তাব গৃহীত হলে তা যে ভারতের অন্যান্য কংগ্রেসীদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে ত'র সম্ভাবনা বিলক্ষণ ছিল।'*

আর বাংলার মুখপাত্র তখন দেশবন্ধু ভিন্ন আর কে ছিলেন? খুব যত্নের সঙ্গে তিনি তাঁর ফরিদপুর ভাষণটি রচনা করেছিলেন এবং তিনি তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে এ বিষয়ে পূর্বাহ্নে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। তাঁরা সকলেই দেশবন্ধুর বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করেছিলেন বলে জানা যায়। ভাষণটি ইংরেজী ও বাংলায় মুদ্রিত করা হয়েছিল এবং ইহাই তিনি সেখানে পাঠ করেন। অনেকের মতে, দেশবন্ধুর ফরিদপুর ভাষণ জাতির নিকট তাঁর শেষ নির্দেশনামা (Testament) বলে বিবেচিত এবং ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক চিন্তার বিকাশের ইতিহাসে ইহা একটি দিকচিহ্নরূপে পরিগণিত হওয়ার দাবী রাখে। ইহজীবনে ইহাই ছিল দেশবন্ধুর সর্বশেষ প্রকাশ্য বক্তৃতা। আমরা তাই আলোচ্য অধ্যায়ে তাঁর এই ভাষণটি সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনাই করব।

ফরিদপুর প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের সভাপতিরূপে দেশবন্ধু যে অভিভাষণ প্রদান করেন তাতে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, কয়েকটি বিশেষ শর্তে তিনি সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সম্মত আছেন। তাঁর এই ভাষণের মূল বক্তব্য ছিল, honourable settlement বা সম্মানজনক সহযোগিতা। ইদানীং দেশবন্ধুর চিন্তার ধারা যেন এইখানেই প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছিল। তাঁর অনেক সহকর্মীর নিকট এটা ছিল অপ্রত্যাশিত। সুভাষচন্দ্র তাঁর রাজনৈতিক গুরুর এই ভাষণ পছন্দ করেন নি। তিনি লিখেছেন: 'Deshbandhu made a speech which was regarded as rather tame for a Bengal audience. He spoke in condemnation of terrorism. The

* *The Indian Struggle*: Bose

speech as a whole appeared to be an appeal to the Government and to the more extreme elements among Indians to adopt a compromising attitude so that the ground could be prepared for a settlement. It was not welcomed by the youthful section of the audience.'*

দেশবন্ধুর মুখে সসম্মান সহযোগিতার প্রস্তাব সত্যিই অপ্রত্যাশিত ছিল এবং এটাই ছিল তার বিরুদ্ধে তাঁর সহকর্মিগণের তীব্র সমালোচনার কারণ। এর কিছুদিন আগে বাংলার বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে তিনি যে ইস্তাহার দিয়েছিলেন, সেটির প্রতি ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেডের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল, সে কথা আগেই বলেছি। এর ফলে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সহযোগিতার পথে আর একপদ অগ্রসর হলেই লর্ড বার্কেনহেড তাঁর সঙ্গে একযোগে কাজ করতে পারবেন। সেই অনুসারেই এক ধাপ অগ্রসর হয়ে তাঁর ফরিদপুর অভিভাষণে দেশবন্ধু সম্মানপূর্ণ সহযোগিতার প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর বিপ্লব-বিরোধী বিবৃতি বিপ্লবীদের কাছে যেমন নিন্দিত হয়, তেমনি এই প্রস্তাব করে তিনি বহু সহকর্মীর সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। কথিত আছে, এতে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে দেশবন্ধু এই সময়ে নিশীথ সেনকে বলেছিলেন, 'নিশীথ, ইচ্ছে হয় সব ছেড়ে দিই, আর রাজনীতি নয়।'

বাংলার অসহযোগ যজ্ঞের প্রধান হোতা কি সহযোগিতার ঘৃতাহুতি-দানে স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্‌যাপন করতে চেয়েছিলেন? তিনি কি মন্ত্রিত্বের লোভে সহযোগিতা করতে অভিলাষী হয়েছেন? তিনি কি নিজের ভুল বুঝতে পেরে সহযোগিতার দ্বারা সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছেন? ১৯২২-এর শেষ ভাগ থেকে দেশ

* *The Indian Struggle* : Bose

যখন হতাশা ও উত্তমহীনতার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল তখন যিনি নতুন কার্যপদ্ধতি উপস্থাপিত করে দেশবাসীর মধ্যে উৎসাহ-উদ্যম পুনরুদ্দীপিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই অমিত পরাক্রমশালী বীর যোদ্ধা কি আজ রণক্লান্ত হয়ে সংগ্রামের পথ ত্যাগ করে, সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করতে চাইছেন ? এই রকম হাজারো প্রশ্ন উঠেছিল দেশবাসীর মনে দেশবন্ধুর ফরিদপুর অভিভাষণকে কেন্দ্র করে। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন : 'In his Presidential address at the Bengal Provincial Conference at Faridpore on May 2nd, Chittaranjan defined his new position as one of willingness, under certain conditions, to accept the gesture from Whitehall. In this address he struck alltogether a new note and invited the Government to meet him half-way on terms of honourable co-operation, a gesture which surprised both his friends and enemies. But beyond declaring his change of heart, he did not commit himself to any details."*

ইহাই সত্য। তাঁর হৃদয়ের পরিবর্তন ঘোষণার অতিরিক্ত কিছু দেশবন্ধু করেন নি। তিনি ছিলেন ক্রান্তদর্শী নেতা। তাই তিনি বিশ্বাস করতেন যে তাঁর এই ঘোষণার পর, বাকী দায়িত্ব তাঁর নয়, সরকারের। তিনি জীবিত থাকলে ভারতসচিব তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনে কতদূর অগ্রসর হতেন, তা শুধু আমাদের অনুমান সাপেক্ষ, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্বরাজ্যদলের প্রাধান্য হ্রাস পাওয়ার ফলে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হৃদয়ের পরিবর্তনটা কিছুকালের মতো স্থগিত থাকে। সে কথা থাকুক, আমরা এখন ফরিদপুর ভাষণের প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

---

* *Life and Times of C. R. Das* : Ray

অনেকে বলেন, ফরিদপুর বক্তৃতার পিছনে একটি মহৎ উদ্দেশ্য লুক্কায়িত ছিল। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, দেশবন্ধু স্পষ্টভাবে তাঁর অভিপ্রায় প্রকাশ করে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করুন—তাঁর কতকগুলি ইংরেজ বন্ধুর এইরূপ ব্যগ্রতার ফলেই ঐ বক্তৃতা প্রদত্ত হয়েছিল। তিনি তাঁদের ইচ্ছানুরূপ কাজই করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজ এই দেশপ্রেমিকের উদ্দেশ্যের সরলতার প্রতিদানে রাজনীতিক বন্দীদের কি মুক্তিদান করেছিলেন? না। স্বয়ং গান্ধীও, দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে, তাঁদের মুক্তিভিক্ষা করে ব্যর্থকাম হয়েছিলেন। সরকারের সন্দেহ ও অবিশ্বাস তখনো পর্যন্ত সমান বলবৎ ছিল।

গান্ধী বলেছেন: 'ফরিদপুর দেশবন্ধুর অতুলনীয় বিজয়ের ক্ষেত্র। ফরিদপুর অভিভাষণে তাঁর মহতী রাজনীতিজ্ঞতা এবং যুক্তিপরায়ণতা সপ্রমাণ হয়েছে। এইখানেই তিনি বিশেষ চিন্তার পরে ন্যায্যভাবে কেবল অহিংসনীতিকেই যুক্তিযুক্ত এবং ভারতের রাজনীতিক মত বলে গ্রহণ করেছিলেন।'* দেশবন্ধু তাঁর এই বক্তৃতায় কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেন, যথা—১। স্বরাজ ও স্বাধীনতা; ২। বেঙ্গল অর্ডিনান্স; ৩। রিফর্ম আইন; ৪। সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা ও ৫। কমনওয়েলথ। এই প্রধান চারটি বিষয় ভিন্ন তাঁর এই ভাষণে দেশবন্ধু হিংসাত্মক কার্য ও বাংলায় বৈপ্লবিক দলের উদ্ভবসম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেন। ইংরেজী ও বাংলা দুইটি ভাষণই পাশাপাশি রেখে পাঠ করলেই বোঝা যায় যে, এই ভাষণটি তিনি প্রথমে ইংরেজীতেই রচনা করেন ও পরে এর বাংলা তর্জমা করা হয়। ভাষণটি আরম্ভ হয়েছে এইভাবে:

'ভারতবর্ষ বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছে—মুক্তি কোন্ পথে? সুদূর অতীতে এই প্রশ্ন ছিল একান্তভাবেই আধ্যাত্মিক। কিন্তু বর্তমানে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে ইহা নিপীড়িত ভারত-আত্মার ক্রন্দন—মুক্তি কোন্ পথে? অতীতকালে যাহা ছিল ব্যক্তি-মানবের পরমাত্মালাভের প্রশ্ন, বর্তমানে উহাই জাতীয় প্রশ্ন হইয়া

দাঁড়াইয়াছে। সে প্রশ্ন হইল: অধীনতা ও পাপ হইতে মুক্তিলাভের অর্থ কি? যাঁহারা অধীনতার শৃঙ্খল তৈরী করেন তাঁহাদের পক্ষে উহা যেমন পাপ, তেমনি যাঁহারা ঐ শৃঙ্খল নির্মাণে আপত্তি করেন না, তাঁহাদের পক্ষেও ইহা পাপ।'

তারপর স্বরাজ ও স্বাধীনতার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:

'মুক্তির আদর্শ লইয়া আলোচনা প্রসঙ্গে আমার মনে হয়, স্বরাজের আদর্শ অপেক্ষা স্বাধীনতার আদর্শ অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। ইহা সত্য যে স্বাধীনতার অর্থ অধীনতার অভাব। সুতরাং এই আদর্শ মূলতঃ অভাবাত্মক কিন্তু অধীনতার অভাব হইলেই ভাবাত্মক (Positive) কিছু স্বতঃই আমরা নাও পাইতে পারি। আমি অবশ্য ইহা বলি না যে, স্বাধীনতা ও স্বরাজ পরস্পর বিরোধী অথবা ইহার একের সঙ্গে অপরের সামঞ্জস্য-বিধান হইতে পারে না। এমন কথা আমি বলি না। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন শুধু অধীনতার অভাব নয় —ভাবাত্মক বা বস্তুগত এক অখণ্ড স্বরাজের প্রতিষ্ঠা। কল্য প্রভাতেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারে, যদি যে-কোন উপায়েই হউক ইংরাজরাজ এদেশ হইতে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহাতেই আমি স্বরাজ অর্থে যাহা বুঝি, তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না। স্বরাজলাভ একটা বিশেষ রকমের ভাবাত্মক বস্তুর উদ্ভব বা প্রতিষ্ঠা। সেই বস্তুটি কি? কি উপায়ে ইহার প্রতিষ্ঠা? ইহাই প্রশ্ন এবং সত্যই ইহা সুস্পষ্ট উত্তরের দাবী আমাদের নিকট করিতে পারে। স্বরাজের স্বাধীনতার আদর্শ হইতে স্বরাজের আদর্শে পার্থক্য কি? স্বরাজের আদর্শে কি আছে যাহা স্বাধীনতার আদর্শে নাই? আমি বলি, আমাদের জাতির সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার যে আদর্শ, তাহাই স্বরাজ।'

দেশবন্ধু তাঁর এই বক্তব্যের ভিতর দিয়ে যে কথাটা বোঝাতে চেয়েছেন তার অর্থ এই যে, স্বাধীনতার চেয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্য থেকে স্বরাজলাভ বড় জিনিস, তাঁর এই সিদ্ধান্ত স্বাধীনতা বা আত্মকর্তৃত্ব জিনিসটা অভাবাত্মক তার সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্বরাজ তার চেয়ে বড় জিনিস, লোভনীয় জিনিস—সেদিন অনেকেই গ্রহণ করেন নি। ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিবর্তনের পথে ঔপনিবেশিক স্বরাজের দাবীটা ছিল স্বাভাবিক ও সঙ্গত এবং দেশ-

*_Long Live Deshbandu_ : Gandhi (_Forward_, June, 1925)

বন্ধুর মতে এটাই ছিল তথাকথিত স্বাধীনতা অপেক্ষা কাম্য ? দুঃখের বিষয় সেদিন এটা আমরা বুঝতে চাই নি এবং এইখানেই তাঁকে আমরা ভুল বুঝেছিলাম।

হিংসা বা violence সম্পর্কে তিনি বললেন :

'হিংসা কোন যুগেই আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ ছিল না বা এখনও নাই—সুতরাং হিংসামূলক কোন উপায় আমরা অবলম্বন করিতে পারি না। কেননা, তাহা আমাদের জাতীয় সভ্যতার আদর্শে নাই। হিংসা আমাদের প্রকৃতির মধ্যে তেমনভাবে নাই, যেমন য়ুরোপে আছে।'

অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেও এটা আমরা সত্য বলে মানতে পারি না যে, অহিংসা কোন কালে আমাদের জাতীয় আদর্শ বা সংঘবদ্ধ জীবনের আদর্শ ছিল। আত্মরক্ষা বা মুক্তির জন্য যুদ্ধ করো না, এমন কথা ভারতবর্ষের কোন শাস্ত্রে, কাব্যে, ইতিহাসে, পুরাণে বলে নি। গীতা তার একটি প্রমাণ; গীতার আদেশ ও নির্দেশ—প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করতেই হবে। কাজেই ভারতবর্ষের আদর্শ বা জাতীয় প্রস্তুতি সম্বন্ধে এমন কথা বলা দেশ-বন্ধুর পক্ষে কতখানি যুক্তিসঙ্গত হয়েছে সেটা অবশ্যই বিচার্য।

সশস্ত্র বিদ্রোহ করে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করতে পারে কিনা সেই বিষয়ে দেশবন্ধু বললেন :—

'আমি বলিতে দ্বিধা করি না যে, হিংসাত্মক বিদ্রোহ দ্বারা আমরা কখনই জাতীয় মুক্তিলাভ করিতে পারিব না। তারপর ভারতীয় প্রকৃতির অহিংসা-মূলক বৈশিষ্ট্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহা কিরূপে সম্ভব যে নিরস্ত্র একটা পরাধীন জাতি হিংসামূলক বিদ্রোহ দ্বারা অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত গভর্ণমেণ্টের আজিকার দিনের প্রচণ্ড হিংসামূলক প্রচুর আয়োজন ও বাধার বিরুদ্ধে জয়ী হইবে? ফরাসী বা অন্যান্য দেশের বিদ্রোহের কথা তুলিয়া কাজ নাই। যে-সমস্ত বিদ্রোহের যুগে মানুষ তীর-ধনুক ও বর্শা হাতে যুদ্ধ করিত, কখন বা জয়লাভও করিত। ইহা কি কল্পনায় সম্ভব যে, ঐ উপায়ে আমরা এই বিজ্ঞানের যুগে সামরিক শক্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত একটা রাজশাসনকে বিধ্বস্ত

করতে পারি? আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, ইংলণ্ডেও সেই শ্রেণীর বিদ্রোহ আর আজিকার দিনে সম্ভবপর নয়।'

দেশবন্ধুর এই উক্তি যে যথার্থ নয়, তা পরবর্তীকালে তাঁরই রাজনৈতিক চিন্তার উত্তরাধিকারী নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে এমনভাবে দেখিয়ে গেছেন, যার ফলে প্রবল প্রতাপ ইংরেজ রাজশক্তি ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়েছিল। একটা পরাধীন জাতির মুক্তিসংগ্রামে 'অসম্ভব' বলে কোন কিছু থাকতে পারে না, যদিও অহিংসাকে আমরাও সমর্থন করি। সম্ভবতঃ এইজন্যই সুভাষচন্দ্রের কাছে তাঁর গুরুর এই ভাষণ প্রাণহীন অর্থাৎ 'tame' বলে মনে হয়েছিল আর গান্ধীর কাছে মনে হয়েছিল 'অতুলনীয়'। তবে দেশবন্ধু যেখানে বলেছেন যে, 'বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ, সামঞ্জস্য ও সমন্বয়সাধন ব্যতীত ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্যস্থাপন ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব'—সেখানে আমরা তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

বাংলার বিপ্লবীরা তাঁর বক্তৃতার যে অংশে আপত্তি করেছিল সেটি এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছিলেন:

'আমরা যদি হিংস্র হইয়া উঠি, তাহার ফলে গভর্ণমেণ্ট আরো অধিক হিংস্র হইয়া উঠিবে এবং এমন এক প্রচণ্ড দমননীতি আমাদের উপর চালনা করিবে, যাহার ফলে স্বরাজলাভ করিবার যে আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনের মধ্যে আছে তাহা একেবারে নির্বাপিতও হইয়া যাইতে পারে। হিংসামূলক বিদ্রোহের পক্ষপাতী যে সমস্ত যুবকগণ আছেন, তাঁহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, আমাদের দেশবাসী কি তাঁহাদের পক্ষ লইবে? ফলে জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন হইবে অথবা যাহাদের বিপন্ন হইবার আশঙ্কা জন্মিবে, তাহারা সকলেই এই বিদ্রোহের ত্রিসীমানার মধ্যেও আসিবে না। তরাং এইরূপ বিদ্রোহ কার্যকরী হইবে না।'

হিংসা ভাল নয়, এ কথা আমরা মানি। যুগে-যুগে দেশে-দেশে স্বাধীনতার যুদ্ধ হয়েছে; এবং তাঁর সময়েও কোন কোন দেশে

হচ্ছিল। এই কারণে, যে ভয়ের যুক্তি দেশবন্ধু বিশেষ করে দেশের তরুণদের জন্য উপস্থিত করেছিলেন, তাতে তারা সায় দিতে পারে নি। তারপর আইন অমান্য আন্দোলন বা অহিংসামূলক অবাধ্যতাকে তিনি স্বাধীনতার যুদ্ধে আমাদের হাতে শেষ অস্ত্র—ব্রহ্মাস্ত্র—বলেছেন ও দরকার হলে এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করবেন বলেছিলেন। কিন্তু সরকারী নিগ্রহের সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই যে এই অস্ত্র প্রযুক্ত হওয়া দরকার, সেটা তিনি পরিষ্কার করে তাঁর বক্তৃতার কোথাও বলেন নি—বলেন নি যে, গভর্ণমেণ্টের হিংস্রতাকে যদি ভয় করতে হয়, তাহলে সশস্ত্র বিদ্রোহের কল্পনাকেও ভয় করতে হবে, অহিংস অবাধ্যতার কল্পনাকেও তা করতে হবে। তবে 'রাজদ্রোহিতার পর পুনরায় একটা রাজ-অত্যাচার আত্মপ্রকাশ করে এবং যখনি গভর্ণমেণ্ট আপাতদৃষ্টিতে প্রজার হিতের জন্য কোন আইন পাস করেন, আবার ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই দমন-নীতি সমর্থক আর একটা আইনও পাস হয়'—দেশবন্ধুর এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত।

এইবার তাঁর ফরিদপুর ভাষণের মূল বক্তব্যে আসি। সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবার যে-সব শর্ত দেশবন্ধু নির্দেশ করেছিলেন, সত্য কথা বলতে তার অধিকাংশ এখন অস্পষ্ট (vague) যে, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। অনেকের বিবেচনায় কর্তৃপক্ষকে খুশি করবার জন্য তিনি সেদিন এতটা নীচে নেমেছিলেন যে, তাঁর ও তাঁর দলের বহুনিন্দিত মডারেটরাও কখনো এত নীচে নামেন নি। তিনি বলেছিলেন :

'আমি একথা আপনাদিগকে বিশেষরূপে চিন্তা করিতে বলিতেছি যে, আমরাও গভর্ণমেণ্টের সহিত এমন একটা শর্তে আবদ্ধ হইব যে, কি কথায়, কি কার্যে, কি হাবেভাবে আমরা রাজদ্রোহমূলক কোন আন্দোলনে উৎসাহ দিব না—অবশ্য এখনো দিই না এবং আমরা সর্বতোভাবে এইরূপ আত্মঘাতী আন্দোলন দেশ হইতে দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিব।'

উত্তম কথা। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, সমকালীন গভর্ণমেণ্ট অনেক আন্দোলনকে রাজদ্রোহমূলক মনে করতেন, যা সেদিন ভারতীয় বহু দেশভক্ত ন্যায্য মনে করতেন। অসহযোগ আন্দোলনকেই তো সরকার রাজদ্রোহমূলক বলে মনে করতেন। নতুবা এত অসহযোগী কারাগারে যেত না। তাঁর স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠনও তো একসময় সরকারের কাছে রাজদ্রোহমূলক বিবেচিত হয়েছিল বলেই না শত শত স্বেচ্ছাসেবকে একদিন কারাগার পূর্ণ হয়েছিল। সুতরাং রাজদ্রোহমূলক আন্দোলন সম্বন্ধে এতখানি অঙ্গীকারে বদ্ধ হওয়ার কথা একটা প্রাদেশিক সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা দেশবন্ধুর ন্যায় একজন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে কতদূর সমীচীন হয়েছিল তা আজ বিচার্য। তারপর তিনি যে আত্মঘাতি আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেছেন, গান্ধী-প্রবর্তিত আইন অমান্য আন্দোলনকে কি আমরা ঠিক এই বিশেষণে বিশেষিত করতে পারি না? সভ্যতা-বিরোধী এই আন্দোলন কি আত্মঘাতি আন্দোলন ছিল না? ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী এই রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করে গান্ধী ও তাঁর অনুগামীরা যে উন্মত্ত উচ্ছৃংখলতার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন তার ফলে ভারতের প্রকৃত হিত না অহিত সাধিত হয়েছে, ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক তা একদিন নিশ্চয়ই বিচার করবেন। তবে এর মাশুল আজও, স্বাধীনতা লাভের পরেও, আমাদের দিতে হচ্ছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এই যে দেশবন্ধু তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ব্রিটিশ-সরকারের সঙ্গে একটা আপোস রফায় আসতে চেয়েছিলেন, তার পরিণতিটা কি হয়েছিল? ১৬ই জুন তাঁর মৃত্যু হয় আর ৩০শে জুন লণ্ডনে সেণ্ট্রাল এশিয়ান সোসাইটির এক ভোজসভায় লর্ড বার্কেনহেড যে বক্তৃতা প্রদান করেন, আমার বিশ্বাস, দেশবন্ধু জীবিত থাকলে, হয়ত তার সমুচিত জবাব দিতেন এবং আপোসের হস্ত

প্রত্যাহৃত করে নিতেন। 'তলোয়ারের সনদেই আমরা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া আছি—তলোয়ারের দ্বারাই আমরা চিরকাল প্রভুত্ব করিব।' বার্কেনহেডের এই স্পর্ধিত উক্তির জবাব দেওয়ার মতো মানুষ সেদিনকার ভারতবর্ষে আর কেউ ছিলেন না। তেমনি অনেকেই হয়ত জানেন, দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর ভারতের রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার জন্য গান্ধী ভারতসচিবের কাছে আবেদন করেছিলেন। এই আবেদনের উত্তরে হাউস অব কমন্সে আর্ল উইনটারটন বলেছিলেন (২৭শে জুলাই, ১৯২৫), লর্ড বার্কেনহেড ভারতবাসীদের খুশী করতে পারলে বড়ই আনন্দিত হতেন; কিন্তু মিস্টার গান্ধীর পরামর্শ-মতো কাজ করা সম্ভবপর নয়।'

সম্মানজনক সহযোগিতার এমন অসম্মানকর পরিণতি হবে জানলে, দেশবন্ধু কি এই ভুল করতেন? কখনই না। ইংরেজের সদিচ্ছায় আস্থা স্থাপন করা তাঁর মতো রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে কতদূর সমীচীন হয়েছিল তা বিচার্য। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তাই এক পত্রে (এই চিঠির তারিখ ২১শে জুলাই, ১৯২৫) গান্ধীকে লিখেছিলেন :

'দেশবন্ধু সম্মানজনক সহযোগিতা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু লর্ড বার্কেনহেড প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়াছেন, মনে হয়; স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম আমরা আরম্ভ করিয়াছি, সেই সংগ্রামে আমাদিগকে এখনও অনেক অনাবশ্যক বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে।'

কিন্তু সেই সংগ্রামের দিন দেশবন্ধু আমাদের মধ্যে ছিলেন না। আপোসের হস্ত একটু পূর্বাহ্নে প্রসারিত করলেও, একথা সত্য যে, তাঁর ফরিদপুর ভাষণের উপসংহারে দেশবন্ধু একথাও অবশ্য বলেছিলেন, আমরা লড়াই করব, বীরের মতোই লড়াই করব।' কিন্তু সে অবসর তিনি আর পান নি। ফরিদপুর ভাষণের উপসংহারে দেশবন্ধু ভবিষ্যতের জন্য এই আশা পোষণ করেছিলেন :

'আমি দেখিতেছি—বিচ্ছিন্ন মানবজাতির মধ্যে একটা গঠন, একটা

শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের জন্ম মানবের আত্মা ব্যাকুল হইয়াছে। আমি বিশ্বাস করি, জগতের এই মহামিলনের ভারতবর্ষ খুব বেশী সাহায্য করিবে। জগতের সম্মুখে ভারতবর্ষের কিছু বলিবার আছে। ভারতবর্ষ তাহা বলিবার জন্ম ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পায়ে ভর করিয়া ভারতবর্ষ দাঁড়াইয়া আছে—মানবের বিভিন্ন জাতির মিলন-মন্দিরের সিংহদ্বারে ভারতবর্ষ তাহার যুগ-যুগান্তর অমর বাণী লইয়া সমুপস্থিত।'

ক্রান্তদর্শী নেতার উপযুক্ত এই কথা। এই আশা বুকে নিয়েই তো তিনি হিমালয়ের ক্রোড়ে অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

ফরিদপুর থেকে জ্বর নিয়েই কলকাতায় ফিরলেন দেশবন্ধু ৫ই মে।

এইবার তিনি নিজের বাসভবনে উঠলেন না—কারণ সে বাড়ি তখন তাঁর ছিল না, দানপত্র করে তা দেশবাসীর হাতে অর্পণ করেছেন। উঠলেন তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়িতে। সহকর্মী ও অনুরাগীজন দেখা করতে আসেন, কুশল কামনা করেন সকলেই। একদিন নিশীথচন্দ্র সেন এলেন দেখা করতে। নিশীথ তাঁর অতি প্রিয় পাত্র। তিনি যখন হাইকোর্টের একজন দিকপাল ব্যারিস্টার বলে গণ্য হয়েছেন তখন থেকেই নিশীথচন্দ্র তাঁর জুনিয়র হিসেবে কাজ করেছেন। দেখা করতে এসে নিশীথচন্দ্র তাঁর প্রিয় নেতার রোগক্লিষ্ট শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'অনেক তো খাটলেন এবার একটু বিশ্রাম নিন'। দেশবন্ধু বলেন, 'নিশীথ, খাটছি বটে, কিন্তু দেহ তো আর বয় না। আর পারি না।' অন্তরে কি মর্মবেদনা নিয়ে স্বরাজ-রথের সারথি সেদিন এই কথা বলেছিলেন, তা বুঝবার মতো লোক ছিল না। সাতকড়িপতি রায় তখন প্রদেশ কংগ্রেসের সেক্রেটারি, তাঁর একজন বিশ্বস্ত সহকর্মী। তিনি এসে কর্তার কুশল জিজ্ঞাসা করেন। অন্তরঙ্গস্থানীয় সহকর্মীরা দেশবন্ধুকে 'কর্তা' বলে ডাকতেন। তাঁকে দেশবন্ধু বললেন, 'তোমরা গঙ্গার ধারে আমার জন্তে একটা কুঁড়েঘর তৈরি করে দিও, জীবনের

শেষ কয়টা দিন আমি সেখানেই থাকব।' হায়, রাজরাজেশ্বর, একদিন কুবেরের ঐশ্বর্য ছিল তোমার, কমলার কৃপা তোমারই শিরে বর্ষিত হয়েছে অজস্রধারে, দেশমাতৃকার চরণে সে-সব অর্পণ করে আজ তুমি ভিখারী সেজেছ, প্রাসাদ ত্যাগ করে আজ তাই তুমি পর্ণকুটীরে বাস করার বাসনা জানালে। এই তো তোমার যোগ্য কথা।

১৯২৫ সালের গোড়া থেকেই দেশবন্ধু মিটমাটের কথা চিন্তা করছিলেন ও এজন্য ইংলণ্ড যাওয়ার ইচ্ছাও ছিল তাঁর। নিজের ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য আর বিশেষভাবে পার্লামেন্টের সদস্যদের সঙ্গে মিটমাট সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে আলোচনা করতে পারলে সব বিষয় ঠিক হয়ে যাবে—এই তাঁর ধারণা ছিল। কিন্তু অর্থাভাবে যেতে না পারায় দুঃখিত হন। শোনা যায়, বার্কেনহেডের কাছ থেকেও কিছু শর্ত এসেছিল তাঁর কাছে। এই অর্থাভাবের কথা তিনি তাঁর সহপাঠী ও বন্ধু প্রখ্যাত সিভিলিয়ান জে. এন. গুপ্তের কাছে বলেছিলেন—বলেছিলেন, 'আমার টাকা নেই ভাই, আর আমি কখনো নিজের জন্য পার্টির তহবিল খরচ করি না।' গুপ্ত সাহেবই তাঁকে এই সময়ে লণ্ডন যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন। সিংহল অথবা ইংলণ্ডের জলবায়ু তাঁর তখনকার স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী হবে, এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন স্বনামধন্য চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকার। এই কথা শুনে, কথিত আছে, দেশবন্ধুর অনুরাগী এক ধনী ব্যক্তি তাঁকে দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি তা গ্রহণ করেন নি ; বলেছিলেন, 'টাকাটা স্বরাজ ফাণ্ডে দিও, কাজ হবে।'

আর একদিন। সত্যরঞ্জন বক্সী প্রমুখ তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্মী (সত্যরঞ্জন দীর্ঘকাল 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ও রাজবন্দী হিসাবে অনেক দিন আটক ছিলেন) দেখা করতে এসে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ফরিদপুর কন্‌ফারেন্সের দাবী সরকার

যদি অগ্রাহ্য করে তখন কি হবে?' দেশবন্ধু এর উত্তরে বললেন—জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র উপায় জনসাধারণের মধ্যে তীব্র জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলা। এই issue নিয়েই তিনি আগামী বছরের নির্বাচনে দাঁড়াবেন। এই কথার মধ্যে দেশবন্ধুর ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর আভাস পাওয়া যায়। ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯২৬ সাল যে একটা সংকটজনক বৎসর হবে, এই ধারণাটা তাঁর মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়েছিল এই সময়ে। মতিলাল নেহরুকে দার্জিলিং থেকে লেখা একটি পত্রের (এই চিঠির তারিখ ৯ই মে, ১৯২৫) মধ্যে এর সুস্পষ্ট আভাস ছিল। সেই পত্রে তিনি লিখেছিলেন: 'আমাদের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা সংকটকাল ঘনাইয়া আসিতেছে। এই বৎসরের শেষভাগে এবং আগামী বৎসরের প্রথম দিকটাতে অফুরন্ত কাজ আমাদিগকে করিতে হইবে। আমাদের সমস্ত শক্তি উহাতে প্রয়োগ করিতে হইবে। অবস্থা তো ইহাই, অথচ আমরা উভয়েই এই সময়ে পীড়িত। ভগবান জানেন কি ঘটিবে।' যা ঘটবার তা ইতিহাসের অনিবার্য গতিপথে ঘটেছিল, কিন্তু সেই সংকটের দিনে দেশবন্ধু আর ইহলোকে ছিলেন না।

শেষ পর্যন্ত দার্জিলিং যাওয়াই ঠিক হয়।

সেখানে তিনি থাকবেন কোথায়? সে সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে এলেন স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার। দার্জিলিং-এ 'স্টেপ এস্যাইড' নামে তাঁর যে বাড়ি ছিল (বর্তমানে উহা দেশবন্ধুর স্মৃতি-মণ্ডিত একটি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে), সেইখানেই দেশবন্ধুর থাকবার ব্যবস্থা হলো। পরিচর্যারও। ১৫ই মে তিনি সপরিবারে দার্জিলিং পৌঁছলেন। পথিমধ্যে কয়েকদিন পাবনায় পদ্মার তীরে অবস্থান করেন। পদ্মা তাঁর প্রিয় নদী ছিল। বন্ধুদের হেসে বলছেন, আমার জীবনটা যেন অনেকটা এই পদ্মার মতো, এক কুল ভাঙি তো অন্য কুল গড়ি। ভাঙা-গড়াই তো

মানুষের জীবন।' জীবন-রসিক দেশবন্ধু একথা যেমন জানাতেন এমনটা বোধ হয় তাঁর সমকালীন আর কেউ জানতেন না।

দার্জিলিং-এ তাঁর অবস্থান কাল ঠিক একমাস।

বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যলাভের জন্য এসেছিলেন বটে, কিন্তু সর্বক্ষণের জন্য চিন্তা করতেন শুধু দেশের ভবিষ্যৎ। 'ফরওয়ার্ড'-সম্পাদক প্রফুল্ল-কুমার চক্রবর্তী মে মাসের শেষ সপ্তাহে একবার দার্জিলিং এসেছিলেন দেশবন্ধুকে দেখতে। তিনি লিখেছেন: 'স্টেপ এ্যাসাইডের বারান্দায় একটি সোফার উপর অর্ধশায়িত দেশবন্ধুর সেই মূর্তি আমি কখনো ভুলব না। কথা বললেন মৃদুস্বরে—ওষ্ঠে সেই চিত্তজয়ী মৃদু হাসি আর দুই চক্ষে উজ্জ্বল দৃষ্টি। দেশই ছিল তাঁর মন জুড়ে—সেখানে অন্য চিন্তা ছিল না। কিছুক্ষণ কথার পর বললেন, প্রফুল্ল এখন এসো। আমি একটু নাম করব।'

জুন মাসের গোড়ায় একদিন সকালে দেশবন্ধু সাক্ষাৎ করতে এলেন তাঁর বন্ধু পৃথ্বীশচন্দ্রের সঙ্গে। স্টেপ এ্যাসাইড থেকে তাঁর বাসভবন ছিল অনেক দূরে—শহরের একপ্রান্তে বললেই হয়। একটা রিক্সা চেপে তিনি এতটা পথ অতিক্রম করেছিলেন প্রাতঃভ্রমণ হিসাবে। উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা হয় অনেকক্ষণ। এই প্রসঙ্গে পৃথ্বীশচন্দ্র স্বয়ং লিখেছেন:

In the course of a conversation Chittaranjan frankly confided to me his anticipations of the Birkenhead-Reading conversations. He gave me the impression that, given the gesture he was looking for, he would even be prepared to accept the task of forming a Ministry and administer the transferred departments from a constructive point of view. On terms of honourable co-operation he was even prepared to work the Montagu Act, provided only that the

Minister-in-charge of transferred departments were made masters in their own houses, with independent powers of purse and without the risk of interference from the head of the administration.'*

এর থেকেই আমরা জানতে পারি, তখন দেশবন্ধুর মনের হাওয়া কোন্ দিকে বইছিল—কোন্ খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল তাঁর চিন্তার স্রোত। আমরা অনুমান করতে পারি—অনুমান নয়, ইহা সত্য—দার্জিলিং আসার পর থেকেই দেশবন্ধু যেন উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে সাগরপার থেকে একখানি চিঠির অথবা একটি ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করছিলেন। বড়লাট লর্ড রিডিং তখন লণ্ডনে গিয়ে ভারতসচিবের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। সংবাদপত্রে সেই সংবাদ পাঠ করে অবধি দেশবন্ধুর মন বলছিল, এই আলোচনার ফলে একটা কিছু হবেই। মৃত্যুর তিনদিন আগেও এক বন্ধুকে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন: 'জুলাই অথবা আগষ্ট মাসে কিংবা তারপরে একটা কিছু ঘটতে পারে এই বার্কেনহেড-রিডিং আলোচনার ফলে। আমার মন বলছে, এবার ওরা একটা না একটা প্রস্তাব করবে আমাদের কাছে। সে প্রস্তাব কাজের হবে কিনা সেটা অন্য কথা। কিন্তু গ্রহণযোগ্য কিছু যদি না আসে তবে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে কংগ্রেসকে একটা পরিষ্কার পন্থা দেখাতেই হবে।'

সরোজিনী নাইডুর সভানেত্রীত্বে ১৯২৬ সালের কংগ্রেস যখন সত্যই দেশকে একটা সুনির্দিষ্ট পন্থার সন্ধান দিল তখন দেশবন্ধু জীবিত ছিলেন না। গান্ধী তখনো বাংলাদেশে। ফরিদপুর সম্মিলনীর পর তিনি পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলায় পরিভ্রমণ করছিলেন। আবার মে মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা। দেশবন্ধু তাঁকে তাঁর রোগশয্যা

---

* *Life and Times of C. R. Das*: Ray

পার্শ্বে একবার পেতে চাইলেন। ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং শেষ হয়ে গেলে পাঁচ দিনের জন্য গান্ধী দেশবন্ধুর আতিথ্য গ্রহণ করতে এলেন দার্জিলিং। ৪ঠা জুন সকালে যখন তিনি এসে পৌঁছলেন তখন তাঁকে কাছে পেয়ে দেশবন্ধুর সে কি আনন্দ! দুই নেতার মধ্যে এই শেষবারের মত সাক্ষাৎ। তখন তাঁর স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি হয়েছে। উভয়ের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সেই একই—লণ্ডনে বার্কেনহেড-রিডিং কথাবার্তা। 'Lord Birkenhead is a strong man and I believe he will do something for India'—এই আশা সেদিন তিনি গান্ধীর কাছেও প্রকাশ করেছিলেন বলে জানা যায়। এই সময়ে দেশবন্ধুর মনে প্রবল ধর্মীয় ভাব লক্ষ্য করে পরবর্তীকালে গান্ধী লিখেছিলেন: 'এই সময়ে রাজনীতি অপেক্ষা দেশবন্ধুর মনে একটা প্রবল ধর্মীয় ভাব লক্ষ্য করতাম। যদিও রাজনীতি তাঁর ধর্মাচরণেরই অঙ্গস্বরূপ ছিল, তথাপি তাঁর জীবনের শেষের কয়দিন তাঁর আধ্যাত্মিক প্রবণতা তাঁর সকল রাজনৈতিক চিন্তাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল।'

বস্তুতঃ দার্জিলিং আসার পর থেকে দেশবন্ধুর সমগ্র সত্তায় একটা আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এমন একটা প্রশান্ত মধুর ভাব তাঁর কথায়, তাঁর চিন্তায় এই সময়ে অভিব্যক্ত হয়েছিল যা দেখে তাঁর অন্তরঙ্গস্থানীয়দের মধ্যে অনেকেই, এমন কি গান্ধী পর্যন্ত, বিস্মিত হয়েছিলেন। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, বিদ্বেষ নেই, এমন কি আক্রোশের ভাব পর্যন্ত নয়। এর সাক্ষ্য দিয়েছেন প্রমথ চৌধুরী (বীরবল), এর সাক্ষ্য দিয়েছেন পৃথ্বীশচন্দ্র রায়। এঁদের উভয়ের অভিমত এই যে, এই সময়ে দেশবন্ধুর প্রকৃতিতে এমন একটা স্নিগ্ধ মাধুর্য দেখা গিয়েছিল যা তাঁর অতুলনীয় চরিত্রকে দিয়েছিল একটা নতুন ব্যঞ্জনা। যাঁদের বিরুদ্ধে আজীবন তীব্র সংগ্রাম চালিয়েছেন, যা ছিল তাঁর পুরুষ-কারের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য—এমন কি তাঁদের বিরুদ্ধেও এখন তাঁর

কোন অভিযোগ ছিল না। এর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন পৃথ্বীশচন্দ্র। দেশবন্ধুর মৃত্যুর প্রায় দেড়মাস পূর্বে প্রকাশিত হয় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা (*A Nation in Making*)। তাঁর ফরওয়ার্ড পত্রিকায় বইখানি সমালোচনা করবার জন্য দেশবন্ধু তাঁর বন্ধু পৃথ্বীশচন্দ্রকে অনুরোধ করেন এবং তাঁকে বিশেষভাবে বলেন, 'দেখো, সমালোচনাটা যেন কঠিন না হয়।' তেমনি তাঁর এই সময়কার কথাবার্তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর পূর্বেকার বিদ্বিষ্ট মনোভাব আর বিন্দুমাত্র ছিল না; বরং তাঁর পরিকল্পিত এশিয়াটিক ফেডারেশনের একমাত্র যোগ্য নেতা তিনি কবিকেই মনে করেছিলেন এবং বন্ধু পৃথ্বীশচন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন, তিনি যেন কলকাতায় ফিরে গিয়ে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ-আয়োজন করবার জন্য কবিকে সচেষ্ট হতে ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর প্রতি তিনি যে কিছুটা অবিচার করেছিলেন, এ অনুশোচনাও তাঁর মনের মধ্যে উঁকি দিয়েছিল এবং হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে বলেছিলেন, 'হেমেন্দ্র, তুমি কলকাতায় গিয়ে শ্যামসুন্দরের সঙ্গে একবার দেখা করে বলো, তিনি যেন আমার উপর রাগ না করেন।' হেমেন্দ্রবাবুর মুখে শুনেছি, তিনি যখন দার্জিলিং থেকে ফিরেই 'সার্ভেন্ট' অফিসে এসে শ্যামসুন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে দেশবন্ধুর ঐ কথা জ্ঞাপন করেন, তখন সেই ব্রাহ্মণ তাঁর অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি; বলেছিলেন, 'আমি কি কখনো চিত্তর উপর রাগ করতে পারি? তাকে যে আমি প্রাণের চেয়ে ভালবাসি।' গান্ধী সত্যিই বলেছেন, 'আমার দার্জিলিং-এ অবস্থানকালে আমি কোনো দিনই তাঁর মুখ থেকে তাঁর কোন বিরোধীর সম্বন্ধে তীব্র ভাষা বহির্গত হতে শুনি নি।'

এইভাবে বিভিন্ন লোকের একাধিক বিবরণ থেকে (এবং এঁরা সকলেই দার্জিলিং-এ দেশবন্ধুর রোগশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন ও এঁদের অনেকের সঙ্গেই তিনি তখন প্রাণ খুলে কথা বলেছিলেন)

জানা যায় যে, দেশবন্ধুর প্রকৃতিতে এই সময় সত্যিই একটা আশ্চর্য রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়েছিল। আমরা অনুমান করতে পারি, তাঁর সমগ্র সত্তা যেন বিদ্বেষ ও অভিমানশূন্য এক অপার্থিব কমনীয় মাধুর্যে ও অনাবিল প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। চিত্তের সেই প্রগাঢ় প্রশান্তি ও বিনম্র মাধুর্যের ভিতর দিয়েই বুঝি তিনি জীবনের পর-পারে যাত্রা করেছিলেন। সেই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সংগ্রামময় জীবনের এইটাই তো ছিল স্বাভাবিক পরিণতি। তাঁর যৌবনকালে অন্তর্যামীর উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন :

এস আমার মৃত্যুঞ্জয়! এস অবিনাশি।
বুকের মাঝে বাজিয়ে দাও অভয় তোমার বাঁশি।

'স্টেপ এ্যাসাইড'-এর ঘরটিতে রোগশয্যায় শায়িত দেশবন্ধুর শেষের দিনগুলি যখন এক নিবিড় নীরবতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল তখন, আমরা অনুমান করতে পারি, তাঁর এই আরাধ্য দেবতা বরাভয় নিয়ে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

১৬ই জুন, মঙ্গলবার, ১৯২৫।

বাংলা ২রা আষাঢ়, ১৩৩২।

সময় অপরাহ্ন—ঘড়ির কাঁটা তখন সাড়ে পাঁচটার ঘরে এসেছে। অমনি নিস্তব্ধ হয়ে গেল দেশবন্ধুর প্রাণস্পন্দন। দিনের সূর্য তখনো অস্ত যায় নি, ভারতসূর্য অস্তমিত হলেন। হিমালয়ের পাদমূলে কর্মক্লান্ত দেহভার রক্ষা করে, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন শত যুদ্ধের বিজয়ী বীর চিত্তরঞ্জন। বাংলার আশা-ভরসা সঙ্গে নিয়ে লোকান্তরে গমন করলেন লোককান্ত মহান্ নেতা। অন্তর্হিত হলেন ভারতের রাজনীতিক্ষেত্র থেকে এক বিরাট শক্তিমান পুরুষ। সকলের দৃষ্টির অন্তরালে মহাপ্রস্থান করলেন এক স্বাপ্নিক, এক অক্লান্ত যোদ্ধা—নবযুগের শৃঙ্খলমুক্ত 'প্রমেথুস'। বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ আচম্বিতে প্রত্যক্ষ করল এক ইন্দ্রপতন। চিরদিনের মতো নিস্তব্ধ হয়ে গেল নরকেশরীর সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বর যা একাদিক্রমে

পাঁচটি বছর ধরে ভারতের চারিপ্রান্তে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে শাসকের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল।

দেশবন্ধুর এই মৃত্যু মৃত্যু নয়— স্বদেশ-সেবাযজ্ঞে একটি পরিপূর্ণ আত্মাহুতি। ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামে একটা নবীন প্রেরণা সঞ্চারিত করে দেওয়ার জন্য বুঝি এমনই একটি মহিমান্বিত আত্মাহুতির প্রয়োজন ছিল। ভারতের লক্ষকোটি নর-নারী বেদনাবিহ্বল-চিত্তে প্রত্যক্ষ করল একটি অবিস্মরণীয় দীপ-নির্বাণ আর ভারতজননী সাশ্রুনেত্রে শুধু চেয়ে দেখলেন :

দিন সূর্য অস্ত গেল
সন্ধ্যার চিতায়।

সেই চিতাগ্নির আলোকে একটি মৃত্যুহীন প্রাণের যে উদ্ভাসন সেদিন দেখা গিয়েছিল, তা কি আমরা আর কোনদিন দেখতে পাব? শোকার্ত একটি জাতির অন্তর মথিত করে এই একটি প্রশ্নই সেদিন উঠেছিল। এই প্রশ্ন আজো রয়ে গেছে।

দেশবন্ধু যে কি রকম জনপ্রিয় নেতা ছিলেন সেটা তাঁর জীবিতকালে যেমন, তাঁর মৃত্যুর পরেও তেমনি দেখা গিয়েছিল। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তাঁর শবানুগমনে জাতিবর্ণ-ধর্মনির্বিশেষে তিন লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল। মহানগরীর রাজপথে সেই বিরাট শোকমিছিল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে একজন ইংরেজ সাংবাদিক লিখেছিলেন : 'The funeral of a great and popular leader in Calcutta last Thursday was the greatest and strangest scene witnessed anywhere in the British Empire.' সত্যি, এমন অদৃষ্টপূর্ব শবযাত্রা এদেশে কখনো দেখা যায় নি—এমন কি, পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহাসে কোন একজন রাষ্ট্রনেতার প্রতি সমগ্র জাতি এমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রদ্ধানিবেদন করে নি। দেশবন্ধু সত্যিই একজন মৃত্যুঞ্জয়ী রাষ্ট্রনেতা।

সেদিন, ৪ঠা আষাঢ়ের সেই বিষাদমলিন দিনটিতে, কেওড়াতলার মহাশ্মশানে চিতাগ্নির লেলিহান শিখায়-যা পার্থিব, যা নশ্বর, যা ক্ষণস্থায়ী তা চক্ষের নিমেষে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু সেই চিতাভস্মের মধ্যে উৎকীর্ণ হয়ে রইল একটি মৃত্যুঞ্জয়ী নেতৃত্বের ইতিহাস যা ত্যাগে উজ্জ্বল, দেশ-সেবায় অনন্যসাধারণ আর সংগ্রামে অপরাজেয়। উত্তরপুরুষ একদিন সেই ইতিহাস স্মরণ করবে আর শ্রদ্ধা-বিনম্রচিত্তে বলবে :

'Kingly was Deshbandhu Das in every impulse and gesture of his life, royal alike in the splendour of his bounty and the splendour of his renunciation. As the idol of the nation he served with unsurpassing devotion. To the generations of to-morrow, he will grow into a radiant figure of historic legend and romance, a vital portion of epic beauty and grandeur of their spiritual heritage.'*

তাঁর জীবনের এই অলৌকিক ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ দ্বারা দেশবন্ধু তাঁর হৃদয়ের সমস্ত আবেগকে রূপান্তরিত করেছিলেন একটি আধ্যাত্মিক শক্তিতে আর রাজনীতির সংকীর্ণ ধ্যান-ধারণাকে অতিক্রম করে তিনি স্পর্শ করেছিলেন ভারত-আত্মার যথার্থ তন্ত্রীটিকে। এইখানেই তাঁর জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। একটি ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে এবং আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি কেন্দ্রীয় বিগ্রহ-মূর্তি হিসাবে দেশবন্ধু তাঁর স্বজাতির স্মৃতিপটে চিরকাল অম্লানভাবে বিরাজ করবেন।

জাতীয় জীবনের ধ্রুবনক্ষত্র দেশবন্ধুকে প্রণাম।

* সরোজিনী নাইডু প্রদত্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি

পরিশিষ্ট (ক)

।। সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে দেশবন্ধু ।।

দেশবন্ধু গিয়াছেন। যশোরশ্মিবিমণ্ডিত পূর্ণরবির ন্যায় তিনি জীবন-মধ্যাহ্নেই অস্ত গিয়াছেন। সিদ্ধিদাতার বরপুত্র তিনি বিজয়-মুকুট পরিয়াই ভারতের বিশাল কর্মক্ষেত্র হইতে দিব্যলোকে যাত্রা করিয়াছেন। অত্যন্ত ত্যাগের মধ্য দিয়া তিনি আজ অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আজ আমাদের বাহিরে তিমির, অন্তরে শূন্যতা। অনেকে মনে করেন যে, দেশবন্ধুর স্বদেশ সেবাব্রতের উদ্দেশ্য ছিল দেশমাতৃকার চরণে সবস্ব উৎসর্গ করা। কিন্তু আমি জানি তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ইহা অপেক্ষাও মহত্তর। তিনি তাঁহার পরিবারকেও দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং অনেকটা সফলও হইয়াছিলেন। বাহিরের ঘটনা সকলেই জানে। কিন্তু এই ঘটনার মূলে—লোকচক্ষুর অন্তরালে যে ভাব, যে আদর্শ, যে প্রেরণা নিহিত রহিয়াছে—তাহার সন্ধান কয়জন রাখে? তাঁহার সাধনা শুধু নিজেকে নয়—তাঁহার সাধনা তাঁহার সমস্ত পরিবারকে লইয়া।

দেশবন্ধুর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের সকল কথা আমি অবগত নই। তাঁহার জীবনের মাত্র তিন বৎসরকাল আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম এবং অনুচর হইয়া তাঁহার কাজ করিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত আমার শেষ দেখা আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। আরোগ্য লাভের জন্য এবং বিশ্রাম পাইবার আশায় তিনি সিমলা পাহাড়ে গিয়াছিলেন, আমাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সিমলা হইতে রওনা হইয়া কলিকাতায় আসেন। আমাকে দেখিতে তিনি আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে দুইবার আসেন এবং আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয় আমার বহরমপুর জেলে বদলী হইবার পূর্বে। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ হইলে আমি তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া বলিলাম, 'আপনার সঙ্গে আমার বোধ হয় অনেক দিন দেখা হইবে না।' তিনি তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ও উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, 'না, আমি তোমাদের শীগ্‌গির খালাস করে আনছি।' হায়, তখন কে জানিত যে ইহজীবনে আর তাঁহার দর্শন পাইব না? সেই সাক্ষাতের প্রত্যেক ঘটনাটি, প্রত্যেক দৃশ্যটি, প্রত্যেক ছায়াটি

পর্যন্ত আমার মানসপটে চিত্রের স্থায় আজো অঙ্কিত আছে এবং বোধ করি চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে। তাঁহার সেই শেষ স্মৃতিটুকু আমার প্রাণের সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জনমণ্ডলীর উপর দেশবন্ধুর অতুলনীয় অলৌকিক প্রভাবের নিগূঢ় কারণ কি, এ প্রশ্নের সমাধান করিবার অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন। আমি সর্বপ্রথমে অনুচর হিসাবে তাঁহার প্রভাবের একটি কারণ নির্দেশ করিতে চাই। আমি দেখিয়াছি তিনি সর্বদা মানুষের দোষগুণ বিচার না করিয়া তাহাকে ভাল-বাসিতে পারিতেন। তাঁহার ভালবাসার উৎপত্তি হৃদয়ের সহজ প্রেরণা হইতে; সুতরাং তাঁহার ভালবাসা গুণীর গুণের উপর নির্ভর করিত না। যাহাদিগকে আমরা সাধারণতঃ ঘৃণায় ঠেলিয়া ফেলি, তিনি তাহাদিগকে বুকে টানিয়া লইতে পারিতেন। কত বিভিন্ন রকমের লোক তাঁহার হৃদয়ের টানে নিকটে আসিত এবং জীবনের কত ক্ষেত্রে এই নিমিত্ত তাঁহার প্রভাব ছিল। সমুদ্রে প্রকাণ্ড ঘূর্ণাবর্তের স্থায় এই বিপুল জনসমাজে তিনি চারিদিক হইতে সকল প্রাণকে আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া শেষে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আমি জানি। যাঁহারা তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিকট মাথা নত করেন নাই, অসাধারণ বাগ্মিতায় বশীভূত হয়েন নাই, বিক্রমের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন নাই, অলৌকিক ত্যাগে মুগ্ধ হয়েন নাই, তাঁহারা পর্যন্ত ঐ বিশাল হৃদয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

তাঁহার সহকর্মীরা ছিলেন তাঁহার পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাহাদের উপকার অথবা মঙ্গলের জন্য কি না করিতে প্রস্তুত ছিলেন? জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না—একথা একশোবার সত্য। দেশবন্ধুর জীবন ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাঁহার অনুচরবর্গ ও সহকর্মিগণ তাঁহার আদেশে কি না করিতে পারিতেন? আমি জানি, তাঁহার অনুচরবর্গ তাঁহার কাজ করিতে গিয়া সানন্দে সকল প্রকার দুঃখ ও কষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছিল এবং তাহাতে গৌরব অনুভব করিয়াছিল। দেশবন্ধু ও জানিতেন যে, তাঁহার অহিংস সংগ্রামে তাঁহার এমন কতকগুলি সৈনিক আছে যাহাদের উপর তিনি সর্বাবস্থায় নির্ভর করিতে পারেন।

সাধারণ সাংসারিক জীবের স্থায় দেশবন্ধু আত্মপর জ্ঞান ছিল না।

তাঁহার বাড়ি সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছিল। সর্বত্র—এমন কি তাঁহার শয়ন প্রকোষ্ঠেও সকলের গতিবিধি ছিল। তাঁহার অন্তরের এবং বাহিরের সম্পদের উপর সকলের দাবী ছিল। তিনি তাঁহার অনুচরবৃন্দকে যে শুধু ভালবাসিতেন তা নয়, তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা সহিতেও প্রস্তুত ছিলেন। আমি বহুবার লক্ষ করিয়াছি তাঁহার অনুচরবর্গের প্রতি তাঁহার কত গভীর ভালবাসা, তাহাদের জন্য কত গভীর বেদনা, তাহাদিগকে সমর্থন করিতে গিয়া তাঁহার কত লাঞ্ছনা।

দেশবন্ধুর সঙ্ঘগঠনের অপূর্ব শক্তি দেখিয়া অনেকে বিমোহিত হইতেন—হইবারও কথা। কারণ দেশবন্ধু যাহা দেখাইয়া গেলেন তাহা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন। তিনি যে পর্বতের ন্যায় অটল সঙ্ঘ গঠন করিয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল নায়ক ও অনুচরবর্গের মধ্যে প্রাণের সংযোগ। ইহা ব্যতীত দোষগুণ নির্বিশেষে ভালবাসিবার ক্ষমতার সাহায্যে এবং তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশলের দ্বারা তিনি ভিন্ন ভিন্ন পন্থী ও ভিন্ন-রুচি লোকদিগকে একত্র চালাইতে পারিতেন। অনেকে বলিয়াছেন যে দেশবন্ধুর অনুচরবর্গ বা সহকর্মিগণ দাসত্বপরায়ণ ছিলেন। দেশবন্ধুর মন্ত্রণাগৃহে যাঁহারা কখনো উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা একথা আদৌ সমর্থন করিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না। তিনি আলোচনার সময় কখনও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন বটে কিন্তু নির্ভীক ও স্পষ্টবাদীর উপর তিনি কোনও দিন মনে বিরক্ত হইতেন না।

১৯২১ সালে ডিসেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে আমি মাত্র ৩।৪ মাস কাল তাঁহার অধীনে কাজ করিয়াছিলাম। সুতরাং সেই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাকে ভালরকম বুঝিবার সুবিধা আমার হয় নাই। তারপর যখন আটমাস কাল দেশবন্ধুর সহিত কারাগারে একত্র বাস করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য ঘটিল তখন খাঁটি মানুষটিকে আমি চিনিতে পারিলাম। দেশবন্ধু যে সহজ ও অনাবিল রসিকতার অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন একথা আমি জেলখানায় ভালরকম বুঝিতে পারি।

ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। সাহিত্য বিষয়ে যে তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে সাহিত্যের অবতারণা করিয়া তিনি সাহিত্যকে যেরূপ সজীব সর্বসাধারণের উপভোগের বস্তু করিতে পারিতেন এরূপ আর কয়জন সাহিত্যিক করিতে পারিতেন বা পারেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। ইংরেজী

কবিদের মধ্যে তিনি ব্রাউনিং-এর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। ব্রাউনিং-এর অনেক কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।

যে আটমাস কাল তাঁহার সঙ্গে ছিলাম সেই সময়ে তাঁহার অন্তরের সকল কথা ও অনুভূতি জানিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল, কিন্তু আমি কোনও দিন কোনও কাজে অথবা কোনও কথার মধ্যে নীচতার চিহ্ন পর্যন্ত পাই নাই। তাঁহার শত্রু রাজনীতিক্ষেত্রে অনেক ছিলেন এবং তিনি তাঁহাদের কথা জানিতেনও। কিন্তু কাহারও প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না—এমন কি প্রয়োজন হইলে তিনি তাঁহাদের সাহায্য করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

দেশবন্ধু বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম বা বিবাদ পছন্দ করিতেন না এবং তিনি এ বিষয়ে কার্ল মার্কসের বিরোধী ছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁহার আশা ছিল যে, ভারতের সকল ধর্মসম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে চুক্তিপত্রের (pact) সাহায্যে সকল বিবাদ দূর হইবে এবং জাতি-ধর্ম-শ্রেণী-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী স্বরাজ আন্দোলনে যোগদান করিবে। অনেকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন যে, চুক্তিপত্রের সাহায্যে প্রকৃত মিলন সংঘটিত হইতে পারে না, কারণ উহা সমবেদনা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে, দর কশাকশির উপর নির্ভর করে না। দেশবন্ধু ইহার উত্তরে বলিতেন যে, আপোসে মিটমাট না করিয়া লইতে পারিলে মানুষ একদিনও এ সংসারে বাঁচিতে পারে না এবং মনুষ্য সমাজও একদিনও টিকিতে পারে না।

ভারতের হিন্দু-জননায়কদের মধ্যে দেশবন্ধুর মতো ইসলামের এত বড় বন্ধু আর কেহ ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না—অথচ সেই দেশবন্ধুই তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অগ্রণী হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মকে এত ভালবাসিতেন যে তার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন অথচ তাঁর মনের মধ্যে গোঁড়ামি আদৌ ছিল না। সেইজন্য তিনি ইসলামকে ভালবাসিতে পারিতেন। দেশবন্ধু ধর্মমত হিসাবে বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বুকের মধ্যে সকল ধর্মের লোকের স্থান ছিল। চুক্তিপত্রের দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন হইলেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না যে শুধু তাহারই দ্বারা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসা জাগরিত হইবে। তাই তিনি কালচারের দিক দিয়া হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে মৈত্রী সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেন।

ভারতে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে উচ্চশ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়

জনসাধারণের উপকার ও মঙ্গলের জন্য; একথা দেশবন্ধু যেরূপ জোর গলায় প্রচার করিয়াছিলেন, প্রথম শ্রেণীর আর কোন নেতা সেরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। স্বরাজ জনসাধারণের জন্য, একথা পৃথিবীতে নূতন নয়। য়ুরোপে বহুকাল পূর্বে এ মন্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল কিন্তু ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে একথা নূতন বটে। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে একথা লিখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজীর সে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিধ্বনি ভারতের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে শুনা যায় নাই।

বাংলার সভ্যতা ও শিক্ষার সার সংকলন করিয়া তাহাতে রূপ দিলে যেরূপ মানুষের উদ্ভব হয় দেশবন্ধু অনেকটা সেইরূপ ছিলেন। তাঁহার গুণ বাঙালীর গুণ, তাঁহার দোষ বাঙালীর দোষ। তাঁহার জীবনের সবচেয়ে বড় গৌরব ছিল যে তিনি বাঙালী। তাই বাঙালী জাতিও তাঁহাকে এত ভালবাসিত। বাংলার যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, বাঙালীর চরিত্রে যে সে বৈশিষ্ট্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে—একথা দেশবন্ধু যেরূপ জোরের সহিত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পূর্বে সেরূপ আর কেহ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। দেশবন্ধু তাঁহার স্বদেশপ্রেমের মধ্যে বাংলাকে ভুলিয়া যাইতেন না। অথবা বাংলাকে ভালবাসিতে গিয়া স্বদেশকে ভুলিতেন না। তিনি বাংলাকে ভালবাসিতেন প্রাণ দিয়া, কিন্তু তাঁহার ভালবাসা বাংলার চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। দেশবন্ধুর সময়ে বাংলা স্বরাজ আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়াছিল। তাঁহার দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা আবার নেতৃত্ব হারাইয়াছে, কবে ফিরিয়া পাইবে ভগবানই জানেন।

* সুভাষচন্দ্রের বিভিন্ন পত্র থেকে সংকলিত

পরিশিষ্ট (খ)

॥ দেশবন্ধুর জীবন-পঞ্জী ॥

১৮৭০ (৫ই নভেম্বর)	জন্ম।
১৮৮৬	এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস।
১৮৯০	বি. এ. পরীক্ষায় পাস ও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত গমন।
১৮৯৩	ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন ও কলিকাতা হাইকোর্টে এ্যাডভোকেট হিসাবে যোগদান।
১৮৯৫	প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মালঞ্চ' প্রকাশিত।
১৮৯৬	পিতৃঋণের দায়ে আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত।
১৮৯৭ (৩রা ডিসেম্বর)	বাসন্তী দেবীর সঙ্গে বিবাহ।
১৮৯৯	পুত্র চিররঞ্জনের জন্ম।
১৯০৫	'স্বদেশীমণ্ডলী' স্থাপন ও স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান।
১৯০৬	বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিলনের প্রধান প্রস্তাব রচনা।
১৯০৭	রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পালের মামলায় তাঁদের পক্ষ সমর্থন।
১৯০৯	আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন। ডুমরাঁও মামলা গ্রহণ।
১৯১০	ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিন দাসের পক্ষ সমর্থন।
১৯১১	দ্বিতীয়বার বিলাত গমন ও 'সাগর-সঙ্গীত' রচনা।
১৯১৩	দেউলিয়া থেকে নিষ্কৃতি লাভ। মাতা নিস্তারিণী দেবীর মৃত্যু।
১৯১৪	দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় আসামীপক্ষ সমর্থন। পিতা ভুবনমোহন দাশের মৃত্যু। 'নারায়ণ' প্রকাশিত।
১৯১৭	ভারতসচিব মণ্টেগুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি। বাঁকিপুর বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি।
১৯১৮	বোম্বাইতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগদান

ও দিল্লী কংগ্রেসে রাউলাট কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তৃতা।

১৯১৯ — ময়দানের জনসভায় সত্যাগ্রহের শপথ গ্রহণ, ময়মনসিংহে প্রাদেশিক সম্মিলনীতে যোগদান। কংগ্রেস-পরিচালিত জালিয়ানওয়ালাবাগ তদন্ত কার্যে যোগদান। অমৃতসর কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান এবং নতুন শাসন-সংস্কারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা ও প্রস্তাব উত্থাপন।

১৯২০ — কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীর অসহযোগ নীতির বিরোধিতা।
নাগপুরে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে যোগদান ও অসহযোগনীতির সমর্থন।

১৯২১ — প্র্যাক্‌টিস ত্যাগ।
বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ।
দেশবন্ধুর অধীনে কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের যোগদান।
সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার।
আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত।

১৯২২ — ছয় মাসের জন্য বিনাশ্রমে কারাদণ্ড।
গয়া কংগ্রেসের সভাপতি।

১৯২৩ — মতিলাল নেহরুর সহযোগিতায় 'স্বরাজ্যদল' গঠন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনের সভাপতি। ইংরেজী দৈনিক 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা স্থাপন। নির্বাচনে জয়লাভ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে লর্ড লিটন কর্তৃক নতুন শাসন-সংস্কার অনুযায়ী নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রিত।

১৯২৪ — কলিকাতা পৌরসভার প্রথম মেয়র নির্বাচিত।
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্বরাজ্যদলের প্রথম দলপতি। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ পরিচালনা।
সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সম্মিলনীতে যোগদান।
কলিকাতায় নিখিল ভারত স্বরাজ্যদলের সম্মিলন।
শেষবারের মতো কংগ্রেসের বেলগাঁও অধিবেশনে যোগদান।

১৯২৫ (মে) — ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতি।

১৯২৫ (১৬ই জুন) — দার্জিলিং-এ মৃত্যু।

॥ শুদ্ধি-পত্র ॥

অনবধানবশত বইটির মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক মুদ্রাকর প্রমাদ রয়ে গেছে । এখানে সেগুলির সংশোধিত রূপ দেওয়া হলো। সহৃদয় পাঠকবৃন্দ যেন পড়বার সময় শুদ্ধি-পত্রটি একবার মিলিয়ে নেন।

—গ্রন্থকার।

পৃষ্ঠা	খণ্ড	আছে	হবে
৩	১ম	সত্বার	সত্তার
১০	,,	লোককে	লেখককে
১০	,,	নিস্পভ	নিষ্প্রভ
১০	,,	দিয়াছেন	দিয়েছেন
১৯	,,	সভা	সত্তা
২০	,,	ক্ষত্রশক্তির	ক্ষাত্রশক্তির
৩৪	,,	মানসিক	সামাজিক
৩৪	,,	প্রভার	প্রভাব
৩৫	,,	স্মরণীয়	আচরণীয়
৪১	,,	প্রয়োজনই	প্রয়াসই
৫৬	,,	এর	×
৬১	,,	স্ট্রীট	স্ট্রীটে
৭৭	,,	যিনি	তিনি
৯৯	,,	Remi riscences	Reminiscence
১০১	,,	প্রধান	প্রবীণ
১০১	,,	মিছরি	মিছরির
১১০	,,	বর্ণিত	রণিত
১১৯	,,	'সাগর-সঙ্গীতে'	'সাগর-সঙ্গীত'

পৃষ্ঠা	খণ্ড	আছে	হবে
১৫০	১ম	পরিবর্তনের	পরিবর্তিত
১৬৯	,,	জোনাখান	জোনাথান
১৭৩	,,	সংহতিটা	সম্পর্কটা
৩৫	২য়	উঠিতে	উঠতে
৮৭	,,	প্রাতভার	প্রতিভার
৯০	,,	প্রতিষ্ঠা মত ছিল	প্রতিষ্ঠা হয়, এই তাঁর
৯১	,,	বিশেষ	কর্তৃক
৯৩	,,	কংগ্রেসও	কংগ্রেসেও
৯৯	,,	and	are
১০০	,,	Bengal	Bengal,
,,	,,	in	is
,,	,,	non-co-operation	non-co-operator
১০১	,,	বললেন	বলিলেন
১০৪	,,	same	some
১০৮	,,	নিধারণ	নির্ধারণ
১০৯	,,	কিম্বদন্তীকে	কিম্বদন্তীতে
,,	,,	ডমরাঁও	ডুমরাঁও
,,	,,	উঠিল	উঠিলে
১১১	,,	চলছিল।	চলছিল
১১২	,,	মেন	যেন
১১৫	,,	বাষ্ট্রগুরু	রাষ্ট্রগুরু
১১৭	,,	তোমার	তোমরা
১২০	,,	চালাব।	চালাব ?
১২১	,,	সক্রিয়	সক্রিয়
১২৩	,,	আহ্বান	আহ্বানে
,,	,,	তখনো	কখনো
১২৫	,,	এখানে	এখনি
১২৬	,,	ভাড়ায়	ভাড়া

পৃষ্ঠা	খণ্ড	আছে	হবে
১২৭	২য়	উদ্বদ্ধ	উদ্বুদ্ধ
১২৯	,,	সেখানে	যেখানে
১৪৭	,,	ছিল	ছিলেন
১৫০	,,	নাগপুর	নাগপুরে
১৫৬	,,	আত্মসমর্থনের	আত্মসমর্পণের
১৬০	,,	রকম	ক্ষেত্রে
৩	৩য়	লাভ।	লাভ,
৬	,,	সবাই	সঙ্গেই
৮	,,	Rajandra	Rajendra
১৮	,,	বিদ্রোহীরই	বিদ্রোহেরই
২১	,,	হন,	হন
২৯	,,	সর্ববাদীসম্মতিক্রমে	সর্বসম্মতিক্রমে
৩০	,,	ভারতবর্ষে	ভারতবর্ষ
৩১	,,	নয়।	নয়,
,,	,,	দু'জনেই	দু'জনই
৪০	,,	নিজস্ত	নিজস্ব
৪২	,,	ধাড়া	ধর
৫৩	,,	Controvercy	Controversy
,,	,,	Vilified	vilified
৫৪	,,	ইতিহাসেই	ইতিহাসই
,,	,,	১৯২০	১৯২৩
,,	,,	solved ?	solved.
,,	,,	deleted	deleted.
৬০	,,	shame	sham
৭১	,,	চিত্তরঞ্জনও	চিররঞ্জনও
,,	,,	রসনার	রসনায়
,,	,,	রসে	রকম
৭৮	,,	করলেন ;	করলেন।

পৃষ্ঠা	খণ্ড	আছে	হবে
৮০	৩য়	Law,	Law.
৮১	,,	আইনসভা,	আইনসভা
৯১	,,	genious	genius
৯৪	,,	Common wealth	Commonwealth
৯৫	,,	allience	alliance
৯৫	,,	উত্থাপিতপূর্ণ	উত্থাপিত পূর্ণ
৯৬	,,	দি	দিয়ে।
১০২	,,	আত্মত্ব	আত্মকর্তৃত্ব
১০৩	,,	স্বানীতা	স্বাধীনতা
১০৫	,,	এখন	এমন
১১২	,,	এই পৃষ্ঠার ফুটনোট ১১১ পৃষ্ঠায় বসবে	